বাংলা উপন্যাসের

।। কালান্তর ।।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-নয়

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
১৯৬১ | ১৩৬৮

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-ছয়

উপন্যাসরসজ্ঞ বন্ধু

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের

করকমলে ॥

প্রায় আট বছর আগে 'নতুন সাহিত্য ভবন' থেকে 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' বেরিয়েছিল। বইখানি বাজারে বহুদিন নিঃশেষিত। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার রায় ও প্রকাশক শ্রীতপনকুমার ঘোষের উৎসাহে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমার বন্ধু শ্রীঅনিলকুমার সিংহ। গ্রন্থের জন্মকালে, কিছু সুপরামর্শে ও গ্রন্থের নামকরণে অধ্যাপক শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী যে সহৃদয়তা ও যত্ন নিয়েছিলেন তা বন্ধুপ্রীতি নয়, সাহিত্য-দায়িত্ব। এটাই তাঁর চরিত্র।

বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান আলাপ-আলোচনা তখন নানাদিকে আলোকসম্পাত করেছিল। আনন্দের সঙ্গে সে বুদ্ধিদীপ্ত আলাপনকে স্মরণ করি। সহকর্মী বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তীর বিভিন্ন আলোচনা আমাকে নানা চিন্তার উপাদান যুগিয়েছে।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর যে সকল সমালোচক, অধ্যাপক, লেখক ও পাঠক গ্রন্থটিকে অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনায় সম্মানিত করেছেন তাঁদের সকলকে আমি নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার ছাত্রী শ্রীমতী শুক্তিসিতা ভট্টাচার্য, এম. এ. বিশেষ যত্নে এবারের গ্রন্থটির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছে। তাকে আশীর্বাদ জানালাম।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য ১ ॥ উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ৩০ ॥ উপন্যাসের ভাষারীতি ৫০ ॥ বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল ৬৮ ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা ৯৬ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নবনিরীক্ষা ১৫২ ॥ শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা ২২৩ ॥ জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ২৬২ ॥ তিরিশের যুগ: বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি ২৭৬ ॥ উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস ৩৪০ ॥

উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য

এক

কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে যেমন কখনো কখনো সময়ের অগ্রবর্তী চেতনার উন্মেষ দেখা যায়, কোনো কোনো রচনাতেও তার ছায়া পড়ে। কিন্তু ছায়া-লক্ষণের দ্বারা কোনো সাহিত্যের যুগ নির্ণয় হয় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লেখা শ্রীমতী মুরাসিকির 'গেন্‌জীর কাহিনী' জাপানী সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস অথবা উপন্যাস-কল্প রচনা যাই হোক না কেন এটা উপন্যাসের যুগারম্ভসূচক বলে গৃহীত হতে পারবে না। মুরাসিকি অথবা গিয়োভান্নি বোকাচিও অথবা বাণভট্ট একজাতীয় লেখক নন। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। বাস্তবধর্মী হোক বা রোমান্সপন্থী হোক, লৌকিক মর্ত্য-অনুরাগের কাহিনী-কথনে লেখকেরা গদ্য-মাধ্যমের প্রতি বিশিষ্ট আনুগত্য দেখিয়েছেন। গদ্য-মাধ্যমের চর্চা এই পথে ও আরো নানা পথে চলতে চলতে অবশেষে কালান্তরের আনুকূল্যে উপন্যাসের তাৎপর্য পেয়েছে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাসের যুগারম্ভ হয়নি যতক্ষণ না উপন্যাস যুগ-শিল্প হয়ে উঠেছে। তখনই শিল্প-রূপের বিচারে উপন্যাস বিশিষ্টতা দাবী করতে পেরেছে।

ইতিহাস বিচারে যাকে আধুনিক কাল বলা হয় সে-কালেরই সাহিত্যকর্মের প্রধান এবং শক্তিশালী শাখা হল উপন্যাস—একথা সমালোচকদের দৌলতে আমাদের জ্ঞাত। সে কারণেই উপন্যাসের বিচারকার্যের প্রারম্ভে এবং সমগ্র ভাবে উপন্যাস সংক্রান্ত কোনো আলোচনার উপক্রমণিকায় আধুনিক কাল-লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত বর্তমান গ্রন্থেও সে আলোচনা যথোপযুক্ত সময়ে হবে। আপাতত আমাদের আলোচনা এ প্রবন্ধের শিরোনামাকে লঙ্ঘন করবে না। উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হবার পর বাংলা উপন্যাস আলোচনাকালে কাল-লক্ষণ বিচার প্রাসঙ্গিক হবে।

এ আলোচনায় প্রথমেই একটি অপরিহার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। উপন্যাস সত্যই একটা নির্দিষ্ট শিল্পরূপ বা art-form কিনা? একথা আমরা জানি যে উপন্যাস ছোট গল্প নয়, কবিতা নয়, নাটক নয়। কিন্তু এ তো মাত্র নেতিবাচক

পরিচিতি। যে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একটা সনেটকে বলি সনেট, ছোট গল্পকে বলি ছোট গল্প বা নাটককে বলি নাটক, উপন্যাসের বেলায় সে ধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট এবং অব্যর্থ সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া যায় কি না এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু অবকাশ আছে। Tristram Shandy, Moby Dick এবং Sign of Four, আবার এদিকে Magic Mountain এবং Ulysses—এর সবগুলিই উপন্যাস বলে অভিহিত। অথচ আমরা জানি যে মবি ডিক-কে সার্থক উপন্যাস আখ্যা দিলে আর ইউলিসিস-কে সে আখ্যাদানের যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না। আবার 'সাইন অব ফোর'-কে উপন্যাস আখ্যা দিলে ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর জন্য কোন্ সংজ্ঞার সন্ধান করব তা স্থির করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এক সময় মোঁপাসার কোনো উপন্যাসকে কোনো সমালোচক রচনা-হিসেবে রসোত্তীর্ণ বলেও, উপন্যাস হিসেবে সার্থক বলতে স্বীকৃত হননি। মোপাসাঁ তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রায় কুড়িখানি উপন্যাসের একটি তালিকা উপস্থিত করেন। উক্ত তালিকাভুক্ত উপন্যাসগুলির একটির সঙ্গে আর একটির এতই পার্থক্য যে একটিকে উপন্যাস বললে আরগুলিকে উপন্যাস বলা যায় না। মোপাসাঁরও প্রশ্ন ছিল এই যে, সার্থক উপন্যাস তাহলে কাকে বলব ?

পাঠকের দিক থেকে বিবেচনা করলে এর একটা প্রাথমিক উত্তর মেলে। আমরা যে-বাসনা নিয়ে নাটক দেখতে যাই, অথবা যে-আবেগ নিয়ে একটি কবিতা পড়ি সেই বাসনা এবং আবেগকে আমরা যেমন চিনি এবং জানি; উপন্যাসের কাছে আমাদের প্রত্যাশাকে তেমন করে আমরা জানি চিনি কিনা এর ওপরেই সার্থক উপন্যাস বলতে সঠিকভাবে আমরা কী বুঝি তার উত্তর নির্ভর করবে। নাটকে জীবনের ব্যাখ্যাকে আমরা হৃদয়স্থ করি দৃশ্যের মাধ্যমে। নাটক দৃশ্য-মাধ্যমী জীবন-ব্যাখ্যা। যেহেতু নাটকের প্রাথমিক আবেদন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের শ্রুতির কাছে এবং দৃষ্টির কাছে তাই সংক্ষিপ্তি নাটকের মূল লক্ষ্যের অন্যতম। এই সংক্ষিপ্তিকে শিল্পোজ্জ্বল করতে গিয়ে নাট্যকার জীবন থেকে ঘটনা এবং চরিত্রকে নাটকের মতো করে, নাট্যকারের মনোভাব নিয়ে নির্বাচন করেন। ঘটনার এবং চরিত্রের স্ব-স্ব অথবা পরস্পর দ্বন্দ্ব নাটকের অনিবার্য বিষয়। নাট্যকারের এই বিষয়-বৈশিষ্ট্যের কাঠিন্য নাট্যসূত্রের একটি প্রধান নির্দেশের ভিত্তি-নির্ভর। সেটা হল সময়ের অতিপাত। সময়ের অতিপাত বা passage of time নাটকের প্রধান কথা। এই সময়ের অতিপাতকে নাটকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার না করলে অতি বিশিষ্ট চরিত্র-কল্পনাও হানিগ্রস্ত হয়।

সময়ের অতিপাতের বাস্তব-নিষ্ঠ প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত objective co-relative-এর। এলিয়ট সাহেব তাঁর বিখ্যাত হ্যামলেট-বিষয়ক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে উপযুক্ত objective co-relative-এর অভাবে হ্যামলেট চরিত্র স্থিতিধর্মী হয়ে পড়েছে। পটোত্তলনের পর যে বিন্দু থেকে ঘটনার যাত্রা যবনিকাপাতের সময় সেই বিন্দু থেকে ঘটনাকে অনেকখানি এগিয়ে আসতে হবে। না হলে নাটকের প্রথম ও প্রধান শর্তই লঙ্ঘিত হয়।

অথচ আমরা জানি যে উপন্যাসে এ রকম কোনো কঠিন নিয়ম নেই। Passage of time বা সময়ের অতিপাত উপন্যাসের পক্ষে একটা প্রধান কথা হতেও পারে, আবার নাও পারে। ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এ অবশ্যই সময়ের অতিপাতের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু ইউলিসিস-এর উপন্যাস-মহিমা নিশ্চয় সময়ের অতিপাতের ওপর নির্ভরশীল নয়। সময়ের পরম্পরাও এ উপন্যাসে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক নয়। সে কারণেই মনে হয় যে নাটকের জন্য যে ধরণের নাটকীয় অনুভূতি প্রয়োজন, কবিতার জন্য যে-রকম কাব্যিক অনুভূতির দরকার, উপন্যাসের জন্য সে-ধরণের কোনো স্বতন্ত্র অনুভূতির আবশ্যক নেই। স্রষ্টা এবং ভোক্তা উভয়েই এখানে কাব্য এবং নাটকের চেয়ে বৃহত্তর প্রান্তরে উপস্থিত। এবং এটাই উপন্যাসের শিল্পরূপকে উপলব্ধি করার গোড়ার কথা। এখানে একটা পুরনো কথা আমাদের স্মরণে আসতে পারে যে, উপন্যাসকার কবি এবং নাট্যকার অপেক্ষা স্বাধীন। কথাটির মধ্যে যেন একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে যে, কাব্যে এবং নাটকে যে সাংগঠনিক কাঠিন্য বিদ্যমান, যে আঙ্গিকগত অনুশাসন উপস্থিত, ঔপন্যাসিক তা থেকে মুক্ত বলে তিনি অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকারী। অথচ এ অনুমান একেবারেই মিথ্যা। বরঞ্চ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই 'স্বাধীনতাই' উপন্যাসকারের দুরূহ সমস্যার স্থল।

নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই চলে, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়। তিনি জানেন যে জীবন নাটক, কাব্য, কাহিনী এবং হয়তো আরো অনেক কিছু। তাই উপন্যাস সর্বগ্রাসী। সার্থক শিল্পী জানেন যে মানুষের অন্তর্মুখীনতা বা হৃন্ময়তা কবিতারই বিষয়, তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকেরই বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানেন যে সেই হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামাজিক মানুষের সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান তখনই উপন্যাসের অগ্রাধিকার। এই উদ্দেশ্যেই the novelist has been quicker than the poet or the

philosopher to borrow their specialities, than they have to borrow his. শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। মানব-মনীষার অন্যতম প্রধান দান দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব, এবং সাহিত্য শিল্পের যতগুলি শাখা অর্থাৎ কবিত্ব, নাট্যরস এবং কাহিনীরস সকল কিছুরই উত্তরাধিকারকে বহন করছে উপন্যাস। সাহিত্য-শিল্পের আর কোনো শাখাই উপন্যাসের মতো সর্বার্থসাধক নয়। কিন্তু তাই বলে এটা ঔপন্যাসিকের পক্ষে কোনো সহজ উত্তরাধিকার নয়। কখন নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কার্যকরী হবে, কখন কার্যসিদ্ধি ঘটবে কবিত্বময় বর্ণনায়, তা উপন্যাসের জটিল অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত লেখকের পক্ষেই মাত্র জানা সম্ভব। তাই ঔপন্যাসিককে সর্ব-রস-সিদ্ধ হতে হয়। উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্ব-রস-ভোক্তা। হাতে সকল শক্তির সম্বল আছে বলেই কিন্তু ঔপন্যাসিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার নেই। যথাসময়ে নাটক পরিহার করে অকস্মাৎ কবিত্বময় বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ, অথবা যেখানে শুধু একটা বিশদ বর্ণনাতেই কাজ হতে পারত যেখানে গুরুগম্ভীর নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনা কেবল যে উপন্যাসের আঙ্গিকবিন্যাসেরই হানি ঘটায় তা নয়, লেখকের বিষয়ভাবনাও যে কতখানি ব্যত্যয়গ্রস্ত তারও পরিচয় দেয়।

এবং এই কাব্য-রস, কাহিনী-রস, এবং নাট্য-রস সকলকেই একাধারে সমন্বিত করার যে প্রচণ্ড শক্তি উপন্যাসের অধিগত, তার মূল রয়েছে উপন্যাসের শিল্প-মহিমার একান্ত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই। উপন্যাসের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। দ্বন্দ্বময় চরিত্র সৃজনে সফল হলেই ভালো নাটক সৃজিত হয়। অনুভূতিকে চিত্রকল্পময় করতে পারলেই কবিতার সাফল্য আসে। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারিত করতে না পারলে উপন্যাস ব্যর্থ। জীবনের গোটা রূপই উপন্যাসকারের ধ্যেয়। জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখেই উপন্যাসের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হেনরি জেম্‌স্ তাঁর সুবিখ্যাত Art of Fiction প্রবন্ধে বলেছেন :

As people feel life, so they will feel the art that is most closely related to it. This closeness of relation is what we should never forget in talking of the effort of the novel.

এই closeness of relation বা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার বিচার উপন্যাসের শিল্প-বিচারের প্রধান কথা। এবং জীবনের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যই উপন্যাসের জন্মলগ্নের প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

দুই

উপন্যাস যে the interpretation of human life by means of fictitious narrative in prose—জনশ্রুতির দৌলতে একথা আমাদের মুখস্থ। যে কোনো শিল্পরূপেরই আঙ্গিক তাৎপর্য (significance of form) সেই শিল্পের জীবন-ব্যাখ্যার বিশিষ্টতার ধারক। এখন মূল বিষয় হল এই যে উপন্যাসে জীবন এবং জীবন-ব্যাখ্যা দুইই আমাদের কাম্য। উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ-বিধৃত মানুষ পট এবং পট-নির্ভর জীবনই উপন্যাসের উপাদান। তাই শত আয়োজনেও উপন্যাস—উপন্যাস নয়, যদি না তা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধক হয়ে ওঠে। এই কারণেই যখন আমরা বলি যে উপন্যাসের কোনো একক ফর্ম নেই, তখন উপন্যাসের এই জীবন ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ রেখেই তা বলি। যেহেতু জীবনের কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম নেই সেই হেতু জীবনের এই নিকটাত্মীয় শিল্পেরও কোনো বিশেষ ফর্ম নেই।

বস্তুত উপন্যাসের জন্মও হয়েছিল কোনো বিশেষ শিল্প-পিপাসা বা রূপ-(form) জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি সাধনের জন্য নয়। বরঞ্চ তীব্র জীবন পিপাসার তৃপ্তিসাধনের জন্যই উপন্যাসের জন্ম। এবং সমস্ত উপন্যাসকেই বুঝতে হবে এই দিক থেকে। এক সময়ে এমন কথাও ভাবা হয়েছে যে উপন্যাস হল পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উপাদান। সৌন্দর্য, ভাষ্য অথবা তাৎপর্য সন্ধান ঔপন্যাসিকের কাছে গৌণ। এবং স্যার ডেসমণ্ড ম্যাকার্থির উপন্যাস বিষয়ক প্রাথমিক অনুমান মেনে নিলে একথা স্বতঃস্বীকার্য সে কৌতূহলের খাদ্য হল সংবাদ বা তথ্য। এই তথ্য-ক্ষুধা বা সংবাদ-ক্ষুধাকে পাঠকের জীবনাগ্রহেরই এক নিদর্শন ভাবা যেতে পারে। পাঠক কোন্ ধরণের সংবাদ চাইছেন, বা তাঁর কৌতূহল কোন্ বিষয়ে অধিকতর তা বুঝতে পারলে পাঠক মণ্ডলীর চরিত্র উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে লেখক যে ধরণের information বা সংবাদ দিতে চাচ্ছেন তার ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায় লেখকের মূল্যবোধ। একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে এটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাস্থল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্যে ইতিহাসের অগস্টান পিরিয়ডে ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের যথার্থ উদ্বোধন হয় এক শক্তিশালী art-form বা শিল্পরূপ

হিসাবে। নিজ বিশিষ্টরূপে উপন্যাস যে এ যুগেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে তার উপযুক্ত ঐতিহাসিক কারণও এ যুগে উপস্থিত ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন কতকগুলি সামাজিক রূপান্তর এ যুগে সংঘটিত হয়েছিল যা বিশেষ তাৎপর্য-সূচক।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুগেই প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনাচরণকে জীবনাদর্শ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে যে সংখ্যা-তাত্ত্বিক হিসাবের গড়পড়তা মানুষের কথা ভাবা হয়, এ সাধারণ মানুষ সেই বর্ণহীন জনসমষ্টি নয়। এ যুগের কর্মচঞ্চল জীবন্ত ব্যক্তির কথাই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভোট যুদ্ধে ব্যস্ত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ে উদ্যোগী বণিক শ্রেণী, শুভ নীতিবোধে আস্থাবান ধর্মপ্রচারক, দুঃসাহসী ভ্রমণকারী, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত গ্রামীণ ভদ্রলোক, সেতু-পথ-খাল নির্মাণে অগ্রণী কারুবিদ্, সামাজিক স্বভাবসম্পন্না মহিলা, চিকিৎসক, আইনজীবী, নাবিক, দোকানদার, সৈনিক সব মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল এই পাবলিক। অবশ্যই এই সাধারণ মানুয এবং তার কার্যকলাপের কোনো পর্যায়ই নতুন কথা নয়। কিন্তু এই বিচিত্র-কর্মা সাধারণ মানুষ নিজের নিজের জীবন সম্বন্ধে এ যুগে হয়ে উঠেছিল অসীম আগ্রহী। এ যুগের লেখকেরও কাজ ছিল তাই কর্মিষ্ঠ বহুমুখী আশাশীল এই সাধারণ মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা।

এ যুগের এই পাবলিকই ছিল লেখকের বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী। তৎকালীন প্রধান শিল্পচেষ্টা প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং সামাজিক কবিতা। এই বিশিষ্ট ত্রিধারার দিকে লক্ষ্য রাখলেও বোঝা যায় কতখানি পাবলিক-সচেতন ছিলেন তখনকার লেখক। নতুন উদ্যোগী শ্রেণীর উদয়ে পুরাতন পৃষ্ঠপোষকদের দরবারী শৃঙ্খল ছিঁড়ে তৎকালীন লেখকদের দল এই ব্যাপক পাঠকমণ্ডলীকেই আশ্রয় করেছিলেন। এবং সে-যুগের সাধারণ মানুষও সাহিত্যে নিজেকেই প্রতিবিম্বিত দেখতে চাইত। তীব্র জীবনাগ্রহে এ যুগের মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ ঘরে বাইরের জীবন সম্বন্ধে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে হয়ে উঠেছিল গভীর কৌতূহলী। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই মানুষ আবিষ্কারের আনন্দ খুঁজে পেত এই অসীম আগ্রহী মানুষ সাহিত্যেও পেতে চাইত নিজেকেই। এ যুগের সাহিত্যাগ্রহ প্রকৃতপক্ষে জীবনাগ্রহেরই এক বিশেষ অচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ব্যক্তির জাগরণের আলোকে এ জীবনাগ্রহের অনন্য মূল্য। এর কারণ এই, ঘরে বাইরে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের তখন বিস্তৃতি ঘটছে। বণিক এবং সওদাগরদের কণ্ঠে তখন

সমাজের দেওয়া বরমাল্য। উপন্যাসের চরিত্রে, নাটকের চরিত্রে তখন এঁদেরই ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে। বসওয়েলের একটি উক্তি সমকালীন ইংলণ্ডীয় মধ্যবিত্তের প্রাণের কথা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে :

"In this great commercial country, it is natural that a situation which produces much wealth should be considered as very respectable."

জাতীয় জীবনে এই respectability-র সাধক যাঁরা তাঁরাই ইংলণ্ডের সেই বিখ্যাত gentleman বা ভদ্রলোক শ্রেণী। সর্বতোমুখী কর্মচঞ্চলতায় জীবনাগ্রহী এই ভদ্রলোক শ্রেণী তখন গড়ে তুলেছিলেন এক বাস্তব-উপযোগী মানবতাবাদ বা practical humanism। জাতীয় জীবনের সকল দিকেই—সাহিত্যে, রাজনীতিতে, দর্শনে বুদ্ধি যুক্তি (লক্ এবং হিউমের প্রভাব) এবং এই বাস্তব উপযোগী মানবতাবাদের প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপার এ সময়ে লক্ষ্য করা যায়। যে ভদ্রলোক শ্রেণী এই প্রাধান্যবিস্তারের শক্তিশালী মেরুদণ্ড তাদের ইতিবাচক স্বরূপটিও প্রণিধানযোগ্য। শোভন আচরণ-বিধি এবং সৌজন্যের ধারণাই ভদ্রলোক শ্রেণীর একমাত্র পরিচয়চিহ্ন ছিল না। নীতিবাদী ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক এবং দৈহিক সাহস, মানসিক এবং শারীরিক উদ্দীপনা এবং সংস্কৃতিমনস্কতা—এক কথায় যা কিছু সমাজ প্রগতির সহায়ক সমস্তই ছিল নবধা কুল-লক্ষণের মতো ভদ্রলোকের পরিচয়চিহ্ন। "A man completely qualified as well for the service and good, as for the ornament and delight, of society." এই ধরনের মানুষের উদ্দেশ্যেই অগস্টান যুগের দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ তাঁদের কর্মধারাকে প্রবাহিত করে তুলেছিলেন।

ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় হয়ে ওঠে এই ভদ্রলোক শ্রেণীর ঘরে বাইরে আত্মবিস্তৃতির যুগে। আগেই বলা হয়েছে শিল্পাগ্রহ অপেক্ষা জীবনাগ্রহই এর মূলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সক্রিয় ছিল। ব্যক্তির নিজ কীর্তি সম্বন্ধে নব মূল্যবোধের উৎসে ছিল নবীন জিজ্ঞাসা।

তিন

এই জীবনাগ্রহের জন্যই এ যুগের প্রধান ঔপন্যাসিকবৃন্দ যথা ডিফো, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন এবং স্মলেট সকলেই তাঁদের উপন্যাসের জীবন জীবনেরই মতো

প্রতীয়মান করানোর জন্য বেশি তৎপর ছিলেন। এঁরা কেউ ছিলেন ছাপখানার মালিক, কেউ ছিলেন বা সাংবাদিক, কেউ বা অনুরূপ কিছু। সমকালের জীবনের ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রে ছিলেন এঁরা অধিষ্ঠিত। স্বভাবতই স্বকালীন মর্মবাণীতে এঁরাও বিশ্বাসী ছিলেন দৃঢ়ভাবে। সে মর্মবাণী হল ; Follow nature অথবা Portray the world as you see it—যে বিশ্ব-সংসার দর্শন করেছ তাকেই রূপায়িত করো। একে অনুসরণ করেই Restoration Comedy জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। এ যুগের উপন্যাসে Restoration Comedy-র প্রভাব প্রকৃতপক্ষে জীবনকে যা দেখেছ 'সে ভাবেই চিত্রিত করো' এই বাণীরই অনুসরণ মাত্র।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ডিফোর উপন্যাসকে truth-teller জাতীয় উপন্যাস বলেছেন (তাঁর Phases of Fiction প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ-কথা বলার পিছনে যে-যুক্তি তিনি প্রয়োগ করেছেন তা হল এই ; এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান গুণ এরা আমাদের বিশ্বাসবৃত্তিকে পরিতোষণ করে। ঘটনার যে বিবরণ এ জাতীয় উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আমাদের তিল মাত্র সন্দেহ থাকে না। বর্ণিত ঘটনা যেন চোখের সামনেই ঘটছে এমন মনে হয়। "Belief is completely gratified by Defoe. Here the reader can rest himself and enter into possession of a large part of his domain. He tests it, he tries it, he feels nothing give under him or fade before him." যে কারণের জন্য শ্রীমতী উল্ফ্ ডিফোর উপন্যাসের স্থান truth-teller শ্রেণীর মধ্যে নির্দেশ করেছেন অবশ্যই সেই কারণের জন্যই অপর একজন সমালোচক ডিফোর উপন্যাস-ধর্মকে narrative realism বলে আখ্যাত করেছেন। আমরা যদি ডিফো সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করতাম তা হলে একা ডিফোর প্রসঙ্গই বিশেষভাবে আলোচিত হত। কিন্তু আমরা দেখাতে চাইছি এ যুগের বাস্তব জীবনাগ্রহ। এ যুগের শিল্পাগ্রহ যে বাস্তব জীবনাগ্রহেরই আত্মীয় এ কথাটাই উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার। স্যামুয়েল রিচার্ডসন এ যুগের আর একজন প্রধান ঔপন্যাসিক। "A faithful and chaste copy of real life and manners." ছিল রিচার্ডসনের লক্ষ্য। এ যুগের গদ্যরীতির যে-ধর্ম—খুঁটিনাটি বাস্তব ব্যাপারের তন্নিষ্ঠ বর্ণনা প্রদান—তাকে রিচার্ডসনও যেন ডিফোর শিল্পের মতোই অনুসরণ করেছেন।

আবার স্মলেট এবং ফিল্ডিংও এই লক্ষ্যেরই ভিন্নপন্থার পথিক। লেস্‌লি ষ্টিফেন ফিল্ডিং-এর আলোচনাকালে ফিল্ডিং-এর প্রধান গুণের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সবিশেষ বাস্তবানুগ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার বিষয়ে বলেছেন। এ যুগের চিত্রশিল্পী হগার্থের মতো তিনিও তাঁর দৃষ্টিসীমার ভিতরে যা কিছু আসতো তাকেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরতেন। ("We have the conviction that the man has given an absolutely faithful portrait of all that came within the sphere of vision.")

আমাদের আলোচ্য যুগে—যে যুগে উপন্যাসের প্রাধান্য বিস্তারের সূচনা হয়েছিল—সে যুগে সাধারণ মানুষের কর্মধারা তথাকথিত বৃহৎ মানুষের কীর্তি অপেক্ষা সাধারণ মানুষের মনে অনেক বেশি কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল—এই বহুমুখী বিচিত্রপন্থী মানুষের জীবনই উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসের কাছে জীবনের থেকে বড়ো আর কিছু নেই। উপন্যাসের শিল্পরূপের যে নমনীয়তা সেটা এসেছে এই বিশুদ্ধ জীবনকে সামগ্রিকভাবে অঙ্গীভূত করার প্রয়াস থেকে। যে যুগে জীবনকে নতুনভাবে দেখা হয়, বোঝা হয় সে-যুগেই জীবনের ইতিবাচকতার পাদপীঠে উপন্যাসের নব নব ভাব, নব নব রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। এই উপলব্ধি ও দর্শনের তারতম্যের ওপর কিংবা প্রকারভেদের ওপর নানা যুগের উপন্যাসের প্রভেদও নির্ভর করে।

যেমন ধরা যাক অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের তুলনামূলক পার্থক্যের কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যবান সর্বদর্শী বাস্তবতা এবং উনিশের শতকের ভাববাদী চরিত্রায়ন ও কাব্যিক অনুভূতি শুধু অগস্টান যুগের সুস্থ জীবনাগ্রহ এবং ভিক্টোরীয় ভাববাদ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে অষ্টাদশ শতক ছিল ইংলণ্ডের ইতিহাসে নতুন শ্রেণীর আত্মবিকাশের কাল। এ সম্বন্ধে আর্নল্‌ড কেট্‌ল্‌ তাঁর An Introduction to the English Novel নামক অপরিহার্য পাঠ্য পুস্তকে বলেছেন যে এ-যুগে যে নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণীর উদ্ভব হল, ঈশ্বর নির্ধারিত ধর্ম, গির্জা এবং রাষ্ট্রবোধের কারাগারে স্বভাবতই তাঁরা আর বন্দী থাকতে চাইলেন না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের মূল মন্ত্র। সেই নতুন সমাজের মানুষের পক্ষে তখন প্রয়োজন ছিল সেই কর্মচঞ্চল সমাজের উপযোগী একটা নব্যদর্শন সৃষ্টি করা। তা তাঁরা করেছিলেন। সে-যুগের উক্ত নতুন মানুষের দল পূর্বতন শতাব্দীর সামন্তযুগীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চাইছিলেন নিজ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই। কেননা স্বাধীনতা ছাড়া এই নতুন শ্রেণীর

পক্ষে জীবনধারণ ও নানা মুখে সম্প্রসারণ ছিল অসম্ভব। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, অনুসন্ধান-আবিষ্কার কিছুই কল্পনা করা যেত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবোদিত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীনতা স্পৃহারই অপর নাম জীবনাগ্রহ।

কোনো প্রকার সমাজতাত্ত্বিক হবার ভান না করেই এই সহজ শিক্ষালব্ধ সত্য কথাটার আবৃত্তি করা চলে যে, উনবিংশ শতাব্দী জীবনবোধের ঐ দুঃসাহসিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে জীবনের স্রোত শুকিয়ে যাবার মুখোমুখি হলেই, অথবা জীবনের ভারসাম্যে কথঞ্চিত ব্যত্যয় ঘটলেই জীবন-স্পর্শ-প্রবণ উপন্যাস-শিল্পে তার প্রভাব অনুভূত হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ইংলণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্য সে-জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল। বাণিজ্যপন্থী ভদ্রলোক এবং আত্মসচেতন ভূস্বামী অভিজাতের স্বর্ণ দিবস ততক্ষণে গত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নায় এক অতিশক্তিধর শিল্পপ্রভুশ্রেণীর অবির্ভাব ঘটল।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল—যে-সামাজিক এবং জাতীয়, অখণ্ড ভবিষ্যৎদৃষ্টি অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে) রাজত্ব করছিল তা ভেঙে গেল। শোষিত ধ্বংসমুখীন গ্রামীন কৃষিজীবন, নবোদ্ভূত নগর, নগর-জীবনের ধনীদরিদ্রের বিপুল অসাম্য, ভারতবর্ষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে লুণ্ঠন এবং অন্যদিকে আমেরিকার প্রথম গণতন্ত্রী সরকাররূপে আত্মপ্রকাশ—উনবিংশ শতকের প্রধান ইতিহাস সূত্র। চার্টিস্টদের অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের কথা স্মরণ রাখলে হ্যামণ্ড দম্পতির মতো গত শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরকে আখ্যা দিতে হয় Bleak age বা Age of discontent.

এই অসন্তোষের যুগে এটা স্বাভাবিক যে উপন্যাস চিন্তারও মৌল পরিবর্তন দেখা যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যগত বাস্তবতার চেয়েও এ যুগের ঔপন্যাসিকদের কাছে কবিসুলভ আদর্শীকরণের ব্যাপারটা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। তাই স্কট থেকে ডিকেন্স পর্যন্ত প্রায় সকল ঔপন্যাসিকেরই poetic idealization-এর ঝোঁক স্পষ্ট; এটাকে ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগের কাব্য-প্রসাদের সঙ্গে ভিক্টোরীয় যুগের বিস্তৃত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজের সখ্য স্থাপনের চেষ্টা বললে ভুল হবে। সামাজিক খণ্ডীভবনের সম্মুখে মীমাংসায় অক্ষম শিল্পীর আদর্শীভবনের কাব্যাশ্রয় গ্রহণই এর মূল কথা। স্বভাবতই আগের শতাব্দীতে বস্‌ওয়েল যে respectability সাধনার কথা বলেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর

স্থূল বস্তুতন্ত্রী প্রলুব্ধতার যুগে সেটা হয়ে উঠেছিল একান্তই surface respectability।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য-কাহিনীর মুখ্য লক্ষ্য যেখানে ছিল পাঠক জনসাধারণের বিশ্বাসবৃত্তিকে তোষণ করা, উনবিংশ শতকের গদ্য-কাহিনীর মূল লক্ষ্য সেখানে দাঁড়াল পাঠকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করা। বস্তুত বাস্তব জীবনের যে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে রোমান্টিকতার জন্ম, উপন্যাসের দীর্ঘ বিস্তৃত পটে কবিত্ব অঙ্গীভূত হয়েছে সে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকেই। ভিক্টোরীয় যুগের আপাত-উজ্জ্বল বর্ণাবরণের অন্তরালে ছিল এই অসম্পূর্ণতার বোধ। অবশ্যই ডিকেন্স ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিকতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো শান্ত কিংবা শেলীর মতো ঝঞ্ঝাঘন প্রকৃতি কখনও ডিকেন্সের মূল বিষয় ছিল না। জনাকীর্ণ লণ্ডন শহরের বিভিন্ন পরিবেশ, লণ্ডন শহরের অলিগলি, তার নিম্ন-মধ্যবিত্তজীবনের নানান চিত্র ও এইরকম নানা ধরণের অসংখ্য খুঁটিনাটি ডিকেন্সকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। লণ্ডন শহরের এই নতুন চেহারাকে সমগ্রভাবে ধরার চেষ্টাই ডিকেন্সের চেষ্টা। উপন্যাসে অনাসক্ত হাস্যরস-সৃষ্টি ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরও মূলে সক্রিয় হয়ে রয়েছে তাঁর সর্বগামী অনুভূতির সর্বৈব বিকাশ। সাধারণ ছোট মানুষের জীবনের নাটক এবং প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করা, আত্মসন্ধিৎসু ঐহিকতাবাদকে আঘাত হানা ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়ে ডিকেন্স প্রকৃতপক্ষে এ-যুগের আত্মাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। ডিকেন্সের কথা কিন্তু কখনই সমাপ্ত হবে না যতক্ষণ না আমরা ডিকেন্সের শিল্প প্রচেষ্টার প্রতিটি অংশের প্রাণ-স্পন্দনশীল কবিত্বের আভাটুকুর কথা বলছি। স্বভাবতই এ কবিত্ব রোমান্টিক যুগের প্রসাদসম্পন্ন নয় বরঞ্চ এ কবিত্বকে আত্মীয়তার দিক থেকে এলিজাবেথানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-কথা বলা যায়। Poetic fantasy-র ব্যবহারে স্বচ্ছ হাস্যরসের প্রয়োগে ডিকেন্সের কবি প্রতিভা তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকেরা Bleak House উপন্যাসের কুয়াশা বর্ণনার কথা উল্লেখ করে থাকেন। আসলে ডিকেন্সের কবিত্ব উপন্যাস-অতিরিক্ত কোনো ব্যাপার নয় বরঞ্চ বলা যেতে পারে সমগ্র উপন্যাসের আত্মাতেই এই কাব্যশ্রীর অধিষ্ঠান।

শুধু ডিকেন্স নন, ভিক্টোরীয় যুগের আর একজন প্রধান শিল্পী জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রেও এই কবি কল্পনার প্রশ্ন ওঠে। জর্জ ইলিয়টকেই বলা যেতে পারে যে

আপাদমস্তক ভিক্টোরীয় যুক্তিবাদের দ্বারা দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর সমগ্র উপন্যাসের পরিমণ্ডলে একটি মননশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। জর্জ ইলিয়টের চরিত্রগুলি আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য কেবল বহিরঙ্গ বিবরণের যথার্থতাকে বহন করার কাজেই ব্যবহৃত হয় না। "Her portraits are all primarily portraits of the innerman"—এই innerman-কে অনুসন্ধান করার জন্যই জর্জ ইলিয়ট পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনায়, এবং তাঁর ভিক্টোরীয় পূর্বসূরীদের অপেক্ষা জটিলতর চরিত্রকে অঙ্কন করার ব্যাপারে অধিক পারদর্শিতার এবং প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। ডিকেন্সের ন্যায় অথবা অনুরূপ আর কারো মতো বাইরের মানুষটাকে নিয়ে জর্জ ইলিয়টের কারবার ছিল না।

জেন অস্টেন, ডিকেন্স এবং জর্জ ইলিয়টের প্রয়াসের কথা স্মরণে রেখেও এ-কথা বলা চলে যে অষ্টাদশ শতকের উপন্যাসের গৌরবমহিমা চ্যানেলের অপর পারেই বরঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হেনরি জেম্‌স্, কন্‌রাডের লেখনী ধারণ পর্যন্ত, তবে সে আবার হতে পেরেছে উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্বর্ণপ্রসূ। ঊনবিংশ শতকের উপন্যাসের আদর্শ পুরুষ বালজাক, স্তাঁদাল এবং নিঃসন্দেহে অনেকখানিই টলস্টয়। হয়তো এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যমহিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভিক্টোরীয় আপাতসন্তুষ্টি এবং surface respectability-র কথা উত্থাপিত হতে পারে ; এবং চ্যানেলের ওপারে কিংবা কন্টিনেন্টের শেষপ্রান্তে জীবনের এবং সমাজের সবস্তরে ইতিহাসের যে নির্মম টানাপোড়েন চলছিল তার কথাও স্তাঁদাল এবং টলস্টয় প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে—বলা যেতে পারে যে সমাজ এবং সভ্যতার ময়ালমন্থর জরদ্গব মূর্তি স্বভাবতই উপন্যাস-শিল্পীকে অলস করে তোলে, স্বভাবতই সে অবস্থায় পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে তোষণ করার জন্য উপন্যাসের স্বাভাবিক বিকাশ অপেক্ষা ঔপন্যাসিককে কবিত্বাভিমুখী হতে হয়। এবং এ কবিত্ব লালন করার জন্যই অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রকে উপন্যাসের পূর্বনির্দিষ্ট প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। হার্ডি সম্বন্ধে ফর্স্‌টার সাহেবের অভিযোগ-বাণীটিও এ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা চলতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি যে এ ধরনের সমাজতাত্ত্বিক টীকাভাষ্য প্রণয়নে কদাচই শিল্পের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত হতে পারে না। দান্তের কালে তাঁর সমকালীন স্বাদেশিক সভ্যতা ও সমাজের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের স্বদেশের ও সমাজের সম-

সাময়িক রূপের প্রতিতুলনার মধ্যে উভয় মনষার তারতম্যের কোনো সূত্র সুপ্ত হয়ে নেই সে কথা এলিয়ট সাহেবের দান্তে-বিষয়ক প্রবন্ধের মারফতে আমরা জানি। মুকুন্দরাম এবং শেক্‌সপীয়র উভয়ে সমপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কেবল একজনের সমাজ আর একজনের থেকে হীনতর ছিল বলে প্রতিভার ফলেরও তারতম্য হয়েছে একথা কিছুকাল পূর্বে হয়তো মানাত, কিন্তু এখন আমরা জানি এ হাস্যকর উক্তি অর্থহীন। কাজেই স্তাঁদাল এবং টলস্টয় উভয়ে স্বদেশীয় এবং স্বকালীন সমাজ সভ্যতার নানা টানাপোড়েনের আনুকূল্য পেয়েছিলেন বলেই মহৎ উপন্যাসের জনক হতে পেরেছিলেন এ-কথা সত্য নয়। সমাজ এবং সভ্যতার অন্তরের অসঙ্গতি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে যত স্পষ্ট হয়েছে, যত তার খণ্ডীভবনকে তাঁরা অনুভব করেছেন ততই ঔপন্যাসিকেরা চরিত্রাঙ্কনে অন্তর্মুখিতার আশ্রয়ী হয়েছেন। এই অন্তর্মুখিতা বা inwardness-এর সাহায্যে ফ্লবেয়ার ও দস্তয়েভস্কি যেমন উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঙ্গিকরীতির বিশিষ্টতা সৃজন করেছেন—ইংরাজি সাহিত্যে তেমনি হেনরি জেম্‌স্‌ উপন্যাসে আধুনিকতার জনক হয়ে রইলেন—তাঁর প্রখর আঙ্গিক সচেতনতার জন্য এবং বক্তব্যগত বিশিষ্টতার জন্য। আঙ্গিক সচেতনতার জন্য জেম্‌স্‌কে ফ্লবেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। প্রকরণের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিশীলতা শুধুমাত্র শেষ ভিক্টোরীয় সৌখিন রুচিবিলাস হিসাবে জেম্‌সের কাছে প্রতীয়মান হয়নি। উচ্চ কোটির মানুষের এবং বিশ্রব্ধ জীবনের অন্তর্লগ্ন ক্ষয়িষ্ণুতা চিত্রণের বেলায় তিনি বালজাকেরই স্মৃতিবহ। তাঁর প্রথম প্রধান উপন্যাস 'দি পোর্ট্রেট অব এ লেডি' প্রসঙ্গে তাঁর রচনাকালীন মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে উপন্যাসটির প্রধান বিষয় বা বক্তব্য হল কেমন করে মুক্তি এবং সম্ভ্রমের প্রয়াসী একটি তরুণী প্রথানুগত্যের যাঁতায় নিষ্পেষিত হল! ন্যূনাধিক পরিমাণে জেম্‌স্‌ জীবনকে এই রূপকেই ভেবেছেন এবং রূপায়িত করেছেন। স্বভাবতই এই জাতীয় চরিত্র-চিত্রণের জন্য বৃহৎ ঘটনামুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা চরিত্রের অন্তর্মুখিতাকে রূপান্বিত করে তোলা অধিক তাৎপর্যবাচক। কেননা ভালো বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়ের সংঘাতমূলক কাহিনীতে ঘটনার ডাক পড়ে অবশ্যম্ভাবী হিসাবে। জেম্‌স্‌-এর নায়ক-নায়িকাদের জীবনরীতিই তাদের কর্তব্য নির্ধারণের জনক। ইসাবেলের শেষ প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যে গভীর আত্মমর্যাদার বোধ বিদ্যমান তার মধ্যে ঔচিত্য অনৌচিত্যের প্রশ্ন অপেক্ষা ইসাবেলের জীবনের প্যাটার্নটাই বেশি সক্রিয়। যে

মর্যাদা, যে শুচিতা মানুষের পরমার্থ এবং জীবনার্থ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছিল বন্ধ্যা, জেম্‌স্‌ মননশীলতায় এবং কবিকল্প বাগ্‌বিন্যাসে সেই মর্যাদার ট্র্যাজেডিকেই এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। জেন অস্টেন এবং জর্জ ইলিয়টে পাত্রপাত্রীর আন্তর সত্তার স্বরূপ বিচারের যে প্রাধান্য জেম্‌স্‌-এর সাহিত্যকর্মে বক্তব্য-সূত্রে তা অধিকতর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, বহুধাখণ্ডিত জীবন-ব্যাখ্যার সূত্রে অন্তর্মুখিতাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল; ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর প্রভাব অবশ্যই এখানে সক্রিয় ছিল। কিন্তু বোধকরি সমাজের ও সভ্যতার মর্মশায়ী গভীর অসুস্থতার চেতনা মানুষের মনোময় সত্তার সন্ধানী হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক নিয়মে। এমন কি, বর্ণাঢ্যতা, বীর্যবত্তা, চূড়ান্ত পরিস্থিতি-প্রবণতা কনরাডের আপাত-লক্ষণ হলেও উপন্যাসের গঠনসৌষ্ঠবের আশ্চর্য মহিমায় চরিত্রের অন্তর্গামী স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই তিনি ব্যস্ত ছিলেন অধিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ঔপন্যাসিকেরা—অন্তত যাঁরা পরিচর্যাশীলতায় বৃহৎ পাঠক সমাজ অভিমুখী নন—ফ্লবেয়ারের শিল্পপ্রাণতার অভিনিবেশী শিষ্য ছিলেন এই কারণে যে অব্যর্থ রূপক, অব্যর্থ প্রতীক প্রয়োগে তাঁরাও ফ্লবেয়ারের মতোই স্থির লক্ষ্য খুঁজছিলেন। ফ্লবেয়ার যে একদিকে ইওরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল ঔপন্যাসিক সেটা সেই শিল্পপ্রাণতার দিক থেকে অনুধাবনযোগ্য। জয়েস এবং লরেন্স উভয়ের বিপুল বৈপরীত্য সত্ত্বেও, সদৃশলক্ষণ বোধ হয় এইখানে যে উভয়েই প্রতীকে এবং কাব্যের অনুশাসনে উপন্যাসের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথকভাবে দুজনেই কাব্য চর্চা করেছেন। এবং দুজনেই উপন্যাসে দৃশ্যের অতীতকে ধরতে চেয়েছেন। লরেন্সীয় প্রতীক সে ক্ষেত্রে লরেন্সের সহায়ক, জয়েসের গদ্যের কাব্য-কল্প অবিচলতা তাঁর বিষয়ের বাহন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যত দিন যেতে লাগল ততই formal realism-এর শক্তিমান গদ্য-মাধ্যম বিষয়গত বাস্তবতার দায় পরিহার করে, বিষয়ের অতীতে বা স্বরূপে পৌছনোর জন্য কাব্যের দ্বারে প্রার্থী হতে থাকল। উনিশের শতকের শেষ দিকে যখন থেকে social disintegration ধীরে ধীরে অনুভূত হয়েছে, তখন থেকেই উপন্যাসের ফর্মে গদ্যের বস্তু-লক্ষ্য, ঋজু অনুশাসন অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাস সাহিত্য জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলে উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জাতির জীবনের চিত্রকলা, কাব্যধারা, অর্থাৎ জীবন-বিষয়ক সমকালীন

সমস্ত কিছু থেকেই উপন্যাস নিজের প্রাণ-বায়ুর কিছু-না-কিছু অংশ সংগ্রহ করে থাকে। হার্ডির উপন্যাসে চিত্রকল্প, রূপকের প্রয়োগ, কাব্যময় ভাষা ওয়েসেক্সের আঞ্চলিক জীবনধারার সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত—সেখানকার লোকজীবনের অনিবার্য অভিব্যক্তি তেমনি আবার হার্ডির পরাভবাত্মক বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে, এই সব কাব্যময়তা অপরিহার্য। লরেন্স ও জয়েসও মানুষের আত্মা এবং সমগ্র মনোলোকের বিন্যাস আয়ত্ত করতে গিয়ে কাব্যের এবং গদ্যের অন্তবর্তী ব্যবধানকে কমিয়ে এনেছেন।

লরেন্স এবং জয়েস যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-গগনের প্রধান জ্যোতিষ্ক তখন ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপন বন্ধ্যাত্বে দার্শনিক-শূন্যতায় ক্লান্ত। ইংলণ্ড যে টমাস মানের মতো ম্যাজিক মাউণ্টেন সৃষ্টি করল না, এবং আলেক্সি টলস্টয়ের অগ্নিপরীক্ষার মতো উপন্যাস সৃজন করেনি এর কারণ ইংলণ্ডের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভিজ্ঞাতার বিশিষ্টতার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। জাতীয় অভিজ্ঞতার ব্যক্তি-রূপকের আধার উপন্যাসের রসোত্তীর্ণতার যোগ্যতার ধারক। মান্-এর ব্যক্তিমানস ইওরোপীয় সংস্কৃতির সংকটের ব্যাকুল চেহারাকে যতটা উপলব্ধি করেছিল তার মধ্যে আবহমানকালের সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের চেতনা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। "অগ্নিপরীক্ষায়" একটা জাতির অগ্নিপরীক্ষার পর্বের যন্ত্রণা রূপান্বিত। লরেন্স এবং জয়েসের সংকট চেতনায় এই-জাতীয় ব্যাপকতার সর্বতোমুখী যন্ত্রণা জ্বলন্ত ছিল না। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিংশের প্রথম পাদে মাত্র নিজশ্রেণীর সংকটকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছে। ইংলণ্ডের সংকটকে নয়, ইওরোপের সংকটকেও নয়। সেই শ্রেণী আপন বন্ধ্যা পর্যায়ে শুধুমাত্র মূল্যের ভাঙনগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছে। জয়েস এবং লরেন্স দু-দিক থেকে এই ভাঙনের ছায়াবহ। বহু ভগ্নাংশে পরিকীর্ণ অস্তিত্বের খণ্ডীভবনের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় পৃথকভাবে লরেন্স এবং জয়েস নিজ নিজ শিল্প মাধ্যমের সন্ধানী হয়েছেন। এই সন্ধানের পশ্চাতে যে পরিমাণে শিল্পীর সততা সে পরিমাণে শিল্পের সমস্যাও বিদ্যমান এবং সে সমস্যার উৎস নিঃসন্দেহেই জীবন।

যে জীবনাগ্রহ বা জীবন বিষয়ক কৌতূহল থেকে উপন্যাসের অগ্রচারী পদক্ষেপ আরম্ভ হয়েছে আজ সে কৌতূহল হারিয়ে গেছে একথা ভাবার কারণ নেই। সে কৌতূহলের রূপবদল হয়েছে। আজ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যে অস্তিত্বের অর্থহীনতার বোধ, অনন্বয়ের বোধ প্রবল তখন সেই বোধ সম্বন্ধে যে কৌতূহল ক্রমবর্ধমান সেও তো এক প্রকারের জীবন সম্বন্ধেই

কৌতূহল। Formal Realism-এর যুগে বা Truth tellers-দের ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খায়ণ। আজ ব্যক্তির মনোলোকের চিন্তাতরঙ্গের অনুপুঙ্খায়ণ। কৌতূহলের কেন্দ্র বদল হয়েছে। তাই রূপেরও বদল হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যের যৎসামান্য সীমারেখাগত পরিচয় বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা-গ্রন্থে নানা কারণে প্রাসঙ্গিক। জীবনের জন্য নিবিড় আগ্রহে অনন্য এই শিল্প মাধ্যমে সমাজ এবং সভ্যতার নানা-কালের টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, নানা গভীর প্রশ্ন সদাই প্রত্যক্ষ ছায়াপাত করে। জীবন প্রত্যক্ষ সৃষ্টিবাচকতায় পূর্ণ হলে উপন্যাসেও আসে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও প্রত্যক্ষ সংকটের ছায়া, তদুপযুক্ত মাধ্যম বা আঙ্গিকরীতি—জীবন অবক্ষয়ে ক্লান্ত, কর্মসার্থকতাহীন পরোক্ষ এবং নেতির সম্মুখীন হলে তার প্রসঙ্গ প্রকরণও বিভিন্ন। ডিফো-ফিল্ডিং থেকে অধুনাতন লেখক পর্যন্ত সেই ইতিহাস। বাংলা উপন্যাস আলোচনাকালে এই সূত্র আমাদের সহায় হবে।

চার

আসল কথা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড়ো বিষয় হল জীবনের সমগ্রতার সন্ধান। সে সন্ধানের প্রেরণা সর্বত্রই উপস্থিত। বলা বাহুল্য আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসকার জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। এই সামগ্রিকতা ব্যতিরেকে কখনই সার্থক উপন্যাস সৃজিত হতে পারে না। ইউলিসিস পর্যন্ত যতগুলি সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা স্মরণে আনতে পারি, সকল ধরনের এবং সকল বিষয়ের উপন্যাসেরই প্রধান কথা হল এই সমগ্রতা। আমরা ইংলণ্ডের যে-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কথা বললাম সে-যুগে নিশ্চয়ই ডিকেন্স, জেন অস্টেন প্রমুখের রচনায় এই সমগ্রতার সন্ধান উপস্থিত ছিল। কিন্তু এই সন্ধানের সার্থকতর রূপ তখনই সৃজন করা যায় যখন উপন্যাসকারের নির্ভীক নিরাসক্তি জীবন সন্ধানে লেখককে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করে তোলে (স্তাঁদাল এবং বালজাক এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের surface respectability-র যুগে এই নির্ভীক নিরাসক্তি ছিল ব্যাহত। যখন আমরা হার্ডির চরিত্রকে কবিত্বময় প্লটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখি, কিংবা দেখি ডেভিড কপারফিল্ডের আশ্চর্য বাস্তবতাবোধের অবান্তর স্নিগ্ধ পরিসমাপ্তি এবং এরই পাশাপাশি যখন আমরা দস্তয়েভস্কির (যাঁর ওপর ডিকেন্সের প্রভাব

নাকি বিদ্যমান) ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের নায়কের যন্ত্রণার কথা ভাবি, কিংবা রেজারেকসনের নেখলুড্যফ চরিত্র প্রসঙ্গ চিন্তা করি একমাত্র তখনই এই নির্ভীক নিরাসক্তির ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে আসক্তি মানেই আংশিকতা।

এ নির্ভীক নিরাসক্তির ফল কিন্তু বাস্তবের স্থূল অতিবর্ণনা নয়। তা যদি হত তাহলে নিশ্চয় আমরা ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুতার পটভূমিকায় জোলা-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতাম। কিন্তু আমরা জানি যে এ প্রসঙ্গে জোলা-র গুরুদেব ফ্লবেয়ার-এর কথা যদিবা উত্থাপিত করা চলে জোলা নৈব নৈব চ। সামগ্রিকতা মানে **totality of objects** এবং **totality of objects** মানে **cataloguing of details** নয়; নয় শুধুমাত্র পরিধিগত পৃথুলতা। আসলে এটা লেখকের অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী নয়। লেখকের জীবনবোধ পূর্ণবৃত্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা এইটাই প্রধান কথা। উপন্যাসকার যে জীবন আমাদের সামনে হাজির করেন সে জীবন সামগ্রিক এই কারণে যে সে জীবন সৎ নয়, অসৎ নয়, শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয়, নীতিদুষ্ট নয়, নীতিগ্রস্ত নয়; সেই জীবন মানসোৎসুক হংস, যে সব সময় উত্তীর্ণ হতে চাইছে; সে জীবন সেই সীতা যে বারংবার অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় দেবে কিন্তু পরীক্ষার কখনও অস্ত হবে না। এই সমগ্র জীবনকেই অডিসি, ইলিয়াড, রামায়ণ, মহাভারতের মহাকবিরা একদিন ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের আশ্চর্য বোধের সামনে আমাদের যে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তার কারণ এই সর্বতোমুখী সমগ্রতা। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যান তিনি পত্নী পুনরুদ্ধারের জন্য বালীবধ করেন। মানুষের এই পরীক্ষাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের সামগ্রিকতার পরীক্ষা। যিনি এতে উত্তীর্ণ হন তিনি সেকালে মহাকবি—একালে মহৎ ঔপন্যাসিক। সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যেই এই সামগ্রিক বোধের জন্মদান সম্ভবপর নয়। সামগ্রিক বোধ তখনই সৃজিত হতে পারে যখন ঔপন্যাসিকের জীবন-অভিজ্ঞতা একটা নৈতিক সচেতনতায় শেষ পর্যন্ত মণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর্নল্ড্ কেট্ল্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী এ-কথা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে উপন্যাসে থাকা চাই জীবন এবং জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ দুইই। এই **life and pattern**-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস। ফর্স্টার সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত **Aspects of Novel** গ্রন্থে **pattern** প্রসঙ্গে আলোচনা করতে

গিয়ে বলেছেন "The pattern appeals to our aesthetic sense." সুতরাং উপন্যাস শুধু জীবনের যথাদৃষ্ট রূপ নয়—উপন্যাসকে জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে স্বীকার করেও সে-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। Pattern causes us to see the book as a whole—এবং এই সময়েই উপন্যাসটির প্রকৃত পরীক্ষা। উপন্যাসের জীবনবোধে ফাঁকি থাকলে অথবা জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ হলে যত তথ্য সঞ্চয়ন হোক না কেন এই pattern-এর বোধ পাঠক মনে সঞ্চারিত হবে না। এবং এই pattern-এর বোধ সঞ্চারিত না হলে যে নৈতিক সচেতনতা এবং জীবনের অমেয় সম্ভাবনামূলক বিশ্বাস উপন্যাসের অম্বিষ্ট তা আয়ত্ত হওয়াও সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপন্যাসের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে pattern হচ্ছে সেই বস্তু যা ঔপন্যাসিকের রচনাকে অখণ্ড রসমূর্তি দান করে।

জীবনের সামগ্রিকবোধ এবং pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ। একটি উপন্যাস থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত শুধু জীবন খুঁজি না, জীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কী বক্তব্য সেইটারই সন্ধান করি। উপন্যাসের pattern মানে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই অখণ্ড রসমূর্তি-রচনা যা পাঠকের রস পিপাসার সর্বতোভাবে নিবৃত্তিসাধক—সেই pattern লেখকের এই জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব ধ্যান ধারণার ওপরেই স্থাপিত। এই ধ্যান ধারণাই হল লেখকের জীবনদর্শন। টলস্টয় বা স্তঁাদালের শিল্পে এই জীবন এবং জীবনদর্শন দুইই সমমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিক বোধ শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাসবোধকে তোষণ করা নয়, বা শুধুমাত্র আমাদের বাস্তবজ্ঞানের সম্প্রসারণ অথবা আমাদের কল্পনাবৃত্তির পরিচর্যাও এর লক্ষ্য নয়। জীবনের কাব্য এবং নাটক, কাহিনী এবং আলেখ্য সকল কিছুকেই কুক্ষিগত করে এই সামগ্রিকবোধ গড়ে ওঠে। সেই সমগ্রতাবোধের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে উপন্যাসে রূপদান। এ কারণেই উপন্যাস কখনই realism—naturalism ইত্যাদির পুঁথি নির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ করে চলে না। যেহেতু জীবনের কোনো ছক নেই, সেই হেতু উপন্যাসকেও তার এই সামগ্রিকতার জন্যই, কোনো ছকে ফেলা চলে না। টলস্টয়, দস্তয়েভ্স্কি, টমাস মান প্রমুখ মহৎ শিল্পীদের রচনায় আমরা যে সামগ্রিকতার সাক্ষাৎ পাই তা এই কারণেই কোনো প্রকার ছক, পূর্বচিন্তা, পূর্বপোষিত মতাদর্শ বা dogma নিরপেক্ষ ভাবেই গড়ে উঠেছে। জগৎ জীবন সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট আগ্রহ কোনো সূত্র-নির্ভর হতে পারে না।

পাঁচ

এখন প্রশ্ন হবে একজন ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবন সম্বন্ধে এই সামগ্রিকতাবোধ ব্যাপারটি বস্তুত কী? কী ভাবে আমরা এর বিচার করব এবং কী ভাবেই বা আমরা এর ব্যাখ্যা করব?

প্রত্যেক উপন্যাসই প্রকৃতপক্ষে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে লেখকের ধ্যান ধারণার রূপক। এবং এই সুবিস্তৃত রূপকে লেখক ঘটনা, আখ্যান, চরিত্র, কথোপকথন, সমাজ-প্রতিবেশ এবং রচনাশৈলী—এই প্রতি বিষয়েরই ব্যবহারে তাঁর উদ্দিষ্ট রূপকার্থেরই প্রতিফলন ঘটে। রূপকের লেখকের মতো সচেতন ভাবে তিনি এটা করেন কিনা এবং করলে তা শিল্পকর্ম হয় কিনা এ প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন যোগ্য কিন্তু আপাতত আমরা এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে এই কথাটুকু বলতেই পারি যে উপন্যাসের সমগ্র জীবন যখনই একটি pattern পরিগ্রহ করে তখনই রসিক পাঠকের কাছে উপন্যাসে বিস্তৃত জীবন এক বিস্তৃত রূপকের আকারে প্রতিভাত হয়। উপন্যাসে উপরোক্ত সমস্ত উপাদানই তখন অংশত এবং সমগ্রভাবে সেই রূপকেরই তাৎপর্য বহন করে। উপন্যাস সমগ্রভাবে সেই রূপক নির্মাণ করে বলে উপন্যাসের প্রতি অংশের সঙ্গে এই রূপকের সম্পর্ক নিবিড়। এরকম একটা ধারণা থাকা স্বাভাবিক যে উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রই বুঝি সেই সমগ্রতার ধারক এবং বাহক। চরিত্র যদিও সমগ্রতা নির্মাণে অনেকখানি ভূমিকা পালন করে তথাপি উপন্যাসের সমগ্রতা চরিত্র ছাড়াও আরও নানা কিছুর ওপর নির্ভরশীল। চরিত্র তার মধ্যে একটা অংশ বিশেষ। চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারণার কথা ব্যক্ত করেন এটা ঠিকই, কিন্তু এই ধ্যান ধারণা যেহেতু উপন্যাসের সমগ্রতার ভিত্তির ওপর স্থাপিত সেইহেতু আরও নানা কিছু এ প্রসঙ্গে উপন্যাসকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলি হল ব্যক্তি, সমাজ এবং সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা। উপন্যাসকার তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে পাঠকের জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের নিবৃত্তি সাধন করবার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু বহুবিচিত্র বলেই জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলও অন্তহীন। এই কারণে একই বিষয় নিয়ে দুই লেখকের রচনা দুই ভিন্ন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন করে। অন্তহীন এই জীবনের বহু বিচিত্র রূপই বারে বারে ঔপন্যাসিককে ডাক দেয় জীবনের গূঢ়

রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। ঔপন্যাসিকের মন সেই বহিরঙ্গ বিচিত্রতার ব্যবহারে জীবনের একটা সমগ্র অর্থ সৃজন করে, যা শেষ অবধি উপন্যাসকে একটা জীবন-দর্শনে পৌছিয়ে দেয়। এই জীবনদর্শন ঔপন্যাসিক সৃজন করেন জীবনের আকাঁড়া তথ্যগুলি থেকে। সুতরাং লেখকের মন এবং সেই মনের উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি একটা সার্থক উপন্যাসের নেপথ্যে সক্রিয় থাকে। হেনরী জেম্‌স্‌ এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে উৎকৃষ্ট মনই উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে রূপায়িত হতে পারে। "The deepest quality of a work of art will always be the quality of the mind of the producer." এখন শিল্পী মানসের সেই গভীর মনীষার পরিচয় আমরা উপন্যাসের ভিতরে কেমন করে সন্ধান করি উপন্যাসের সমগ্রতা এবং তার pattern-এর বিচার প্রসঙ্গে সে-কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেকটি উপন্যাসই শিল্পীর অন্তরাত্মারই প্রতিফলন। সুতরাং উপন্যাসের শিল্প বিচারের সময় আমাদের দেখতে হয় পাঁচটি বিষয়। এক, কোন্ পদ্ধতিতে শিল্পী জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; দুই, তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেন; তিন, কী তিনি পরিহার করেছেন; চার, কোন্ ধরণের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন; পাঁচ, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোন্ নৈতিক মূল্য নিষ্কাশিত করেছেন—এই পঞ্চ পরিচয়ের ওপরে ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের বিচার হবে। এবং এর ওপরে একটা উপন্যাস শিল্পকর্ম হিসাবে কতখানি উত্তীর্ণ হল তারও মীমাংসা হবে। শিল্পীর অন্তরাত্মার পরিচয় গ্রহণের কালেই এই পদ্ধতির ভিতরে তাঁর সমাজ সভ্যতা বিষয়ক জিজ্ঞাসাও স্পষ্ট হবে। সুতরাং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অনুভূতিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের রূপকে তুলে ধরেন একথা আমরা যে কোনো মহৎ উপন্যাস আলোচনা কালে উপলব্ধি করতে পারি। তাই যদিও পাঠকের জীবনাগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধন করা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যের একটা প্রাথমিক অংশ তাহলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ঔপন্যাসিকের quality of mind-টা'ই বড়ো কথা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা একক অভিজ্ঞতার কোনো অন্ত নেই। মানুষও যেমন বহুবিস্তৃত অন্তহীন বৈচিত্র্যের অধিকারী, বাস্তবতাও তেমনি শতরূপিণী। কাজেই শুধু অভিজ্ঞতাকে আলাদা করে কখনই বিচার করা যায় না। এ প্রশ্নের কখনও মীমাংসা হয়নি যে অভিজ্ঞতার কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ। অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কেউ দাবি করতে পারেন না। ঠিক এই সূত্রেই বলা চলে যে অভিজ্ঞতার শ্রেণীবিভাগও হয় না। উত্তম অভিজ্ঞতা বা

অধম অভিজ্ঞতা বলে কোনো কথা নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবন রসের নিষ্কাশন হবে স্বভাবত সেটাই প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে প্রধান কর্মকর্তা হল শিল্পীমানসের কল্পনার উৎকর্ষ। রোমান্টিক কবিদের কাছে যেমন কল্পনাই অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাই যেমন তাদের উপাস্য ঈশ্বর, ঔপন্যাসিকের কাছে তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাই হল প্রধান কথা। এই বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা অথবা লেখকের ঔপন্যাসিক মনীষাকে আমরা যে-কোনো স্বাধিকারই দিতে প্রস্তুত—তা সে তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর মতাদর্শ যে ব্যাপারেই হোক না কেন। আমাদের শুধু বিচার্য হল এই যে তিনি তাঁর সমস্ত উপাদানের ব্যবহার করেছেন কী ভাবে। তাঁর আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত তথ্য এবং উপাদান গভীর এবং গূঢ় মনের ভিতর দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা pattern পরিগ্রহ করেছে কিনা; শেষ পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসটি তাঁর সমস্ত জীবন ধারণার একটি বিস্তৃত রূপকের আকার ধারণ করেছে কিনা। সুতরাং লেখকের অভিজ্ঞতা—যেটা উপন্যাসের একটা প্রধান ব্যাপার—সেটা আদপেই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা নয়। ঔপন্যাসিকের অপরিহার্য প্রধান শক্তি কী এই প্রশ্ন যদি কখনও ওঠে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উত্তর হবে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও মননসমৃদ্ধ কল্পনাই হল ঔপন্যাসিকের ব্রহ্মাস্ত্র। যেহেতু শিল্পমাত্রেই শেষ পর্যন্ত নিপুণ এবং অভিনিবিষ্ট নির্বাচন সেইহেতু উক্ত কল্পনা এ বিষয়ে ঔপন্যাসিককে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকেই সাহায্য করে। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে-মন কৃত্রিমতায় পূর্ণ, যে-মন আসক্ত, যে-মন পল্লবগ্রাহী সেই মন কখনও উৎকৃষ্ট উপন্যাসের স্রষ্টা হতে পারে না। ঔপন্যাসিকের মন কবির মতো শুধু কবিত্বেই আসক্ত নয়, নাট্যকারের মতো শুধু নাট্যরসেই তার পক্ষপাত নয়, সেই মন জীবনের সহজ স্বাস্থ্যের অধিকারী বলেই জীবনের কাব্যে কাহিনীতে নাট্যে, তুচ্ছ এবং উচ্চ, নীচ এবং মহৎ, সুন্দর এবং কদর্যের সকলেরই রূপসাধনা করতে পারে। এই বিচিত্র রূপসাধনা প্রকৃতপক্ষে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব রসসাধনা। এ রসসাধনার লক্ষ্য জীবন সন্ধান। এই জীবন স্বরূপই সামগ্রিকতা।

রসসাধনার এই দুরূহ পথে শিল্পীকে প্রতি পদেই পরীক্ষা দিতে হয় নানাভাবে। জীবন এবং বাস্তবের মায়া সৃজনে সে পরীক্ষার প্রথম অধ্যায়, আবার সেই সৃজিত মায়া থেকে মায়াধীশ সত্যে পৌছনোর প্রয়াসে এ পরীক্ষার চূড়ান্ত রূপ। জীবন এবং বাস্তবের এই মায়া রচনার ক্ষেত্র ঔপন্যাসিকের স্বভূমি। এই ভূমিতে

দাঁড়িয়ে তিনি কবি-নাট্যকার থেকে পৃথক। বরঞ্চ এ বিষয়ে তাঁর প্রতিযোগী শিল্পী-পুরুষ হলেন চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পেরও প্রধান কথা হল জগৎ ও জীবনের সাদৃশ্য বহন। ঔপন্যাসিকেরও কাজ তাই। আমরা বর্তমান আলোচনার শুরুতে এ-কথা বলেছি যে উপন্যাস পাঠকের কাছে রস পিপাসা এবং জীবন পিপাসা প্রায় একীভূত ব্যাপার। জীবন আধুনিক যুগে যত ফিউডাল কাঠামোকে ভেঙে ভেঙে নানাদিকে নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছে ততই সে হয়েছে বিচিত্র এবং কৌতুহলোদ্দীপক। এই জীবন সম্বন্ধে অসীম আগ্রহের জন্য এ যুগের অন্যতম সাহিত্য-সন্তান উপন্যাসের কাছে অসীম এবং বিচিত্র জীবনের সাদৃশ্য আমরা কামনা করি। ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষ সেই বাঞ্ছিত জীবন-মায়া সৃজন করে। কেমন করে এবং কী ভাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে সেটাই আলোচিত হবে।

ছয়

জীবনকে জীবনেরই মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা ঔপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। এরই অপর নাম বাস্তব এবং জীবনের মায়া (illusion) সৃজন। কেমন ভাবে এই মায়া সৃজিত হয় তা অবশ্যই জটিল সৃষ্টিক্রিয়ার অঙ্গীভূত ব্যাপার। কাজেই কতকটা দুর্জ্ঞেয়ও বটে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই মতারণ্যে দিশাহারা হবারই কথা। বিশেষত রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম প্রমুখ নানা ইজমের প্রবক্তারা যেখানে নানা মতবাদী বক্তব্য নিয়ে সদাই প্রস্তুত। আমরা এই মতবাদের জটিল বিতণ্ডায় না গিয়ে একেবারে ব্যাপারটির মর্মানুধাবনের চেষ্টা করব। জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য কী হবে এ প্রসঙ্গে জোলা-র একটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত করা যাক। জোলা বলছেন :

> "একজন লেখক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখতে চান। এই অভিপ্রায় থেকে তিনি যখন কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে (চরিত্র বা বিষয় কিছুই তখন তাঁর হাতে নেই) উপাদান সংগ্রহ করা ; মঞ্চ-জগৎ সম্বন্ধে তিনি যা বর্ণনা করতে চান তার বিষয়গুলি খোঁজাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। তিনি তখন হয়তো কতকগুলি অভি-নেতার সঙ্গে আলাপ করবেন এবং কিছু অভিনয়ও দেখবেন। তারপরে তিনি তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তাদের মতামত

সংগ্রহ করবেন, গল্প এবং চিত্রাদি যোগাড় করবেন। কিন্তু তা-ই সব নয়। প্রাপ্তব্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পুঁথিপত্র তাঁকে পড়তে হবে। পরিশেষে তিনি তার যথানির্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শন করবেন এবং একটি থিয়েটারে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য কয়েকদিন অতিবাহিত করবেন, অভিনেত্রীদের সাজঘরে একটি সন্ধ্যা কাটাবেন এবং যতটা সম্ভব সেই পরিবেশকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবেন। যখন এই সমস্ত উপাদান এইভাবে সংগৃহীত হবে তখনই উপন্যাস নিজ নিয়মে তার আকার ধারণ করবে।"

পরিবেশকে আত্মসাৎ করবার এই যে ব্যাপার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সমালোচক-দের কঠিন মতামত প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। এই ধরনের লেখকেরা এই প্রকার অনুজ্ঞা অনুসরণ করে যে উপন্যাস রচনা করেন তাতেও অ্যাভারেজ সাধারণ চরিত্রই মুখ্যত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই আটপৌরে অ্যাভারেজ চরিত্র এবং ডিফো-ফিল্ডিং-এর আমলের অ্যাভারেজ মানুষ এক বিষয় নয়। এ হল এক ধরনের যান্ত্রিক গড়পড়তার সাধারণ মানুষ। ডিফো-ফিল্ডিং-এর অ্যাভারেজ মানুষ সমাজের পটে আবির্ভূত সে-শতাব্দীর নতুন মানুষ। তারা ছিল এক নবোদ্ভূত শ্রেণীর প্রতিনিধি। কাজেই টাইপ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য সেখানে উপস্থিত ছিল। জোলা-র বাস্তব-মায়ায় এই গড়পড়তা মানুষের দল কোনোপ্রকার pattern বা রসতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু এইখানেই নয়। To absorb the atmosphere বা পরিবেশকে আত্মসাৎ করা বলতে জোলা কী বুঝেছেন। এ যদি হয় শুধুমাত্র আহৃত উপাদানের বর্ণহীন আটপৌরে প্রদর্শনী, অথবা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার যদৃচ্ছ প্রকাশের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থালিপি মাত্র তাহলে অবশ্যই এ থেকে কোনো বৃহত্তর সার্থকতার সাক্ষাৎ মিলবে না। এই প্রসঙ্গে হেনরী জেম্স্ যে কথা বলেছেন সে কথা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন লেখকের অভিজ্ঞতার শক্তি কখনই উপন্যাসকে জীবনের হুবহু অনুকৃতি করে তোলার সাধনা নয়। নিখুঁত সাদৃশ্য উপন্যাসের একটা গুণ হতেও পারে, নাও পারে। কেননা ডন কুইক্সোট কিংবা মিঃ মিকোবরের বাস্তবতা স্রষ্টার রঙে এত অনুরঞ্জিত যে এদের যত বাস্তবের নিখুঁত অনুসরণ বলা চলুক না কেন এরা কিছুতেই সাধারণভাবে সংসারে দেখতে পাওয়া চরিত্র নয়। অভিজ্ঞতার শক্তি আসলে একটা প্রচণ্ড অনুভবের শক্তি এবং এই

অনুভবক্রিয়া সৃজনী-চেতনার প্রকোষ্ঠে যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ জাগতিক ঘটনার এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি তুলতে পারে, এবং সেখানে এত সূক্ষ্ম ব্যাপারেরও এত সুস্পষ্ট সাড়া জাগে যে এই ব্যাপারটাকে একটা অপরূপ মানস পরিবেশ উদ্ভূত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। লেখকের এই মানস পরিবেশই আমাদের পূর্বে কথিত জীবন ও জগতের মায়াসৃজনের মূলে।

পরিবেশকে আত্মসাৎ করা অবশ্য প্রয়োজন। তার মূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এবং একথা যথার্থই যে পরিবেশকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে মানস-পরিবেশ সৃজনের কোনো মৌল বিরোধ নেই। বরঞ্চ শিল্পীমানস পরিবেশকে আত্মসাৎ করলে পরেই মনের নির্বাচনী ক্ষমতা অবচেতন স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, এবং তখনই সৃজিত হতে পারে সেই অবস্থা যার ফলে উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে লেখকেরই মানস-মণ্ডল। তাই বলা হয় যে, উপন্যাসে জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কখনই হুবহু অনুলিপির আশ্রয়ী হন না। হলেও, তিনি জানেন যে এর ওপরে বাস্তবের অধ্যাস রচনার সার্থকতা নির্ভর করে না। পরিবেশকে লেখকের গোটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ করে তোলাতেই এর সার্থকতা। ডিফো-র রবিন্‌সন ক্রুশো থেকে এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে।

এ-কথা সুপরিজ্ঞাত যে ডিফো-র Formal Realism-এর প্রধান ভিত্তি ছিল পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়। যে বিষয় তিনি বর্ণনা করতে মনস্থ করেন সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও তিনি এমন বিশ্বাস্যভাবে বর্ণনা করেন যার ফলে পাঠকের চিত্তে যে শুধু অবিশ্বাসের ইচ্ছাকৃত নির্বাসন ঘটে তাই নয়, পাঠক একেবারে স্পষ্টত বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। রবিন্‌সন ক্রুশোর জাহাজডুবির পর ক্রুশো যখন ক্রুশোর মৃত বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করছেন তখন তিনি বলছেন : I never saw them afterwards, or any sign of them, except three of their hats, one cap, and two shoes that were not fellows; বর্ণনার এই অংশটুকু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শেষ বাক্যাংশটুকুই হচ্ছে সেই অব্যর্থ অংশ যার ওপরে ভর করে পাঠকের বিশ্বাস্যতা নিমেষে গড়ে উঠতে পারে। দুটো জুতো ভেসে এসেছে এবং এ দুটো জুতো একই জোড়ার দুটো জুতো নয়, এই ব্যঞ্জনাটুকু সমুদ্রের বিশালতা এবং উদাসীনতা এই উভয়কে আশ্চর্যভাবে নিমেষে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই অতি তুচ্ছ বর্ণনাংশের মাহাত্ম্য এইখানে

যে এ পাঠকের চিত্তে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এবং এর ফলে লেখকের আশ্চর্য তন্ময় দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার বিস্ময়ের আনন্দ লাভ করি। কিন্তু ব্যাপারটি যদি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটা হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌশল যা গড়পড়তা লেখকের সম্বল। এ শক্তিটি তখনই লেখকের প্রবল মানসিক শক্তির পরিচায়ক যখন এই ধরনের তুচ্ছ বর্ণনাংশ আপন তাৎপর্যের গুণে পাঠকের চিত্তকে অকস্মাৎ অতিমাত্রায় গ্রহণশীল করে তোলে। অর্থাৎ কল্পনার দিক থেকে পাঠকের মনকে সক্রিয় করে তোলে। Three **hats, one cap and two shoes** কেবলমাত্র আঙ্কিক যাথার্থ্যের পরিচায়ক। **That were not fellows** এই বাক্যটুকুতে লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্র-ব্যঞ্জনা। পাঠকের মনে এর ফলে জেগে ওঠে এক ভাবঘন অবস্থা। এরপর থেকে সে আর ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবনের প্রতিবিম্বকে এক মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাস করে না। ক্রুশো, বিরাট সমুদ্র, বিজন দ্বীপ, এক কথায় ঔপন্যাসিকের সমগ্র বিষয়কে এ বর্ণনা স্পষ্ট করেছে বলেই এ সার্থক শিল্প।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' থেকে একটা যুদ্ধ বর্ণনার অংশও অনুধাবনযোগ্য। Before Tilsit অধ্যায়ের ৩৭শ পরিচ্ছেদে যুযুধান রুশ ও ফরাসী সৈন্যদের যুদ্ধোদ্যত মুহূর্তের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক ঃ

It was now past noon, and the weather had cleared ; a brilliant sun was moving westward over the Danube and the surrounding hills ; the air was windless, rent now and then by bugle call and the shouts of the enemy. There was nothing now between the squadron and the enemy but some patrols. An empty space of some three hundred fathoms divided them from each other. The enemy had ceased firing, and all the more one felt that ominous, insurmountable and indefinite barrier that lies between two hostile armies. One step beyond the boundary on either side lies something that suggests that other boundary which divides the dead from the living, What is it ? Is it the dread Unknown of suffering and death ? What is it ? just beyond that field, on the other side of that tree, of that roof on which

the sun is shining ! Who can tell, and who does not wish to know ? The soldier fears and yet longs to cross the line, for he feels that, sooner or later, he must, and that then he will know what lies beyond as surely as he will know what lies beyond this life. He is full of exuberant vigour, of health, spirits, and courage, and those around him are just as eager, just as brave as himself..............."

এখানেও উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ের আগের স্তব্ধতা বর্ণনার সাফল্য দুই যুযুধান বাহিনীর মধ্যবর্তী empty space-এর বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল। এই empty space বা শূন্য এলাকার বর্ণনাকে এক লহমায় টলস্টয় জীবন-মৃত্যুর সীমারেখার রূপকে উন্নীত করেছেন। এর ফলে ঔপন্যাসিকের কবিত্বই যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের ভয়াবহ মুহূর্তের সংশয় উত্তেজনা আশঙ্কা এই রূপকের সাহায্যে সত্য বলে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পেরেছে। যুদ্ধের গম্ভীর বিস্তৃত বর্ণনার জন্য পাঠকের মন প্রস্তুত হয়ে উঠতে পেরেছে। এরপর সে যুদ্ধকে দার্শনিকের নিরাসক্তিতে গ্রহণ করবে।

আবার একটি ছোট বর্ণনার আঁচড়ে বোরোদিনের যুদ্ধের সুবিশাল অস্ত্রসঘন পরিবেশ এবং অমীমাংসিত যুদ্ধফল-কে জীবন্ত করে তুলেছেন টলস্টয়। পিটার এবং এক ফরাসী সৈনিক যেখানে কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিলা পাকড়ি দুইজনা দুইজনে সেখানে লেখক বর্ণনা করছেন :

It was French officer ; but he dropped his sword, and took Peter by the collar. They stood for a few seconds face to face, each looking more astonished than the other at what he had just done.

'Am I his prisoner or is he mine ?' was the question in both their minds. The Frenchman was inclined to accept the first alternative, for Peter's powerful hand was tightening its clutch on his throat.

'কে কার বন্দী'—উভয়ের এই যুগপৎ চিন্তার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ কতখানি ঘোরালো হয়েছিল। যুদ্ধের সুবিশাল প্যানোরামা যে কাজ পাতার

পর পাতা ধরে করেছে, কামান শ্রেণীর পরিসংখ্যান, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সংস্থান তথ্য যে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, এই একটি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশ সে কাজের সাফল্যে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

যে কোনো শিল্প-সফল উপন্যাসে বাস্তব জগতে জীবনের অধ্যাস রচনার এই শক্তি সদাই রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যায় যে ঔপন্যাসিকের এই গূঢ় শক্তিতে ইনি কতখানি শক্তিমান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝিতে কুবেরের গৃহ বর্ণনা করছেন লেখক। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে বিষয় এবং বিষয়ীর এমন এক সুযোগ্য সাযুজ্য ঘটেছে যার ফলে বর্ণনা পাঠকের কাছে জীবনকল্পরূপ ধারণ করেছে। বর্ণনাটি এই ;

> কোনার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈল চিক্কন কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়ি কলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়ি কলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নিচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বার বার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল-সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মতো চিতার আগুনের জড়তম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র।

এই গৃহ বর্ণনায় প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হল, লেখক ধীবর জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিভাষা-কণ্টকিত করে প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি।

সমগ্র বর্ণনাটিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে ঢেঁকির কাঠের প্রসঙ্গে। পদ্মার জলে ভেসে আসা কাঠের প্রসঙ্গ কুবেরের ঘরের দরিদ্র মাঝির বর্ণহীন গৃহস্থালির বর্ণনায় বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। এই ঢেঁকির কাঠের সাহায্যে ঘরখানি পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে পদ্মানদীর মাঝির ঘর। ঢেঁকির কাঠের মতো তুচ্ছ বিষয় পদ্মার অনন্ত জীবন-মরণ রহস্যকে, এক কথায় উপন্যাসে পদ্মা যে নিয়তির প্রতীক তাকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে। এই বর্ণনার সমালোচনা হিসাবে এইটুকু বলা যায় যে লেখক কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ যদি পরিহার করতে পারতেন তাহলে এ বর্ণনা প্রথমশ্রেণীর বর্ণনায় পরিণত হতে পারত। কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ বাস্তবতার আতিশয্যের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিতে এই ঝোঁক অবশ্য-বর্জনীয়।

বলা প্রয়োজন যে ঔপন্যাসিকের এই শিল্প-কৌশলের মূলে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্বাচনী ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সমস্ত কিছুতেই লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার সমস্ত কিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং সংযুক্ত, সেই হেতু লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরেই সেই শক্তি রয়েছে যা ঘটনা, চরিত্র এবং খুঁটিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের গোটা রূপকে আভাসিত করে তোলে। উল্লিখিত উদাহরণগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বর্ণনাংশের যেসব ছোট ছোট কাজের ওপর জীবনের মায়া-সৃজন নির্ভর করে রয়েছে, সেগুলি লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ফল। এই নির্বাচনী ক্ষমতা লেখকের সচেতন প্রয়াস বটে, কিন্তু তা উপন্যাস-ধৃত সমগ্রতার সঙ্গে অন্বিত। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ লেখকের সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা গড়ে তুলেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা আসলে তারই সন্তান। পরিবেশ এবং পরিবেশ-ধৃত মানুষকে উপলব্ধির ব্যাপারে লেখকের মনীষা কতখানি সাহায্য করেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা তারও প্রমাণ বটে। এই নির্বাচনী ক্ষমতা শিল্প এবং জীবন এই দুই কূলে সমদৃষ্টি রাখতে পারলে কখনও যাত্রাভ্রষ্ট হয় না। জীবনের মায়া-সৃজনের রহস্য মোটামুটি এই। একটি অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা-সম্পন্ন শিল্পী যখন জীবনকে তাঁর শিল্পের রূপকে ধরতে চান তখন এই নির্বাচনী ক্ষমতাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় মেলে। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্যই অন্যত্র। সে-কথা স্থানান্তরে আলোচিত হবে।

মহাকাব্যের মতো সার্থক মহৎ উপন্যাসও শান্তরস পরিণামী। উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে পাঠক চিত্তে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের গভীরতা বাড়ে, ব্যক্তি জীবনের বাসনা কামনাকে সুবৃহৎ পটে স্থাপিত দেখে তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের হ্রাস হয়। আমরা তখন সহিষ্ণু উদার চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সচেতন হই। চিত্তে শমভাবের সঞ্চার সার্থক উপন্যাসের শিল্পকর্মের লক্ষ্য। একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু এবং তার ব্যবহারে সেই কারণেই আবিষ্টতা পরিহার্য। যে বিষয়, যে ভাষা, যে রচনারীতি বা ঘটনা-সংস্থান লেখক নির্বাচিত করেন সেই সমস্ত কিছুই আসলে এক স্থানে এক আধারে এসে সংহত হয় লেখকের জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের টানে। এই বক্তব্যই ঔপন্যাসিকের জীবনার্থ; যাকে তিনি আহরণ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতায়, সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁর স্মৃতিতে, গড়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনায়, তাঁর মননে। ব্যক্তিস্বরূপের এই নিয়ত আবিষ্কারের অনলস প্রয়াসে নৈর্ব্যক্তিকতাই তাঁর সাধন পীঠ। তাঁর জীবনার্থও জীবন-নির্ভর। এ প্রসঙ্গে লরেন্সের বক্তব্যই সকল উপন্যাস-রস-সন্ধানীর দিশারী। লরেন্স Why the Novel Matters নামক প্রবন্ধে বলেন, আমি এখন এটা মূলেস্থূলেই অস্বীকার করছি যে আমি একটা আত্মা, অথবা দেহ, অথবা মন কিম্বা বুদ্ধি, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুক্রিয়া, কি কোষপুঞ্জ কি এই ধরণের আর কিছু। সমগ্র সর্বদাই অংশের থেকে বড়ো। সে কারণেই আমি জীবন্ত মানুষটা আমার আত্মা দেহ মন চেতনা বা আমার যে কোনো অংশের থেকে বড়ো। আমি জীবন্ত মানুষ। যতদিন পারব ততদিন আমি জীবন্ত মানুষই থাকতে চাই। এই কারণেই আমি ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য

এক

উপন্যাসের গল্পাংশ বা আখ্যানভাগকেই উপন্যাসের বিষয় বলে না। ফর্স্টার সায়েব যে story বা plot-এর কথা বলেছেন উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে শুধু তাদেরও বোঝায় না। তেমনি আবার কেবলমাত্র সৃজিত চরিত্রাবলীর ঘোরাফেরা, তাদের গতি-পরিণতিও উপন্যাসের বিষয় নয়। আনা কারেনিনা এবং মাদাম বোভারির গল্পাংশে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও (বিবাহিত নারীর প্রেম) এই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তু পৃথক। বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল দুটো উপন্যাসই পুরুষের দ্বিচারিতার বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও এই দুই উপন্যাসের লক্ষ্য এক নয়—কাজেই এরা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। সে কারণে শুধু শৈশবকল্পনার চিত্রণে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে জঁ। ক্রিস্তফের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে পথের পাঁচালির সাদৃশ্যসন্ধান নিরর্থক, যেমন নিরর্থক শুধু যুদ্ধের উত্থান-পতন ব্যবহৃত হয়েছে বলে রাজসিংহের সঙ্গে ওঅর অ্যাণ্ড পীসের তুলনা সন্ধান। কেননা, বিষয়-বিধৃত বক্তব্যে এক একটি উপন্যাস এক এক রকমের।

Subject-matter বা বিষয়বস্তু বা উপন্যাসের বিষয় বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন বিষয়াতিগ নয়। সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই যেমন একথা সত্য যে শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত ব্যাপার, শিল্পাতিগ কিছু নয়—উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সে কথা সমান প্রযোজ্য। শিল্পের বক্তব্য শিল্পনিহিত। 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল' কবিতার যা বক্তব্য তা কবিতাটির সরল গদ্যীকরণের মধ্যে অপ্রাপ্য—সে বক্তব্য শুধু ঐ কবিতাটির শিল্পসারের মধ্যে সন্ধেয়। তেমনি একটি উপন্যাসের যা বক্তব্য বা জীবন-ব্যাখ্যা তা উপন্যাসের সমগ্র প্যাটার্নের মধ্যে নিহিত থাকে। উপন্যাসকার যখন তাঁর গল্প নির্বাচন করেন, চরিত্র ধ্যান করেন, চরিত্র-পরিবেশ এবং ঘটনার পরস্পর সম্পর্কের কথা চিন্তা করেন তখনই জীবন সম্বন্ধে তিনি কী বলতে চান তাও ভাবা হয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিপর্যায়ের এই স্তর শিল্পীর পক্ষে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রণাময় স্তর। লেখক

স্বভাবতই সচেতনভাবে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য স্থিরীকরণের পর উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হন না। তাঁর গল্পের এবং চরিত্রের রূপরেখার মাধ্যমে তিনি জীবন সম্বন্ধীয় বক্তব্যকে রূপময় করে তোলেন। এই রূপান্বিত বক্তব্যই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একজন ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু কী সে-কথার উত্তরে আমরা এই রূপান্বিত বক্তব্যের কথাই বলে থাকি। এ শুধু আখ্যানভাগের সারাংশ লিখন নয়।

দুই

এ শুধু আখ্যানভাগ নয় বলে, এর সঙ্গে ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনের প্রশ্নও জড়িত থাকবে বলে, উপন্যাসের প্রসঙ্গে পট এবং পটবিধৃত মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা প্রধান। উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ পিকারেস্ক-জাতীয় উপন্যাস থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই পরিবেশ এবং পটের প্রসঙ্গ প্রভাবী হয়ে উঠেছে। Outcast বা সমাজচ্যুত মানুষ, যে সমাজকে উপেক্ষা করে, এবং যাকে সমাজ উপেক্ষা করে, তার প্রতিক্রিয়া সমাজের নির্দিষ্ট ছকে কোন্ আলোড়ন সৃষ্টি করে পিকারেস্ক উপন্যাসের রস পরিণামে সেটাই লক্ষ্য। এমন কি আধুনিকতম উপন্যাসের পিকারেস্ক নায়কের মধ্যেও এই উপেক্ষা ও উপেক্ষিতের সম্পর্কের আশ্চর্য চিত্র ফুটে উঠেছে বিখ্যাত Best Seller, The Ginger man নামক উপন্যাসে। ব্যক্তি বা Individual-এর যে প্রশ্ন পরবর্তী উপন্যাসসমূহে প্রধান হয়ে উঠল পিকারেস্ক উপন্যাসে তারই প্রথম সূত্র। ব্যক্তির প্রশ্ন উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের রূপ দ্বিবিধ। ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে এর এক রূপ; সমাজ বা সভ্যতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিরূপণে এর দ্বিতীয় রূপ। গোরা উপন্যাসের গোরা-চরিত্র এর আশ্চর্য নিদর্শন। গোরা-সুচরিতা-আনন্দময়ীর সম্পর্ক অথবা গোরা-বিনয়ের সম্পর্ক-সূত্র বা পরেশবাবু-ললিতার সম্পর্ক এই উপন্যাসের ব্যক্তিসম্পর্কের দিক। আবার গোরার যন্ত্রণায়, পরেশবাবুর শান্ত দৃঢ়তায়, বিনয়-ললিতার বিবাহে এই উপন্যাসের সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের দিক। আমরা যেভাবে পৃথক করে এখানে বিষয়টির বর্ণনা দিলাম সেভাবে উপন্যাসে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের পৃথক রূপায়ণ ঘটে না। ব্যক্তির মৌল প্রশ্নের সঙ্গে পরিবার এবং সমাজের বিস্তৃত পটভূমি জড়িয়ে যায়। যখন এইভাবে পটবিধৃত ব্যক্তির যন্ত্রণাময় কর্মশীল বা অনুভূতিময় সংবেদনশীল সত্তাকে ঔপন্যাসিক রূপময় করে তুলতে পারেন তখনই সার্থক উপন্যাসের জন্ম। যেমন ম্যাজিক

মাউন্টেন এবং ক্রাইম অ্যাণ্ড প্যানিশমেণ্ট, যেমন রেজারেকসন এবং যোগাযোগ। এগুলি মহৎ উপন্যাস। এবং এই অনুভূতিময় সংবেদনশীলতার জন্যই জেম্স্ জয়েসের ইউলিসিসও মহৎ সৃষ্টি।

এই ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের মূল্যবান প্রশ্নটি উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিহাস-গত কারণেই প্রাসঙ্গিক। সমাজ এবং সভ্যতা কোথাও স্থিতিশীল নয়। সুতরাং প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সভ্যতার বৃহৎ দায় ব্যক্তি কেমন করে বহন করছে, আবার ব্যক্তি কীভাবে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের ভূমিকা পালন করছে, উপন্যাসের ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কে এই প্রশ্নটি অন্যতম প্রশ্ন। সাহিত্য জীবনেরই একটি অংশ। জীবন প্রতি মুহূর্তেই রূপান্তরমুখী। কালাশ্রিত জীবনের এই রূপান্তরমুখিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই একথা বলা হয় যে every age is an age of transition। সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজের পরস্পর সম্পর্কের এই সূত্রটি গাণিতিক সূত্রের মতো লেখকের মাথায় ভর না করে থাকলেও উপন্যাসের রচয়িতার কাছে যে-কটি বিষয় আপন মননের সাহায্যে অনুধাবনীয় এই বিষয়টি তার মধ্যে প্রধান। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলতে আমরা ব্যক্তি এবং সভ্যতার সম্পর্কের এই বিশিষ্ট প্রশ্নটিকেই বুঝি। 'আউটসাইডার' উপন্যাসে নায়কের যন্ত্রণা বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক। এই কারণে উপন্যাসের আলোচনায় তথা তার বিষয়বস্তুর আলোচনায় দেশকালের আলোচনা উত্থাপিত না হয়ে পারে না। যদিও শেষ পর্যন্ত শিল্পরূপ প্রধান হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক, তথাপি যেহেতু শিল্পরূপ কোনো নির্বস্তুক (abstract) ব্যাপার নয়, সেই হেতু আধুনিক কালের এই প্রধান শিল্পকে দেশকালের কঠিন মৃত্তিকা থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করতে হয়। এক এক দেশের উপন্যাস সেই সেই দেশের সমাজ এবং সভ্যতার জটিল এবং বঙ্কিম গতির চিহ্নধর। সে-কারণেই ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে বক্তব্যের (যেটা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর অন্যতম অঙ্গ একথা আমরা পূর্বে বলেছি) তারতম্য এবং পার্থক্য এই দেশকাল-সাপেক্ষ সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন গতির জন্য সম্ভবপর হয়। একই ধরনের উপন্যাসে মোটামুটি গাল্পিক বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও বিষয়বস্তু যে শেষ পর্যন্ত পৃথক হয়ে যায় সে বিচারও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয়।

মাদাম বোভারি এবং আনা কারেনিনা উপন্যাস দুটির নাম-চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে উত্থাপনযোগ্য। উভয় নারী সমাজ-জীবনের প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গিয়েছিল। উভয় নারীর জীবনে জীবন সম্বন্ধে ক্ষুধার বিচিত্র

অভিব্যক্তি আমরা অনুভব করেছি। উভয়েরই বিয়োগান্ত পরিণতিতে আমরা ভ্রান্তিজাত পরিণামের ক্ষমাহীন অনিবার্যতা সম্বন্ধে সচেতন হই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও টলস্টয় এবং ফ্লবেয়ারের idea of writer's subject বা বিষয়-ধারণা এক নয়। ফ্লবেয়ারের ক্ষুরধার মনীষা, উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতির ইতিহাসে মাদাম বোভারির মতো চিরস্মরণীয় সৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেলেও আনা কারেনিনার বিশাল নৈতিক তাৎপর্য মাদাম বোভারির নেই। একটা ছোট মফস্বল শহরের চিকিৎসক-বধূ, যার ভাবপ্রবণ ক্ষুধা এবং নির্বোধ পল্লবগ্রাহিতা পণ্ডিতম্মন্য স্বামীর বৈচিত্র্যহীন জীবনে নিজ-তৃপ্তি খুঁজে পায়নি—একটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও—সেই বধূটি মাদাম বোভারি উপন্যাসের নায়িকা। অবশ্যই মাদাম বোভারি উপন্যাসে শিল্পীর শিল্পবোধের পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্তভাবে। ফ্লাবেয়ারকে ব্রতী হতে হয়েছে শিল্পীর দ্বৈত-সাধনায়। বিষয়ীর নিরাসক্ত বাস্তব-চেতনা এবং বিষয়ের যথাযোগ্য রূপসাধনা—যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই দ্বৈত-সাধনার দুই দিক। এক্ষেত্রে ফ্লবেয়ারের পরীক্ষাও ছিল এই জাতীয়। কিন্তু এ জাতীয় পরীক্ষা হলেও ফ্লবেয়ারের পরীক্ষা ছিল কঠিনতর। বাস্তব দৃষ্টি এখানে রোমান্টিক নারীমানসের সমগ্রতাকে রূপায়িত করতে ব্যয়িত হয়েছে। কাজেই কল্পনাচারিতা এবং বাস্তববুদ্ধির উভচর শক্তিকে আয়ত্ত করেছেন লেখক। এর যে কোনো একটির ঈষৎ আতিশয্যে যে রূপসিদ্ধির জন্য উপন্যাসটির ক্লাসিক মর্যাদা সেই রূপেরই হানি ঘটত। এ পথ ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যকে স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত অনাহত থাকেই। এমা বোভারির জীবনের ঘটনা শেষ পর্যন্ত কোন্ তাৎপর্যকে বহন করেছে—লেখকের বিষয়ধারণার দিক থেকে এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। এমার অভিজ্ঞতা, এমার দুঃখবোধ, এমার সমুদয় চাওয়া এবং বিড়ম্বনার পরম মূল্য কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তর না দিলে শিল্প-জিজ্ঞাসা জীবন-জিজ্ঞাসার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে না। কেননা, সতর্ক শিল্পবোধে বিশিষ্ট জীবনবোধের প্রতিফলন। এ কথা শিল্পসাহিত্যের যে কোনো শাখা সম্বন্ধে প্রযোজ্য—উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি করে সত্য। তাই ফ্লবেয়ারের অমিত কীর্তিধর প্রতিভাকে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুপ্রণাম জানিয়েও এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে বোভারিদম্পতির মফস্বল-জীবনের নিস্তরঙ্গ মধ্যবিত্ত মানস একটা নির্দিষ্ট পটভূমির সঙ্গে কেন দৃঢ়বদ্ধ হতে পারেনি। নির্দিষ্ট কোনো পটভূমিগত ব্যাপ্তি

ছিল না বলে এমার চাওয়া এবং পাওয়ার বিড়ম্বনা এমাকে কেন্দ্র করেই শুধু বেঁচে রইল। ততোধিক কোনো ব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারল না।

অথচ এই প্রসঙ্গেই আমরা যখন আনা কারেনিনার কথা চিন্তা করি তখন আনার সমস্ত জীবন ব্যাপারকে এমন তাৎপর্যান্বিত হতে দেখি যা উপন্যাসের বিষয়কে অনন্যসাধারণ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে উপন্যাসের ব্যক্তি কদাচ একক ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি-কাহিনীও একক কাহিনী নয়। পরস্পর সম্পর্কের টানাপোড়েনে ব্যক্তির জীবনের শুধু নয়, সমষ্টিরও মূল্য-বোধের নানা দিক এবং তাদের যথার্থতা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে সমাজ-জীবনের মূল্যবোধের যাচাই হয়; কাজেই পটভূমির প্রসঙ্গকে পরিহার করে উপন্যাস বিচার অসম্ভব। আনার ভিতরে এমন কোনো বিশেষ ধরনের অসঙ্গতি নেই যার ফলে তাকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় বলে মনে করতে পারি। বস্তুত আনার জীবনাচরণে আর পাঁচজনের ব্যতিক্রম নেই—অন্তত প্রথমে ছিল না। এমা বোভারির মতো নির্বোধ রোমাণ্টিক ক্ষুধার সাক্ষাৎ আনা-র ক্ষেত্রে পাই না। এই অসীম জীবনাগ্রহী সুস্থ তরুণী যখন থেকে প্রচলিত ছকের বাইরে চলে গেল তখন থেকে ভ্রনস্কির প্রসঙ্গে না বিচার করলে এই গোটা ব্যাপারটির মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কোনো বিখ্যাত সমালোচক বলেন যে আনা-ভ্রনস্কি এবং কারেনিনের কাহিনীতে বুর্জোয়া দাম্পত্য জীবনের ও প্রেমের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিরই রূপায়ণ ঘটেছে। একেবারে এমনভাবে সূত্রানুসারী বিচারপদ্ধতি না অনুসরণ করেও বলা চলে যে আনার অভিজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সমাজপটের একটা নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে—যে ব্যাখ্যা আনার জীবন-নির্যাসে সিদ্ধ বলেই শিল্পসম্মত হতে পেরেছে। কারেনিনকে বিবাহ আনার হৃদয়ে কোনো নতুন প্রত্যাশার জাগরণ ঘটায়নি। All happy families are alike—এই উক্তির ভিতরে টলস্টয় তাঁর বক্তব্য বলেছেন। কারেনিন এবং আনার দাম্পত্য-জীবন সচরাচর উচ্চ মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-জীবন। কারেনিনের যান্ত্রিক জীবনধারা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি লেখক যথোপযুক্ত সুবিচারের সঙ্গে এঁকেছেন। কারেনিনকে যে আনা আবেগের সঙ্গে কোনোদিনই ভালবাসতে পারেনি—এর জন্যে কারেনিনের কোনো অস্বাভাবিকতাকে লেখক দায়ী করেননি। আনার ব্যাপার যে সৃষ্টি-ছাড়া কিছু ব্যাপার নয় সে সম্বন্ধেও লেখকের ইঙ্গিত পরিস্ফুট। ভ্রনস্কির মায়ের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখই যথেষ্ট। আনা বর্তমান সামাজিক জীবনের সম্পত্তিবাদী

স্বামীর পত্নী। সে আশাহত আবেগহত অনুভূতিশূন্য অ্যাভারেজ মধ্যবিত্ত ঘরনীর ক্লান্তিময় দাম্পত্য-জীবনে যে-চূড়ান্ত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে তারই প্রতীক। সেই জন্যই তার গোটা অভিজ্ঞতা এমা বোভারির মতো মাঝারি অভিজ্ঞতা নয়।

আবার যে লোকটা আনাকে প্রচলিত জীবনের ছকে অনুগত থাকতে দিল না তার সম্বন্ধেও টলস্টয়ের অভিনিবেশ লক্ষণীয়। ভ্রনস্কি আনার প্রেম এবং আনার মৃত্যু এই উভয়ের প্রত্যক্ষ হেতু। কী করে সে আনার প্রেমকে জাগ্রত করল, আবার কী করে সে আনার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল দুইই অনুধাবনযোগ্য। আশ্চর্যের বিষয় উভয় ব্যাপারই সংঘটিত হচ্ছে ভ্রনস্কির ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক চরিত্রের টানাপোড়েনে। যে ভ্রনস্কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিমুক্ত প্রাণাবেগের প্রতীক, যে ভ্রনস্কি সামরিক-বিভাগ পরিহার করে নাগরিক জীবনের সান্ধানী, যে ভ্রনস্কি উদারতাবাদী রুশ যুবকদের তৎকালীন প্রতিভূ—যে ভ্রনস্কি নিজ জীবনের ধারা-ধরনের পরিবর্তন প্রয়াসী সেই ভ্রনস্কি আনার হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ সম্ভব করে তুলেছিল। আনা কারেনিনের ঘরনী হিসাবে যে যান্ত্রিক জীবন বহন করছিল তার জন্যে তার মনে ফল্গু-বিক্ষোভ বিদ্যমান ছিল, যাকে সে নিজেও হয়তো ভালো করে চিনত না। ভ্রনস্কির প্রতি আসক্তি সেই বিক্ষোভের সুড়ঙ্গ-পথ। আবার এই একই ভ্রনস্কির ভিতরে উদারতাবাদী রুশ মধ্যবিত্ত যুবকের সর্বাঙ্গীণ অসঙ্গতিও উপস্থিত। সে নিজের জীবনের ধারা পরিবর্তনের প্রয়াসী, কিন্তু এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা তাকে যা করে তোলে তা হল সূক্ষ্মতা-বিলাসী *dilettante*। এর সামর্থ্য সীমিত। এই হল এই সূক্ষ্ম রুচিবিলাসীর জীবনের মূল অসঙ্গতি। কাজে কাজেই আনার সমুদয় প্রেমের দায় সে বহন করার যোগ্য নয়। চায়ের টেবিলে আনার চা খাওয়ার ভঙ্গিকে তার মনে হয় কুৎসিত। এমনি করে আনারও ঘোড়দৌড়ের ঘটনার পরে মনে হয়েছিল যে কারেনিনের কানগুলো খুব বড়ো বড়ো। কিন্তু টলস্টয়ের বিষয়চেতনা এমনই মর্মগ্রাহী যে পাঠকের কাছে আনার মনে-হওয়াটাকে মনে হবে নির্দোষ। মনে হবে যে সেটা হল কারেনিনের নিরাবেগ অভ্যাসিকতা-মন্থর জীবনের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি। আর ভ্রনস্কির মনে-হওয়াটাকে মনে হবে কদর্য। কেননা ভ্রনস্কি প্রেমের দায়কে বহন করার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার উজ্জ্বল নায়ক অনিবার্য প্রতিমুখে স্থাপিত হয়ে স্তিমিত হয়ে গেল। দেখানো

হল, আধুনিক যুগের তথা সভ্যতার বিশিষ্ট পর্যায়ে কিবা দাম্পত্য-জীবন, কিবা প্রেম, উভয়েরই সংকট ও অন্তর্জটিলতা কতখানি কঠিন, কতখানি অমোচনীয়। এই অন্তর্জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতায় আনা কারেনিনা উপন্যাসে নৈতিক সচেতনতা সক্রিয় হয়ে রয়েছে। এবং এই বিচারেই এমা বোভারির মাঝারি অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আনা কারেনিনার গভীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি তাৎপর্যবহ। উপন্যাসের এই পট এবং পটবিধৃত ব্যক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে তরুণ মোপাসাঁকে লিখিত ফ্লবেয়ারের একটি চিঠি আলোচ্য। মোপাসাঁকে ফ্লবেয়ার লিখেছিলেন যে যদি শিল্পীকে একটি বিশেষ গাছের বিষয় বর্ণনা করতে হয় তাহলে তিনি ততক্ষণ ধরে সেই গাছটিকে প্রত্যক্ষ করবেন যতক্ষণ না সেই বিশেষ গাছটিকে অন্য সকল গাছ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ফ্লবেয়ারের ধারণা ছিল এই পদ্ধতিতেই নাকি সেই বিশেষ গাছটির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়বে। কিন্তু আংশিকভাবে এর কার্যকারিতা মেনে নিলেও এই পদ্ধতির সীমিত দিকটিও আমাদের দৃষ্টিতে আনা উচিত। এই পদ্ধতির ফলে ঐ বিশেষ গাছটি যে প্রকৃতির বিস্তীর্ণ পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতেই যে পূর্ণ শিল্পবোধের ব্যত্যয় ঘটে শিল্পীর সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন।

তিন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঔপন্যাসিকের বিষয়চেতনা অন্য শিল্পের মতো শুধু প্রকাশ-চেতনা বা বৃহৎ অর্থে আঙ্গিক-সচেতনতা নয়। তদতিরিক্ত কিছু। এইখানে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে পটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মিলিয়ে দেখতে চাওয়াটাই ঔপন্যাসিকের দেখতে চাওয়া। এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী কোথায় মিলছে না। অসমন্বয়ের এই যন্ত্রণাকে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল প্রেমে, সকল মানুষ তার স্বরূপকে খুঁজছে। ব্যক্তিমানুষের এই সন্ধানী যাত্রায় ঘন ঘন করাঘাত সমাজ-পরিবেশের বুকের ওপরেই বাজতে থাকে। তাতে যে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় উপন্যাসের ফলশ্রুতি নির্মাণে তার ভূমিকা অন্যতম। সে কারণে বলা যায় যে যন্ত্রণাই সমস্ত উপন্যাসের বিষয়—সে যন্ত্রণা অস্তিত্বের যন্ত্রণা।

এ প্রসঙ্গে আমরা বর্তমানে আলোচনা করব—একদিকে রাসকল্‌নিকফ ও

নেখল্যুডফের অভিজ্ঞতার কথা; আর একদিকে ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেজারেকশনের নায়ক রাসকল্‌নিকফ এবং নেখল্যুডফ জীবনের বহুধাবিস্তৃত পটে কর্মতৎপরতায় বিশিষ্ট নায়ক। ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট এবং রেজারেকশনের কাহিনীতে অবশ্যই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এই দুই নায়কের যন্ত্রণার সাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য দ্বিবিধ; প্রথম, উভয় নায়কেরই এক পাপকৃতির চেতনা রয়েছে—নেখল্যুডফের মাসলোভা সংক্রান্ত স্মৃতি এবং রাসকল্‌নিকফের খুনের এবং পরস্বাপহরণের স্মৃতি। দ্বিতীয়, উভয়েই এই পাপচেতনার আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেদের শুদ্ধ স্বরূপের সন্ধান করেছে। এই সন্ধানের জটিল বিস্তৃত পর্যায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস দুটি শেষ হয়েছে। দুই উপন্যাসের শেষ বাক্য হচ্ছে এক পর্যায় সমাপ্ত হল। যে নব পর্যায়ের শুরু হল তা কেমন হবে সে গল্প আর এক গল্প (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট), একমাত্র ভবিষ্যৎ তার বিচারক (রেজারেকশন)।

দুটি উপন্যাসে প্রেমের ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে। এই প্রেমের আখ্যান রাসকল্‌নিকফ এবং নেখল্যুডফের জীবনের পরিণতি রচনায় মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে দুঃখদহনের স্বেচ্ছা-বরণে এই দুই নায়কের শুদ্ধতার জন্য সংগ্রামের পরম নিদর্শন, প্রেম তাকে উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু দুই উপন্যাসে দেখা যায় যে প্রেম-কাহিনীর ব্যবহার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতিতে হয়নি। যন্ত্রণার পথে প্রেম এসেছে যন্ত্রণাকে বৃহত্তর তাৎপর্য দানের জন্য; যন্ত্রণাকে পরম রমণীয় করে তোলা এই দুই প্রেমকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল না। সে কারণে বলা চলে যে মহৎ উপন্যাসের যোগ্য আবহাওয়া রয়েছে এই প্রেমের আখ্যানভাগে। উপন্যাসের মুশকিল আসানের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক উপায়ক্রম হিসাবে এদের ব্যবহার ঘটেনি। রেজারেকশনে নায়কের দীর্ঘযাত্রার শেষে দেখা গেল নায়িকা মাসলোভা নেখল্যুডফকে বিবাহ করতে অক্ষম। দানব্রতী কর্ণের কবচকুণ্ডল পরিহারের মতো নেখল্যুডফকে মাসলোভার প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হল। এবং জীবনের যে সৎ-স্বরূপকে অভিজ্ঞতার ছকে ছকে সে নানাভাবে খুঁজল তার সেই জীবন-পিপাসারও চূড়ান্ত পরীক্ষা হল এই শেষ যন্ত্রণার কষ্টিপাথরে। আবার রাসকল্‌নিকফের যন্ত্রণাকেও সহনীয় করে তোলার জন্য সোনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারটিকে ব্যবহার করা হয়নি। সাইবেরিয়ায় মাসলোভা নেখল্যুডফকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে সেক্ষেত্রে রাসকল্‌নিকফ সোনিয়াকে সাইবেরিয়ার ঊষর বন্দী জীবনের মাঝখানে স্বীকার করে নিল। অবশ্যই দুটো ব্যাপারের নিষ্পত্তি হচ্ছে দু-রকম ভাবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দুই লেখক একটা বিন্দুতে আশ্চর্যভাবে স্থির। টলস্টয় এবং দস্তয়েভস্কি কোনো শিল্পী-সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। নায়ককে জীবনের যন্ত্রণার মুখে স্থাপিত করে, পরে প্রেমের উপাদানের সাহায্যে সে-যন্ত্রণাকে সহনীয় করে তোলার আয়োজন করলে সেই সুবিধাবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হত! 'আমি সমস্ত কিছু স্বীকার করব'—এই সিদ্ধান্তের পরমুহূর্ত থেকেই রাসকল্‌নিকফ সোনিয়ার সঙ্গে দূরত্ব রচনা করার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। সে সোনিরার কাছ থেকে যখন বিদায় গ্রহণ করেছে তখন মৌখিক বিদায় সম্ভাষণ করাও প্রয়োজন মনে করেনি। সাইবেরিয়ার কারাবাসে সোনিয়াকে দেখে প্রথম প্রথম যে ব্যবহার সে করেছিল সে-ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং উদাসীন। সুতরাং প্রেমের আকাশে মুক্তি পাবার প্রলোভনে সে গ্লানিমোচনের পথে পা বাড়ায়নি। নেখল্যুডফ এবং রাসকল্‌নিকফ এদের দুজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অস্তিত্বের গভীর অন্তস্তল থেকে যন্ত্রণার উৎসমুখ উন্মোচিত হয়েছে। এই যন্ত্রণা থেকে এরা উভয়ে পৃথিবার পীড়িত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে—বুঝেছে যে পৃথিবীর গভীর—গভীরতর অসুখ এখন। এই সমস্যা গোটা ব্যক্তি-বিবেকের সমস্যা। যেহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা একক অংশীভবনের ভিতর দিয়ে বলা যায় না, সেইহেতু গোটা ব্যক্তি-বিবেকের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিটা যে সমাজের অংশ, সভ্যতার যে পর্যায়ের সে প্রতিনিধি তার বিচিত্র রূপও এই সব ব্যক্তি-জীবনের মুকুরে নানাভাবে ছায়াপাত করে। ঔপন্যাসিকের বিষয়-চেতনা এই সকল কিছুকেই আত্মসাৎ করে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ভ্রমর এবং কুমু। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং যোগাযোগ অবশ্যই এক ধরনের এবং ভঙ্গির উপন্যাস নয়, কিন্তু এই উপন্যাসদ্বয়ের নায়িকাযুগলের মূলভিত্তিক সমস্যার একটা সুদূর সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমস্যাটা এই যে উভয়েরই স্বামী নামক আইডিয়ালের প্রতি, বা স্বামীত্বের ভাবাদর্শের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ; কিন্তু গোবিন্দলাল বা মধুসূদন উভয়েরই ব্যক্তি-জীবনের আচরণের সঙ্গে ভ্রমর এবং কুমু সেই ভাবাদর্শের সঙ্গতি কেমন করে রক্ষা করবে? কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সমস্যা চূড়ান্ত হল উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনাগতির চূড়ান্ত সীমায় বা climax-এ পৌছে—রোহিনী-হত্যার পর।

যোগাযোগে এ সমস্যা উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। উপন্যাসটি অসমাপ্ত। কাজেই এ সমস্যার শেষ পরিণতি কী তা জানা সম্ভব নয়।

তথাপি একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে সমস্যার মূল সূত্র নিহিত হয়ে রয়েছে দুই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধে। ভ্রমর বলেছিল তার স্বামীকে যে, যতদিন তার স্বামী শ্রদ্ধার পাত্র ছিল ততদিন সে শ্রদ্ধা করেছে। আবার কুমুর ক্ষেত্রে সমস্যাটা এসেছিল এইভাবে যে জীবনযাত্রার এক বিপরীত বিন্যাসের বা ছকের মাঝখানে গিয়ে কেমন করে সে নিজেকে তার সঙ্গে মেলাবে। ভ্রমর তার যা কিছু ethical শিক্ষা সংগ্রহ করেছিল তার স্বামী গোবিন্দলালের কাছ থেকে। গোবিন্দলাল তাকে যা শিখিয়েছিল তা উনিশ শতকের সম্পত্তিবান যুবকের নীতিবিশ্বাস প্রণোদিত শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ আমরা কৃষ্ণ-কান্তের উইল উপন্যাসে পাই না। কিন্তু সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ভ্রমরের মধ্যে আমরা এই উপন্যাসে নানাভাবে দেখতে পাই। গোবিন্দলালের প্রদত্ত শিক্ষা নিশ্চয়ই ধনবান একান্নবর্তী সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বিরোধী কোনো শিক্ষা নয়। কাজে কাজেই বধূ হিসাবেই ভ্রমরের অস্তিত্ব। তার বাইরে ভ্রমরের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভ্রমরের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আলোকে তখনই দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠা সম্ভব হল যখন সে স্বামীরই প্রদত্ত বিচারবোধের মাপকাঠিতে স্বামীকে বিচার করে বসল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলেছিল যে, তুমি শ্রদ্ধার উপযুক্ত নও, আর বলেছিল মৃত্যু-মুহূর্তে, 'আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।' এই দুটো কথাই হিন্দু সমাজের প্রচলিত পত্নীত্বের সংজ্ঞাবিরোধী। সর্বাবস্থায় পতি হিন্দু নারীর পূজ্য এবং পতিগতপ্রাণতায় তার সুখ, ভ্রমর এই দুই ধারণারই বিরুদ্ধতা করল। এইখানেই ভ্রমর-চরিত্রের নৈতিক মূল্য। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোকে বঙ্কিম নিজে উদ্ভাসিত ছিলেন ভ্রমরের চরিত্রের ভিতর দিয়ে তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। ভ্রমরের চরিত্র তার নিজ ন্যায়কে অনুসরণ করতে করতেই বঙ্কিমের আন্তর সত্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই যে reflection of writer's innerself—শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কীর্তির এটা একটা বড়ো নিদর্শন। ভ্রমরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সামান্য অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ভ্রমরের জা নেই, শাশুড়ি থেকেও নেই (সূর্যমুখীরও এই অবস্থা ছিল)। ফলে ভ্রমরের অন্তঃপুরের পারিবারিক জীবনযাত্রার-সমস্ত প্রকার সম্পর্কগুলোকে ঠিকমতো উপস্থাপিত করা হয়নি। এইভাবে উপস্থাপিত করলে ভ্রমরের যন্ত্রণা আরও বেশী real হয়ে উঠতে পারত। কারণ

আমরা জানি মেয়েদের জীবন এত বেশি ছক-অনুবর্তী ও এত বেশি নানা সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল যে শুধু দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতর দিয়ে একটি নারীর সর্বস্ব উপলব্ধি হয় না। রোহিনীকে যেমন আমরা রোহিনীর সমশ্রেণীর ঝি-চাকরানী প্রমুখ পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত অবস্থাতেই সর্বদা পাচ্ছি, ভ্রমরকে সে জায়গায় একক অন্তঃপুরচারিণী বলে মনে হয়। ভ্রমরকে যে কেবল শেষ পর্যন্ত একটা ideal-এর মূর্ত প্রতীক বলে ভ্রম হয়েছে সেটা এই কারণে। নারীর সহস্র গ্রন্থিল পারিবারিক জীবনের চাপ এবং প্রতিক্রিয়া যদি প্রতি মুহূর্তেই তার ওপর পড়ত তাহলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না।

কিন্তু এইভাবে সামাজিক ও পারিবারিক পটের দিক থেকে সম্পর্কগত খানিকটা ব্যত্যয় থাকলেও অন্য একদিক থেকে ভ্রমর একটি নিরুপম আদর্শের সৃষ্টি করেছে। সেটি ইতিহাসের দিক থেকে। এ-কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে শিল্প-সার্থক প্রতিটি উপন্যাসই যুগ লক্ষণাক্রান্ত। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের কুশীলবেরা এই যুগ লক্ষণকে বহন করে থাকে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তায় তার ব্যক্তি-জীবনের ন্যায়-ক্রম যতটা ক্রিয়াশীল থাকে যুগের সমকালীন টানাপোড়েনও ততটা না হোক কম-বেশি করে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ। কিন্তু একটি সার্থক উপন্যাসের চরিত্রাবলী কখনই এই ইতিহাস ব্যাখ্যার সীমাকে লঙ্ঘন করে চলতে পারে না। রবিনসন ক্রুশো চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ শিল্প-রূপের সম্যক আলোচনায় আমাদের নিশ্চয় কেবলমাত্র ডিফো-র কালের ইংলণ্ডীয় সমাজ-ইতিহাসের নজির আকর্ষণ করলেই চলবে না, তার সাহিত্য সমালোচনাই সেখানে মূল কথা। কিন্তু এ সাহিত্য সমালোচনাও আবার পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না ডিফো-র শিল্পীমানসের নিজস্ব বিচিত্র গতিকে আমরা সকল দিক দিয়ে উপলব্ধি করছি। এই উপলব্ধি আরো বহুকিছুর সঙ্গে ঐতিহাসিক পটবিচারেরও মুখাপেক্ষী। টুর্গেনিভের বিখ্যাত বাজারভের প্রসঙ্গও এ-ক্ষেত্রে তুলনীয়। বাজারভকে রুশ মধ্যবিত্ত যুবকদের তাৎকালিক চিন্তাগত পট-ভূমিকায় স্থাপন করা ছাড়া তার অভিজ্ঞতার পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভ্রমরের ব্যাপারেও অনুরূপ বিচার পদ্ধতি প্রয়োজন।

ভ্রমর বাংলা দেশের নারীসমাজের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু তাই বলে ভ্রমরকে শুধু সেই আখ্যায় ভূষিত করলেই তার স্বরূপাবিষ্কার সম্ভব হবে না। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উনিশ শতকের নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ

ভ্রমরের চিন্তায় এবং চেতনায় পরোক্ষ উদ্ভাসন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লেখকের অন্তরাত্মার এই বিশিষ্ট প্রতিফলন গণিতের সরল সূত্র অনুসরণ করে সম্ভব হয়নি। সৃষ্টিক্রিয়ার গূঢ় এবং জটিল পন্থার অনুসরণ এখানে লক্ষণীয়। চরিত্রের প্যাটার্নের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে ভ্রমর সম্পূর্ণভাবে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের প্রচলিত ছকের অঙ্গীভূত চরিত্র। সে একান্নবর্তী সামন্ত-পরিবারের বধূ। সেই বধূত্বের যে বোধ সেই বোধের নির্দেশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেই তার সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতিকে ব্যবহার করেছেন লেখক। এই সূত্র থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে ভ্রমরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমষ্টিরূপ এবং ব্যক্তিরূপের মধ্যস্থিত এই দ্বন্দ্বময় রূপের শিল্পায়নই ঔপন্যাসিকের কাজ। ভ্রমর সে-হিসাবে খাঁটি উনবিংশ শতকের বাঙালী বধূ। যার বধূ-চেতনায় চিরকালের বাংলাদেশ ক্রিয়াশীল—যার নীতি-চেতনায় উনবিংশ শতকের প্রভাব। এই ঔপন্যাসিক-লক্ষণের বিদ্যমানতার জন্যই ভ্রমরের সামান্য পটভূমিকাগত সীমাবদ্ধতার ক্ষতি-পূরণ হতে পেরেছে।

কুমুর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যাপকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। মধুসূদনের পরিবারে কুমুর অস্তিত্বকে নানা সম্পর্কের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। মধুসূদনের রুচি এবং কুমুর রুচির মধ্যে যে বিরোধ তা অবশ্যই জীবনের দুটো বিন্যাসের বিরোধ। দুটো ব্যক্তিত্বের বিরোধ। সম্পত্তিবান মধুসূদনের অধিকার-বোধের প্রতিমুখে স্থাপিত নিজ-জীবনার্থ সন্ধানী এক নারী। সে তার পত্নীও বটে। তাদের অমীমাংসার সমস্যা যোগাযোগের সমস্যা। ভ্রমরের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের উৎস যেখানে, কুমুর উৎস তদপেক্ষা আরো গভীরে। এ কারণে কৃষ্ণকান্তের উইল অপেক্ষা যোগাযোগের বিষয় অধিকতর গভীর।

ভ্রমর, কুমু এবং সাহেব-বিবি-গোলামের ছোট বৌয়ের কাহিনীর তুলনামূলক বিচারে তিনজন লেখকের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের তারতম্য-বিচারও সুসাধ্য। ভ্রমরের চিন্তার সংকট এসেছে একটা অতি স্থূল চরিত্রের ঘটনা থেকে। তার স্বামী চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে গেল। ভ্রমর এবং গোবিন্দলাল উভয়ে মিলে জীবনের যে ছক গড়ে তুলেছিল বহির্নিক্ষিপ্ত একটা ঘটনার আঘাতে সেই ছকের বাইরে চলে গেল ভ্রমরের স্বামী। রোহিনীর বিষয়ে গোবিন্দলাল নিরাসক্ত থাকলে ভ্রমরের সংকট সম্ভব হত না। তারা উভয়েই সচরাচর অনুসৃত জীবনযাপন করতে পারত। পুণ্যবান মানুষও দুর্বল বলেই পাপের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে ফেলে——শুধু এই ঘটনার আতিশয্যেই এই উপন্যাসের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত হয়ে

অপেক্ষা করছিল। এইখানে যোগাযোগের তুলনায় বিষয়গত গভীরতার ন্যূনতা। এ ধরনের ঘটনাচক্র এবং অদৃষ্টের আকস্মিক দুর্যোগ যোগাযোগে অনুপস্থিত। মধুসূদন একদা পুণ্যবস্তু ও অধুনা পাপাসক্ত নীতিশাস্ত্র পড়া যুবক নয়। উপন্যাসের সমস্যারম্ভ তথাকথিত নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু থেকে নয়। কুমুর কাছে এবং মধুসূদনের কাছে জীবনের মানে পৃথক, সমস্যারম্ভ এখানে। মধুসূদন এবং কুমু পরস্পরকে পরিহার করতে চাইলে সমস্যার কোনো অস্তিত্বই সম্ভব হত না। এখানে এরা দুজনে পরস্পরকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চায়। তার পথে যে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে রয়েছে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল সেই বাধার সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী। সে-বিচারে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে লেখক অপার নৈতিক সচেতনতার বা moral awareness-এর পরিচয় দিয়েছেন। সেটা হল : আমরা ভালবাসতে চাইলেই যে ভালবাসতে পারব এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে ব্যক্তিমানস একটি জটিল সৃষ্টি। সেই ব্যক্তিমানসের সারীভূত রূপ হল ব্যক্তিত্ব। আমাদের নিভৃত ভালবাসার অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রেও সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানস তার ভূমিকা হারিয়ে ফেলে না। কুমুর অভিজ্ঞতার মূল্য এ কারণেই ভ্রমরের অভিজ্ঞতা থেকে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব সাহিত্যাদর্শের পাশে সাহেব বিবি গোলামের ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতার প্রতিতুলনা যদি করা যায় তাহলে বোঝা যায় ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতার মূল্য এদের তুলনায় কত স্বল্প। বিষয়বস্তু হিসাবে ছোট বৌঠানের অভিজ্ঞতা লেখকের ব্যবহারের দোষে তাৎপর্যহীন হয়েছে। এ গল্পে অবশ্যই ছোট বৌঠানের ব্যক্তিস্বরূপকে সামন্ত পরিবারের বধূত্বের ফ্রেমে ঠিক ভাবেই বসানো হয়েছে। কিন্তু ছোট বৌঠানের কারুণ্য ভ্রমরের ট্র্যাজেডির পর্যায়ে উঠতে পারল না লেখকের বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত দুর্বলতায়। স্বামীর ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে বধূটি মদ্যপান করে ও আত্মবিসর্জন দেয় তার নিঃসহায় কারুণ্যের মূল্য কতটা? নির্যাতিত নারীত্ব বা জমিদার বাড়ির কেচ্ছা ছাড়া একে আর অন্য কোন্ তাৎপর্যে অর্থবান করে তোলা যাবে? নিজে মদ্যপানাসক্ত হয়ে স্বামীর কাছে বেশ্যাদের বিকল্প রচনা করে ট্র্যাজিক মহিমা তবেই অর্জন করা যেত যদি নীতিবোধ সম্বন্ধে বৌঠানের কোনো দৃঢ় সুস্পষ্ট চিন্তা ছিল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট.পূর্ব-প্রমাণ আমাদের হাতে থাকত। তবেই মদ্যপানের ভিতরে বৌঠানের দ্বন্দ্বময় আর্তি রূপায়িত হতে পারত। এর অবর্তমানে যা হয়েছে তা হল সত্যিই চাকরের চোখে দেখা একটি বিশেষ জমিদার বাড়ির অ্যাভারেজ কেচ্ছা কাহিনী মাত্র।

আসলে বিষয়বস্তুটা ততক্ষণ লেখকের কাছে বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে না যতক্ষণ ন' লেখক নিজে একটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্য খুঁজে পান। অমুক বইয়ের বিষয়বস্তু এই, অথবা ঐ বইটার বিষয়বস্তুটা ভালো এসব কথা এই জন্যই নিরর্থক। অতি সাধারণ বিষয়ও বক্তব্যের টানে শিল্পময় হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ বিষয়ও বক্তব্য-বিরহিত অবস্থায় ব্যর্থ শিল্পকর্মের নজির হিসেবে কাজে লাগতে পারে। এই ভাবেই একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের বড়ো হওয়ার বিষয় একজনের কাছে শৈশব অতিক্রমণের গল্প, আর একজনের কাছে যৌন চেতনা উন্মেষের গল্প, তৃতীয় জনের কাছে একটা জগৎ ভেঙে গুঁড়িয়ে আর একটা জগৎ গড়ে ওঠার গল্প। জেন অস্টেনের 'এমা' উপন্যাসের subject matter হল বিবাহ—সেও এই ভাবেই শিথিল উক্তি। আমাদের দেখা দরকার subject matter বা বিষয়বস্তুর সাহায্যে লেখক ব্যক্তি -এবং সমাজ সম্পর্কের চলিষ্ণু রূপকে কী অর্থে বিশিষ্ট করলেন, কীভাবে রূপময় করলেন। সে বিশিষ্টতাতেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের বিষয়।

চার

সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাৎসার। সেই কারনেই বলা হয়ে থাকে যে উপন্যাসেই একমাত্র মানুষের সহস্র সম্পর্কের সূত্রগুলিকে উন্মোচিত করে দেখানো সম্ভব। এর মূলে রয়েছে পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা লেখকের বিষয়-চেতনা। বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের বোধ এবং চেতনার বিস্তার এবং গভীরতা উপন্যাসের প্রতিটি অংশেই অভিব্যক্তি লাভ করে থাকে। পার্সি লাবক তাঁর সুবিখ্যাত Craft of Fiction নামক গ্রন্থে উপন্যাসের ঘটনাংশের বা বর্ণনাংশের রূপায়ণ পদ্ধতিকে নানাভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন। চিত্রানুগ বর্ণনা বা pictorial treatment, দৃশ্যানুগ বর্ণনা বা scenic treatment, নাট্যানুগ বর্ণনা বা dramatic treatment প্রভৃতি নানা পদ্ধতির কথা উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের ভিন্ন উদাহরণও উপযুক্ত উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের treatment বা বিষয় ব্যবহারও শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল লেখকের বিষয়বোধের বনিয়াদে। একই ধরনের ঘটনাংশ দুই ভিন্নধর্মী উপন্যাসে দুই জীবন-ব্যাখ্যার জন্মদাতা।

ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের রাত্রির নারী পুরুষের যথেচ্ছ-সজ্জার কৌতুক আর ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর Walpurgis Night-এর, যক্ষ্মা-রোগীদের যথেচ্ছা-সজ্জার রঙ্গরস আপাতদৃষ্টিতে একই লক্ষণাক্রান্ত। নাটকের রিলিফের মতো বড়োদিনের সন্ধ্যা এবং Walpurgis Night গাম্ভীর্য-ঘন, ঘটনা-ছায়াচ্ছন্ন এই দুই উপন্যাসে এনে দিয়েছে অবাধ মুক্তির সানন্দ-অবকাশ। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর কাহিনীর ঘটনাঘন অধ্যায়ে উক্ত ছদ্মসজ্জার রজনীতে নাটাশার ওষ্ঠে গুম্ফাঙ্কন এবং তাতার সওয়ারের বেশ ধারণ, নিকোলাস, সোনিয়ার বরফ-হিম রাত্রে উদ্দামগতিতে শ্লেজগাড়ির অশ্বধাবন তৎকালীন রুশিয়ার কামান-বিঘোষিত ইতিহাসে নবীনের অনিবার্য প্রাণাবেগের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত যে জীবন নতজানু হয় না—এই প্রগল্‌ভ উল্লাসময় ঘটনাংশ তারই প্রমাণ। যক্ষ্মা হাসপাতালের মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন আকাশে Walpurgis Night (ম্যাজিক মাউণ্টেনে) এক রাত্রির জন্য মৃত্যু-উপেক্ষী ব্যাধি-বিস্মৃতির বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়। রোগীরা সেদিন কেউ বা সাজে থার্মোমিটার, কেউ বা সাজে ওষুধের রেখাঙ্কিত শিশি। এরও আপাত-তাৎপর্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসের বড়োদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্যের সঙ্গে সমতুল্য। কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য সাদৃশ্যের সীমা এই পর্যন্ত। গূঢ় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুই ঘটনাংশই ভিন্ন তাৎপর্যের অধিকারী। এ তাৎপর্য উভয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই মাত্র উপলব্ধি করা সম্ভব। নতুবা নয়।

Walpurgis Night এবং বড়োদিনের রাত্রি—এই উভয় সদৃশ ঘটনা উক্ত উপন্যাস দুইটিতে মূল প্রেমকাহিনীর একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। নিকোলাস এবং সোনিয়ার প্রেম এবং হান্স কাস্টর্প ও ক্লাভদিয়ার প্রেম-কাহিনীর গতি এবং আবেগ সঞ্চারের কাজে উক্ত দুই রাত্রির বর্ণনা ঔপন্যাসিকের কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। হান্স কাস্টর্প ও ক্লাভদিয়ার প্রণয় স্বাভাবিক এবং সাধারণ প্রণয়-কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে না। এই প্রেম কাহিনীর পটভূমিকা যক্ষ্মা হাসপাতাল। প্রেমের পাত্রপাত্রী দুজনও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। স্বভাবতই হান্স কাস্টর্প-এর প্রেমে morbidity বা রুগ্নতার আশঙ্কা সদা সর্বদা উপন্যাসে ছিল। কম বেশি করে টমাস মানকে এই রুগ্নতাকে পরিহার করার সংগ্রামে সারা উপন্যাসেই নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। মান্-এর অন্তর্ভেদী জীবনদৃষ্টি জীবনের বহিরঙ্গের সমস্ত রুগ্নতা, দুর্বলতা এবং খর্বতাকে ভেদ করে জীবনের সত্যস্বরূপের

শুদ্ধতার সন্ধানকে এই উপন্যাসে শিল্পের উৎস বলে মনে করেছে। হান্স কার্স্টর্প-এর সর্বতোমুখী জীবন সন্ধান—তা সে Herr settembrini-এর সঙ্গে মানবতাবাদ বিষয়ে তর্কের কচকচিতেই হোক, অথবা দুরন্ত বরফপাতের রাত্রে একক পরিভ্রমণে হোক, কিংবা জীবতত্ত্ব বা উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণাতেই হোক—এই উপন্যাসে নানাভাবে প্রদর্শিত। Walpurgis Night-এর ছদ্মাবৃত কৌতুকময়ী প্রগল্‌ভতার বর্ণনায় ক্লাভদিয়া এবং হান্স কার্স্টর্প-এর প্রেমও তাই সেই বিস্তৃত জীবনান্বেষণের একটি অধ্যায় বলে পরিগণিত হবে। ম্যাজিক মাউণ্টেন অবশ্যই টমাস মান-এর এবং এ যুগের একটি অন্যতম মহৎ সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু কখনো কখনো যেন মনে হয় যে টমাস মান ম্যাজিক মাউণ্টেন রচনাকালে তার বিষয়বস্তুর সীমা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটা মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হবার পক্ষে ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর বিষয়বস্তু যে সর্বাংশে উপযুক্ত নয় এই বোধ যেন টমাস মান-কে কিছুটা স্পর্শ করেছিল। তাই, দেখা যায় হান্স কার্স্টর্প-এর অন্বেষা, সর্বতোমুখী জীবন সন্ধানে, প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত পরিহৃত হয়েছে। মান জানতেন যে ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর লেখকের মতো তাঁর হাতে কোনো ঘটনার বর্ণাঢ্য বিষয় নেই। সুতরাং যক্ষ্মানিবাসের মিত-পরিসরে জীবনের নানা বর্ণকে প্রতিফলিত করার দুঃসাধ্য ব্রত তাঁকে পালন করতে হবে। হান্স কার্স্টর্প-এর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই জীবনের বহুধাবিস্তৃত অভিজ্ঞতার মূল্যও নিরূপিত হবে। সমগ্র উপন্যাসটি এই ছকে নির্মিত। ঔপন্যাসিকের সুশৃঙ্খল শিল্প চেতনা শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে যে-জীবনব্যাখ্যার জনক এ উপন্যাসে সেই শৃঙ্খলা এবং জীবন-ব্যাখ্যা দুইয়েরই সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবম্বিধ বিষয় মান-এর পক্ষে অসুবিধাজনক হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। এ উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে গুরুভার পণ্ডিতিয়ানার অভিযোগ ওঠে তার উৎস এখানেই। সুতরাং মান-কে এই অসুবিধা অতিক্রম করার জন্য উপন্যাসের পটভূমিকায় আনতে হয়েছে ইওরোপীয় মহাকাশের বিস্তৃতি। বিষয়বস্তুর যা অসুবিধা তাকে তিনি অতিক্রম করেছেন পটভূমিকাকে অগাধ-বিস্তারের তাৎপর্য-প্রদানের ভিতর দিয়ে। উপন্যাসে বর্ণিত যক্ষ্মা-হাসপাতালকে সংকটাপন্ন ইওরোপীয় সংস্কৃতির রূপকে ধারণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই। নানা দেশ থেকে আগত রোগীবৃন্দের সমাহারে বিরচিত পরিবেশে তাই বারে বারে ইওরোপের বিরাট ভাবাকাশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যাজিক

মাউণ্টেন-এর যক্ষ্মানিবাস উক্ত ভাবাকাশের গ্রহসংস্থান অবলোকনের জন্য উপযুক্ত মানমন্দির। শেষ পর্যন্ত মানুষেই মুক্তি হান্স কার্স্টর্প-এর এই সিদ্ধান্তের জন্য পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ঘনায়মান সংকটকে যক্ষ্মা হাসপাতালের জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নানাভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে। হের সেটেমব্রিনি এবং তার বন্ধু নাপ্তা-র ভূমিকা এবং ক্লাভদিয়া আর হান্স কার্স্ট্র্প-এর প্রেমের আখ্যান এই সমগ্র ব্যাপারেরই এক একটা অংশ। পটভূমির পরোক্ষ বিস্তৃতিসাধন না ঘটালে ম্যাজিক মাউণ্টেন-এর সমস্ত কাহিনী কেবল রোগী এবং রোগের কাহিনী বলে পরিগণিত হত।

সুতরাং বলা চলে যে ক্লাভদিয়া এবং হান্স কার্স্টর্প-এর পরস্পর সম্পর্ক প্রচলিত অর্থে নরনারীর প্রেম-সম্পর্ক মাত্র নয়। সে কারণেই কার্নিভ্যাল-রাত্রির প্রগল্‌ভতার অন্তর্নিহিত কারুণ্য হান্স কার্স্টর্প-এর জীবনদর্শনকে উপলব্ধি করার পথে বড়ো সহায়। হত-ভবিষ্য হান্স কার্স্টর্প যেন হত-ভবিষ্য মানবতারই প্রতিভূ। সে যখন বলে যে ঐ রাত্রের মুখোশধারী চপলতার অন্তরালে Thou had the full sway তখন তা প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় যাজ্ঞা। ক্লাভদিয়া-র কাছে সেই প্রবাসী আত্মার মিনতিই সে পরোক্ষে ব্যক্ত করেছিল। একদিক দিয়ে সভ্যতা মানুষকে প্রবাসীর যন্ত্রণাই দিয়েছে। কিন্তু তার অসঙ্গতি এইখানে যে সে আর সেই যন্ত্রণাকে পরিহার করার জন্যও কোনো ফলপ্রসূ প্রেরণা অনুভব করে না। যেমন হান্স কার্স্টর্পও আর সমতল ভূমিতে নেমে যেতে কোনো তীক্ষ্ণ ইচ্ছা বোধ করে না। সে ভেবেছিল ক্লাভদিয়ার প্রেমে সে খুঁজে পাবে জীবনার্থ। ক্লাভদিয়া চলে যাবার পর তার জন্য প্রতীক্ষাকেও তার তাই মনে হয়েছে। এই প্রেমকাহিনীর Carnival-অধ্যায় (Walpurgis Night) এবং পরে Peeper corn-এর অধ্যায়ে জীবনের সেই জটিলতার যন্ত্রণাই বিধৃত। কার্নিভ্যাল রাত্রি সেই মানুষ এবং মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন যুবকের মনে যন্ত্রণাকে প্রেমের রূপ দিয়েছিল। হান্স কার্স্টর্প-এর যে-অভিজ্ঞতা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, উপন্যাসের প্রেমের আখ্যানভাগও সেই বিষয়-মাহাত্ম্যেই সমৃদ্ধ এবং অনন্য।

এইভাবে ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জীবন-ব্যাখ্যা উপন্যাসের প্রতি অংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ক্লাভদিয়ার উপবেশন ভঙ্গি থেকে শুরু করে সব কিছুই হান্স কার্স্টর্প-এর হ্যামবুর্গীয় ভদ্রয়ানার ঐতিহ্যবিরোধী। এ ছাড়া যে ক্লাভদিয়ার প্রতি হান্স কার্স্টর্প আকর্ষণ অনুভব করেছে

তার মূল প্রতিপাদ্য থেকে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটিও ব্যাখ্যাত হয়। জীবন-ব্যাখ্যাহীন বা অদার্শনিক লেখকের রচনাতেই কেবল দেখা যায় যে উপন্যাসের গোটা কাঠামোয় প্রেমের ঘটনাংশ ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটায়।

অবশ্যই ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের সন্ধ্যার বর্ণনায় টলস্টয়কে মানে-র মতো বিষয়বস্তুগত অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। পটভূমিকার পরোক্ষ বিস্তৃতি বা বিষয়বস্তুর রূপক নির্মাণের জন্য সতত জাগ্রত প্রয়াসের বোঝাও টলস্টয়ের ছিল না। এ উপন্যাসের প্রাণশক্তির মূল রহস্য স্বগত বিশ্লেষণে বা বিদগ্ধ আলাপনের উজ্জ্বল আলোকসম্পাতে নয়। ঘটনানুক্রমিকতায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস-এর শিল্পরস নিহিত হয়ে রয়েছে। এবং উপন্যাসটির এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য লেখকের বিষয়গত বক্তব্যেরই প্রতিফলন। যেখানে উদ্দেশ্য উদাসীন মহাকালের পদক্ষেপকে ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষুদ্র ঘটনায় প্রতিবিম্বিত করে তারই প্রভাবকে ব্যক্তি জীবনের সুখে-দুঃখে অনুভব করানো—সেখানে এই সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকার্য। বড়োদিনের সন্ধ্যার যথেচ্ছ-সজ্জার বর্ণনাকেও এই নিরিখেই বিচার করতে হবে।

এই ঘটনাংশের পূর্বে এনড্রুর প্রবাস জীবনকে অবলম্বন করে নাটাশার যন্ত্রণা কোন্ তীব্রতার আবর্তে পড়েছিল সে কাহিনী কথিত হয়েছে। যে কোনো মর্মদাহী যন্ত্রণা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে—এই টলস্টয়ী বিশ্বাস এখানেও শিল্পকর্মের মূল প্রেরণা হিসাবে ক্রিয়াশীল। যন্ত্রণার পরবর্তী অধ্যায়ে নাটাশার শান্তশুদ্ধ মূর্তি বড়োদিনের রাত্রির সাধারণ মানুষের আনন্দাবেগের সহজ ধারায় স্নান করে মনের পক্ষাঘাতকে অতিক্রম করল। এই মানসিক বিহ্বলতাকে অতিক্রম না করলে নাটাশার প্রেমের সংকট (আনাতোল অধ্যায়) উপন্যাসে উপস্থাপিত হতে পারে না কিন্তু তাই বলে এটা কোনো সাধারণ উপন্যাসের যান্ত্রিক চাতুর্য নয়। জীবন-রসোচ্ছল নাটাশা চরিত্রের যুক্তিক্রম অনুসারে এটা তার জীবনের স্বাভাবিক গতি বলে প্রতিভাত হয়। বড়োদিনের সন্ধ্যায় নাটাশার পুনরুজ্জীবন পরবর্তী আনাতোল অধ্যায়ের পরোক্ষ প্রস্তুতিপর্ব। এইভাবে যন্ত্রণা থেকে অধিকতর যন্ত্রণায় না উত্তীর্ণ হলে শুদ্ধ থেকে অধিকতর শুদ্ধতার পথের পথিক হওয়া যায় না। বড়োদিনের রাত্রি নাটাশার জীবনের যন্ত্রণার দুই স্তরের মধ্যবর্তী এক সহজ আনন্দের সঞ্জীবনী অধ্যায়।

সোনিয়া এবং নিকোলাসের দিক দিয়ে দেখলেও এই বড়োদিনের সন্ধ্যার তাৎপর্য

তাদের প্রেমের প্রসঙ্গেই অনুধাবনীয়। বড়োদিনের সন্ধ্যায় সোনিয়া ও নিকোলাসের প্রেমের ঘনীভূত অধ্যায়ের পরেই এই প্রণয়ীদ্বয়ের প্রেমের শেষে বিবাহ সমস্যার রূপ ধারণ করে দেখা দেবে। সেই সংকটের প্রত্যক্ষ প্রস্তুতিপর্ব বড়োদিনের আবেগময় সন্ধ্যার পলাতক মুহূর্তে। ভবিষ্যৎ দর্শনের দর্পণে সোনিয়া কিছুই দেখেনি। যা সে দেখেছে তা শুধু শূন্যতা। কিন্তু নাটাশার ব্যাকুল আহ্বানে সে মধুর মিথ্যা ভাষণে রত হয়েছে। বলেছে—এনড্রুকে দেখেছি শায়িত কিন্তু সানন্দচিত্ত। এখানে সোনিয়ার শূন্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বড়োদিনের সন্ধ্যার মতো আনন্দে নিটোল সন্ধ্যা আর দ্বিতীয়টি নেই। সমগ্র উপন্যাসে জীবনের সরু মোটা দুই তার জড়িয়ে যাওয়ার বেদনা সর্বত্রই সমুপস্থিত। বড়োদিনের সন্ধ্যার এক উজ্জ্বল বর্ণ-সমারোহ সে হিসাবে সারা উপন্যাসে একক। এই সন্ধ্যাই সেই সুখের গিরিচূড়া —এবং নাটাশা ও সোনিয়ার প্রেমের সংকটের উপোদ্‌ঘাত। এর পরেই সংকটের আবর্তের দিকে অবতরণ।

পাঁচ

এ সব উদাহরণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আত্মাহীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু লেখকের জীবনার্থের ধারক এবং পোষক। বিষয়বস্তুর মর্যাদা নিরূপিত হবে তা কতখানি লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলন সেই মাপকাঠিতে। সেই-কারণেই অশ্লীল বিষয় বলে কোনো কথা সার্থক উপন্যাসের আলোচনাকালে উত্থাপিত হতে পারে না। যে বিষয়বস্তুকে অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে তা যদি লেখকের বিস্তৃত জীবন-সংক্রান্ত গভীর বক্তব্যের অংশীভূত হয় তবে তা কোনো মতেই অশ্লীল পদবাচ্য নয়। উপন্যাসের প্রতিটি অংশ—ঘটনা, চরিত্র, বর্ণনা—সকল কিছুই উপন্যাসের নির্দিষ্ট শিল্পকর্মের অংশ —পক্ষান্তরে গোটা শিল্পকর্মটাই এক অখণ্ড মূর্তি ধারণ করতে পারে লেখকের জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে প্রকাশ করার তীব্র প্রেরণায়। কাজেই উপন্যাসে সেই বক্তব্যের প্রসঙ্গের বাইরের যা কিছু তাই কুশিল্প অথবা অশিল্প—তাই অপ্রকাশ্য।

ছয়

এই বিচার-দৃষ্টিতেই বর্তমান শতাব্দীর মনোভূমি-প্রধান বা মনস্তাত্ত্বিক বস্তুগুলির বিষয়বস্তুর মূল্যও অনুধাবনযোগ্য। আমরা জানি যে গত শতাব্দীর প্লট-নির্ভর বা ঘটনাশ্রয়ী উপন্যাস আর এ শতাব্দীর অনুভূতি-সঞ্চারী উপন্যাসে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এও জানি যে গত শতকের উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল যেখানে নায়ক-নায়িকার জীবন-বৃত্তান্তকে, তাদের অভিজ্ঞতাকে বিধৃত করা, এ শতাব্দীতে সেখানে নায়কের চেতনার স্রোতস্বিনীর নানা তরঙ্গ-শীর্ষে প্রতিফলিত চিন্তার আলোকরশ্মিকে পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট করাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। কাজেই বাস্তবের মায়া সৃজনের জন্য নির্বাচনশীল হওয়ার ঝোঁক এখনকার ঔপন্যাসিকের নেই। বরঞ্চ তিনি যে নির্বাচনশীল নন—এই মায়া সৃজন করতে পারলেই অনুভূতির শতমুখী সামগ্রিক চেহারা পরিস্ফুট হতে পারে।

সুতরাং নায়কের অনুভূতিই এখানে বিষয়বস্তু। স্বভাবত সে অনুভূতি নায়কের অভিজ্ঞতার নামান্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। Every thought is a part of a personal consciousness—সুতরাং চিন্তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের প্রতিফলনের ভিতর দিয়ে পুরো ব্যক্তি-চেতনার আভাস মেলে। যেহেতু ব্যক্তি-চেতনা স্বয়ম্ভু ব্যাপারে নয়, সমাজ এবং সভ্যতার বিশেষ অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির যোগফল হল ব্যক্তিচেতনা, তাই শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তিচেতনার মুকুরে সভ্যতার চেহারাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। সভ্যতা এবং সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা এখানে একটি পরোক্ষ পটভূমির মতো বিরাজমান।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে আধুনিক উপন্যাস যদিও অতিকায় বিষয়ভারে মন্থরগতি বিপুল গ্রন্থ আর নয়, তথাপি যে বিশেষত্ব নিয়ে শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের আবির্ভাব, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস সে বৈশিষ্ট্যে বঞ্চিত নয়। মনের সমগ্র চেহারায় সভ্যতারই সমগ্র চেহারা সেও আঁকতে চায়।

উপন্যাসের ভাষারীতি

উপন্যাসের শিল্পরূপ সর্বার্থসাধক বলে কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস এবং বর্ণনা একই উপন্যাসের পরিসরে পরস্পর-নিবদ্ধ। এ কারণে, এবং, উপন্যাসের অবাধগতি সর্বত্রচারিতার দিকে দৃষ্টি রেখেই বলা যেতে পারে যে সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে উপন্যাস সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রী।) আপন বলিষ্ঠ প্রাণবত্তায় কাহিনী, কবিত্ব, নাট্যরস সকল কিছুকে কুক্ষিগত করে উপন্যাস নিজ স্বরূপে বিশিষ্ট। উপন্যাসের ভাষাও সেই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে চিহ্নিত। উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করে কখনো তা কাব্যের মতো গভীরগামী, কখনো বা মন্থর এবং গম্ভীর। বলাবাহুল্য উপন্যাসে ভাষার ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা এখনো তাদৃশ সচেতন নয়। উপন্যাসের ভাষা উপন্যাস-নিরপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মতো পৃথক উচ্চারণে উপন্যাসের ভাষার প্রতি সমালোচকের কর্তব্য শেষ হয় না—ফ্লবেয়ারের মন্তব্যটি এখানে ঔপন্যাসিকের যথেষ্ট সহায়ক—If you know exactly what you want to say you will say it well. ভাষাকে ফ্লবেয়ার কখনোই বহিরঙ্গ সৌন্দর্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পীর সত্যভাবনার ত্রুটিই তাঁর ভাষা বিন্যাসের সামান্যতম ত্রুটিতেও প্রতিফলিত হয়।

স্বল্পসম্বল, অভিজ্ঞতান্যূন ঔপন্যাসিকেরাই উপন্যাসের ভাষাকে ভাবেন ভারবাহী পশু—উপন্যাসের ঘটনা বহন করাই তার কাজ, কখনো ভেবেছেন একে অযথা আবেগ প্রকাশের কাব্যিক রাজপথ, কখনো ভেবেছেন বর্ণাঢ্যতায় বুঝি এর কাব্য, কখনো ভেবেছেন বর্ণান্ধতায় এর বাস্তবতা। অথচ গদ্য এ-যুগের শক্তিশালী মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে গদ্য সাহিত্যের অমিল যতটা সুদূর পরবর্তী শতাব্দীতে এবং বর্তমানে গদ্য স্বীয় গতিশীল ভূমিকার সাহায্যে কাব্যকে ততখানিই নিজ সীমার মধ্যে আকর্ষণ করে সে ব্যবধানকে করে তুলেছে ক্ষীয়মাণ। কাব্য যেদিন থেকে গদ্যকে নিজ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল গদ্যের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রতি সেই দিনই সে জানিয়েছে প্রথম প্রণতি। এ-যুগের সমস্ত কাব্য প্রয়াসের মূলকথা গদ্যের ব্যাপক শক্তির বিস্তারকে আয়ত্ত করা, কিংবা তার সঙ্গে মিলিত হওয়া।

কিন্তু উপন্যাসের বা গদ্যসাহিত্যের ভাষা সর্বগ্রাসী বলেই যথেচ্ছাচারী নয়। বরঞ্চ দেখা যায় যে কবিতারই মতো উপন্যাসের ভাষাও স্রষ্টার কল্পনার এক অলিখিত অনুশাসনের সূত্রে বাঁধা। সেখানেও ভাষা ব্যবহারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিদর্শনে লেখকের ঔপন্যাসিক রস-সন্ধানের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথাই প্রমাণিত হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং দর্শনের সঙ্গে ভাষার ওতপ্রোত সম্বন্ধ। বাক্য যোজনায়, শব্দ-প্রয়োগে, বর্ণনায় এবং চিত্রকল্প-নির্মাণে সর্বত্রই ঔপন্যাসিকের বৃহৎ কল্পনা ক্রিয়াশীল বলেই সমালোচনায় বহুধাবিস্তৃত ব্যবহারে এরাও নবনব তাৎপর্যের দ্যোতক। এবং উপন্যাসের ভাষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা-কালে হার্ডির মতো বিধুর কবিপ্রাণ ঔপন্যাসিকই যে আলোচনার বিষয়ীভূত তা নয়—ডিফো-র মতো গদ্যময় অথবা কন্‌রাডের মতো এপিক-লক্ষ্য ঔপন্যাসিকও এ জাতীয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। আসলে উপন্যাস যদি শুধু গল্প বা কাহিনী মাত্র না হয়, বালিকা কিশোরীদের অবসর বিনোদনের বিস্ময়বিলাস না হয়ে সে যদি সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাছাকাছিও যাবার প্রয়াসী হয়—উৎকৃষ্ট রস-কল্পনা এবং শিল্পগত নৈতিক দীপ্তি যদি উপন্যাসের অভিপ্রায় হয়, উপন্যাসের ভাষায় সেক্ষেত্রে একটা অখণ্ড কল্পনার ছাপ পড়বেই।

ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার সম্পর্ক কী সে-কথা নানা ভাবে বিভিন্ন সমালোচক দেখিয়েছেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় সেই সমস্ত উদাহরণের কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় গ্রহণ করে আমাদের উপন্যাস আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাবে। এ পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন সাহিত্য বিচারে বহিরঙ্গ প্রবণতার অভিযোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

সার্থক উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের অখণ্ড কল্পনার কতখানি দৃঢ়বদ্ধ অনুবর্তী তা ডিফো-র রবিনসন ক্রুশো উপন্যাসের আলোচনকোলে জনৈক সমালোচক দেখিয়েছেন। রবিনসন ক্রুশোর বিষয়বস্তু ডিফো-র কল্পনাকে গভীরভাবে নিজের করে রাখতে পেরেছিল বলেই এমনটা ঘটেছে। প্রসঙ্গত ঝড় ও নৌকা ভাঙ্গার পর ভাঙা জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আহরণ করার জন্য ক্রুশোর বার-বার যাওয়া এবং দ্বীপে পুনরায় ফিরে আসা উল্লেখযোগ্য।

I was under some apprehensions during my absence from the land, that at last my provisions might be devoured on shore, but when I came back, I found no sign of my visitor, only there sat a creature like a wild cat upon one of the

chests which, when I came towards it ran away a little distance, and then stood still. She sat very composed and unconcerned, and looked full in my face, as if she had a mind to be acquainted with me. I presented my gun at her; but as she did not understand it, she was perfectly unconcerned at it, nor did she offer to stir away; upon which I tossed her a bit of biscuit......and she went to it, smelled of it and ate it. শুধু বর্ণনার যথাযথতাই উদ্ধৃত অংশের একমাত্র আকর্ষণ নয়। এই বিষয়টি সত্যই কৌতূহলের উদ্রেক করে যে ভাষার এই লক্ষ্যভেদী অব্যর্থতা একটা উপন্যাসের বিরাট এবং কখনো কখনো অসংহত পরিসরে কী করে বহন করা হয়। ক্রুশোর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগের জন্য devour ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বিড়ালের বিস্কুট ভক্ষণের জন্য eat ক্রিয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। এটা কেবল বাগ্‌বিলাস নয়। যেখানে ক্রুশোর সমগ্র সত্তার প্রশ্ন জড়িত সেখানে eat অপেক্ষা শক্তিশালী devour-এর সন্ধান করা হয়েছে। আবার tossed এই ক্রিয়ার ব্যবহারটিও লক্ষ্য করার মতো। Tossing-এর পরিবর্তে throwing ব্যবহার করা চলত বটে কিন্তু toss করার মধ্যে ক্রুশোর কৌতুকপ্রীতি এবং আপাত-শান্ত মনের পরিচয় রয়েছে। সামুদ্রিক বিপর্যয়ের পরই ক্রুশোর মনে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের অধ্যায় শেষ হয়েছে, উপন্যাসেও। এর পর শুরু হবে পুনর্বসতির অধ্যায়। বিড়ালের ব্যবহার তারই প্রতীক। কাজেই toss ক্রিয়া এখানে সেই তাৎপর্যেই প্রযুক্ত হয়েছে।

হয়তো এতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খতা সত্যই বহিরঙ্গ বিচার কিন্তু উপন্যাসের সমগ্র কল্পনার পটভূমিকায় যখন উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ আলোচিত হয় তখনই তা উপন্যাসের মৌল বক্তব্যকেই নব নব ভাবে আলোকিত করে। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে উপন্যাসের ভাষা-বিন্যাস যে উপন্যাসের তারতম্যের মান নির্দেশক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ডিফোর দীর্ঘ বাক্যাবলী, বাক্যের বিলম্বিত লয় রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller জাতীয় উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী ভাষা।

অবশ্যই ভাষা-রীতি উপন্যাসের সমগ্র রীতি বা রচনাধর্ম থেকে পৃথক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এটাও একটা প্রাথমিক সত্য কথা যে, ব্যক্তি এবং সমাজ

চেতনার সমগ্র মহিমাকে লেখক তাঁর ভাষা-রীতির আধারেই ধরে রাখেন। কী করে রাখেন, গদ্য সাহিত্যে কেমন করে সাহিত্যের দীর্ঘ কালগত ঐতিহ্যকে অধিকার করছে, উপন্যাসের গদ্যের ধর্ম কী এবং মহৎ ঔপন্যাসিক কী ভাবে সে ভাষাকে ব্যবহার করেন—সচেতন পাঠকের কাছে সেটা একটা বিশেষ মনোনিবেশের বিষয়। মনস্তত্ত্বমূলক অথবা রোমান্টিক অথবা রবিনসন ক্রুশোর মতো truth-teller, যে জাতীয় উপন্যাসই হোক না কেন, বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের জন্য স্বভাবতই ভাষার বিভিন্ন বিন্যাস, বিভিন্ন ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। উচ্চধ্বনিময়, পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাপরায়ণ বিশেষণ সমন্বিত বর্ণাঢ্য গদ্য কখনোই ডিফোর উপন্যাসের ভাষা হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে ক্রুশো 'নতুন মানুষ' এবং অষ্টাদশ শতকীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিভূ, বলা হয়ে থাকে ক্রুশো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর বিলয় এবং নতুন উৎপাদন শক্তির উন্মেষের কালের যোগ্য প্রতিনিধি। সেই জন্যই ক্রুশোর কাহিনীর জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তার লক্ষ্য গণতান্ত্রিকতা—ডিফোর ভাষায় যে সমালোচকেরা বলেছেন, অ্যাংলো-স্যাকসন উপাদান বেশি, মনে হয় তারও মূলে এই সর্ববোধগম্যতা এবং সর্বজনবিশ্বাস্যতা উৎপাদনের প্রয়াস। ডিফোর বর্ণনা-রীতিও সেই আদর্শেই বিশিষ্ট।

কিন্তু বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি এক জায়গায় ঔপন্যাসিককুলকে মিলিত হতেই হয়। সেটা হল উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার ভূমিকার ক্ষেত্রে। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুইকেই ধারণ করে। আর যেহেতু উপন্যাস যে-কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাস মাত্র নয়, সেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘাটনকালেই উপন্যাস-লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। কাব্যিক মানুষ অথবা নাটকীয় মানুষ নয়, বাস্তব মানুষটাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। তার কর্মিষ্ঠ অস্তিত্বকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গিয়েই উপন্যাস-শিল্পের জন্ম। উপন্যাসের ভাষাকে তাই সর্বত্রগামী হতে হয়। গদ্যের স্থল এবং কাব্যের জল উভয়ত্রই তাকে হতে হয় সাবলীল। রাম দাড়ি কামাচ্ছে, বাজার করছে, দৈনন্দিনের নানান কাজ করছে এও যেমন সত্য, রামের জীবনের আবেগময় মুহূর্তগুলিও তেমন সত্য। পূর্ণাবয়ব জীবিত-কল্প রামকে আঁকতে গেলে ঔপন্যাসিককে নিজ প্রয়োজনে এমন ভাষা গড়ে নিতে হয় যা তাঁকে উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য করবে। তখনই ঔপন্যাসিক জানেন

যথা স্থানে সুপ্রযুক্ত একটি শব্দ বাস্তব জ্ঞানের চি[illegible] তাঁর ভাষায় প্রয়োজন মত আসে গদ্যের যথাযথতা, কাব্যের ব্যঞ্জন[illegible]
এবং এই উভচর বৃত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সাবলীলতায় উপন্যাসের গদ্যের লাবণ্য। খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় বলতে বলতে জীবনগত কাব্যকে আবিষ্কার করবে এই গদ্য। এই দুই পর্যায় এমনভাবে মিলেমিশে থাকে সার্থক উপন্যাসের গদ্য ভঙ্গিতে যে কখনো মাটিতে আছড়ে পড়লাম অথবা হঠাৎ বেলুনের মতো আকাশে উড়ে গেলাম এ জাতীয় বিসদৃশ অনুভূতি আমাদের পীড়িত করে না। মধ্যবিত্ত রুচিশীলা ছাত্রী-নায়িকা এবং তার প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাসের ভাষার কারুকলা নিঃসন্দেহেই কৃতিত্বপূর্ণ। শুধু ত্রুটি এইখানে যে এই ভাষার সীমাবদ্ধতায় বিজনের মতো বখাটে ছেলেকে ব্যক্ত করা যায় না। তিথিডোর উপন্যাসেও তা যায়নি। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের অতিরিক্ত বলেই তাঁর চরিত্রগুলি তাঁর গদ্যভঙ্গির কীর্তিসাধক হয়ে থাকতে চায়। উপন্যাসের গদ্যভঙ্গির এটা একটা ত্রুটি। উপন্যাসে অতি প্রসাধিত গদ্য মাত্রেরই শেষ পর্যন্ত মণ্ডনকলায় রূপান্তরিত হবার ঝোঁক থাকে। সন্ধেয় সত্য তার ফলে হয় হারিয়ে যায়, নয় ঢাকা পড়ে। George Sand যে চিঠি ফ্লবেয়ারকে লিখেছিলেন তার কিছুটা এখানে উল্লেখযোগ্য—'You seek for nothing more than the well made Sentence, it is something—but only something—it is not the whole of art, it is not even half of it, it's a quarter at most, and when the other three quarters are beautiful, people will overlook the one that isn't.

তা বলে নিশ্চয় ডিফো-র গদ্যময় বর্ণনার অতি অনুসরণকেই আদর্শ বলা হচ্ছে না। প্রত্যহের কর্মময় মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার গদ্যরূপটিকেই চিত্রিত করা উপন্যাসের কাজ নয়। এবং যদিও স্কটের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন—হয়তো বেশি সচেতন—তথাপি স্কটের পক্ষে একটা কথা বলা হয়েছে যে তিনি Prose of life এবং Poetry of life-কে নিজ উপন্যাসে বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক সার্থক ঔপন্যাসিকই নিজ নিজ পন্থায় উপন্যাসের গদ্যকে এই আদর্শে গড়ে নিতে চান। সে কারণেই উপন্যাসকার যদি তাঁর বর্ণিত বিষয়বস্তুতে গাঢ় রহস্যের উপাদান আছে এ-কথা বোঝাতে গিয়ে 'অদ্ভুত' 'বিচিত্র' 'দুর্বোধ্য' 'অস্পষ্ট' প্রমুখ বিশেষণে সে-কথা ব্যক্ত করতে চান তবে

আমরা একথা ন্যায্যতই মনে করতে পারি যে ঔপন্যাসিকের কল্পনায় ত্রুটি আছে। এবং সেই ত্রুটিই উপন্যাসের বর্ণনায় ছায়াপাত করেছে। যেমন উৎকৃষ্ট কবিতায় কল্পনাকে বস্তুময় করে তোলা কবির কাজ তেমনি উপন্যাসের গদ্যকেও যথার্থ লক্ষ্যভেদী করে তোলা ঔপন্যাসিকের কাজ। নায়িকা কেবল 'হাহাকার' করলেই নায়িকার অবস্থার যন্ত্রণাময় অস্থিরতা প্রকাশ পায় না। তা যদি পেত তাহলে নায়িকা যেন চাষার মেয়ের মতো মাথা কুটিতে লাগিল—এই বর্ণনায় "চাষার মেয়ের মতো" কথাটি কেবল উপমাবিলাস বলেই পরিগণিত হত।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিককার নিদর্শনগুলিকে পরীক্ষা করি তাহলে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য না করে উপায় থাকে না। আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মজ্জাগত পঙ্গুতায় ক্রুশোর মতো নায়কের পরিকল্পনা সম্ভবপর ছিল না। কাজেই truth-teller জাতীয় উপন্যাস রচনায় আমরা কখনোই অভ্যস্ত হইনি। ইংরাজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাগতপ্রাণ উপন্যাসের যে অভিজ্ঞতা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের পিছনে ছিল আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকের দিক্‌পালদের পিছনে এ জাতীয় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ডিফো, ফিল্ডিং-এর মতো গদ্যময় মানুষের কথা বলবার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম প্রধান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। রোমান্সের এবং ভাবময় বীরোচিত পরিবেশের অঙ্গনেই তাঁর প্রথম পাঠ।

সেই কারণেই বঙ্কিমের গদ্য মানুষের কর্মময় দৈনিকের চিত্রাঙ্কনে পরাঙ্মুখ। সে গদ্য মানুষের আটপৌরে চেহারা আঁকতে চায় না। বস্তুত বঙ্কিমের অন্য উপন্যাসের কথা স্মরণ রেখেও বলতে হয় যে কপালকুণ্ডলার পরিবেশে এই উন্নীত গদ্য যে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছে তেমনটি বোধ করি আর কোথাও নয়। এই রচনায় বঙ্কিমের গদ্য এবং তার কল্পনা যে সাযুজ্য লাভ করেছে বঙ্কিমের উপন্যাসের অন্যত্র তা দুর্লভ। বাস্তবিক পারিবারিক এবং সামাজিক উপন্যাস-গুলিতে বঙ্কিমের ভাষার প্রধান ত্রুটি বলে যেটা পরিগণিত হবে সেটা হল আমাদের আটপৌরে জীবনযাত্রাকে সে ভাষা চিত্রিত করতে পারেনি। উনিশ শতকের আপিস-আদালতের কথা দূরে থাক একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক, কিংবা তার ঘাত-প্রতিঘাতকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই এড়িয়ে চলতেন। মানুষের গদ্যময় রূপ, তার কর্মিষ্ঠ চেহারা বঙ্কিমের কল্পনাকে স্পর্শ করত না। আসলে ডিফো-ফিল্ডিং-এর পর্যায় বাদ দিয়ে আমার একেবারেই রোমান্টিক

পর্যায় থেকে শুরু করেছি। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে মানুষের হৃদয়গত ভাববৈষম্যের বর্ণনায় বঙ্কিমী কল্পনা এবং ভাষা যে পরিমাণে সার্থক, বিরলরেখ জীবনের বর্ণনায় তা সেই পরিমাণেই বিফল। বঙ্কিমের যুদ্ধ বর্ণনা যে পরিমাণে সার্থক, গৃহস্থালী বর্ণনা সে পরিমাণে ব্যর্থ। সে সময়ের অন্য ঔপন্যাসিকদের কথা এ-প্রসঙ্গেই উঠতে পারে। সে যুগের কর্মময় মধ্যবিত্তের কথঞ্চিৎ পরিচয় রমেশ দত্তের সামাজিক উপন্যাস দুটিতে পাই। কিন্তু রমেশ দত্তের ভাষা ও কল্পনা এবং তার গদ্য আমাদের কল্পনা এবং প্রত্যয় কিছুই উৎপাদন করে না। এমন কি রমেশ দত্তের বহুবিধ প্রগতিশীল চিন্তা সত্ত্বেও ইন্দিরাও আমাদের কাছে প্রিয়তর গ্রন্থ। কারণ রমেশ দত্তের বাচনিক প্রগতিশীলতা উপন্যাসকারের কল্পনার শুদ্ধ গভীরতা থেকে উৎসারিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সংসার ও সমাজ কেরিয়ারমুখী বাঙালী যুবকের কাহিনীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গ্রামে থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই'—এ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যও নয়, সামন্ত কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও নয়। সরল চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের সহজ স্বীকারোক্তি। এভাবে সংসার ও সমাজ রমেশ দত্তের নৈতিক-দীপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে উপন্যাসের কল্পনা ও ভাষাকে সীমিত এবং স্তিমিত করেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমই রমেশ দত্তের মতো সংসার ও সমাজ অথবা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো স্বর্ণলতা না লিখলেও নতুন কালের চিন্তায় ধৃত মানুষের যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছিলেন। সে যন্ত্রণা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল বলেই তার বর্ণনায় বঙ্কিমী-গদ্য কাব্যের প্রসাদগুণে বিশিষ্ট। বিষবৃক্ষে হীরার কবলে পড়বার আগে কুন্দর বিহ্বলতার বর্ণনা লক্ষ্য করার মতো।

> অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথে আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।
>
> তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সার্সী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধ পথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

অথবা—

> রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরো কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরো কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র কখনো কখনো মেঘে ডুবিতেছে, কখনো ভাসিতেছে। বাড়ির চারিদিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে।

অথবা—

> এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল।······নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর্ সর্ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাও?" তালগাছ তর্ তর্ শব্দ করিয়া বলিল "কোথা যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল "কোথা যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল—"যায় যাউক, আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।"

এই অংশের বর্ণনাভঙ্গির সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করার মতো। এর ভাষা এবং চিত্রকল্প দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘন ঘন দ্বিরুক্তি, কাটা কাটা বাক্যবিন্যাস, কুন্দনন্দিনীর প্রায়-অপ্রকৃতিস্থতার পক্ষে উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিমের গদ্যে এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় কাব্যের স্পন্দন আসে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের তৃতীয়াংশের গদ্য যেন পদ্যচ্ছন্দের নিকটবর্তী হয়েছে। প্রথমাংশের 'অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল' কুন্দ পরিকল্পনার মৌল ধারণার উপযুক্ত চিত্রকল্প। পতঙ্গের ব্যঞ্জনাও যে কোনো সাধারণ পাঠকের চোখে পড়বে। সর্বোপরি প্যাথেটিক ফ্যালাসির ব্যবহার সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলীতেও এর চেয়ে অধিক সুপ্রযুক্ত কোথাও হয়নি। যেন একটা ঘনবদ্ধ কবিতার যথাবিহিত পরিণতিতেই এটা এসেছে। কিন্তু এই প্যাথেটিক ফ্যালাসি, চিত্রকল্প এবং ভাষাবিন্যাস শেষ পর্যন্ত কুন্দর কাব্যিক মূর্তির অতিরিক্ত কিছু গড়তে পারল না। আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তের আনা কারেনিনা আর উদ্ধৃত অংশের কুন্দনন্দিনীর প্রতিতুলনা করলেই এটা ধরা পড়ে। গোটা ব্যক্তিটা চিরকালই বঙ্কিমের চোখে হারিয়ে গেছে। এবং কল্পনার

উচ্চগ্রামকে স্পর্শ করে না। এমন সব কিছুকে পরিহার করতে গিয়ে বঙ্কিমকে জীবনের অনেকখানি বাদ দিতে হয়েছে। বিষবৃক্ষেই জমিদার বাড়ির বর্ণনা যে পরিমাণ যথাদৃষ্টং তথালিখিতং পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে কিন্তু ঔপন্যাসিকের কল্পনা এবং জমিদার বাড়ির বাস্তবতা কোনোটাই নেই। এ ক্ষেত্রে যদিও বঙ্কিমের কল্পনা বঙ্কিমের নৈতিক চেতনায় দীপ্ত হওয়ায় তিনি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকদের স্থূল গদ্যের থেকে অনেক কার্যকরী চিত্র অঙ্কন করেছিলেন—যেমন 'সংসারের' কলিকাতা বর্ণনা এবং ইন্দিরার চোখে প্রথম দেখা কলিকাতার বর্ণনার প্রতিতুলনা এ-ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে—তথাপি বঙ্কিমের কল্পনা এবং ভাষা জীবনের গদ্যকে প্রায়ই হারিয়ে ফেলেছে। জীবনের কাব্যও যে এর ফলে সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে তা নয়। ভ্রমরকে বাঁচানো গেলেও রোহিনীর জীবনের বাস্তবতার ভয়ে তার জীবনের কাব্যকে সমগ্রভাবে ধরা যায়নি। ইন্দিরার স্বামী কমিসারিয়েটের জুয়াচোর হয়ে থাকলে যে ইন্দিরাকেই ব্যর্থ হতে হয় এবং এভাবে জীবনের গদ্যময় দিকটিকে যে ধরা যায় না বঙ্কিমের উচ্চকল্পনাচারী মনই তাঁকে সে কথা বুঝতে দেয়নি—এই উচ্চকল্পনাচারী মনকে যখনই একটু নিচু গ্রামে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন তখনই তাঁকে কল্পনার অসঙ্গতির ফল ভোগ করতে হয়েছে। তবু যে ইন্দিরার গদ্যভঙ্গি সংসার ও সমাজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে গণিত হবে ইন্দিরা চরিত্রের ইতিবাচকতাই তার মূলে।

উপন্যাসের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয়—সর্ববিধ বিষয়, এবং সর্বস্তরের মানুষ, তথা এর বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্য ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা। জীবন সম্বন্ধে লেখকের ইতিবাচক মনোভাব, জীবনের নৈতিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতাই উপন্যাসে উক্ত বিষয় ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণের দৃঢ়তা সঞ্চার করে। আবার এই দৃঢ়তাই ভাষার ক্ষেত্রেও ঘনীভূত হয়ে উঠে উপন্যাসকে ভাবে-রূপে সার্থকতা দান করে। কিভাবে করে, 'গোরা' তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গোরা উপন্যাসের প্রধান গুণ এর বিশাল পরিসরের সর্বত্রব্যাপী সুসমতা। উপন্যাসের কল্পনা, ভাষা, ঘটনা-বিন্যাস এবং চরিত্র-চিত্রণ—সর্বত্র ঔপন্যাসিকের সামঞ্জস্যজ্ঞান শেষাবধি সমুপস্থিত। এই সর্বত্রব্যাপী সুসমতার মূলে গোরার মৌল পরিকল্পনাই ক্রিয়াশীল। কাব্যিক মানুষ বা নাটকীয় মানুষ নয়, দেশকালের বিচিত্র বিন্যাসে ধৃত গোটা মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পটে ধরতে চেয়েছেন। ফলে কবিত্ব এবং নাটকীয়তা ভাষাবিন্যাসের এই

দুইয়ের কোনোটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। গোরার গদ্যরীতির প্রধান গুণ এই যে উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে এ এমনভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে যে আমাদের মনোযোগের অন্যায্য অংশকে এই ভাষাবিন্যাস কখনোই দাবি করে বসে না। উপন্যাসের আদর্শ গদ্যরীতিতে এমন এক নিরাসক্ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে যে তার স্থিতিস্থাপকতা চমৎকৃত করে। চরঘোষপুরের নাপিত, হরিমোহিনী, কৈলাস, মহিম অথবা সুচরিতা কারো জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই—গোরারই মতো নির্ভীক এবং সর্বত্রচারী এই গদ্যরীতি। সেই জন্যই নাপিতের মুখেও রবীন্দ্রনাথ নিজের গদ্যের ভঙ্গি তুলে দিতে ভীত হন না। অতি বিশেষীকরণের জন্য অকারণ ব্যস্ততায় উপন্যাসের এপিক মর্যাদার লাঘব করেন না। সে দিক থেকে বাংলা উপন্যাসের গদ্যরীতির কিছুটা পরিচয় নিতে গেলে আমরা দেখব যে উপন্যাসের এ জাতীয় তাৎপর্য নির্মাণ বড় বেশী ঘটে নি।

বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের ভাষায় যে ধরনের গদ্যময় বাস্তবতা অঙ্কনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সেই গদ্যময় বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা নয়। মাত্র বিষয়ানুগ বর্ণনা। যে-কোনো কারণেই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য গদ্যরীতিতে সামাজিক বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার প্রয়াস সর্বদাই মাত্র বাস্তবের বহিরঙ্গ-বিশ্বস্ততা রক্ষার্থেই নিঃশেষিত হয়েছে। আলালের ঘরের দুলাল ও বিষবৃক্ষ থেকে দুটি নিদর্শন এ প্রসঙ্গে আলোকসম্পাত করতে সক্ষম।

> বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই-একজন ভট্টাচার্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছে—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই—লবণ দিয়ে দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংসভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচকচি করিতেছেন। একপাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে। তাহার মধ্যে একজন খেলোয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। একপাশে দুই-একজন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে—তানপুরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। একপাশে মুহুরী বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে—অনেকের দেনা পাওনা ডিক্রি ডিসমিস হইতেছে—বৈঠকখানা লোকে থই থই করিতেছে।

শুধুমাত্র বাক্‌ভঙ্গিতে কিছুটা গাম্ভীর্যের প্রশ্ন মেনে নিলে এই একই বর্ণনাত্মক রীতি, যার কাজ কেবমাত্র অবহিত করা, অনুসৃত হয়েছে বিষবৃক্ষে জমিদার বাড়ির বর্ণনায় ;

দাসদাসী কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্ধ্ববাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ির বাহির মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনাধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোনো উদরপরায়ণ 'সাধু' ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে' বলিয়া কীর্তন করিতেছে।

এই অপরকে অবহিত করার প্রবণতা, মাত্র বর্ণনাত্মক রীতি, আমাদের দৃষ্টিকে শুধু বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখে। বলা বাহুল্য এতে বিষয়েরই স্বরূপ উপলব্ধি ব্যাহত হয়। যে কৌশলে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মন্ময় রসে জারিত হয় সে কৌশল রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে আর কোথাও সাবলীল হয়ে দেখা দেয়নি। একই উদ্দেশ্য-সাধক নিচের বর্ণনাটি অনুধাবনযোগ্য। এ অংশটি যোগাযোগ থেকে উদ্ধৃত।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদবর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি। সদর দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে

বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতম দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা রকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা।

এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, কেবলমাত্র বিষয় অনুগামী বিশ্বস্ততাকে বহন করাই এর কাজ নয়। সেই কারণে এখানে বর্ণিত বিষয়েরও একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র বর্ণনাটিকে নির্বিশেষত্ব থেকে উদ্ধার করে একটা স্বকীয়তা এনে দিয়েছে, যে স্বকীয়তা যোগাযোগ উপন্যাসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। উপন্যাসের গদ্যরীতিতেও Style is the man-এর প্রসঙ্গ অচল নয়। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিপুরুষই বাণীভঙ্গিমার জনক। স্বভাবতই সে বাণীভঙ্গিমা ঔপন্যাসিকের চিন্তা, দর্শন এবং অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা থেকে উদ্ভূত। ওপরের বর্ণনার লক্ষ্য জমিদার-বাড়ির অতীত মহিমার স্মৃতি চিত্রণ। সেই স্মৃতিচিত্রণ সফল হয়েছে কতকগুলো আশ্চর্য উল্লেখে। 'ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা', 'পানের সোনার বাটা', 'বহুকালের পুরানো বন্দুক, বল্লম, বর্শা'—এই সমস্ত শুধুমাত্র যে একটি বাস্তব বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বহুকালের জমিদার বাড়ির সোঁদা পুরনো সৌরভকেও এরা যেন ধরে রেখেছে। এই ভাবেই বর্ণনা জীবন্ত হয়। যে ব্যক্তিপুরুষ এর চিত্রকর তিনি বিষয়টিকে বিষয়-নিষ্ঠের মতো খুঁটিয়ে দেখেছেন তারপরে কবির মতো অনুভব করে সেটাকে সাজিয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের পুরনো কালের আভিজাত্যকে চেনবার পদ্ধতি, তার চরিত্রকে উপলব্ধি করার সাহস সমস্তই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরনো সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ এবং স্বেচ্ছাচারের অপব্যয়ের এবং বিলাসের সৌন্দর্য এবং চরিত্র দুইকেই রবীন্দ্রনাথ ধরতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সাফল্যের মূল তাঁর ব্যক্তি-জীবনীতে খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। সেই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্যারীচাঁদ যেখানে বিত্তশালী পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে "কেহ কেহ" এবং 'কোথাও কোথাও' এই বলে বাক্যাংশ শুরু করে খুঁটিয়ে বর্ণনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে দুটি একটি মোক্ষম উল্লেখে লক্ষ্যভেদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আলোচনা আর একটু গভীর ভাবে করার আগে এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতির কথা একটু বলে নেওয়া ভালো। শরৎচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অনেকটাই বাগভঙ্গির

দিক দিয়ে রবীন্দ্র প্রভাবিত। বিশেষ শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতিতে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্টতই ক্রিয়াশীল। শরৎচন্দ্রের প্রধান ক্ষমতা, যে-কোনো ভাবেই গল্প কথনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতার জন্যই বিরোধী সমালোচকেরা শরৎচন্দ্রের কোনো ক্ষতি করতে পারেননি। এই গল্প কথনের ফলশ্রুতিকে মুগ্ধতা সঞ্চারী করে তোলার দিকে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ সদাই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের গদ্য কখনও বঙ্কিমের মতো সংবাদবহ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতো উচ্চকল্পনা-সঞ্চারীও নয়। এর একমাত্র কাজ হল গল্পকে পাঠকের কাছে পরম উপভোগ্য করে তোলা। নিচের অংশটুকু লক্ষণীয়:

> কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই; কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্‌বুদের মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড়ো ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকা-কড়ি ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের তো তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড়ো একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

এ-ভাষার শক্তি এইখানে যে এ অবাধ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো একটানা অগ্রসর হবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু উপন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে এ-ভাষা ত্রুটিপূর্ণ, কেননা বিষয় সম্বন্ধে লেখকের ভাবোচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করাই এর কাজ। ভাবোচ্ছ্বাসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি ভাবোচ্ছ্বাস অসংহত বলে। মহা, অদ্ভুত, অপার্থিব প্রভৃতি বিশেষণের সাহায্যে যে কিছুকে রূপময় করে তোলা যায় না এ-কথা যেন শরৎচন্দ্র বিস্মৃত হয়েছিলেন। সেই কারণে 'এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই' এ যেন অনেকটা লেখকের প্রদত্ত ক্যারেকটার সার্টিফিকেট। সার্টিফিকেট দিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করা বা রূপায়িত করা যায় না। 'অদ্ভুত', 'অপার্থিব', 'রহস্যময়', 'ভীষণ' প্রভৃতি কল্পনার অমার্জিত বিন্যাসের ফল। শরৎচন্দ্রকে

যাঁরাই অনুসরণ করেছেন, এমন কি বিমল মিত্র পর্যন্ত, তাঁহাদের সকলের গদ্য-রীতি এই পরম উপভোগ্য হবার কল্পনায় ব্রতী বলে অল্পবিস্তর এই দোষে দুষ্ট। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপুরুষেরই অভিব্যক্তি। আমরা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস গোরা থেকে এইবার সামান্য আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

বিশিষ্ট এবং ঐক্যসূত্রে ধৃত গদ্যরীতির জন্যই উপন্যাসের বিরাট পটভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ এত অনায়াসে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এবং এই একই কারণে উপন্যাসের ঘটনা-ঘন মুহূর্তে এই গদ্য সার্থক কবিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উপন্যাসের গদ্যের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতায় এই কবিত্ব কখন যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে আবার কখন যে ঘটনাকে বহন করে চলতে শুরু করে পাঠকের কাছে তা থাকে দুর্লক্ষ্য। মেরিডিথ এবং শার্লট ব্রন্টি-র দুটি রচনা আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্তা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ এ-প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে, উপন্যাসের ছন্দপাত ঘটিয়ে কাব্যের অকস্মাৎ-আগত purple patch লেখকের কল্পনার অসঙ্গতির কথাই ঘোষণা করে। ("The objection to the purple patch, however, is not that it is purple but that it is a patch.") উপন্যাসের অংশ-বিশেষের লিরিক্যাল গুণ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, কিংবা তার গদ্য যতই কাব্যগুণে অন্বিত হোক না কেন উপন্যাসের সকল দিকের বিচারে তারা কতখানি সুপ্রযুক্ত হয়েছে সেটাই দ্রষ্টব্য। গোরার মতো সার্থক সৃষ্টি তার কবিত্বকেও সর্বব্যাপী সঙ্গতির সঙ্গেই মিলিয়ে নেয়। তখন সেখানে কবিত্ব আর পৃথক সত্তা নয়।

নতুবা যে দোষটা ঘটে সেটা শিল্পরীতির একটা সাধারণত প্রধান ত্রুটি। তা হল লেখকের ভাষাবিন্যাসে অতি যত্নশীলতার দৃষ্টিকটু বহিঃপ্রকাশ। শিল্পীর কল্পনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে এটা একটা বড়ো বাধা। এককালের বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের এ-অভিযোগের কারণ আছে। যদিও বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত রচনার গদ্যের আমি রীতিমতে ভক্ত এবং অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের ক্ষুরধার গদ্য বহুবার আমাকে মুগ্ধ করেছে তথাপি দেখেছি উভয়েরই ভাষা উপন্যাস-নিরপেক্ষ ভাবে শানিত এবং উজ্জ্বল। লেখকের উপন্যাস সম্বন্ধে ধারণার অসঙ্গতি থেকে এগুলো জন্মায়। আর আশ্চর্য ছোটগল্পের গদ্যের চাল যে উপন্যাসে অচল অচিন্ত্যকুমারের শেষতম উপন্যাস পড়ে মনে হল সেটা যেন তিনি স্বীকার করেন না।

সে-ক্ষেত্রে গোরায় স্টিমারে বিনয়-ললিতার রাত্রিযাপনের অংশটুকু এবং তৎপূর্ববর্তী চরঘোষপুরের হাঙ্গামার অংশটুকু পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় যে দুটো বিপরীতধর্মী ঘটনা হওয়া সত্বেও একটা ঘটনা থেকে আর একটায় উত্তরণের কালে ভাষার গতিতে কোনো অসমতা আসেনি। কোন প্রকার ঝাঁকুনি ব্যতিরেকেই আমরা নিম্নোদ্ধৃত অংশে উপনীত হই :

—শুক্তির মধ্যে মুক্তোটুকু যেমন, গ্রহতারা-মণ্ডিত নিঃশব্দ তিমির বেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু, এই সুডোল সম্পূর্ণ সুন্দর বিশ্রামটুকু জগতে তেমনি একটি মাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। 'আমি জাগিয়া আছি', 'আমি জাগিয়া আছি'—এই বাক্যে বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।

শুক্তির বন্ধনে মুক্তা অথবা বক্ষঃকুহর থেকে অভয় শঙ্খধ্বনির মহাকাশ গমন এই দুই চিত্রকল্পই বিনয়ের বর্তমান মনোভাবের পরিচায়ক। ললিতা সম্পর্কে তার প্রেমানুভূতি ব্যতীত বিনয় গোরার বন্ধু এবং হৃদয়োচ্ছ্বাসের নীরব শ্রোতাই থেকে যেত এ-কথা খুবই সত্য। সুতরাং এই প্রেমানুভূতি তার নিজ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির সূত্র। যে প্যারাগ্রাফ থেকে উদ্ধৃত অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে সেই সমস্ত প্যারাগ্রাফটিই বিনয়ের এই নিজেকে চেনার আবেগে স্পন্দিত। এখানে প্রবহমান জলরাশি থেকে শুরু করে সমস্ত নিসর্গ বর্ণনা, সমস্ত চিত্রকল্প বিনয়ের নবার্জিত স্বাতন্ত্র্যের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছে। অনুপ্রাণিত শিল্পীর মতো লেখকের কল্পনা ভাষার একটা ঘনীভূত রূপ সৃষ্টি করেছে গোরায়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য গোরা উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমারাশির কথা। ঘন ঘন সুপ্রযুক্ত উপমায় রবীন্দ্রনাথ গোরা-র উপন্যাসগত ভাবকেই শুধু সমৃদ্ধ করেননি, —এ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় একপ্রকার ব্যাপকতর জীবনবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ভাষা বিষয়ে অমিতব্যয়ী, অথবা তাঁর উপমা আতিশয্যে কখনো কখনো যুক্তির আসন পরিগ্রহ করে—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগবাণী গোরা উপন্যাসের কাছ থেকে নীরবেই ফিরে যাবে। এবং এই উপমার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে শতাবধি পাতায় লেখক একেবারেই প্রায় উপমা প্রয়োগ করেননি। ' নিরলংকৃত বাক্য-স্রোত সরাসরি উপন্যাসের উদ্দিষ্ট ঘটনাবলীর মাঝখানে গিয়ে না পৌঁছনো

পর্যন্ত বাক্যের অলংকরণের দিকে মনোযোগী হয়নি। এবং এর পর যে উপমা-রাশি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে তা অবলীলায় গোরার প্রচণ্ডতা, ললিতার নাটকীয়তা, ষ্টিমারে রাত্রির কবিত্ব সকল কিছুকেই যথারীতি ব্যক্ত করেছে। উৎকৃষ্ট কবিতার মতোই গোরা উপন্যাসের মৌল কল্পনার সঙ্গে এই ব্যবহৃত উপমারাশির নিবিড় যোগের আর একটি নিদর্শন হল বিভিন্ন প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে জল বা নদী বা স্রোত সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প প্রযুক্ত হয়েছে। গোরার চরিত্রই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু—রচনাকালে গোরার চরিত্র-কল্পনাই বারে বারে বর্ণনায় তার যোগ্য উপমা খুঁজে পেয়েছে। এবং এই কারণে, শুধুমাত্র প্রেমের উন্মেষের দৃশ্য বলে নয়—উদ্ধৃত ষ্টিমারের অধ্যায় উপন্যাসের মৌল আবহাওয়ায় এতখানি প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছে।

গোরা উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিতে আগাগোড়া যে ঐক্য বিদ্যমান সেই ঐক্য উপন্যাসের ভাষার একটা আদর্শ। চতুরঙ্গ এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ। এখানে স্পষ্টত বলা প্রয়োজন যে চতুরঙ্গ অথবা গোরার ভাষাকে যে আদর্শ বলা হচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে এই ভাষাই অনুকরণীয়। গোরা বা চতুরঙ্গে উপন্যাসের ভাষা নির্বাচনের পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য। গোটা উপন্যাসের ভাষার ভিতরে যখন সৃষ্টির অনুশাসন সক্রিয় থাকে তখনই ভাষারীতিতে আদ্যন্ত ঐক্যের বাঁধন দৃঢ় বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে কালানৌচিত্য বলে ভুল হয় তারও ব্যাখ্যা করা যায় শিল্পীর উক্ত অনুশাসনের আলোকে। চতুরঙ্গ গোরার পরবর্তী রচনা। চতুরঙ্গে নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে সাধু ক্রিয়াপদাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী রচনা গোরায় নায়ক-নায়িকার কথোপকথনে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপারটি নিশ্চয় খেয়ালখুশির নিদর্শন নয়। গোরার দেশকালের অতিপ্রত্যক্ষ আবহাওয়ায় এবং বিস্তৃত বহুবিধ জীবনের সমাবেশে পাত্রপাত্রীর অভিজ্ঞতা স্বভাবতই প্রত্যহের জলবাতাস থেকে প্রাণ সংগ্রহ করেছে। তাদের কথাবার্তায় লৌকিকতার ভিত্তিভূমি রক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। চতুরঙ্গের জন্য ভিন্ন ভঙ্গি প্রয়োজন হয়েছে। এখানে প্রথম থেকে উপন্যাসকে এই ভাষার উপযুক্ত উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছে; আমাদের বোঝানো হয়েছে যে যাদের কথা, অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার বিষয় এ উপন্যাসে বিধৃত তাদের ব্যক্তিসত্তার একক এবং নিঃসঙ্গ মহিমা প্রথম থেকেই এমনভাবে কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত যে এরা সাধু ভঙ্গিতে কথা না বললে মনে হত যেন এদের অনেকটা নিচেয় নামানো হয়েছে। কাব্যনাটকের চরিত্রগুলি

যেমন মাত্র কবিতায় কথা বলবার জন্যই কবিতা বলে না, কাব্যভূমিতেই তাদের জন্ম, তেমনি এই উপন্যাসেরও চরিত্রগুলি কল্পনায় জন্মমুহূর্ত থেকেই সাধু ভঙ্গিতে কথা বলে। এর ফলে এদের যন্ত্রণায় একটা সুদূর নিঃসঙ্গতার সৌন্দর্য এসেছে। উপন্যাসের ভাষাজ্ঞানের এবম্বিধ মান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য। মাণিকবাবুর সাহিত্যকর্মের আলোচনা-কালে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করব। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ভাষায় প্রধানত তিন ধরনের ভাষাভঙ্গির প্রভাব বিদ্যমান। এক নাটুকে রীতি; দুই সর্বদা প্রস্তুত প্রচলিত রীতি; তিন চটকদার ভাষার রীতি। প্রথম রীতির উদ্দেশ্যে পাঠককে বিস্মিত করা; দ্বিতীয় রীতির উদ্দেশ্য পাঠকের চিন্তাকে কোনোভাবে আঘাত না করে প্রচলিত চিন্তার ছকে তাকে বেঁধে রাখা; তৃতীয় রীতির উদ্দেশ্য হল পাঠককে চমৎকৃত করা। ঔপন্যাসিকের ভাষার বিশিষ্টতা ঔপন্যাসিকের চিন্তার বিশিষ্টতার ধারক। বাজার-সফল বাংলা উপন্যাসে যে ক-এর সঙ্গে খ এবং খ-এর সঙ্গে গ-এর ভাষার কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার কারণ অধিকাংশের মধ্যেই চিন্তার ক্ষেত্রেও কোনো প্রভেদ নেই। অ্যাভারেজ অভিজ্ঞতার জন্যই বর্তমান বাংলা উপন্যাসের ভাষায় অ্যাভারেজ গুণের এত কদর।

একে অতিক্রম করার জন্য কেউ কেউ অকারণ আবেগমত্ততার আশ্রয়ী হন। এটা ঔপন্যাসিক ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। জীবনের স্বরূপকে আবিষ্কার করা উপন্যাসের কাজ। ভাষা তার অন্যতম আধার। এই আধারের দৌর্বল্যে জীবনের স্বরূপকে তিনি রূপময় করতে পারবেন না।

পূর্ণ জীবনবোধে অনুপ্রাণিত ঔপন্যাসিকের ভাষায় সুদৃঢ় অনুশাসন ও উপযুক্ত গাম্ভীর্য প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হয়। সে বিচারে উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয়বস্তু ব্যতীত উপযুক্ত ভাষার শৈলী-নির্মাণ কদাচ সম্ভব নয়। উপন্যাসের ভাষা ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞানেরই অপর নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যময় উপন্যাস-ভাষার স্রষ্টা হিসেবে জগদীশ গুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবশ্য কর্তব্য। যে দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট জগদীশ গুপ্তের লেখায় বারে বারে ছায়া ফেলেছে তারই স্পর্শের হিম-শীতলতা যেন জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যের ভাষাশৈলীতে অনুভবগম্য। যাকে আপাতদৃষ্টিতে অমনোযোগ বলে মনে হয় তা যে আসলে এক গূঢ় মনোযোগেরই নামান্তর জগদীশ গুপ্তের লেখায় তা খানিকক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিরাসক্ত সত্যন্বেষা তাঁর নিরাসক্ত অনুচ্ছ্বসিত বাগভঙ্গিকে গড়ে তুলেছে। জীবানন্দের মতো মাণিকবাবুরও সর্বোত্তম সাবলীলতা লৈখিক ক্রিয়াপদের মাধ্যমে বিকশিত। অনুমান হয় লৈখিক ক্রিয়াপদে নৈর্ব্যক্তিকতা আরো বেশি ফুটতে পারে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা ও পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসের ভাষাশৈলী উপন্যাসের পট-পরিবেশ থেকে অচ্ছেদ্য। বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক উপন্যাস সাহিত্যে অসীম রায়, কমল কুমার মজুমদার ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষারীতি পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। অসীম রায়ের 'একালের কথা' থেকে 'শব্দের খাঁচায়' পর্যন্ত উপন্যাসগুলিতে গদ্যের ঋজু বলিষ্ঠতার সঙ্গে কবির শাব্দিক অব্যর্থতার এক সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বাহুল্যবিমুক্ত তাঁর গদ্যভঙ্গিতে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট চিন্তার উদ্ভাসন। তাঁর গদ্যের একটা পৃথক স্বাদ আছেই, কিন্তু তা উপন্যাসের ভৌম-প্রশ্রয়েই পুষ্ট—প্রাকৃতিক তরুশ্রীতেই তার তুলনা।

ভাষাগত নিরীক্ষায় কমলকুমার মজুমদারের শিল্পনিষ্ঠ স্বতন্ত্র পদচারণা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষণীয়। বাক্যের বিন্যাসে তিনি যে ওলট পালট করেন, বিশেষণে তিনি যে তাৎপর্য আনেন তা কমলকুমারের ঈপ্সিত চিত্রময়তাকে সাহায্য করে বলেই শিল্পসঙ্গত। নতুবা তা হয়ে যেত চূড়ান্ত রীতিবিলাস। আধুনিক চিত্রকলায় শিল্পী যে দুঃসাহসিক স্বাতন্ত্রের চর্চা করেন কমলকুমারের গদ্যের সঙ্গে সেই স্বাতন্ত্র-চর্চার স্বভাবাত্মক মিল আছে। অথচ বর্ণে, বিশেষণে, বিন্যাসে এ, অন্তত এর উত্তম মুহূর্তে কখনোই উপন্যাসাতিরিক্ত নয়। বাঙালী লেখকের হাতে লৈখিক ক্রিয়া যে এখনো সম্পদ বলেই পরিগণিত হতে পারে, কমলকুমারের লেখায় তার প্রমাণ আছে। অমিয়ভূষণের ভাষাশৈলী কমল-কুমারের মতো স্বতন্ত্র পথচারী নয়। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ক্ষুদ্রোপন্যাস 'মধু সাধুখাঁ'র ভাষায়, অন্তত সংলাপের ভাষায়, কমলকুমারের প্রথাবিরোধী বিন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অমিয় ভূষণের 'গড় শ্রীখণ্ড' অবশ্য কমলকুমারের উপন্যাস সমূহের পূর্ববর্তী রচনা। সে উপন্যাসেও অমিয় ভূষণের ভাষার শান্ত, ধীর চাল, সুসমঞ্জস গঠন, এবং অনাবিষ্ট ভঙ্গি উপন্যাসের বিষয় গাম্ভীর্যের উপযুক্ত আধার হয়েছিল।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল

এক

ইতিহাসের যে ন্যায়সূত্রের অমোঘ নির্দেশে ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জোয়ার তারই কিঞ্চিৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক বিন্যাসেও বিদ্যমান ছিল এরকম ভাবা হয়ে থাকে। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের ইতিহাসটি আমাদের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি এবং শক্তি-দৌর্বল্য উপলব্ধির জন্য বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা এ-কথা আলোচনা করেছি যে সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ হল উপন্যাসের জন্মলগ্নের প্রাথমিক শর্ত। সমকাল এবং সমকালীন জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের ভিন্ন রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্য অন্যভাবে উপস্থিত ছিল। বুদ্ধদেব বা চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবৎকাল এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এঁদের অধ্যাত্ম-কীর্তি সমন্বিত জীবন স্বভাবতই তাঁদের সমকালের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এ দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ আরো বিশিষ্টতার অধিকারী। প্রণমহোঁ কলিযুগ সর্বযুগসার—এই উক্তিতে কল্পিত সত্যযুগের পশ্চাদ্ধাবন না করে সমসাময়িক কালকেই স্বীকার করে নিতে চেয়েছিলেন সে-যুগের বৈষ্ণব সাধকরা। গৃহধর্মীদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের নেতাদের প্রচারিত ধর্মাদর্শের কোনো মৌল বিরোধ না থাকায় মোটামুটি বাংলা দেশ তখন এই সমকালানুবর্তিতাকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

কিন্তু এই সমকালানুগত্য, এই জীবিত মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর (বাংলা দেশের) জীবনাগ্রহ থেকে দূরবর্তী ব্যাপার। ষোড়শ শতকের পুরুষার্থ-চেতনায় মোক্ষ এবং ধর্ম মুখ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমশই এই চেতনা চতুর্বর্গফল লাভের সম্যক অর্থকে উপলব্ধি করার পথে অগ্রসর হয়েছিল। সমকালীন জীবন সম্বন্ধে বাস্তব আগ্রহ এই নতুন পুরুষার্থ চেতনার জনক। এ বাস্তব আগ্রহের স্বরূপনির্ণয় বাংলা উপন্যাসের জন্মকালের আলোচনায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমগ্র ধারণার সন্ধানী সেহেতু এ যুগের জীবনের সমগ্র চেহারার কিছুটা নকশা না সংগ্রহ করলে এ যুগের

জীবনের সমস্যার স্থূল আঁচড়গুলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা এবং মফস্বলের জীবনের বিন্যাস, সে বিন্যাসের ওপর নানা আলোছায়ার বুনুনি সমাজতাত্ত্বিকের কাছে অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু সাহিত্য জিজ্ঞাসুর কাছেও সে সময়ের তীব্র টানাপোড়েন কম চিত্তাকর্ষক নয়। কেন না এই টানাপোড়েনের অমোঘ আকর্ষণেই জন্মলাভ করেছে বাংলা উপন্যাস।

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ব্যয়িত হয়েছে কলকাতাই-জীবনের একটা norm বা স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রয়াসে। আসলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ফলে জীবনের দ্বান্দ্বিক অবয়ব তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জীবন যে একটা অতি কঠোর দ্বন্দ্বময় ব্যাপার এটা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সামাজিক ভাবে অন্তত উপলব্ধি করা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত জীবনাচরণের বিরুদ্ধে কখনো কখনো ক্ষীণভাবে হয়তো একটা অস্পষ্ট বিদ্রোহের স্বর শোনা গেছে। দারু-ব্রহ্ম উপাসক রামানন্দের পাঁচালি অবশ্যই উদ্ধৃতির যোগ্য :

> দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল।
> বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল ॥
> বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
> নিজ কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ ॥

কিন্তু এ ধরনের একক স্বরের কথা বাদ দিলে বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমস্ত জীবনবোধই দাঁড়িয়েছিল এই দ্বন্দ্বকে উপলব্ধিজনিত সামাজিক অনুভূতির ওপরে। কলকাতা এবং কলকাতার সন্নিকটবর্তী মফঃস্বলকে অবলম্বন করে তখন জীবনের দুই ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে ছিল কলকাতাশ্রয়ী দেওয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত নব্য বড়োলোক শ্রেণী—তার সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদি সমেত—আর একদিকে ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন-পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। হুতোমের বিবরণে, নববাবু বিলাসে এবং বঙ্কিমের লোকরহস্যের বর্ণনায় বিদ্রূপের আতিশয্যটুকু বাদ দিলে এই দুই ধারারই প্রতিচ্ছবির সাক্ষাৎ মেলে। যদি এই দুই ধারার মধ্যে কোনো একটিও সৃষ্টি সম্ভাবনায় একাকীই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত তাহলে অবশ্যই বাংলার উনিশের শতকের সামাজিক ইতিহাসে সরল-

রেখার মসৃণ গতি আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু ইতিহাস রচনায় মানুষের কর্তৃত্ব কদাচ ইতিহাসের নিজস্ব ন্যায়ক্রমকে ছাড়িয়ে যায় না বলেই ইতিহাসের গতিরেখা জটিল এবং বঙ্কিম। সে সময়ের নব্য বড়োলোক শ্রেণী সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ছিলেন ততটাই পঙ্গু, সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপন্থী পৃষ্ঠপোষকহীন পণ্ডিতেরা ছিলেন যতটা নিঃসহায়। এঁদের পুরনো অবলম্বনগুলো যত ভেঙে পড়ছিল ওঁদের ব্যর্থ বাবুয়ানির মর্যাদা ভিক্ষা ততই বাইজির নাচে, দুর্গোৎসবের ক্ষেমটায় আবর্তিত হচ্ছিল নিষ্ফলভাবে।

হয়তো তদানীন্তন কলকাতার সমস্ত বহিরঙ্গটা ছিল এই অবস্থারই একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপক। লটারি কমিটির প্রচেষ্টায় কলকাতা শহরের ক্রমোন্নয়নের পশ্চাতে রয়েছে পঙ্কে-পল্বলে জঙ্গলে কলকাতার রূপাবর্তনের ঝোঁক। ঝিঁঝি ডাকা সুতানুটি আর জলেই নিভে-যাওয়া বেড়ালের বিয়ের জলুস সেই দ্বিমুখী জীবনেরই দুই চেহারা। 'সাহেব বিবির দিগের ইংলণ্ডীয় গীতবাদ্য' এবং 'চিৎপুরের রাস্তায় মেঘ কল্লেই কাদা হয়'—এও সেই দুই চেহারারই প্রতিফলন।

দুই

স্বভাবতই কলকাতা নগরীর তাৎপর্য এ-যুগে নানামুখী ছিল। তৎকালীন সমাজ-পটের যে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ চেহারার কথা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বলা হল তা একান্তরূপেই ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক। আবার এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্থির জীবনাদর্শের সন্ধানের প্রয়াসও ছিল কলকাতাশ্রয়ী। রামমোহন অথবা বিদ্যাসাগর কেউই কলকাতাই মানুষ নন। কিন্তু উভয়েরই কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। অবশ্য হয়তো এই কারণেই এঁদের দুজনের কাছেই গোটা স্বদেশের প্রেক্ষাপট কখনো হারিয়ে যায়নি। হিন্দু কলেজীয় অত্যুচ্ছ্বাস এবং অনুস্বরবাদীদের মানসিক কার্পণ্য যে কদাচ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন এবং আংশিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেনি তার কারণ এইখানে যে কলকাতার নব্য জীবনের মিতপরিসর অতি-দীপ্তিকে এঁরা কেউ স্বদেশ জীবনের বিকল্প ভাবেননি। এঁদের মানস-আকাশে স্বদেশ বিদেশের ভাববিস্তৃতি সত্ত্বেও এঁদের জীবনের মূল ছিল দেশজ মৃত্তিকায় সে কারণে এঁরা যা কিছু দেখেছেন ভেবেছেন বা দেখতে ভাবতে চেয়েছেন তা সমস্তই দেশের মানস-আবহ ও ভাবাকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া। এই অর্থেই এঁরা কলকাতার বাইরের হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ নাগরিক মনের অধিকারী।

কিন্তু এই নাগরিকতার প্রসাদ সমগ্র বাংলা দেশ কখনো লাভ করেনি। কলকাতার জীবনের আকর্ষণ মধ্যবিত্ত বাঙালী অবশ্য অনুভব করেছে এমন কি তার রূপ-সৌন্দর্যকেও যে আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে সে নিদর্শন দুর্লভ নয়। বিহারীলালের প্রেম প্রবাহিণী থেকে পরবর্তী অংশটুকু লক্ষণীয়—

কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে
সে সময়ে নিসর্গ রয়েছে শুদ্ধ হয়ে
ব্যোমময় তারা সব করে দপ দপ,
যেন মণিখচিত অসীম চন্দ্রাতপ ;
কোনো দিকে কোনো রব নাহি শুনা যায়
কভু মাত্র পিয়ুকাঁহা হাঁকে পাপিয়ায়।
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো করে
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে।
ফিরিয়াছি পথে পথে পাড়ায় পাড়ায়
যেখানে দু-চোখ গেছে গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হররা উল্লাস চিৎকার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুলজার।
কোথাও উঠিছে হরিবোল হরিবোল,
ধেই ধেই নাচিতেছে বাজিতেছে খোল।
পথে পথে শুঁড়িদের দর্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসি খেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দমায়
গায়ের বিটকেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোনো পথে বাবুজির পাইশালের দ্বারে
পড়ে আছে দু-এক অনাথ অনাহারে।

এরই সঙ্গে যদি রমেশচন্দ্র দত্তর সংসার উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে শরৎ ও হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তামূলক কথোপকথন মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সে সময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কলকাতা-চিন্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ অংশে শরতের বক্তব্য এই : আপনারা কলকাতায় আসুন, আপনারা কি চিরকাল গ্রামেই বাস করবেন? হেমচন্দ্রের বক্তব্যও অনুরূপ : কলকাতা অতি মহৎ

স্থান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র কলকাতার সংকট সম্বন্ধেও সচেতনতা প্রকাশ করেছেন: সেখানে আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে উপযুক্ত লোক কর্মের জন্য লালায়িত হচ্ছে। গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই—মধ্যবিত্ত মানসে তখন কলকাতা এ চিন্তার স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে। বিহারীলালের মতো রমেশ দত্তের নায়িকাদেরও চোখে কলকাতার নতুন রূপের ঘোর।

> বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ি দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌরঙ্গীতে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এখন মর্তে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন তাঁহারা বেরুশ, ফিটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডেন গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান ক্ষমতার অধীন হইয়া নরনারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুকুর নিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

কিন্তু শিল্পীমানসে কলকাতা নগরীর এই যে ছায়াপাত এ সম্বন্ধে আমরা যতই উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি না কেন এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বিহারীলালের কাব্য-ধৃত কলকাতায় যদি বা কলকাতা শহরের অন্তরের চেহারা কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল এ-কালের উপন্যাসে কলকাতার সর্বাঙ্গীণ রূপ আদতেই প্রস্ফুট হয়নি। রমেশ দত্তের নায়িকার চোখে বর্ণিত কলকাতা আর স্বর্ণলতায় নীলমাধবের চোখে দেখা কলকাতার বর্ণনায় কলকাতা দর্শনের প্রথম বিস্ময় উপস্থিত বটে (এমন কি ইন্দিরাতেও) কিন্তু কলকাতা বা কোনো শহর সমগ্রভাবে এ-যুগের কোনো উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। একমাত্র আলালের ঘরের দুলাল এর ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে আলোচনা আমরা বিস্তৃত ভাবে পরে করছি।

ওপরের উদ্ধৃতি সত্ত্বেও আপাতত আমাদের যেটুকু অনুধাবনীয় তা হল এই যে কলকাতা নগরীর প্রসাদ সারা বাংলা দেশ লাভ করেনি। ইতিহাসের অনিবার্য আকর্ষণে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রলেপে কলকাতা নগরীর ক্রমনির্মাণ হয়নি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে হুতোমের বর্ণিত হঠাৎ বাবুদের মতো সেও হঠাৎ শহর। মহাভারতের ষোড়শ মহাজনপদের কলকাতা কেউ নয়। ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের টানে লণ্ডন শহরের বিস্তৃতি অথবা গ্রামীণ ইংলণ্ডের

নববিন্যাস, নতুন শহরের উদয় উদ্ভব প্রভৃতির সঙ্গে কলকাতা শহরের ইতিহাসের কোনো মিল নেই। স্বভাবতই কলোনির প্রয়োজনে নির্মিত শহরের বহিরঙ্গের জেল্লা-জৌলুস বড়োজোর 'বাবুদের মেলা'। শিল্প-রূপান্তরের প্রবল আকর্ষণে উদ্ভূত শিল্প শহরগুলির মূলে ইংলণ্ডীয় জীবনে যে-যন্ত্রণা যে-আবেগ কলকাতা শহর সৃষ্টির মূলে তা অনুপস্থিত। কলকাতা শুধু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে রইল। বিশাল মফঃস্বল বাংলায় স্বনিয়মে, নতুন সৃষ্টির ন্যায়কে অনুসরণ করে কোনো শহর সৃজিত হল না। অথচ শূন্য মক্তব-মাদ্রাসা-টোল এবং নিঃশেষিতপ্রাণ কুটির শিল্পকে ব্যঙ্গ করে দিনে দিনে জনাকীর্ণ হতে লাগল কলকাতা। আর দিনে দিনে শূন্য-প্রায় মক্তব-মাদ্রাসা-টোলের জন্য বাংলার বিপুলতর জনসমাজে কোনোও স্পষ্ট ক্ষোভের দেখা পাওয়া গেল না। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজ বিন্যাসের কিম্ভূত গঠনের জন্যই গ্রামীণ উচ্চ-কোটির মানুষ যেমন ব্যাপকভাবে অসন্তুষ্ট কুটিরশিল্পী, নিপীড়িত নীলচাষীদের জন্য কোনো সমবেদনা অনুভব করলেন না, বর্ণাশ্রমের সেই প্রেত তাড়নাতেই তেমনি প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত সমাজের বিপর্যয়েও কোথাও জাতীয় বিপর্যয়বোধের বেদনা অনুভূত হল না। অথচ কলকাতার উদয়েও শুধু সুবিধাভোগের প্রত্যাশা ছাড়া নেই কোনো প্রাণীন উল্লাস।

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সমকালীন ইতিহাস স্বতন্ত্র। সেখানে শিল্প-বিপ্লবের প্রচণ্ড তাড়নার মূলেও যেমন জাতীয় আবেগ, ১৮৪৬ সালের শস্যে স্বাধীন বাণিজ্যের নীতির ফলে agricultural decline-এও তেমনি জাতীয় বিপর্যয়-বোধ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর অ্যান ইনভেন্‌টিভ এজ নামক কবিতায় রূপান্তরের কবি-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো :

> Wherever the traveller turns his steps
> He sees the barren wilderness erased
> or dissappearing.

কিন্তু কবির মনে এতে কোনো উল্লাস নেই :

> I grieve when on the darker side
> Of this great change I look : and there behold
> Such outrage done to nature as compels
> The indignant power to justify herself.

কলকাতার আঘাতে, উদীয়মান বহু শহরের প্রতিক্রিয়ায় আমাদেরও গ্রামীণ

জীবন-বিন্যাস এ-জাতীয় great change-এর সম্মুখীন হলে অনুরূপ আর্তি আমাদের মধ্যেও উচ্চারিত হত। কিন্তু কলোনির স্বীয় স্বার্থে গ্রামীণ সমাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিতর দিয়ে রইল অর্ধজীবিত হয়ে। বিকল্পে কোনো মহৎ পরিবর্তন এল না। পূর্ণ আবেগে ইংলণ্ডে ১৮৬৫ সালের অল্পপরিচিত কবি উইলিয়ম কসমো মঙ্কহাউস রেলগাড়ির প্রতীকে রূপান্তরিত ইংলণ্ডের অদম্য আত্মাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর দি নাইট এক্সপ্রেস কবিতাটির ভাবলোকে লাসেফেয়ারের দিনের আশ্চর্য ছবি :

Straight on my silent road
Flanked by no man's abode
No foe I parley with, no friend I greet ,
On like a bolt I fly
Under the starry sky,
Scorning the current of the sluggish street.

বলা বাহুল্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর বেদনা এবং মঙ্কহাউস-এর উল্লাস, এ-দুয়ের কোনোটারই অবকাশ আমাদের উনবিংশ শতকীয় জীবনে ছিল না। নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারেখার, কিংবা কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ—এর ক্ষীণ ব্যতিক্রম মাত্র। কাজেই বিহারীলালে যখন নগর-জীবনের ক্লান্তি ধ্বনিত হত তা রমেশ দত্তের নায়কদের নগর-জীবনাকাঙ্ক্ষার মতোই কৃত্রিম। আসলে কলকাতার অভ্যুদয় বৃহৎ বঙ্গ মনোভূমির তীরটুকুকে মাত্র স্পর্শ করেছিল, তীর প্রান্তকে অতিক্রম করে জাতীয় জীবনের অন্তঃপুরে সে ঢেউয়ের প্রসাদ বিশেষ কেউ বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। শনিবারে শনিবারে গৃহ প্রত্যাগত কেরানীর মতো সে হয়তো থেকে থেকে বিলিয়েছে কিছু প্রসাধন, কিছু নিরাময়—তা নইলে রয়ে গেছে যেমন দূরে তেমন দূরে।

তিন

স্বভাবতই ব্রিটিশ পুঁজির এই নিরাপদ প্রয়োগ-ক্ষেত্রে ভালো করে কিছু গড়ে উঠল না, ভালো করে কিছু ভেঙেও গেল না। সেই অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বাস্তব জীবনাগ্রহও সম্যক্ এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ আমাদের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বহন করতে হচ্ছে। বিমূঢ় বৃহৎ বাংলাকে বাদ দিলে উনিশের শতকের কলকাতার মধ্যবিত্ত

বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত প্রয়াস ছিল জীবনের norm বা স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রয়াস। যাকে আমরা উনিশের শতকের সংস্কারান্দোলন বলি তার মূলে অবশ্যই উক্ত স্থিরাদর্শ সন্ধানের প্রেরণা। তীব্র জীবনাগ্রহ থেকেই জীবনকে সমৃদ্ধ করার বাসনার জন্ম। সংস্কারান্দোলন, ধর্মান্দোলন অথবা নবজাগরণ সকল ইতিহাসেরই পশ্চাৎপটে এই জীবনাগ্রহ। সমাজের নতুন শ্রেণীর অবলম্বনে এ জীবনাগ্রহ বাস্তবায়িত হয়। কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলার মধ্যবিত্ত এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত এবং সঞ্জীবিত হল বটে কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল।

কালান্তরের প্রতিক্রিয়ায় নতুন কালকে চেনার পূর্ণ প্রয়াস সর্বত্র সফল হয়নি। কলকাতাই-বড়োলোক শ্রেণীর বিলাস বিকারের প্রগলভ জীবনাচার আর গ্রামীণ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিপর্যয়ের দ্বন্দ্ব অবশ্যই কলকাতার নব-জাগ্রত মধ্যবিত্ত মনের অগ্রণী অংশে অনুভূত হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সফল সংস্কার প্রয়াসের মূলে এই দ্বন্দ্ব থেকেই উত্তরণের অভীপ্সা সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সে অভীপ্সাও সীমিত হতে বাধ্য হয়েছিল উপলব্ধির অসঙ্গতিতে। তাই যদিও সমাচার দর্পণের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে ইংরাজি শিক্ষার নতুন বিস্তারের কাহিনী, জনতার সামনে বালকদিগের ইংরাজি বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শনের বিবরণ, ছড়িয়ে রয়েছে পত্র-লেখকদের গল্পের আকারে লেখা পত্রে বিচিত্র যত খবরের রসালো বিষয়, রয়েছে নতুন কলকাতার সর্বতোমুখী প্রচেষ্টার কথা— তবু বোঝা যায় যে এ-সমস্তই বাহ্য। একটি কি দুটি আত্মীয় সভার মতো প্রতিষ্ঠান বা ইয়ং বেঙ্গলের মতো জ্বলন্ত উগ্রতা জাতীয় জীবনের সমগ্র প্রেক্ষাপটে কতটুকু? কতটুকু উক্ত ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন? শিল্পবিত্তজীবীদের পাদোদক-পদধূলির প্লাবনে এবং ঝড়ে প্রাচীন বিদ্যার যখন লুপ্তি ঘটতে চলেছে সে সময় রামমোহনের একক মনীষা এবং আত্মীয় সভার গুরুতর ভূমিকার কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু যে অসঙ্গতির দায়ভার আমাদের কলোনির বিপাকে সদাসততই বহন করতে হয় রামমোহনের ক্ষেত্রেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। কালান্তরের অসম্পূর্ণতায় জাত আমাদের তৎকালীন জীবনের অসঙ্গতি রামমোহনের চোখে ধরা পড়েছিল:

> যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করে, সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে নিজে ম্লেচ্ছের চাকরি করিয়াছে তাহাকে স্বধর্মচ্যুত ও ত্যজ্য কহে, তবে তাহাকে কি কহি? যদি এক ব্যক্তি

যবনের কৃত মিসি প্রায় নিত্য দন্তে ঘর্ষণ করে ও যবনের চোঁয়ানো গোলাব ও আতর এ সকল জলীয় দ্রব্য সর্বদা আহারাদিকালে ও অন্য সময়ে শরীরে ম্রক্ষণ করে কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন স্পর্শ করিয়া থাক অতএব তুমি স্বধর্মচ্যুত, ত্যজ্য হও, এরূপ বক্তাকে কি কহা যায়? এক ব্যক্তি নিজে ম্লেচ্ছের নিকটে যাবনিক বিদ্যার অভ্যাস করে ও মনুমহাভারতাদির বচনকে সমাচার-চন্দ্রিকা ও সমাচার-দর্পণে ছাপা করায়—যাহা সে ব্যক্তির জ্ঞাতসারে অনেক ম্লেচ্ছে লইয়া থাকে, কিন্তু অন্যকে কহে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করিয়াছ; সুতরাং স্বধর্মচ্যুত, ত্যজ্য হও, তবে তাহাকে কি শব্দে কহিতে পারি?

স্বভাবতই জীবনের জট-পাকানো সূত্রগুলির চেহারা যে রামমোহনের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহনের উপলব্ধি—যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই অনন্যসাধার—একটা সীমায় এসে থমকে গিয়েছিল। 'শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করানোর' মধ্যে স্বীয়-আসনচ্যুত দেশীয় পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকহীন জীবনের যে অসহায়ত্ব, তার ঐতিহাসিক কারণাবলীর অনুসন্ধান রামমোহন করেননি। শাস্ত্রার্থকে মুদ্রা যন্ত্রের মাধ্যমে বিতরণ করার মধ্যে যে অনিবার্যতা তার মূল নির্ণয়ে রামমোহনের অক্ষমতাই প্রতিফলিত হয়েছে অন্যত্র, নীলকর সাহেবদের চরিত্র নির্ণয়ের অক্ষমতায়। নীলকরেরা গ্রামীণ জীবনাচারণের পরিবর্তন আনছে—রামমোহনের এই বিপাকগ্রস্ত সিদ্ধান্তে সেই চেতনার সীমারেখাই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে এই নতুন সম্পর্কের আসল চেহারাটা ১৮২৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে সমাচার দর্পণ থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বোঝা যায়। '১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সালের বাঙ্গালার ও ইংলণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের এক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য কি প্রকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদেশ হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধান রূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে ৭২৩৬ মন মাত্র এখান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়, এবং বর্তমান বৎসরে যে নীল রপ্তানি হইবে তাহা প্রায় এক লক্ষ মনের অধিক হইবে কিন্তু অন্যপক্ষে বস্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতি স্বল্পতা হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এদেশ হইতে বার লক্ষ বাইশ হাজার থান কাপড় ইংলণ্ডে যায় এবং তৎপরে এই বাণিজ্য এমন পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক

লক্ষ থান কাপড় এদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পুর্বে যত রপ্তানি হইত তাহার বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিকে দৃষ্টি করি তবে দেখিতে পাই যে বাণিজ্য বিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নেই, যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে ১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হয়। এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভয় একত্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রপ্তানির ন্যূন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তাঁতিদের ব্যবসায় একেবারে লুপ্ত হইল ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম্র এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম্র আইসে। পাতিলোহার আমদানির অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঘড়ি ও রৌপ্যময় বাসনের আমদানিরও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। পশমী কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়।"

আদান-প্রদানের এই নিবিড় সম্পর্কের ভিতরেই সেই প্রয়োজনীয় সূত্রটি নিহিত রয়েছে যা দিয়ে সমকালীন ইংলণ্ড ও বাংলা দেশের অনেক কিছু বোঝার পথ পরিষ্কার হয়। স্ফীত-বাণিজ্য ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের প্রেরণা কোথায় এবং কী থেকে, ইংলণ্ডের সেই surfece respectabilityর যুগের চিন্তা-জট, উপন্যাসের সীমিত কল্পনা, দর্শনে-অর্থনীতিতে থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের কাটাকুটি খেলা প্রভৃতির অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক কারণ সূত্র কোথায় এও যেমন এই বিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়, তেমনি ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবীরা দেশীয় জীবনের তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি কতটা করেননি তাও এর মধ্যে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র এ অবস্থাতেও protection-এর নীতিকে মহাভ্রমাত্মক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন সে কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

লক্ষ লক্ষ টাকা নীলের বহির্বাণিজ্য যেমন ভারতবাসীর কোনো কাজে লাগেনি ঠিক তেমনিই নবাগত ইংরাজি শিক্ষাও সাধারণ দেশবাসীর জীবনে কোনো রূপান্তরের প্রসাদ আনেনি। শুধু তাই নয় ১৮৩০ সালের মধ্যেই ইংরাজি শিক্ষা সীমিতকরণের বিচিত্র প্রস্তাবের গূঢ়ার্থটুকু লক্ষণীয়;

সমাচার চন্দ্রিকা থেকে নিচের অংশটুকু দেওয়া হচ্ছে···

> ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরাজি বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাঁহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্কর্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কর্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দু কলেজাদি নানা পাঠশালা দ্বারা অনেক বিষয়ী লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরাজি বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরানীর ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃপুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেল সরকারের সম্বন্ধী ইত্যাদি প্রায় বিষয়ী লোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কর্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমত কর্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোনো মুৎসুদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কর্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসুদ্দি তাহাকে কর্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরি করিতে চাহ।

অথচ এরই উল্টোপিঠে আদালতে পারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজি প্রচলনের জন্য যে ধরনের অপূর্ব যুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে তার উপভোগ্যতাও কম নয়। আদালতের বিচার কার্যাদিতে ইংরাজির প্রচলনের পর থেকেই মোকদ্দমা ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং তাকে অবলম্বন করেই আদালতাশ্রয়ী বাবুশ্রেণীর উদ্ভব। নিম্নোদ্ধৃত অংশে যে কারণে পারসী বিদায়ের প্রস্তাবনা করা হয়েছে তার অসঙ্গতিও লক্ষ্য করার মতো। যে সংখ্যার জোরে দেশকে ইংরাজি শিক্ষিত বলে ভেবে নেওয়া হচ্ছে তার ক্ষুদ্র চেহারা যে শুধু হাস্যকর তাই নয়—কলকাতাকেই দেশ ভেবে নেওয়ার প্রবণতাও অনুধাবনযোগ্য।

> পূর্বে তাহার (আদালতে ইংরাজি ভাষা প্রচলনের) এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালী লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্তু এক্ষণে সে বাধা ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতায় কালেজে চারিশত বালক ইংরাজি শিখিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য অন্য ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি পড়ে তাহাদের সংখ্যা এক করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহাদের আটক হয় না।

এই বিপাকের ফলে—আত্মীয় সভার পুস্তক প্রকাশন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববোধিনীর মননজাত ফসল এবং রামমোহনের-বিদ্যাসাগরের দৃঢ়চিত্ত লক্ষ্য-পরতার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য শোধ করেও বলা চলে এর কোন কিছুই জাতীয় ভাববিপ্লবের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে বিচারে রামমোহনের জয়লাভে কলকাতায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার মুষ্টিমেয় তৎকালিক বুদ্ধিবাদীর ভাবরাজ্যের বাইরে সে আলোড়নের মূল্য কতটুকু? অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সঙ্গে রামমোহনের সাময়িক সম্পর্কের চেয়ে তার জোর কোন্ অংশে বেশি সে সময়ের কলকাতার জীবনাচরণের দিকে তাকালে এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। হয়তো সমস্ত সামাজিক সংস্কার হিন্দু কলেজ আর সংস্কৃত কলেজের মধ্যবর্তী রেলিং-ভেদ আর প্রাচীর-ভেদের লুপ্তি ঘটাতে চেয়ে 'নকলবুঁদিগড়' ধ্বংসের তৃপ্তি অনুভব করেছিল। চেয়ে দেখেনি সারা দেশের ছুত-অচ্ছুতের সমস্যাকে। তাই সব বিপ্লবেরই নমুনা দেওয়া চললেও সত্যিকারের বিপ্লব কোথাও ঘঠেনি। আমাদের যুক্তি-আদর্শ ধর্ম-বিপ্লব সবই আমদানি করা কথা মাত্র। পরে 'ভারতী' পত্রিকার সময়ে ঐ পত্রে যখন ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহের তালিকা প্রকাশিত হয় তখন সে তালিকার সংক্ষিপ্ততাতেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ব্যাপারে জাতীয় জনচিত্তের গভীরে কোনোও তরঙ্গ সৃজন করতেই পারেননি। বস্তুতপক্ষে কালবৈগুণ্যে তখন আমাদের নিজস্ব প্রাচীন জীবন-বিন্যাস হতে বসেছিল শতখান, আর দু-একজন শক্তিশালী কৃষকের মানবজমিন চাষের অসামান্য প্রয়াস সত্ত্বেও নতুন কালের ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি। সমাজ-সংস্কারের ন্যায্য চেষ্টায় ভুলতে বসলাম গ্রামীণ জীবনের একদা ঐশ্বর্যবান অতীত, ভুলতে বসলাম তার আসন্ন বিপর্যয়কে।

অথচ যে ইংলণ্ডীয় বিদ্যার জন্য উনিশ শতকের প্রথম পাদে এতদ্দেশীয় বালক-দিগের মধ্যে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়েছিল সে ইংলণ্ডের তখনকার সমগ্র চেহারাও যদি আমাদের চিন্তানায়কদের চোখে পড়ত তাহলে সমগ্র ইংলণ্ডই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের আকারে ফুটে উঠত আমাদের সামনে। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত অগ্নিগর্ভ চার্টিস্ট আন্দোলনের প্রাবল্যে খণ্ডযুদ্ধে ও রুটি অথবা রক্তের ধ্বনিতে আইনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংক্ষুব্ধ সেই ইংলণ্ডের গোটা রূপকে জানলে যে জিজ্ঞাসার জন্ম সম্ভব হত অ্যাডাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান কমিটির অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় সে সামগ্রিকতা সম্ভব ছিল না।

আমরা যখন শূদ্রকে বেদাধিকার দানের জন্য সংগ্রাম করেছি রীতিমতো নিষ্ঠার সঙ্গে—শূদ্ররা তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নীলের দাদনের নাগপাশে রুদ্ধশ্বাস। আমরা যখন কলকাতার স্বল্পপরিসর আলোকোজ্জ্বল জীবনে গুটি কয়েক বিদ্যোৎসাহী সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিক্ষা-সংস্কারের খসড়া রচনা করছি তখনই অগ্নিগর্ভ গ্রাম বাংলায় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে রত হয়েছে বাংলার চাষীরা। নীলদর্পণ ছাড়া কোনো বাংলা উপন্যাসে নীল চাষীদের সাক্ষাৎ মিলল না। সিপাহী বিদ্রোহের কামান গর্জনও থেকে গেল অশ্রুত। সমকালের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নে এই কিম্ভূত-কিমাকার অনাগ্রহ লক্ষণীয়। আমরা গভীরভাবে গ্রামীণ সমাজের বিপর্যয়-মুখী কাঠামোর প্রাচীন বনিয়াদকে বুঝতে চেষ্টা করলাম না—ভুল বিদেশকে অনুবাদ করতে চাইলাম সভা-সমিতির প্রস্তাবে।

চার

ফলে আমাদের যে জীবন-তৃষ্ণার জন্ম উনবিংশ শতকে সম্ভব হয়েছিল তার সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের নবজাত জীবনাগ্রহের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত কোনো মিল নেই। সে যুগের ইংলণ্ডের নবোদিত সাধারণ মানুষ জীবনের সমগ্র ব্যাপারে যে অসীম কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিল সে কৌতূহলের চিহ্ন আমাদের জীবনে তেমন স্পষ্ট ছিল না। চাকরানীর জীবনই হোক আর সমুদ্রবেষ্টিত নির্জন দ্বীপ কিংবা শ্বেত তিমির হিংস্রতাই হোক—শ্লীল-অশ্লীল, তুচ্ছ-মহৎ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, জীবনের সকল কিছু সম্বন্ধে একটা স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা এ যুগের ইংলণ্ডীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের উনবিংশ শতকে উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক সংকটের ছায়াই প্রতিফলিত হয়েছে—ইংলণ্ডেরই উনবিংশ শতাব্দী যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সে বীর্যবত্তা হারিয়ে ফেলেছিল তখন ইংলণ্ড-চোঁয়ানো সেই জীবনীশক্তি বাংলা দেশে আর কী নতুন ফসল ফলাবে?

সুতরাং পিকারেস্ক উপন্যাসের outcast-দের ধারা বহন করে জীবনের অতি সামান্য ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও অশেষ কৌতূহলী বাংলা উপন্যাস সৃজিত হল না। একটি মাত্র বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ছিল, ইংরাজি নীতিশিক্ষার পাঠশালায় পড়া সৎ-মানুষের মডেল হবার আগ্রহ। জীবনের বিচিত্র ভূমিতে পর্যটন করা বিশেষ আমাদের অদৃষ্টে সম্ভব হয়নি, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বর্ণময়তায় আমরা উজ্জ্বল হতে

পারিনি। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অগ্নি-বলয় থেকে জাত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় অসমসাহসী কর্মীর অভিজ্ঞতা বা জীবন-দৃষ্টি আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করেনি। আমাদের প্রথম উপন্যাস আলালের ঘরের দুলাল একটি গোটা উপন্যাসের সকল প্রতিশ্রুতি পালন করলেও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ প্রয়োগে সীমিত শিল্পকর্মই গেথে গেল।

তথাপি যেহেতু আলালের ঘরের দুলাল আমাদের প্রথম উপন্যাস সে কারণে আলালের ঘরের দুলালের সপ্রসঙ্গ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবিষ্কারের পর ফুলমণি এবং করুণার কথা আলালের ঘরের দুলালের প্রসঙ্গে অবশ্যই উত্থাপিত হবে। এবং আমাদের বিবেচনায় শুধুমাত্র সাল-তারিখের বিচারেই প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা বিতরণ সীমাবদ্ধ না রেখে উভয় রচনার তাৎপর্যের তুলনামূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। এই তাৎপর্য নির্ণয়েই প্রথম সার্থক উপন্যাসের মর্যাদা স্থিরীকৃত হবে।

কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস তাকেই বলা চলে, যে প্রথম রচনা জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। শুধু প্রথমত্বই তার একমাত্র গুণ নয়। বাস্তব পক্ষে উপন্যাস ব্যাপারটির সঙ্গে সভ্যতার ও সংস্কৃতির চলিষ্ণু ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগ একটা আবশ্যিক ঘটনা। পরীর গল্প উপন্যাস নয়, বাস্তব জীবনের মর্মমূলের সঙ্গে তার যোগ নেই বলে। তেমনি যদি কোনো গদ্য-গ্রন্থের সন্ধান ফেলে যে রচনায় জাতীয় ভাবাকাশের সাক্ষাৎ ক্ষণেকের জন্যেও মেলে না তাকে আর যাই হোক জাতীয় উপন্যাসের তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া চলে না।

আমরা আগেই বলেছি, এবং পরে বিস্তারিত ভাবেই বলব যে আলালের ঘরের দুলালের প্রচুর সীমাবদ্ধতা। সে সীমাবদ্ধতার মূলেও রয়েছে উনবিংশ শতকের স্বদেশের সমাজ ইতিহাসের অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতা। তথাপি সে মূলশায়ী অসঙ্গতি সর্বার্থেই জাতীয় অসঙ্গতি। পরবর্তী স্মরণীয় প্রতিভাধর উপন্যাসেও সে অসঙ্গতির পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ নানা প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু এ-কথা সদাই স্বীকার্য যে মূল-লগ্ন সেই দুর্বল মৃত্তিকার সবটাই দেশজ মৃত্তিকা। ফুলমণি এবং করুণার বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ মূলগত এইখানে। একে বড়ো জোর একটা গল্পকাহিনী বলা যায় হয়তো, এর বেশি কিছু নয়। যে-মৃত্তিকা এর উৎসমূলে তার সঙ্গে ডোম আন্তোনিয়-জেণ্টু দিগের সহিত কথোপকথনের মিল আছে— উপন্যাসের আকাশ এখানে নেই।

ফুলমণি ও করুণার সুবিস্তৃত পরিচিতিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সর্বদাই রচনাটিকে 'বইখানি' বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে চিত্তরঞ্জনবাবু এটিকে বারেবারে আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে প্রতিতুলনা করেছেন। ভাষায়, বিষয় বর্ণনায় আলালের থেকে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয় যে এটা তাঁর পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এটি রচিত। সুতরাং এটার উপন্যাস-গুণ মাত্র প্রমাণিত হলেই প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা একে দেওয়া চলে। চিত্তরঞ্জনবাবুর মতো সাহিত্যপ্রেমিক সাহিত্যসেবক ফুলমণি ও করুণাকে উপন্যাস প্রমাণিত করতে পারেননি—উপরন্তু আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে অবিচারমত্ত মন্তব্যাদি করেছেন—এটা দুঃখের কথা। ফুলমণি ও করুণার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই—

(ক) ইংলণ্ডেরই হাত-ফেরতা হিউম্যানিজমের পাঠশালায় শিক্ষিত আধুনিক বাংলায় হিউম্যানিস্ট ধারার সঙ্গে লেখিকার কোন সংযোগ ছিল না। বরঞ্চ ধর্মান্ধ সঙ্কীর্ণতায় লেখিকার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ফলে যা কিছু ভারতীয়ত্ব তার প্রতিই লেখিকার চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা। গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেশী খ্রীষ্টানদের প্রস্তাবিত নামকরণের তালিকায় পিতৃনাম ভোলানোর যে আয়োজন তার সঙ্গে ঔপন্যাসিক উদারতার কোনো সম্পর্ক নেই।

(খ) লেখিকার এই মনোভাবের ফলেই সমগ্র বইটি খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচার মাত্র। কোনো অর্থেই বইখানি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনালেখ্য নয়। বরঞ্চ খ্রীষ্ট ধর্মকে বরণ করলেই যে ম্যাজিকের মতো আর্থিক দুর্গতিকেও বশীভূত করা যায় বইখানি তারই ছবি।

(গ) পাত্রপাত্রীরা বাংলা দেশের কোনো অংশেরই জীবনযাত্রার প্রতিনিধি নয়। কী তাদের জীবিকা, কী তাদের জীবন সংগ্রামের রূপ—সে বিষয়ে লেখিকা নীরব। দুই খ্রীষ্টান পরিবার পরিচ্ছন্ন দ্বীপের মতো যেন ভাসমান। সমগ্র গ্রামজীবনের কোনো প্যাটার্নকেই লেখিকা চেনেন না। ফলে কোনো উপন্যাসোচিত সমস্যায় কাহিনী বিধৃত নয়। করুণার স্বামী-সমস্যার যে ক্ষীণ ইঙ্গিত তাও অব্যবহৃত। ফুলমণির ছককাটা সংজীবন কৌতুকপ্রদ মাত্র। মুসলমান আয়ার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ হাস্যকর।

মিস মেয়োর পক্ষে যা ছিল স্বাভাবিক ফুলমণি ও করুণার লেখিকাও স্থানে স্থানে সেই মানসিকতার পরিচয়ই দিয়েছেন ভারতবর্ষে যা কিছু অখ্রীষ্টান তাই হেয় এই

ধারণার পোষকতা করে—ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত কল্পনার সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এ পুস্তক।

সুতরাং, ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি, বিস্তৃত জীবনপটে অভিজ্ঞতার বিন্যাস ও উপন্যাসোচিত সমস্যা—একটি উপন্যাসের এই প্রধান ত্রি-শর্তের একটিও এ পুস্তকে রক্ষিত হয়নি। গদ্যকাহিনীর যে ক্ষীণ স্রোত করুণার জীবনকে অবলম্বন করে বহমান তাও শুধু মেমসাসেবের খ্রীষ্টীয় কৃতিত্ব প্রচারের মাধ্যম বা অজুহাত মাত্র। সব মিলিয়ে বড়োজোর একটা আলেখ্য—তাও একটিমাত্র রঙের যথেচ্ছ ব্যবহারে সে আলেখ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। খ্রীষ্ট ধর্মকে গ্রহণ করে ফুলমণির সুখ এবং যথার্থ খ্রীষ্টধর্মাচরণ না করায় করুণার দুঃখভোগ, ও পরে মেমসাহেবের ঈশ্বর প্রেরিত সুপরামর্শে করুণার সুমতি এবং সুখের মুখদর্শনে কোনো কাহিনী-রসই নেই। আছে শুধু ধর্ম-প্রচারকের প্রত্যাশিত উদাহরণ প্রদান।

একটা উপন্যাসে চরিত্র সৃজনের নিম্নতম মান সদাই রক্ষা করা দরকার। সে চরিত্র স্থিতিধর্মী হলে চলে না। গতিশীলতাই উপন্যাসের চরিত্রের প্রধান গুণ। ফুলমণি ও করুণায় চরিত্রের কোনো বালাই নেই। নীতি-প্রচারকের সুমতি কুমতির গল্পের মতো এ গল্পে লেখিকার উদ্দেশ্যপোষক ভাবে যে-কোনো ঘটনাই যে-কোনো ভাবে ঘটে। মানুষের মৃত্যুদৃশ্যও এ উপন্যাসে মানুষের মৃত্যুদৃশ্য না হয়ে খ্রীষ্টানের আদর্শ মৃত্যুদৃশ্য হয়ে উঠেছে।

লেখিকা ভারতবর্ষে বহুকাল ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মহৎ সভ্যতার কাছে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। তিনি যে-দেশের মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বাসনা অন্তরে পোষণ করতেন সে-দেশের লোক-জীবনের বেগবতী ধারাকে তার ঐতিহ্যসমেত দেখার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করেননি। সম্ভবত লেখিকার স্বদেশও ছিল লেখিকার কাছে বিদেশের মতোই অপরিচিত। যে উৎসে নাস্তিক হেয়ারের প্রাতঃস্মরণীয়তা সেই মানবময় জীবনাচরণকে লেখিকা কখনো স্বপ্নেও দেখেননি। এই বইখানিকে যদি উপন্যাস আখ্যা দিতে হয় তাহলে রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেরির কথোপকথনকে বলতে হয় প্রথম বাংলা নাটক। ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণগুলির নিদর্শন তালিকায় অবশ্যই বইখানি প্রথম স্থান অধিকার করবে—এমন সন্দেহ পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠের পরে হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

এখন চিত্তরঞ্জনবাবু সুবিস্তৃত ভূমিকায় বইখানির উপন্যাসোচিত গুণাবলীর যে

নানা পরিচয় দিয়েছেন সেগুলিকে পরীক্ষা করা যাক। লেখিকা করুণার মতি পরিবর্তনকে মনে করেছেন ঈশ্বরের দয়া। সে দয়ার সূত্র অবশ্যই মেমসাহেব স্বয়ং। করুণার যথাবিহিত খ্রীষ্ট ধর্মাচরণের ফলে, নিয়মিত গির্জা-গমনের ফলে সে যখন স্বামীসোহাগের অধিকারিণী হল তখন অবহেলায় মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা তার প্রায়ই মনে পড়ত। পুস্তকের শেষাংশে লেখিকা করুণার কথা বর্ণনা করেছেন ;

> 'করুণা শেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল, কিন্তু সে ধর্মেতে কখন প্রফুল্লিতা হইতে পারিল না। কেননা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু অনেকবার মনে পড়িত...'

চিত্তরঞ্জনবাবু এর ব্যাখ্যায় বলেছেন

> 'লেখিকা এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন ; তিনি যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সে কথা মনে থাকলে কখনো লিখতে পারতেন না যে, ধর্ম করুণাকে শান্তি দিতে পারেনি। শ্রীমতী ম্যালেন্সের প্রচারক-সত্তা তাঁর শিল্পী-সত্তার নিকট পরাজিত হয়েছে। করুণা মা এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই ধর্মের উপদেশ সন্তান হারাবার বেদনা ভুলাতে পারেনি।'

দুঃখের বিষয় এর কোনো কথাই সত্য নয়। প্রথমত খ্রীষ্টধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম নয়। হরি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাপস্খালনের কথা খ্রীষ্টধর্মে নেই। বরঞ্চ আদি পাপের স্মৃতি সেখানে একটা ভূমিকা অধিকার করে রয়েছে বলেই অনুশোচনার স্থান সেখানে বিদ্যমান। 'প্রায়শ্চিত্ত বিনা ঈশ্বর একটি পাপও ক্ষমা করেন না'— এই হল বাইবেলীয় বিশ্বাস। শ্রীমতী ম্যালেন্সও সেই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়েছেন। এখানে প্রচারক-সত্তা এবং শিল্পী-সত্তার প্রসঙ্গ এই কারণে নিরর্থক। দ্বিতীয়ত, যদি দেখা যেত করুণার পুত্রের অপমৃত্যুর বেদনা তাকে ধর্মাচরণের মাঝেও অশান্ত করে তুলেছে তবে চিত্তরঞ্জনবাবুর বক্তব্যের কথঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যেত। যেটুকু চিত্তরঞ্জনবাবুর উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেছেন তার পরের কথাগুলি হল—"এমত সময়ে সে কেবল প্রভুর বাক্য পাঠ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম-নির্দেশ নিরপেক্ষ যে বেদনার কথা চিত্তরঞ্জনবাবু বলেছেন তা একান্তই তাঁর কল্পনা।

চিত্তরঞ্জনবাবু এই পুস্তকে ব্যবহৃত নানা চরিত্রে দ্বন্দ্ব এবং মানসিক সংঘাতাদি দেখতে পেয়েছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন, যে—

> 'মানসিক দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে শ্রীমতী ম্যালেন্স বাংলা সাহিত্যের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রথম আলোকপাত করেছেন।'

অথবা

'আধুনিক উপন্যাসে ঘটনার কোন পৃথক মূল্য নাই ; মনে কি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তা দিয়েই ঘটনার মূল্য বিচার করা হয়। শ্রীমতী ম্যালেন্সের উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।'

প্যারির খ্রীষ্টান হতে চাওয়া ও স্বামীর বাধাদানের প্রসঙ্গে লেখিকা প্যারির মনোভাব বর্ণনা করেছেন ঃ

'আমি একবার মনে করিলাম, যদি ঘরে যাইয়া স্বামীর সাক্ষাতে ঠাকুর পূজা করি, ও সন্তানদিগকে গোপনে খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিই তবে আমি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্তানসুদ্ধ খ্রীষ্টান হইতে পারিব।'

এই প্রতারণার ক্ষণিক ইচ্ছা চিত্তরঞ্জনবাবুর মতে দ্বন্দ্ব। অবশ্যই এই তথাকথিত দ্বন্দ্বের পূর্বেই আদর্শ খ্রীষ্টানের মতোই প্যারিকে দিয়ে উচ্চারণ করানো হয়েছে যে ঃ

'...কিন্তু তাহাদের বিরহে অদ্যাবধি আমি কখনো খেদ করি নাই কেননা যীশু পরিবার হইতেও ভাল, তিনিই আমার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইয়াছেন।'

সুতরাং এখানেও দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশ ছিল না। প্যারির প্রতারণার ইচ্ছা আসলে সেই আদি শয়তানের প্রলোভন, যীশুর কৃপায় এ থেকে মুক্তি ঘটল। চিত্তরঞ্জনবাবু যাকে উপন্যাস প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যস্ত তাকে বাংলা ভাষায় লিখিত ইংরাজি উপন্যাসও বলা যায় না। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে বোঝা এবং ইংরাজি উপন্যাস সাহিত্যের ধারাকে আয়ত্ত করা দুইই লেখিকার ক্ষমতার বাইরে ছিল।

পাঁচ

পক্ষান্তরে আলালের ঘরের দুলাল একটি যথার্থ উপন্যাসের সকল লক্ষণ অঙ্গীভূত করেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সাহিত্য-কীর্তির সমালোচনা বিস্তারিতভাবে আমরা পরে করছি। প্যারীচাঁদের লেখায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম যে-যে বৈশিষ্ট্যের দেখা পাওয়া গেল বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলি এই—

(ক) উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল এই রচনায়।

(খ) একটি বিস্তৃত দেশজ জীবনপটের, প্রকৃতির এবং মানুষের প্রথম ব্যবহার এখানে পাওয়া গেল।

(গ) ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সর্বগ্রাহী মনের প্রথম পরিচয় এই রচনায় মিলল।

(ঘ) সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা মানসদৃষ্টির সাক্ষাৎও প্রথম এই রচনায় লাভ করা গেল।

(ক) এই উপন্যাসের নায়কের জীবনের বিচিত্র বিন্যাসে উপন্যাসের সমস্যা বিধৃত হয়ে রয়েছে। নায়ক মতিলালের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত কেমন করে ঘটল সেটা উপন্যাসের গল্প। এই গল্পের অন্তরালে যে বক্তব্য ক্রিয়াশীল তা হল মানুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সুখ ও শান্তি মেলে না। ফুলমণি ও করুণায় যেখানে শ্রীমতী ম্যালেন্স ধর্মের মানুষকে খুঁজেছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র সেখানে মানুষের ধর্মকে সন্ধান করেছেন। উনিশ-শতকের মানবময় চেতনার সঙ্গে এ বোধের নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান।

(খ) নবোদ্ভূত কলকাতা নগরী, বিপর্যস্ত প্রাচীন গ্রাম-জীবনের অবশেষ, শহরতলীর বড়োমানুষী সমাজ, পল্লীবাংলার বিপর্যস্ত চাষী, দেশী জমিদার, নীলকর সাহেব ও প্রাচীন ঐতিহ্যময়ী নগরী—এক কথায় গোটা ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিবেশ নানাভাবে স্পষ্টতই পরস্পর অন্বয়ে যুক্ত হয়ে এই উপন্যাসের জীবনপট নির্মাণ করেছে। আদালতের দৃশ্যগুলিতে যে জীবনপটের এক প্রান্ত —নির্বেদগ্রস্ত মতিলালের কাশীধামের গঙ্গাতীরে সে জীবনপটের অপর প্রান্ত। বর্ষাক্লান্ত কলকাতা, নদীবক্ষ, ঝড়, অথবা শহরাঞ্চলের সকাল, নানা কিছু উপন্যাসের স্বভাবোচিত একটা আমূল অখণ্ডতা সমেত উপন্যাসের বক্তব্য রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সভ্যতা, স্বদেশ ও সংস্কৃতি বোধ সার্থক উপন্যাসে পরোক্ষে সদাই উপস্থিত থাকে আলালের ঘরের দুলালের রসমগুলে তার জাগ্রত প্রয়াস প্রথমাবধি বিদ্যমান। পট অথবা পরিবেশ এ বিষয়ে লেখকের সহায়তা করেছে।

(গ) ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টিয়ান কোনো প্রকার নীতিশাস্ত্র লেখকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। ফলে ঠকচাচা-বাহুল্য সংবাদ, অথবা বরদা-বেণীবাবু প্রসঙ্গ, আরক্ষাবিভাগের দুর্নীতি অথবা শ্রাদ্ধ বাড়ির স্থূল কোলাহল এবং আরো বহু বিষয়ে লেখকের আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। যে স্বাস্থ্যবান সমগ্রতাবোধ ব্যতিরেকে একটা উপন্যাসের সার্থকতা অসম্ভব এই

উপন্যাসে অব্যাহত মুক্ত দৃষ্টির প্রসাদ-শুদ্ধ সেই সামগ্রিকবোধের সাক্ষাৎ আমরা পাই। এ দৃষ্টি যেমন নিরাসক্ত তেমনই সর্বগ্রাহী। উপন্যাসে জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গেলে যে প্রত্যয় পাঠকমনে সঞ্চারিত করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমাবধি সচেতন। উপন্যাসোচিত বাস্তবতা নির্মাণে আলালের ঘরের দুলাল প্রথম পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হুতোম প্যাঁচার নকশা অথবা নববাবু বিলাসে যে নির্মম ব্যঙ্গ-নিপুণ দৃষ্টি সমগ্র নাগরিক জীবনযাত্রার অসঙ্গতির চিত্রকর, সে নির্মমতা, সে দৃষ্টি, সেই একমুখিতা প্যারীচাঁদের ছিল না। জীবনকে অখণ্ডভাবে ধারণ করার প্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন। যা তাঁর আগে কেউ করেননি। এ কারণেই তিনি প্রথম ঔপন্যাসিক।

(ঘ) এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের attitude বা মানসদৃষ্টির কথাও ওঠে। Attitude বা মানসদৃষ্টির মূল অবশ্যই লেখকের নিজস্ব বোধে এবং নিজস্ব জীবন-ব্যাখ্যায়। যে রীতিতে এই জীবন-ব্যাখ্যার রূপায়ন তা বহুমুখাপেক্ষী। সেই সব কিছুকে সমগ্রভাবে মিলিয়ে গড়ে ওঠে লেখকের attitude. সেকারণেই আলালের ঘরের দুলালের লেখকের দৃষ্টি ব্যঙ্গ-দৃষ্টি এ-কথা নিরর্থক। বস্তুতপক্ষে এখানে লেখকের মনোভঙ্গির রূপায়ণে বহু কিছুর মতো ব্যঙ্গরসও একটা উপাদান। অসংখ্য চরিত্র, এবং তারাও প্রধান চরিত্র, এ উপন্যাসে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে—ব্যঙ্গ-রসিকের আতিশয্য সে সব চরিত্রে বিন্দুমাত্র নেই। যেটার জন্য আলালের ঘরের দুলালকে ব্যঙ্গ-রচনা বলে ভ্রম হয় সেটা হল এই উপন্যাসের ভাষা। মতিলালের শাসনরহিত জীবনের রূপায়ণে নিয়োজিত ভাষাতেও যেন শাসনরহিত উদ্দামতা সঞ্চারিত হয়েছে। উপন্যাসকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার যে তাগিদ বাইরের দিক থেকে প্যারীচাঁদ অনুভব করেছিলেন, আলালী ভাষার মূলে কেবল সেই তাগিদই কার্যকরী এ-কথা মনে করা সঙ্গত হবে না। মতিলালের জীবন এবং সমস্যাকে বাস্তব করে তুলতে গেলে, সমকালের নাগরিক জীবনাচারকে প্রত্যয়গ্রাহ্য করে তুলতে গেলে এই ভাষার মাধ্যম অপরিহার্য ছিল। সমকালের জীবন সম্বন্ধে প্রবল স্পৃহা, এবং সেই জীবনের বহু ব্যত্যয়ে প্রবল বেদনায় আলালের ঘরের দুলালের জন্ম। স্বভাবতই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পরম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানব-প্রীতিরই প্রসাদে ঠকচাচার কারুণ্য, কাশীর গঙ্গাতীরে মতিলালের প্রাচীন ভারতবর্ষের ছায়ায় আত্মসম্বিৎ—এ সমস্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই

মানবমুখী দৃষ্টিই উপন্যাসের সমাপ্তিবাচনে ঠকচাচীর প্রোষিতভর্তৃক জীবনের নিষ্ঠুর অসহায়ত্বকে এইভাবে প্রকাশ করেছে—

ঠকচাচী কোনো উপায় না দেখিয়া চুড়িওয়ালী হইয়া ভেটিয়ারি গান 'চুড়িয়ালের চুড়িয়া' গাইতে গাইতে গলি গলি ফিরিতে লাগিল।

লক্ষণীয় যে, পাপের সাজা পুণ্যের পরাজয় জাতীয় কোনো মন্তব্য ব্যতীতই প্যারীচাঁদ এই সমাপ্তিবাচন করেছেন। যে অনাসক্ত জীবন-প্রীতির ফলে উপন্যাস এ যুগের বিশিষ্ট শিল্পরূপ সেই অনাসক্ত জীবন-প্রীতির প্রথম প্রকাশ আলালের ঘরের দুলাল।

ছয়

(কিন্তু তথাপি বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠায় যে অসংলগ্নতা যে অসম্পূর্ণতা, সে অসম্পূর্ণতার দায়ভার অবশ্যই প্যারীচাঁদকেও বহন করতে হয়েছিল। শিল্পীর প্রয়াস নিজ জীবনবোধের টানেই শিল্পময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রয়াসের বাঁকে বাঁকে তার স্বাধীন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে সভ্যতার নিজস্ব ছন্দ, কাললগ্নের বিশেষ বিশেষ প্রভাব।) আমরা এই আলোচনার প্রথমে জাতীয় প্রেক্ষাপটে কলকাতা নগরীকে স্থাপিত করে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করেছি। বলেছি যে, ইংলণ্ডে যে-জীবনস্পৃহা থেকে উপন্যাস-সাহিত্যের জন্ম আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের মিত পরিসরে সে জীবনস্পৃহা ছিল সীমিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যে অ্যাভারেজ মানুষ ছিল সকলের চেয়ে আগ্রহোদ্দীপক বিষয়—ঠিক সেই ধরনের অ্যাভারেজ মানুষের সাক্ষাৎ সাধারণ ভাবে এদেশে মেলেনি। নবকালের ফলস্বরূপ যে নতুন মানুষের উদয় হল, উনিশ-শতকের মধ্য-ভাগে তাদের কর্মময় জীবনের পরিসর ছিল গণ্ডিবদ্ধ। সে জীবনের সমস্যা, সে জীবনের আশা এ সমস্তই ছিল মাঝারি ধরনের। উপনিবেশের পাকে বদ্ধ জীবনে মিলের ইউটিলিটি অথবা বেন্থামের হিতবাদ সবই তত্ত্বানুভূতি—বৃহৎ কর্মময় ভূমিকা ছিল অনুপস্থিত। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে যেটা সত্যিকারের বাসনা ছিল তা হল ইংরেজের (উনিশ-শতকীয় ইংরেজ) দেওয়া লেখা-পড়া শিখে সৎমানুষ হবার বাসনা। ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে ভিক্টোরীয় মেজাজ এই বাসনাকে একটা বিশিষ্ট রূপও হয়তো দিয়েছিল। কিন্তু এই সৎমানুষদের কর্মময় ভবিষ্যৎ কী ছিল? স্বভাবতই তেমন কিছু না। বার্ক আমাদের কাছে তখন ছিলেন উত্তেজনামূলক জনশ্রুতি। কীটসের মৃত্যু অথবা

শেলির বিদ্রোহ ছিল আমাদের কাছে কাহিনী মাত্র। আমাদের শান্ত ভদ্রম্মনার সাধনায় রাজার চেয়েও বোধ হয় শৃঙ্খলার দাবিদার ছিলেন ঈশ্বর। স্বভাবতই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোকের উদয়ে ইংলণ্ডের ইতিহাস হয়েছিল age of respectability, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে আমরা সে ভদ্র-লোকদেরই সন্ধান করেছিলাম। দুঃখের বিষয় যাদের দেখা পেলাম তারা ইংরাজি স্কুলের good boy মাত্র।

ফলে এক ধরনের টাইপ অঙ্কনে বাংলা উপন্যাস যতটা সিদ্ধকাম—নতুন কালের নতুন চরিত্র অঙ্কনে সে জাতীয় সাফল্যের স্রষ্টা হতে পারেনি। বেণীবাবু এবং বরদাবাবুর চরিত্রে এই সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে স্পষ্ট। বঙ্কিমের রোমান্সের চরিত্রগুলির বর্ণনাময়তার কথা বাদ দিলে, তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নায়কেরা অনেকে, বা রমেশবাবুর সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসের ভদ্রলোক চরিত্রা-বলা সকলেই এই সীমায়নের ফলভোগী। ঠকচাচার মতো সার্থক টাইপের সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই মেলে—স্বর্ণলতার জীবন্ত 'ঙ'-র কথা ভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আসলে যেমন বলা হয়েছে—ঠকচাচা ভাঁড়ুদত্তের বংশধর মাত্র। এ চরিত্র রূপায়ণে লেখকের সংসার-চেতনা এবং বাস্তব দৃষ্টির যদি বা সুখ্যাতি করা যায়—কল্পনাশক্তির নয়। প্যারীচাঁদ উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র বাঙালী লেখক যিনি আকাঁড়া বাস্তবকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নানামুখী সাফল্যের প্রসঙ্গেই ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র স্মরণের যোগ্য এবং বলা যায় যে উনিশ-শতকে সহসা-উদ্ভূত নগর-জীবনের অসংগঠিত পরিবেশে ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের চরিত্র প্রতিনিধিস্থানীয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ-কথা উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, যে-ব্যক্তির রূপায়ণ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রধান ব্যাপার, টাইপের মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে না। বক্রেশ্বরের হাস্যমুখী প্রবঞ্চনা এবং ঠকচাচার অন্তর্নিহিত যন্ত্রণায় প্রভেদ থাকলেও এই উভয় চরিত্রেই নবকালের নেতির দিকটাই অধিক প্রস্ফুট। মূল নায়ক মতিলালেও অনুরূপ ঘটনাই দৃশ্যমান। অবশ্যই নেতি এবং ইতির প্রশ্নই শিল্পীর কাছে একমাত্র মূল্যবান প্রশ্ন নয়। নেতির প্রতিক্রিয়াতেও শিল্পী অনেক সময় জীবনের গূঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেন ও করাতে পারেন যদি জীবনের বোধ-সংক্রান্ত সূত্রগুলিতে কোনো কৃত্রিমতা না থাকে। কিন্তু মতিলালের মধ্যে, ঠকচাচার মধ্যে বা বক্রেশ্বরের মধ্যে জীবনের যে নেতির দিক প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্যই বা কতটুকু?

নেতির দৃষ্টি শিল্পে কখনই মাত্র নেতি দৃষ্টির জন্যই মূল্যবান হতে পারে না। কার্টুন রচয়িতাকে যেমন বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন থেকে কার্টুনের অভীপ্সিত বিকৃতি রচনা করতে হয়—নেতিবাচক চরিত্রকেও শিল্পী তেমনি সাহিত্যে উপস্থাপিত করেন সুস্থ এবং পূর্ণ জীবন সম্বন্ধে নিজে অবহিত থেকে। আলালের ঘরের দুলালের ইতিবাচক চরিত্রগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মনুষ্যত্ব বলতে কী বুঝতেন সে ধারণা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান। এই চরিত্রগুলির অতি সীমাবদ্ধতার জন্যই মতিলাল, ঠকচাচা এবং বক্রেশ্বরের ফাঁকিবাজির এবং শূন্য-মনস্কতার রূপও পুঁথির পাতাকে বিশেষ অতিক্রম করতে পারেনি। ঠকচাচা ছাড়া, মতিলাল এবং বক্রেশ্বরের যা সাংসারিক সম্ভাবনা ছিল তা হল বেণী বা বরদাবাবু হয়ে ওঠা। কিন্তু বেণী বা বরদাবাবুর অতিসীমিত রূপে আমরা এমন কিছু পেলাম না যার জন্যে মতিলাল এবং বক্রেশ্বরের ব্যর্থতাকে আমাদের কাছে জীবন্ত বলে মনে হবে। ফলে উপন্যাসের গঠনগত ভারসাম্য আহত হয়েছে। কেননা বরদাবাবুদের জীবনাচরণের কোনো যন্ত্রণা নেই। নেই কোনো দ্বন্দ্ব। এমন কি এই আদর্শ জীবনাচরণের কোনো তাৎপর্যকেও লেখক উপন্যাসের রস-সূত্রে গ্রথিত করতে পারেননি। শুধু সদাচারী এবং সদালাপী চরিত্রের মডেল হয়ে উঠেছেন বরদাবাবু। রামতনু লাহিড়ী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্যক্তিবৃন্দের জীবনে বরদাবাবুর আদর্শ কল্পিত হয় না। পরবর্তীকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন-কাহিনীতে শুদ্ধতার জন্য যে জীবনব্যাপী প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তার একটা ত্রিমাত্রিক রূপ নিঃসন্দেহে বিদ্যমান। কিন্তু বরদাবাবুর চরিত্রে সে ত্রিমাত্রিকতা নেই। শিল্পবোধের এই ত্রুটি প্যারীচাঁদের জীবনবোধের ত্রুটি থেকেই উৎসারিত। বরদাবাবুর সদাচারী জীবনের নিদর্শনকে প্যারীচাঁদ এই ভাবে একস্থানে উপস্থাপিত করেছেন ;

> একজন ভদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন—আঘাতিত ব্যক্তির মস্তক দিয়া অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হইতেছে ; ঐ রক্তে উক্ত ভদ্রলোকের বস্ত্র ভাসিয়া যাইতেছে। সারজন্ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে, ও এ লোকটি কি প্রকারে জখম হইল। ভদ্রলোক বলিলেন, আমার নাম বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস—আমি এখানে কোনো কর্ম অনুরোধে আসিয়াছিলাম। দৈবাৎ এই লোক আঘাতিত হইয়াছে। এই জন্য আমি আগুলিয়া বসিয়া আছি—শীঘ্র হাঁসপাতালে যাইব তাহার উদযোগ পাইতেছি। একখানা পালকী আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু

বেহারারা ইহাকে কোনো মতে লইয়া যাইতে চাহে না, কারণ এই ব্যক্তি জেতে হাড়ি।······সারজন্ বলিল—বাবু—বাঙালীরা হাড়িকে স্পর্শ করে না, বাঙালী হইয়া তোমার এতদূর করা বড়ো সহজ কথা নহে, বোধ হয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি।

স্বভাবতই বরদাবাবুকে এখানে সংকার্যের জন্য বদ্ধপরিকর সংস্কারমুক্ত উনিশ শতকীয় চরিত্রের প্রতিনিধি রূপেই আমরা পাচ্ছি। কিন্তু উপন্যাসে যে জীবন-বোধের শিল্প-স্পর্শ ঘটলে এ চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত তা যে ঘটেনি সেটা যে-কোনো সৌখিন পাঠকের কাছেও স্পষ্ট। এর সঙ্গে গোরা উপন্যাসের প্রায় সমজাতীয় একটি ঘটনাংশ বর্ণনার প্রতি তুলনা করা চলে—

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাঁকা ফল-সবজি আণ্ডা মাখন প্রভৃতি আহার্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরাজ প্রভুর পাকশালা অভিমুখে চলিতে-ছিল। চেন পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনো মতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকা সমেত জিনিসগুলি রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে ড্যামশুয়ার বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ আল্লা বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিসগুলি নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান-মুটে ভদ্রলোক-পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু—এ আর কোনো কাজে লাগবে না।" গোরা এ কাজের অনাবশ্যকতা জানিত, এবং সে ইহাও জানিত, যাহার সাহায্য করা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব করিতেছে—বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজের বিশেষ কোনো মূল্য নাই—কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর-এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান মনে করিয়া ধর্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে, এ কথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

গোরা উপন্যাসে এই ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য। আলালের ঘরের দুলালে বরদাচরণ বিশ্বাসের আচরণে যেখানে ইংরাজি পাঠশালার ইওরোপীয়

উদারন্ত্বাবাদের মাত্র বাস্তবে অনুবাদ, উদ্ধৃত অংশে গোরার আচরণের গূঢ়ার্থ সেখানে তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ঘটনাংশেই দেখা যায় যে শিক্ষিত উদার-চেতা বাঙালী বাবু দেশবাসীর সংকীর্ণতায় পীড়িত। কিন্তু দুই প্রতিভার তারতম্য স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন অক্ষুণ্ণ থাকেই, তা হল আলালের ঘরের দুলালের বর্ণিত অংশে জীবিতকল্প সপ্রাণতা নেই, সে-ক্ষেত্রে গোরা উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশে বাস্তবিক একটি পীড়িত মানুষের স্পন্দন অনুভব করা যায় কেন? উপন্যাসের রস-সিদ্ধির গূঢ়-কৌশলের মধ্যেই তার উত্তর নিহিত। সভ্যতার যে বিশিষ্ট পর্যায়ের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, সেই বিশিষ্ট পর্যায়ের প্রধান উপাদান বা সূত্রগুলির সাহায্যেই ঔপন্যাসিক গড়ে তোলেন উপন্যাসের শিল্পরূপ। এটাই হল প্রকৃতপক্ষে জীবনকে শিল্প-বিন্যস্ত করা। যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটে সেখানে উপন্যাসে আর জীবন জীবনের মতো প্রতীয়মান হবে না। মুসলমান মুটের সংকোচ, গোরার সাহায্যের অনাবশ্যকতা-বোধ এবং সাহায্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে লজ্জা, অপর ভদ্রলোকের কৃত অন্যায় অপমানের ফলে অপমানিতের সঙ্গে নিজের একাত্মতা স্থাপনের প্রয়াস এই সকল কিছুর মধ্যে গোরা অনুভব করেছে বাবু-জীবনের সংকীর্ণ পরিধির সঙ্গে বৃহত্তর দেশ-জীবনের বিচ্ছেদের ঘন যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার রঙে গোরা হয়ে উঠেছে জীবন্ত। বরদা-প্রসাদ বাবুও সমগ্র দেশের জন্য বেদনা অনুভব করেন বটে। কিন্তু সে বেদনার লাঘব সাধনের জন্য তিনি অচিরেই খুঁজে পান সান্ত্বনার কৃত্রিম সূত্রগুলিকে। বেহারারা হাড়ির আহত দেহ বইবে না—আমাদের সমাজ জীবনের রূপ নির্ণয়ে এ ছবি যথার্থ। কিন্তু সারজেন্টের প্রশংসাপত্রে যে শিক্ষাভিমানের প্রশ্রয়—'বোধহয় তুমি বড়ো অসাধারণ ব্যক্তি', সে সান্ত্বনায় না প্রস্ফুট হয় জীবন, না প্রস্ফুট হয় শিল্প। যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন গোটা জীবনের প্রতি-ক্রিয়া উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলিতে অনুভব করানো ঔপন্যাসিকের একটা কাজ। সে পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলে শিল্পেরও ত্রুটি ঘটে। আলালের ঘরের দুলালের ভদ্রলোক চরিত্রগুলিতে এই মৌল ত্রুটি বিদ্যমান। এখানে তৎকালীন জীবনের বঙ্কিম গতির প্রতিক্রিয়াকে একান্তই ঋজুভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

সাত

কিন্তু ঠকচাচার প্রসঙ্গ পৃথকভাবে আলোচনা না করে আলালের ঘরের দুলালের কথা শেষ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ঐতি-

হাসিক ডঃ সুকুমার সেন এই মত পোষণ করেন যে, ঠকচাচার দিক থেকে বিচার করলে আলালের ঘরের দুলালকে পিকারেস্ক-জাতীয় নভেলের পর্যায়ে ফেলতে হয়। ঠকচাচা পিকারো বা Rogue-এর পর্যায়ে অবশ্যই পড়ে। কিন্তু মাত্র এই কারণেই পিকারেস্ক-উপন্যাসের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরিত হতে পারে না। প্রধানত যে ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় পিকারেস্ক নভেলের নভেলের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হিসাবে আবির্ভাব সেই সামন্ততন্ত্রী সামাজিক কাঠামোর বিপর্যয়ের সমস্ত চারিত্র্য এদেশে বিদ্যমান ছিল না। কর্নওয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থার ফলে সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারাকে কোনোক্রমে জীবিত রাখার ব্যবস্থাই বরং এদেশে হয়েছিল। ফলে সামন্ততন্ত্রের বিলয় এবং ধনতন্ত্রের উদয়ের মহা-সন্ধিক্ষণ এদেশে কখনো পরিস্ফুট হয়নি। পিকারো-র সমাজ-উপেক্ষী দুঃসাহসিক কার্যকলাপের নিদর্শনও সে কারণেই এদেশে দুর্লভ। ঠকচাচার নিরুপায় প্রবঞ্চনাশ্রয়ী জীবনে পিকারোর দুঃসাহস নেই। কাজেই ব্যঙ্গ দৃষ্টি এবং রঙ্গাত্মক ঘটনার (Satiric observation and comic episodes) কিছু ব্যবহার রয়েছে বলেই একে পিকারেস্ক নভেলের পর্যায় ফেলা যায় না।
দ্বিতীয়ত, পিকারোর চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়—He is not so much a complete individual personality whose actual life experiences are significant in themselves. কেননা Picaroর অদৃষ্টে লিখিত সমস্ত দুঃখভোগকেই পিকারো যেন মন্ত্রে জল করে দেবার ক্ষমতা রাখে।* এই চরিত্রে ব্যতিক্রম ছিল বলেই বিখ্যাত সমালোচক আয়েন ওয়াট ডিফোর 'মল ফ্লাণ্ডার্স'-এর নায়িকার কার্যকলাপে পিকারো-র তুলনা পেলেও উক্ত উপন্যাসকে পিকারেস্ক উপন্যাস বলতে স্বীকৃত হননি। ঠকচাচার ক্ষেত্রেও ঠকচাচার বেদনাকে জল করে দেবার ক্ষমতার কোনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ ঠকচাচার সংসার-বর্ণনায় ঠকচাচা এবং ঠকচাচীর কথোপকথনে যে বেদনার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তা রীতিমতো চিত্তদ্রাবী। ঠকচাচার মৃত্যুভয়, ঠকচাচীর চুড়িওয়ালী হয়ে যাওয়া প্রভৃতিতে যে কারুণ্য তা স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে বলেই ঠকচাচার ক্রিয়াকলাপে Picaro-র ছায়া খুঁজে পেলেও সে শেষ পর্যন্ত পিকারেস্ক নভেলের নায়ক নয়। ঠকচাচার

* Picaro enjoys that charmed immunity from the deeper stings of pain and death. Ian Watt.

দুঃখী জীবনের প্রগাঢ় প্রকাশের জন্যই ঠকচাচা পূর্ণাবয়ব বাস্তব আকৃতি লাভ করেছে। প্রাথমিক ব্যঙ্গের দৃষ্টি অচিরেই বিলীন হয়েছে অশ্রুর বাষ্পাবেগে। এটা পিকারেস্ক উপন্যাসের লক্ষণ নয়। প্যারীচাঁদ মিত্র ঠকচাচার চরিত্র রূপায়ণে প্রথম দিকে হয়তো কিছুটা ক্যারিকেচারের ভঙ্গি বজায় রেখেছিলেন। ডিকেন্সের ক্যারিকেচারগুলো স্মরণ করলে এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে উপন্যাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ক্যারিকেচারগুলোও সাদৃশ্য বহনের দিক থেকে প্রয়োজনীয় যাথার্থের দাবি করতে পারে। ঠকচাচা এবং বাহুল্য উনিশ শতকের সামাজিক ডামাডোলের এক কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার নিদর্শন। কলকাতা-কেন্দ্রিক নতুন বিচারালয়ের আইন ব্যবসায়গত (বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) জটিল অবস্থার অনিবার্য ফল ঠকচাচা এবং বাহুল্য। বলা যেতে পারে বাংলা দেশের নতুন কালের আইন-জগন্নাথের এরাই হল পাণ্ডা। বাহুল্যর বেপরোয়া চরিত্রের পটভূমিকায় ঠকচাচার সংসারী মানুষের কারুণ্য ঠকচাচাকে Picaro বা Rogue-এর পর্যায় থেকে পূর্ণ ব্যক্তিত্বে উন্নীত করেছে। ঠকচাচা-বাহুল্য সংবাদের শেষ দৃশ্য সে প্রসঙ্গে অনবদ্য।—

> এখানে ঠকচাচা ও বাহুল্য জাহাজে চড়িয়া সাগর পার হইয়া চলিয়াছে। দুটিতে মানিকজোড়ের মতো, এক জায়গায় বসে—এক জায়গায় খায়—এক জায়গায় শোয়, সর্বদা পরস্পরের দুঃখের কথা বলাবলি করে। ঠকচাচা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে—মোদের নসিব বড়ো বুরা—মোরা একেবারে মেটি হলুম—ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে—মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হল না—মোর বড়ো ডর তেনা বি পেল্টে সাদি করে।
>
> বাহুল্য বলিল—দোস্ত, ওসব বাত দেল থেকে তফাত করো—দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।
>
> বাতাস হু হু বহিতেছে, জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে, তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছে—দোস্ত, মোর বড়ো ডর মালুম হচ্ছে আন্দাজ হয় মোর মৌত নজদিগ।
>
> বাহুল্য বলিল—মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেম্‌দো হয়ে আছি।

চল মোর নিচু গিয়ে আল্লামির দেবাচা পড়ি। মোর বেলকুল নোকজাবান আছে যদি ডুবি তো পীরের নাম লিয়ে চেল্লাব।

বাহুল্যের তুলনায় ঠকচাচাকে এখানে অনেক ক্লান্ত বলে মনে হয়। 'যদি ডুবি তো পীরের নাম লিয়ে চেল্লাব' আর 'মোর বড়ো ডর তেনা বি পেণ্টে সাদি করে' এই দুই উক্তির পার্থক্য লক্ষণীয়। সে কারণে ঠকচাচাকে কল্পনাসিদ্ধ চরিত্র না বলা গেলেও, মিকবরের মতো তাতে বলিষ্ঠ কল্পনার আঁচড় না দেখা গেলেও, সে যে পূর্ণ-জীবন-প্রমাণ আলেখ্য, ব্যঙ্গচিত্র নয় এ-কথা অনস্বীকার্য।

আলালের ঘরের দুলালের ন্যায় গন্ধময় বাস্তবতার দ্বিতীয় নিদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একমাত্র স্বর্ণলতাতেই কথঞ্চিৎ লভ্য। স্বর্ণলতা যা পল্লী সীমায় সম্ভব করে তুলেছিল তার কথা বাদ দিলে প্যারীচাঁদের সৃষ্টিই এ-ক্ষেত্রে প্রথম প্রধান—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই গন্ধময় বাস্তবতার সীমা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখর মননে প্রথমেই ধরা পড়েছিল বলে বঙ্কিম স্বতন্ত্র ধারানুবর্তী হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা দুরূহতম বিষয় বঙ্কিম-অধ্যয়ন। সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা বারে বারে পুঁথিপ্রাণ প্রথা-পন্থী পণ্ডিতবৃন্দকে এবং মনন-শীল বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ করে। আর্নলডীয় প্রথায় সমাজ-সভ্যতার পটে বঙ্কিমকে স্থাপিত করে বিচারের প্রয়াস বা সাহিত্য মূল্যায়নের নাম করে এক ধরনের সরলীকরণের প্রচেষ্টা—বঙ্কিম প্রসঙ্গে এ সমস্তই ঘটেছে। অবশ্য বঙ্কিম কীর্তির বৈশিষ্টের সন্ধানে কিছু না কিছু আনন্দের পুরস্কার বঙ্কিম বরণের শেষে সকলেরই ভাগ্যে সুপ্রাপ্য। তবে, ন্যূনাধিক সকলেই বঙ্কিম-অধ্যয়নের দুরূহতার মূল নির্দেশ করেছেন উনিশ শতকের বাঙালী মানসের আত্ম-প্রতিষ্ঠার কঠিন কর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী ভূমিকা এবং সৃজনশীল শিল্পীস্বাতন্ত্র্যের দ্বৈত লীলায়।

এক

যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-মহিমার স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্যসীমা, তথাপি বঙ্কিমমানসের আধুনিকতার চারিত্র্য নির্ণয়েই যে সেই ব্যাখ্যাকর্মের ভূমিকা, এ-কথা স্বতঃস্বীকার্য। ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পীর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসার নিজস্ব নিয়মে সে মানসোৎকর্ষের ক্রমবিকাশ ঘটলেও দেশকালাধীন চিন্তাসূত্রগুলিকে অনুধাবন না করলে সে মানসোৎকর্ষের সঠিক ঠিকানা মেলে না। (উনবিংশ শতাব্দীতেই যেহেতু প্রথম আমাদের মনোলোক বিশ্বের চলিষ্ণু জীবনধারার সঙ্গে লগ্ন হবার সুযোগ লাভ করল, সেহেতু বঙ্কিমের দেশকালাধীন ভাব ও ভাবনার রূপ পরিচয়ে প্রায় বিশ্বপরিচয়ের আনন্দই লভ্য।) সে বিচারে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরে নতুন কালের ভাবস্পন্দন অনেক গভীরভাবে অনুভূত হলেও সেকালের ইংলণ্ডীয় শিক্ষার প্রকৃত পরিণাম কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে চাকুরি-বিমুক্ত ঋজুতা বঙ্কিমচন্দ্রে তার অভাব অবশ্যই বিদ্যমান। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাবু নন। যে কারণে

নন সম্ভবত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সে কারণেই বহু বঙ্কিম দুরবগাহ স্রোত। তথাপি বঙ্কিমমানসের উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী দর্পণে সমকালীন ইওরোপ এবং ভারতের যুগপৎ ছায়াপাত অনুসন্ধিৎসু পাঠককে জিজ্ঞাসা-চঞ্চল করে তোলে। ইওরোপ—বঙ্কিমের কাছে যার অনেকখানিই ছিল সমকালীন ইংলণ্ড—এবং ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতকীয় অবয়বে যে শক্তি এবং দৌর্বল্য, বঙ্কিমের শিল্পে এবং মননে স্বভাবতই তারও ছায়া পড়েছে। পাঠকের প্রেক্ষা-পটের সামনে গোটা বঙ্কিমচন্দ্রকে উপস্থাপিত করা সেকারণেই কঠিন। আমরা অখণ্ড বঙ্কিমমানসকে উপলব্ধির পথে অগ্রসর হবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-দৃষ্টিকে প্রথম সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব। পরে এই সূত্রকে অবলম্বন করে তৎকালীন ইংলণ্ড এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিচয় গ্রহণ করব। সমকালীন জীবনের সমস্যা সংক্রান্ত বোধগুলি কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হলে তবেই বঙ্কিমের শিল্পকর্মেরও অনন্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে ব্যবহার্য বলে আমরা মনে করি। একটি প্রবন্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। অপরটি—বঙ্গদেশের কৃষক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা শীর্ষক প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে—

> অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবৎজাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে-তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণত আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

'অনেক কাল পরাধীন থাকিব'—এ-কথাটি প্রায় তৎকালীন শাসকদের কাছে আশ্বাসবাণী-তুল্য বলে কারো কারো কাছে প্রতীয়মান হতে পারে। 'সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই'—এ উক্তিতেও সম্ভবত চাকুরিগত মধ্যবিত্ত মনের অসাহসিকতার অভিব্যক্তি অনেকে খুঁজে পাবেন। কিন্তু এ ধরনের

বহিরঙ্গ-বিশ্লেষণে বঙ্কিমমানসের সমগ্র পরিচয় মেলে না। অথচ উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার সকল বৈশিষ্ট্যের বাহন এ-কথা তখনই বোঝা যায় যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়-সূত্রটিকে যথার্থ অনুধাবন করতে পারি। 'তদ্বাসিগণ আধুনিক ভারতীয় প্রজাগণ অপেক্ষা সুখী ছিল কিনা'—এই প্রশ্নই বঙ্কিমের কাছে মুখ্য প্রশ্ন। যে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎ এবং জীবনের সকল কিছুর বিচার-সন্ধিৎসু ছিলেন, উক্তিটির মধ্যে সেই সামাজিক উপযোগিতাবাদের সাক্ষ্য স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল—'সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।' একটু উন্নতি greatest good নয়। 'বাবু দ্বারকানাথ মিত্র রামরাজ্যে জজ হইতে পারিতেন না। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে পারেন।' সম্ভবত এই ঘটনাকে স্মরণ করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'একটু উন্নতি ঘটিয়াছে' এ-কথা বলেছেন। কেননা greatest good যে ঘটেনি এ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিশ্চিত-দৃঢ়তার প্রমাণ আমরা বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে পেয়ে থাকি। ইংরাজের হাতে স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক ভারতবর্ষের রূপান্তরকে ইংরাজই যে বাধা প্রদান করেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনায় বঙ্কিম সে-মত দ্বিধাবিমুক্ত লেখনীতেই প্রকাশ করেছেন। এবং সে আলোচনাতেও স্বভাবতই সামাজিক উপযোগিতাবাদের জিজ্ঞাসু ছাত্রেরই সাক্ষাৎ মেলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনাকালে আইন শীর্ষক অধ্যায়ে বঙ্গদেশের কৃষক গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী। জমিদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্নওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোনো লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী ; কেননা এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।

এবং প্রবন্ধের উপসংহারে—

> প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই-চারিজন অতি ধনবান ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশসুদ্ধ অন্নের কাঙাল আর পাঁচ-সাতজন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভালো, না—সকলেই সুখস্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভালো ?

> দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভালো তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না।…কেহ অধিক বড়ো মানুষ না হইয়া জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্র-গর্জন-গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।
>
> আমরা দেখাইলাম যে যাঁহারা বিবেচনা করেন যে জমিদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী তাহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোনো কারণ নাই।*

পূর্বে উদ্ধৃত তিনটি অংশেই দেখা যায় যে বঙ্কিমী-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শই সক্রিয় ছিল। স্বাধীন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের প্রশ্নে বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা-বিচারে উভয়তই তিনি এই হিতবাদী বিচারদৃষ্টির ব্যবহার করেন। সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' নামক প্রবন্ধে কথিত ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের 'একটু উপকারের' স্বরূপ বঙ্গদেশের কৃষক জীবনের আলোচনায় উদ্‌ঘাটিতও করেন। সুতরাং আনন্দমঠের শিরোনামায় 'ইংরাজ দেশকে অরাজকতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে' এই উক্তির উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমমানসের কোনো যথার্থ পরিচয় নেই।

এই সামাজিক উপযোগিতাবাদের আলোকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো মানসিক অসম আচরণেরও ব্যাখ্যা সম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ-নিরোধ বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমের বক্তব্যের স্বরূপ এই—

> আমাদের বিবেচনায় বহু বিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রজাকল্যাণকামী আইন ধর্মশাস্ত্রের ঊর্ধ্বে এ-কথা একেবারে জন স্টুয়ার্ট মিলের আদর্শ ছাত্রের উক্তি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনোও মোট বক্তব্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল প্রধানত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের পদ্ধতির বিরুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্রের

* সমসাময়িক 'সমাজদর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমিদারগণ' নামক দশ-শালা বন্দোবস্তের সমর্থনসূচক প্রবন্ধের উদ্দেশে কটাক্ষ।

বক্তব্য ছিল এই যে, প্রজাহিতৈষণার কাছে আর কোনো কিছুই অধিকতর মূল্যবান নয়। মুসলমানেরা বঙ্গীয় প্রজাকুলের অর্ধেক। তাদের ধর্মশাস্ত্রের পাঁতি সংগ্রহ করে কোনো-বিদ্যাসাগরের যেহেতু অবির্ভাব হয়নি সেহেতু বহু বিবাহ হিতকর সামাজিক প্রথা হওয়া সত্বেও সে সমাজে প্রচলিত হবে না এ ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়নি। শাস্ত্র পদাঙ্ক অনুসারী সমাজ-হিতের কল্পনায় বাংলা দেশে যে সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনা তার কথা স্মরণে রেখেই বঙ্কিম এ উক্তি করেছিলেন।*

দুই

যে সামাজিক উপযোগিতাবাদের বঙ্কিম ছিলেন অভিনিবেশী ছাত্র, জন স্টুয়ার্ট মিল উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে ছিলেন তাঁর প্রধান প্রবক্তা। মিলের এই সামাজিক উপযোগিতাবাদ বা utilitarianism is a direct continuance of eighteenth-century reasonableness—অষ্টাদশ শতকীয় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবেই এই সামাজিক উপযোগিতাবাদের জন্ম। জেরেমি বেন্থাম এর কুলগুরু। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায়, বিশেষত জাতির বৈষয়িক উন্নতি সংক্রান্ত চিন্তায় এই মতবাদের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। বহুবিবাহ নিবারণ-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রজাহিতের সুদৃঢ় অভিপ্রায়কেই স্বাগতম জানিয়ে সে প্রসঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন এটা একেবারেই utilitarian method বা সামাজিক উপযোগিতাবাদী চিন্তা-প্রণালী।—

> The utilitarians alone felt that human society, like every other institution and belief, could afford to rest squarely upon a rational basis, without bringing in either Nature or God to give it firmer support. To them the question of whether any scheme of society was natural or divine was unimportant; what counted was whether it were reasonable and socially useful. They claimed that the human reason was in itself sufficiently cogent to criti-

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটি ধরে আমরা আলোচনা করেছি।

cize time-honored and ridiculous traditions in politics as in religion.

জেরেমি বেন্থামের মধ্যেই যে এই চিন্তাদর্শের সম্যক্ স্ফুরণ ঘটেছিল তাই নয়, লক্-এর চিন্তাতেও এর নিদর্শন মেলে। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্যরীতিতে লকের প্রভাব যে চিন্তাসূত্রকে অবলম্বন করে সক্রিয়—To convey knowledge of things—তার প্রেরণায় অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের প্রভাব—সামাজিক উপযোগিতাবাদ যার অন্যতম সহগামী। বঙ্কিমেরও বাংলাভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধের বক্তব্য এই আদর্শানুসরণের ফল। মনের ভাব প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অশ্লীল ব্যতীত কাহাকেও ছাড়িবে না—বঙ্কিমের এই চিন্তাতেও উপযোগিতাবাদের ছায়া। বঙ্কিমের লিখিত প্রবন্ধের গঠন-রীতিতেও এ-ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। যুক্তিমার্গের একমনা পথিক হিসাবেই যেন তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল এ-কথা না বলে শান্তি পেতেন না। প্রধানত মিলের ন্যায়শাস্ত্রই ইওরোপীয় চিন্তারাজ্যে বঙ্কিমের প্রবেশদ্বার। তাই মিলের কাল এবং কর্মের কিছু পরিচয় আমাদের প্রয়োজন।

১৮৩০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিলের কর্মকাল। ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনীতিক ইতিহাসে এ-কালে মিলের চিন্তার স্বাক্ষর স্পষ্ট। অন্যদিকে ১৮১২ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবজাত বহ্নিমান অসন্তোষের শিখাও এ-যুগেই স্পষ্ট।

There was a good deal of lawlessness in eighteenth-century England ; particular grievances, like Enclosure Bills, or dear food, or new machines, excited riots in one place or another. This kind of violence continued in the next century : the riots against the raising of prices for the Covent Garden Theatre lasted several days, and succeeded in their object ; there were savage attacks on the Irish quarter in more than one northern town ; in 1816 mobs were moving about in East Angila with banners inscribed "Bread or Blood" ; the enclosure of Otmoor provoked small farmers and labourers to a

kind of guerilla struggle… ..The Luddite rising in the Midlands and the North in 1811 and 1812, the agrarian revolt in the Southern countries in 1830, the passionate movement inspired by Owen which collected the energy and enthusiasm of the working classes throughout England fot a great constructive idea in 1833, the Chartist agitation in its several forms in the thirties and forties—all these are expressions of a spirit of which there is little trace in eighteenth-century England. (Bleak Age—J. L. & Barbara Hammond).

মিল প্রথম দিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল প্রবক্তা ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক হয়েও ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের উদ্ধৃত চিত্রকে উপলব্ধি করতে ভুল করেননি। তাঁর Political Economy-র তৃতীয় সংস্করণের এই অংশটুকু এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

They have increased the comforts of the middle classes. But they have not yet begun to effect those great changes in human destiny, which it is in their nature and in their futurity to accomplish.

ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজ শাসনের ফলস্বরূপে কিছু মধ্যবিত্তেরই বাস্তব উন্নতির আভাস দেখেছিলেন। ওদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুবক ধনতন্ত্র উনবিংশ শতকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যতই আত্মজ সংকটের চেহারাকে স্পষ্ট করে অনুভব করেছিল ইংলণ্ডের চিন্তাশীলদের চিন্তায় ততই সে সংকটের ছায়া হয়ে উঠেছিল দৃশ্যমান। লাসেফেয়ারের প্রবল ঔজ্জ্বল্য তখন চার্টিস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হতে বসেছে হত-মহিমা। মিলের চিন্তার শেষদিকে লাসে-ফেয়ার নীতিকে সীমিত করে আনার দিকে ঝোঁক। মিল বলেছিলেন যে 'মানুষের পক্ষে সেটাই হল কাম্যাবস্থা যে অবস্থায় কেউ দরিদ্র থাকবে না, কেউ অধিকতর ধনের জন্য চেষ্টিত হবে না; কারো অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় আর কাউকে আঘাত পেয়ে পিছিয়ে যেতে হবে না।'

কিন্তু লাসেফেয়ারের বেগকে সীমিতকরণের প্রস্তাবনাতেই মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত অনুসন্ধেয় নয়। যুক্তিপন্থী, নীতিশাস্ত্রবাদী ধর্মবিরোধী

মিল শেষ পর্যন্ত ধর্ম প্রসঙ্গেও যে দ্বিধাযুক্ত-মানস হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ আছে। উনিশ শতকের পশ্চিমী সভ্যতার সংকটের নানা রূপ। ইংলণ্ড কলোনির সাহায্যেও সেই সংকটের প্রধান তরঙ্গাঘাতকে প্রতিহত করতে পারেনি। এই সমাজ-সংকটের চেহারা যত গম্ভীর হয়েছে মিল প্রমুখের চিন্তাকেও তত অষ্টাদশ শতাব্দীর দৃষ্টিবিন্দু থেকে সরে যেতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Berker তাঁর সুবিখ্যাত আলোচনায় বলেছেন :

> Yet when all these allowances are made, it still remains true that Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual. He had no clear philosophy of rights, through which alone the conception of liberty attains a concrete meaning. He had no clear idea of that social whole in whose realisation the false antithesis of 'state' and individual disappears.

তিন

ধনতন্ত্রের নিজস্ব সংকটের চাপে মিলের চিন্তাগত পরিবর্তনের পাশে পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবর্তনের কথা আলোচনা করাও প্রয়োজন। স্বভাবতই ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সংকটের প্রকৃতি ইংলণ্ড থেকে মূলেস্থূলে পৃথক। বঙ্কিম সর্বত্র এ-বিষয় সমান মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করেননি। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক স্বভাবতই হবে—কেননা শিল্প-রূপান্তরের পণ্যভার তার ঘরে, হাতে তার অগাধ ক্ষমতার বশীভূত কলোনির বাজার। বঙ্কিম এটা অনুধাবন না করে সংরক্ষণকে বলেছিলেন মহাভ্রমাত্মক নীতি। শিশু শিল্পের যুক্তিকে তিনি ব্যবহার করেননি, এবং দেশজ শিল্পের বিপর্যয়ের ব্যাপারটিও তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গে তাঁর যে অখণ্ড দেশ-দৃষ্টির অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় এ ব্যাপারে সে দেশ-দৃষ্টি নিষ্ক্রিয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব অধ্যায়ে বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির যে তালিকা সমাচার দর্পণ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে তা স্মরণীয়।

অবশ্যই জাতীয় জীবনের তৎকালবর্তী অসম্পূর্ণতায় এই খণ্ডিত দেশচেতনা স্বাভাবিক। কেননা জন স্টুয়ার্ট মিল যে-উনিশ-শতকীয় ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিনিধি সে ভদ্রলোক শ্রেণী নিজ সীমার (অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায়

স্তিমিত হলেও) মধ্যেও একটা কর্মময় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জাতীয় জীবনের নানা তরঙ্গ ভঙ্গে, তার স্বাধীন রাজনীতি, ব্রিটিশ লিবারেলদের আবির্ভাব প্রভৃতির ফলে ইংলণ্ডের পাবলিক্ লাইফ তখনও কর্মচঞ্চল। সাম্রাজ্যের ভোগ মন্থর প্রশান্তি তখনও শোণিতে আলস্যের স্রোতহীনতাকে ডেকে আনেনি। এই ভদ্রলোক শ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বাঙালী ভদ্রলোকদের চরিত্রগত পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। সর্ববিধ শুভ প্রচেষ্টা ও সংকল্প সত্ত্বেও বাঙালী ভদ্রলোকের জীবন ছিল মিত-পরিসর, কর্মচাঞ্চল্যহীন। জীবনের অন্দরে ছিল ভূমিজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সকল জট, এবং বাইরে স্কুলে কলেজে আপিসে আদালতে অপরের প্রয়োজনের দাসত্ব ; ইংলণ্ডের পাবলিক লাইফের বিকল্পে স্কুল মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিকে ঘিরে চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট। স্বভাবতই এই জীবনের ব্যর্থতা এবং ক্লান্তি সচেতন এবং সতর্ক মনে প্রতিক্রিয়া এনে দেবে। এবং সে প্রতিক্রিয়া ইংলণ্ডের শিল্প-রূপান্তরের ফলে ধনতন্ত্রের সংকটে বুদ্ধিজীবী মহলের যে প্রতিক্রিয়া তার থেকে পৃথক। ইংলণ্ডে অনুভূত হয়েছিল সত্যিকার সংকট—এখানে, উপনিবেশে ছিল সংকটের অপচ্ছায়া।

জিজ্ঞাসু বঙ্কিমের সম্মুখে বাংলার নতুন কালের এই গ্রন্থিল জটিলতা ছিল একটা দুরূহ গণিতের মতো। এর সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন তিনি অনুশীলন ধর্মে। বেন্থামী হিতবাদ থেকে মিলের অন্তিম প্রত্যয়গুলি যত দূর সেখান থেকে অনুশীলনের আদর্শ তদপেক্ষা আরো দূরে। বঙ্কিম অনুশীলনাদর্শ প্রচারকালে বলেছেন যে, "হিতবাদকে আমি যেখানে স্থান দিলাম তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।" হিতবাদ ধর্মতত্ত্বেরই সামান্য অংশ মাত্র। আমাদেরও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ন্যায় ধর্মতত্ত্বে আপত্তি সম্মতির প্রশ্ন নেই। আমাদের ধারণায় বঙ্কিমের বক্তব্যের অসঙ্গতি অন্যত্র। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব মানুষের ধর্মের তত্ত্ব। এ ধর্মের লক্ষ্য মনুষ্যত্ব অর্জন। মোক্ষ, অমৃত, অথবা পুণ্য প্রভৃতিকে লক্ষ্যে না ব্যবহার করে বঙ্কিম তদপেক্ষা অনেক বাস্তব (concrete) ব্যাপারকে লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এবং মনুষ্যত্বেরও সংজ্ঞা স্থির করেছেন স্পষ্ট ভাষায়—"যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।" বলা বাহুল্য এই মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যক্তির সাধনা। তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র এটা বুঝেছিলেন যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মিল কথিত লিবার্টির সূত্র এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

ইলবার্ট বিলের পূর্বেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এখানে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিক বৈপরীত্য বিদ্যমান। এখানে লিবার্টির প্রশ্ন অক্ষমের শশবিষাণ কল্পনা। অথচ ব্যক্তির বিকাশ যে "সংকীর্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজের"* হাতে, তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সম্ভব নয় এ তত্ত্বও বঙ্কিমের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। এদিকে দিনে দিনে উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপের সংকট, জাতীয়তাবাদের আতিশয্যের চেহারাও তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় চিন্তার সংকট থেকে ত্রাণ-পন্থা হিসাবে কল্পিত হয়েছে অনুশীলন ধর্ম। স্মরণ রাখা দরকার সকল প্রকার ব্যাপক কর্মময়তা থেকে বঞ্চিত বাঙালী মধ্যবিত্তের তখনকার অসহায়তার কথা। তৎকালীন এদেশী মধ্যবিত্ত যেন একটা অদ্ভুত ইঞ্জিন—শিক্ষালব্ধ সকল বাষ্পাবেগ সংগ্রহ করা হয়েছে. শুধু ছুটে চলবার চাকা ক-খানা তাদের ছিল না। অনুশীলনতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো তারই সন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু দেখতে পেলেন না যে, রাষ্ট্র এবং সমাজের সহযোগে, কখনো বা টানাপোড়েনে ব্যক্তি,. থেকে থেকে বিভিন্ন রূপ ধরে। সে প্রশ্নে অসহায় থেকে বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্যের সাধক ব্যক্তির কল্পনায় বঙ্কিমের মননের অনেকখানি ব্যয়িত হয়েছে এবং মূল সমস্যা থেকে গেছে অস্পষ্ট। উনিশের শতকে বাংলা দেশে—ব্যক্তির এবং পরিবারের জীবনের ছকে এবং তার সামাজিক কর্মের প্যাটার্নে যে ব্যবধান, ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুখস্থ করা কথা এবং বাস্তবে মধ্যযুগীয় সংস্কারের অনুসরণে যে পার্থক্য এবং ফাঁকি প্রকৃত পক্ষে সেটাই ছিল এদেশের তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো অসামঞ্জস্য। এই অসামঞ্জস্যকে কেমন করে দূর করা যাবে সেটা এক-শ বছরের আগেরও সমস্যা এবং আজকেরও সমস্যা। 'প্রীতি সর্বব্যাপিনী প্রীতি ঈশ্বর' বলে সমাজের আপামর সকলের সঙ্গে অখণ্ড সম্পর্ক রচনা করা যায় না। সামাজিক সম্পর্কগুলি কোনো মনোভাবের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাদের জন্য অধিকতর বাস্তব ভূমিভিত্তি প্রয়োজন। এ-দেশে সে ভূমিভিত্তি নষ্ট হয়েছে দু-কারণে।* এক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দুই, কলকাতার অসম গঠনের ফলে অনাগরিক বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভব। যাদের গ্রাম-সম্পর্কে স্থাপন করলে মনে হবে পরজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, যাদের কলকাতার আলোকে আনলে অদ্ভুত

* বঙ্কিমচন্দ্রেরই উক্তি।

* নষ্ট যে হয়েছে সে কথা বঙ্কিমও জানতেন। 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই'—তারই উক্তি।

আলাপনে মনে হবে ইওরোপীয় ভাবাদর্শের সন্তান। ফলে সমাজের বৃহত্তর জনজীবন সম্বন্ধে এ'রা হয়ে উঠেছেন নির্বিকার। আর যাঁরা গ্রামীণ অর্থ-নীতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তাঁরা সুবিশাল কৃষিবাংলার পঙ্গু চেহারার কথা অবলীলায় ভুলে গিয়ে কলকাতার মুক্তিকে মনে করেছেন জীবনের মুক্তি। গোটা সমাজ জীবনের এই অসংগঠিত অসম্পূর্ণ বিন্যাসের ছায়া ছিল ব্যক্তির জীবনে। একে দূর করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম অনুশীলনা-দর্শের সাহায্যে। বঙ্কিমের কালের ইংলণ্ডের আকাশে তখন একই আবহাওয়ার ইঙ্গিত ভাসমান।

Craving adjustment amid the peril of change, representative victorians at least until the seventies, sought either in the radiance of God or in the dim consciousness of man some spiritual absolute by which to interpret and control their material advance; whatever misdirections they may frequently have followed their impulse was in essence deeply religious. Victorian Temper (J. H. Buculy).

এই উক্তির সঙ্গে টি-এস এলিয়টের Arnold and Peter নামক প্রবন্ধের শেষ প্যারা প্রায় মিলিয়ে পাঠ করা যেতে পারে। এলিয়ট সাহেবও এই শতাব্দীর প্রচেষ্টাকে Imperfect Synthesis-এর প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।

চার

অবশ্যই শিল্পী বঙ্কিমকে সন্ধান করতে হবে উনবিংশ শতকের পটভূমিকায়। সেই হেতু উনিশ শতকের স্বদেশ ও জগৎ তাঁর চিন্তাকে কী ভাবে স্পর্শ করেছিল সে-কথা না জানলে তাঁর শিল্পী হিসাবে যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। আমরা সে কারণে এতক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার একটি রেখাসীমা অঙ্কন করার চেষ্টা করলাম। এইবার তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের সৃজনী সমগ্রতার পরিচয় খোঁজা যাবে। দেখা যাবে যে synthesis-এর যে প্রয়াসে তাঁর মননশীলতা আমরণ নিয়োজিত ছিল শিল্পীরূপেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সমগ্র বঙ্কিমী উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ তিনটি—

(ক) বিষয়বস্তু বা theme-এর গুরুত্বের বা অসাধারণত্বের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রবণতা।

(খ) উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা।

(গ) মননশীলতাজনিত সুসমতার প্রয়াস।

ন্যূনাধিক পরিমাণে দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত সমুদয় উপন্যাসের পরস্পরের তারতম্য ও পার্থক্যের কথা স্বীকার করেও সাধারণ লক্ষণ হিসাবে ওপরের তিনটি সূত্রের কথা বলা চলে। এখন এই তিনটি সূত্রের বিষয়ে পৃথক আলোচনা করা যাক।

Rajmohon's Wife ইংরাজিতে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের ব্যর্থতার কারণ সাধারণত সন্ধান করা হয় ইংরাজি মাধ্যমের ভিতরে। কিন্তু সেটা প্রধানত বহিরঙ্গ-ব্যর্থতা। Rajmohon's Wife একান্তই গদ্য-জাতীয় রচনা। ঘটনাধারাও গদ্যগত। ঔপন্যাসিকের মানস-দৃষ্টিতে কিছুটা ব্যঙ্গবোধ যেন ক্রীয়াশীল। এই গদ্যগত-প্রাণতা কখনই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বক্ষেত্র নয়। আমরা বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন শীর্ষক অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে বলেছি যে গদ্যময় বাস্তবতাকে উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত করার প্রয়াসে আলালের ঘরের দুলাল উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে প্রায় একক। এই গদ্যময় বাস্তবতাকে বঙ্কিম Rajmohon's Wife-এ একবার এবং ইন্দিরাতে দ্বিতীয়বার ধারণ করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন। কিন্তু গদ্যময় বাস্তবতা বঙ্কিমের কল্পনার স্বভাবকে আকৃষ্ট করেনি। গদ্যময় বাস্তবতা একটি জাতির কর্মময় যুগের যথার্থ দর্পণ হতে পারে। কর্মশীল কোনো সামাজিক শ্রেণী, নতুন মানুষ বা জাতীয় জীবনের নতুন বিকাশের কালে Formal realism অবশ্যই একটা তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পধর্ম। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের নববিকাশের কালে ডিফো, রিচার্ডসন এই ধারার জনক। আমাদের জীবনে এই নববিকাশের কাল বলে যাকে আমরা মনে করি তার ফাঁকি যে বঙ্কিমের কাছে প্রথমাবধিই ধরা পড়েছিল সে-কথা আমরা বলেছি। তাই সেখানে প্রাত্যহিকে নেই কোনো মুক্তির আকাশ, কোনো বাস্তব কর্মের প্রচণ্ড আবেগ সেখানে গদ্যময় বাস্তব মনোভঙ্গি কি কাজে লাগবে? তাই, এই বন্ধ্যা জীবনের সীমাবদ্ধতাকে বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি অ্যাভারেজ ঘটনাকে বা কাহিনীকে পরিহার করেছেন। আলালের ঘরের দুলাল অপেক্ষা দুর্গেশনন্দিনীর লেখকের কল্পনার উচ্চচূড়াবিহারী রূপ দেখে যাঁরা ছন্দিত ভাষায় তারিফ করে সমালোচনার দায়িত্ব শেষ করেছিলেন তাঁরা বঙ্কিমী কল্পনার এই নিজস্ব গতির অন্তর্নিহিত কারণকে উপলব্ধি করেন

নি। অ্যাভারেজ কাহিনীকে সদা সর্বদা পরিহার করেছেন বঙ্কিম, আর করেছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত চরিত্রকে পরিহার। প্রাচীন দুর্গ, যুদ্ধ বিগ্রহ, নদী বা সমুদ্রের বিজন গাম্ভীর্য উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে রাজপ্রাসাদ বা সুরম্য জমিদার-ভবন, বিচিত্র উদ্যান প্রভৃতি। লক্ষণীয় যে, এই কারণেই রজনী এবং ইন্দিরার ঘটনা ছাড়া প্রায় কোনো কাহিনীর ঘটনাস্থল কলকাতায় কল্পিত হয়নি। সমসাময়িক যে সব ঘটনা তাঁর উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে তার সবই মফস্বল বাংলার পটভূমিকায় রচিত। সমকালীন কলকাতাই জীবনের ঘূর্ণিপাককে বঙ্কিম উপন্যাসে প্রায়ই এড়িয়ে চলেছেন। অবসর-শিথিল, জীবিকা-যন্ত্রণা-শূন্য গ্রামীণ বড়োলোকেরাই তাঁর সমকালাশ্রয়ী উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। এই জীবনধারার বিন্যাস থেকে উদ্ভুত সমস্যা বঙ্কিমের উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বভাবতই এ অবস্থায় রোমান্স এবং রোমান্টিকতাই বঙ্কিমের শিল্পধর্মের পরিপোষক হয়ে উঠবে এটা প্রত্যাশিত। রোমান্সের প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বঙ্কিমের সৃজিত রোমান্সগুলি সম্বন্ধে আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় সশ্রদ্ধ। অথচ দুর্গেশনন্দিনী এবং মৃণালিনী ব্যতীত বঙ্কিমের খাঁটি রোমান্স আর একখানিও নেই। রোমান্সের উপাদান হয়তো কপালকুণ্ডলা থেকে শুরু করে সীতারাম পর্যন্ত সর্বত্রই উপস্থিত, কিন্তু অমিশ্র রোমান্স রচনায় কখনও বঙ্কিম-মানস শিল্পীর তৃপ্তি পেতে পারত না—সে কথা বঙ্কিমমানসের রেখাসীমা আলোচনাতে স্পষ্ট। দুর্গেশনন্দিনীর—বঙ্কিমের শিল্পজীবনের ইতিহাস-প্রসঙ্গ বাদ দিলে—অন্য তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। মৃণালিনী সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন কাহিনী। রোমান্সের সঙ্গে রোমান্টিকতার কোনো বিরোধ অবশ্যই নেই। রোমান্সের আকাশবাতাস এবং পরিমণ্ডল রোমান্টিক কল্পনাকে আকৃষ্ট করে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে রোমান্স এবং রোমান্টিকতা এক কথা নয়। রোমান্টিকতা তার নিজস্ব কল্পনাগামী পদ্ধতিতে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে কাজ করে থাকে, রিয়ালিজমের ধারকেরাও তাদের ন্যায় শৃঙ্খলার সাহায্যে সেই কাজই করে—তা হল চেতনার বিস্তৃতিসাধন। রোমান্সের ক্ষেত্রে এই চেতনার বিস্তৃতিসাধনের জটিলতা পরিহৃত হয়ে থাকে। বঙ্কিম প্রধানত রোমান্টিক। এখানে পুনরায় ঊনবিংশ শতকীয় utilitarianism-এর প্রসঙ্গ উত্থাপনযোগ্য। এ-কথা আমরা বলেছি যে উক্ত utilitarianism অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের—(এর ভাবগুরু জেরেমি বেন্থাম যার পূর্ণ বিগ্রহ)—

প্রত্যক্ষ ধারাবাহী। নৈয়ায়িক মিল তাঁর নৈয়ায়িক পদ্ধতির জন্য বিশ্রুত। ঐ শতাব্দীর ভাবমণ্ডলও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়।*

Beauty is ultimately irrational and basically beyond intellectual perceptlon—এই হল রোমান্টিকদের বিষয়ে ভিক্টোরীয় প্রতিক্রিয়ার সাধারণ সূত্র। রাস্কিনের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়:

Romantic art, he suggested, lacked, the authoaity of classic att. Since the classic writer set down only what was "known to be true" while the romantic expressed himself "under the impulse of passion" which might or might not lead to new truths. মিলের যুগ অবশ্যই impulse of passion-কে প্রশ্রয় দেবে না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার—ভিক্টোরীয় যুগের এই সাহিত্য-রুচির পরিবর্তন একমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি যাঁর তিনি হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

কিন্তু প্রশ্ন হবে বঙ্কিম উনবিংশ শতকীয় ইংলণ্ডীয় আবহাওয়ায় নিজ সাহিত্য রুচিকে গঠিত করেও উপন্যাসের মেজাজে রোমান্টিকতাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন—বিশেষত তখন যখন ইংলণ্ডের উপন্যাস-রাজ্যে ডিকেন্স অন্যতম শক্তিধর, যিনি উপন্যাসে আবেগময় প্রকৃতিকে গৌণে রেখে মুখ্য করেছেন বাস্তবালেখ্যকে—বারে বারে আক্রমণ করেছেন উপযোগিতাবাদকে। ডিকেন্স যেখানে লণ্ডন শহরকে উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহারে করতে সদাই সচেষ্ট ছিলেন বঙ্কিম সেখানে রজনী এবং ইন্দিরা ছাড়া কলকাতাকে পরিহার করেছেন। কাজেই ডিকেন্সের Hard times-এর পরিণতি বঙ্কিমে আসেনি।†

অথচ হিতবাদী বঙ্কিম বেন্থামকেও সর্বাংশে স্বীকার করে নিতে পারেননি। বেন্থাম মানুষের চিরস্থায়ী মানসিক অভিপ্রায়ের বিশ্লেষণে সৌন্দর্য প্রেমকে সে মানসিক-অভিপ্রায়ের অন্যতম অঙ্গ বলে স্বীকার করেননি। মিল তার আত্ম-

* The Anti-Romantics শীর্ষক অধ্যায় (Victorian Temper নামক গ্রন্থে) দ্রষ্টব্য।

† Especially Hard times shoull be studied with close and earnest care by persons interested in social questions.—*Ruskin.*

জীবনীতে এর ক্ষতিকারক প্রভাবের কথা বলেছেন। বলেছেন যে, আশৈশব অনুভূতি-নিরপেক্ষ বুদ্ধিতপ্ত শিখায় শেষ পর্যন্ত তাঁর স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে পরিশেষে তিনি খুঁজে পান শান্তি এবং নিরাময়। পরিহাসের সুযোগ নিলে বলা যায় যে মিল হয়তো এইভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইউটিলিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুশীলনা-দর্শের আলোচনায় দেখা যায় যে, তিনি সৌন্দর্যপ্রেম এবং সৌন্দর্যাস্বাদনকে মানবিক বৃত্তিসমূহের অন্যতম বলে মনে করেন। এবং উপযোগিতাবাদীর মতোই মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এদেরও ভূমিকার প্রয়োজনকে মানেন। যদি সৌন্দর্য-রচনা করার ক্ষমতা থাকে তাহলে লেখনী ধারণের সার্থকতা আছে —বাংলার নব্য লেখকের প্রতি বঙ্কিমের উপদেশ বাণীতে সৌন্দর্য-রচনাকে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে এই কারণেই।

তথাপি, এর মধ্যে বঙ্কিমের রোমান্টিকতার হেতু নিহিত হয়ে নেই। এ শুধু তাঁর রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা। হেতু সন্ধানের জন্য পুনরায় আমাদের কালমুখাপেক্ষী হতে হবে। তবেই বঙ্কিমের অসাধারণ বিষয়বস্তুর তাৎপর্যও স্পষ্ট হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বঙ্কিমের কালে রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যের ইংলণ্ডীয় ভাবপুরুষ ছিলেন বায়রন (এবং স্কট, মূর প্রমুখেরা)। বায়রনের বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি, ওজস্বিতা ইংলণ্ডে রোমান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়ার যুগেও এক শ্রেণীর পাঠক-জনতাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। কীট্‌স্ এবং শেলীর সৌন্দর্য-পিপাসা অপেক্ষা বায়রন নব্য বঙ্গীয় কবিবৃন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন অধিক। তার কারণ কেবল অতীত-প্রীতিসম্পন্ন দেশাত্মবোধক কাব্য-প্রয়াসের মধ্যেই অনুসন্ধেয় নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকেই বাঙালী কবিরা বিশেষ এ-যুগে রীতিমতো পাবলিক-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এই পাঠক-মণ্ডলী সম্বন্ধে সচেতনতা রোমান্টিক কবি-বৃন্দের মধ্যে প্রধানত বায়রনেরই ছিল। তাই, কল্পনার সূক্ষ্ম কম্পন অপেক্ষা তার উচ্ছ্বাসময় বাঁধনহারা লীলাকে শ্রাব্য করে তোলাই যখন বাংলা কাব্যের লক্ষ্য ছিল তখন যে বায়রনকেই ছায়া রূপে বারে বারে কবিকল্পনায় দেখা যাবে এটা আশ্চর্য নয়। বিশেষ লক্ষণীয় যে বাংলা সাহিত্যে বায়রনের এই প্রতিষ্ঠার কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থে ছিল বঙ্কিমের আসক্তি এবং অনুরুক্তি দুইই।

এই ব্যাপারে কেবল বঙ্কিমের সাহিত্যরুচির অনন্যতাই সূচিত হচ্ছে না, যে-

কারণে বঙ্কিম সাধারণত নগর-জীবনকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেননি সেই কারণটির প্রকৃত রূপও হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে! নগর-জীবনাপেক্ষা শান্ত প্রকৃতি, উদ্বেল কল্লোজ্জ্বল নদীবক্ষ, খদ্যোত সমাকুল ঘোর নিশীথিনী, ফুল, গাছ, পাখি বঙ্কিমের কল্পনায় সাড়া তুলেছে অনেক বেশি। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে মানব জীবনের ওপরে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবকে বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যথার্থ রোমান্টিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন। এবং উপলব্ধি করেন মানুষের জীবনের ব্যাখ্যার অগম্যতাকে। কপালকুণ্ডলায় এবং মনোরমায় জীবনের সেই রহস্যের সাক্ষাৎ মেলে। মনোরমাকে দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয় রূপে চিত্রিত করার মধ্যেও সেই রোমান্টিক বঙ্কিমেরই পরিচয়। সৌন্দর্য যে বিচারাতীত, প্রকৃষ্ট অনুভূতিতে তার স্থিতি, এই চরিত্র দুটি তার প্রমাণ। কিন্তু এহ বাহ্য। শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের বিষয়বস্তু কি এক অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে আত্মার হাহাকার নয়? আমাদের প্রার্থনা এবং প্রাপ্তির মধ্যে, বাসনা এবং চরিতার্থতার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান বঙ্কিমের কল্পনাকে তা বারে বারেই স্পর্শ করেছে। বঙ্কিমের সমস্ত নায়ক চরিত্রের বেদনার ও যন্ত্রণার উৎসে এই কল্পনাই বিদ্যমান। প্রতাপের মৃত্যু, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস, নবকুমারের আত্মবিসর্জন, সীতারামের সমাপ্তি এই সকল কিছুর মূলে সেই সত্য ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের ইঙ্গিত যথার্থ। তিনি বলেছেন যে, বঙ্কিম কখনও মানুষকে ছোট করে দেখেননি। স্বভাবতই সে কারণেই মানুষের আকাঙ্ক্ষাকেও তিনি কখনো ছোট করে দেখেননি। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যে গুরুত্ব বা অসাধারণত্ব তার মূল এই রোমান্টিকতার মধ্যে। ডিকেন্সের মতো ছোট মানুষের জীবনের নাট্যিকরণে (dramatising the foibles and vitality of little men) তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর পক্ষে এটা সম্ভবও ছিল না। অন্য প্রসঙ্গে আমরা 'উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য' নামক অধ্যায়ে এ-কথা আলোচনা করেছি যে উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে কদাচ বাইরে থেকে বিচার করা চলে না। উপন্যাসের বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবন চেতনা, অথবা সমাজ-সভ্যতা সম্বন্ধে চেতনার নামান্তর। একটা উপন্যাসের বিষয়বস্তু অসাধারণ কিংবা সাধারণ এ-কথা বললে বস্তুত কিছুই বলা হল না। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যে জীবন-চেতনার রূপায়ণ ঘটান সেটাই এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি বিষয়কে কদাচ সরলীকরণের

ভিতরে নিয়ে যেতে চাননি। তাঁর সমস্ত উপন্যাসের সমস্যার মূলে রয়েছে নায়ক বা নায়িকার অনুশোচনার বোধ। এই অনুশোচনার হেতু অবশ্যই পাপ চেতনায়। এই পাপ চেতনার ফলে সঞ্জাত অনুশোচনা ব্যতিরেকে বঙ্কিম মানুষের যন্ত্রণাকে অন্য কোনো ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিম নিজকালের জীবনের সমস্যাকে অনুভব করেছিলেন এইভাবে: আমাদের প্রাচীন সমাজের এবং সংসারের যেটা আচরণ-বিধি বা ধর্ম তার ব্যত্যয়ে ব্যক্তির জীবনে আসে পাপযন্ত্রণা। এই পাপবোধ বাইরের ঘটনার উদ্দীপন লাভ করলেও একান্ত-ভাবেই মন্ময় বা subjective। কপালকুণ্ডলা বাস্তবিক কোনো পাপাচরণ করেনি। সে মনে করেছিল যে বিধিলিপি লঙ্ঘন করে পাপ করেছে। গোবিন্দলাল আইনের সাজাকে যথারীতি সম্পত্তিবান ঘরের ছেলের মতো ফাঁকি দিয়েছে বটে কিন্তু নিজের অন্তরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কুন্দনন্দিনী প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপই করেনি। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত ব্যাপার। কিন্তু সে কারণে কুন্দ পাপ বোধের প্রতিক্রিয়াকে পরিহার করতে পারেনি। সীতারামের প্রসঙ্গেও তাই। প্রতাপের প্রসঙ্গেও তাই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার ভূমিকায় সুখ এবং কল্যাণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল সুখ-সন্ধানী মানুষ যখন সুখস্পৃহার মূলে কল্যাণকে বিসর্জন দেয় তখনই যন্ত্রণারম্ভ। কিন্তু সেই কল্যাণবোধের সামাজিক ভিত্তি কোথায়? স্বভাবতই বঙ্কিমের উত্তর ছিল ধর্মাচরণের মধ্যে। সামাজিক এবং পারিবারিক আচরণ-বিধির মধ্যেই হিন্দু সমাজের কল্যাণবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে। আইন এই ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করতে অথবা স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু কল্যাণবোধের অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে। অথচ বাসনার নিধান প্রবৃত্তিতে। সেক্ষেত্রে এই অবস্থার মধ্যে যে সম্ভাবনা বঙ্কিম তাকেই ব্যবহার করেছেন তাঁর বিষয়রূপে। মানুষের আত্যন্তিক দুঃখের সঙ্গে তার মনোলোকের আলোড়নের একটা সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। যে অবস্থাতেই হোক না কেন জীবনের স্থিতাবস্থা যখন ব্যাহত হয়, খণ্ডীভূত হয় জীবনের ধ্রুব রূপ, তখনই মানুষের কল্পনালোকে শুরু হয় ব্যাপক আলোড়ন। তখনই সে সান্ত্বনা খোঁজে অন্তরে, সাড়া পেতে চায় প্রকৃতিতে। এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নৈতিক সমস্যা। বঙ্কিমের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই গূঢ় সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল। এই বীজকে সফল করার তাগিদে বঙ্কিম অ্যাভারেজ মানুষকে বাদ দিয়েছেন নায়ক মণ্ডলী থেকে।

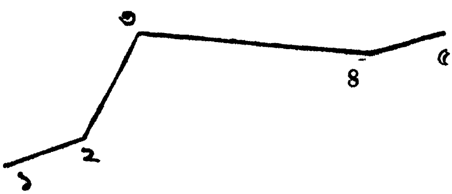
পাঁচ

এই আলোকেই বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচ্য। আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণে নির্দেশ করেছি—উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান রীতিতে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা। পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়ের মধ্যেই এই দ্বিতীয় লক্ষণের বীজ নিহিত। আমরা একবার ডিকেন্সের সঙ্গে সামান্য প্রতিতুলনায় এ-কথা বলেছি যে সাধারণ মানুষের জীবনের অন্তর্গত নাট্য সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা এবং ব্যবহার করা ডিকেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমও বাঙালী জীবনের অন্তর্নিহিত নাটকীয় গুণকে ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম সাধারণ মানুষকে বিষয়ীভূত করতে অবশ্যই ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু "ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র" বঙ্কিমের নায়কেরা যে জীবন যন্ত্রণাকে ভোগ করতে পারত বঙ্কিম তাঁকে বিষয়ীভূত করেছেন।

বঙ্কিমের প্রধান শিল্পসৃষ্টিগুলিতে নাট্যরস প্রচুরভাবে বিদ্যমান। সে নাট্যরস মাঝে মাঝে যে অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়নি তাও নয়। এই নাট্যরস প্রবণতার জন্যই বঙ্কিমের উপন্যাসের খণ্ড-পরিকল্পনা, পরিচ্ছেদ-বিভাগ, ঘটনা-গতি সমস্তই নাট্যানুগ পরিকল্পনায় বিধৃত। বঙ্কিমের ক্লাসিক-শুদ্ধ মন এই নাট্যানুগামিতার জনক মাত্র এই কথা বললে সমস্তটার ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের চরিত্রের মধ্যে আমাদের অদৃষ্টের বীজ নিহিত থাকে। কেমনভাবে এবং কী করে বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে এসে সেই বীজ পরিশেষে মহীরুহে পরিণত হয় ঘটনা-সংস্থানের ন্যায়-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বঙ্কিম সে কথাটিই স্পষ্ট করে তুলতে চান। কাজেই বঙ্কিমের কাছে ঘটনা-সংস্থানের একটা নিজস্ব অর্থ আছে। একটা পূর্ব-স্থিত জীবনের প্যাটার্নে বহিঃনিক্ষিপ্ত উপাদান—ব্যক্তিই হোক বা ঘটনাই হোক—একটা বিপর্যয় বা সংকটের ভূমিকা রচনা করে। এই initial incident বা প্রাথমিক ঘটনাই ধীরে ধীরে rising action এবং climax-এর দিকে ঘটনা-প্রবাহকে নিয়ে যায়। বঙ্কিমের উপন্যাস-রীতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাট্যকারের সংক্ষিপ্তিবোধ। বিষবৃক্ষের বৃহদায়তনের মধ্যে কিছু পরিমাণ এই সংযম বিনষ্ট হয়েছে তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উপন্যাসের শেষে denouement-এর সুযোগে শেক্সপীয়রীয় রীতিতে ট্র্যাজেডির গম্ভীর ঘনঘটার পর সুসমতা আনয়নের প্রয়াসের

লক্ষণেও নাট্যরীতির, বিশেষ শেক্‌সপীয়রের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতাপের মৃত্যু দৃশ্য অথবা কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিশিষ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমী উপন্যাসের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা নিজস্ব তাৎপর্যে বিশিষ্ট। কেননা বঙ্কিমের এই উপন্যাসের গঠন-রীতি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা বস্তুত বঙ্কিমের জীবনদর্শন থেকেই উদ্ভূত। আমাদের জীবন-ধর্মাচরণের ব্যত্যয়ে যে সংঘাত বা দ্বন্দ্ব উনিশের শতকের মধ্যভাগে সূচিত হয়েছিল—যে দ্বন্দ্বের মূল নিঃসন্দেহেই নবকালের উপাদানগুলির মধ্যে—যে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে হিতবাদী, অনুশীলনাদর্শী বঙ্কিমের নিজস্ব ধারণাই তাঁর মানসদৃষ্টি—সেই দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে নাট্য-প্রবণতার উৎস। লক্ষণীয় যে সমকালাশ্রয়ী যে দুটি রচনায় বঙ্কিম নাট্যানু-গামিতা পরিহার করেছেন, রজনী এবং ইন্দিরা—সেখানে বঙ্কিমের এই বিশিষ্ট জীবন সমস্যারও সম্যক্ ব্যবহার ঘটেনি। কলকাতার তৎকালীন জীবনের মধ্যে আমাদের জীবন-নিহিত দ্বন্দ্ব এক ধরনের বাবু-জীবনের সরলীকরণ লাভ করেছিল। শ্রীশ-কমলমণির সংসার যাত্রার মতোই তা ছিল বর্ণবিরল, আত্মমুখী। কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের এই সীমিত পরিসরকে বঙ্কিম নিজ ন্যায় অনুসারে চিনতেন বলেই রজনীর আঙ্গিক-রীতিতে ওই জাতীয় আত্মকথনের রীতি অনুসরণ করেছেন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মতো রজনীতে সেই বিখ্যাত কারণ পরম্পরায় গ্রথিত ঘটনাধারার সাক্ষাৎ মেলে না। অমরনাথের উপস্থাপনা এবং উপসংহার যে পরিমাণে কাব্যময় সে পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ নয়। লবঙ্গলতাদের বাড়ি উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থলী। রজনীর মির্জাপুরের খাপরার ঘরের পরিবর্তে এই স্থানে ঘটনা-কল্পনায় কোনো আপত্তিই থাকত না যদি লবঙ্গলতার সংসারের নিজস্ব ছন্দটিও বিকশিত হত। 'রজনীর' আত্মকথনে সকলেই নিজের কথা বলেছে বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়ে সকলে পরিস্ফুট হয়নি। আরো বলা চলে যে রজনীর গল্প কলকাতায় ঘটেছে শুধু নামে। কলকাতা—এই শব্দটির এই উপন্যাসে কোনো অর্থ নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের অসংলগ্নতায় এবং অসমবিকাশে কলকাতা শুধু বিত্তশালীর সৌখিন আশ্রয় হয়েই সাধারণ মানুষের কাছে রইল। সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনের ছন্দে কোনো পরিবর্তন এল না। কলকাতায় তৎকালীন গ্রামীণ জীবনের সংঘাত ছিল না, নগর-জীবনের প্রচণ্ড গতিশীলতাও ছিল না। এই নিরাবেগ জীবনে বঙ্কিমের ঈপ্সিত নাটকও নেই, ওদিকে গঠন-রীতির নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাও নেই। রজনীর আঙ্গিক-রীতির মূল ব্যাখ্যা এইখানে।

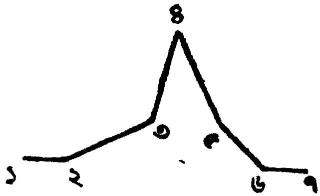
গঠন-রীতির এই নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বঙ্কিমের ক্লাসিক-শুদ্ধ মনের প্রসাদে পুষ্ট। বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের সর্বত্রই এই শৃঙ্খলার পরিচয় মেলে। কপালকুণ্ডলা কৃষ্ণকান্তের উইল এবং শেষদিকে রাজসিংহ এ-প্রসঙ্গে সর্বোত্তম নিদর্শন। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের সমগ্র গঠন-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উপন্যাসটিকে বঙ্কিম দুটি খণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রথম খণ্ডে আছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ, ঘটনাকাল বৎসর খানেকের মতো। দ্বিতীয় খণ্ডে পরিচ্ছেদের সংখ্যা পনেরো—সময়কাল আট বৎসর। প্রথম খণ্ডে ঘটনাগতি দ্রুত এবং জটিল। দ্বিতীয় খণ্ডে ঘটনা সরলরেখা সম্পন্ন। প্রথম খণ্ডে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ঘটনাজাল, একটি পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকার রূপায়ণ। দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু ট্র্যাজেডির নির্মম আকর্ষণে নিম্নাবতরণ। ঘটনার বীজ উপ্ত হয়ে গাছে পরিণত হতে লেগেছে এক বছর। তারপর সে বিষবৃক্ষের ফসল সকলে মিলে আহরণ করেছে দীর্ঘ জীবন ধরে। কাজেই প্রথম খণ্ডের দ্রুত লয় দ্বিতীয় খণ্ডে বিলম্বিত হয়েছে। ঘটনাবিরল দ্বিতীয় খণ্ডে রোহিণী হত্যাই একমাত্র ঘটনা। বাকি দীর্ঘকালের অসহনীয় শূন্যতাকে ঢেকে শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলিই মাত্র বলা হয়েছে। কাজেই এই কালের মন্থরতাকে মন্থর লয়ে পনেরোটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। নিচের রেখাচিত্রটি অনুধাবনযোগ্য। এক, উইলের কথা, দুই, রোহিণীর চৌর্য ও লাঞ্ছনা, তিন, বারুণী পুষ্করিণীর ঘটনা এবং গোবিন্দলালের ভ্রমরের সঙ্গে বিচ্ছেদ, চার, রোহিণী হত্যা, পাঁচ, ভ্রমরের মৃত্যু। গোবিন্দলালের সন্ন্যাস উপন্যাসের পরিশিষ্ট ঘটনা।



সময়কালের দিক দিয়ে বিচার করলে এক থেকে তিন পর্যন্ত ঘটনাকাল এক বছর, এবং তিন থেকে চার পর্যন্ত ঘটনাকালও এক বছর। এক থেকে তিন পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে একত্রিশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, তিন থেকে চার পর্যন্ত আসতে সেক্ষেত্রে লেগেছে নয়টি পরিচ্ছেদ। কেননা তিন থেকে চার—কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডের ঘটনার তাড়নায় সংঘটিত পরিণাম। নতুন ঘটনা

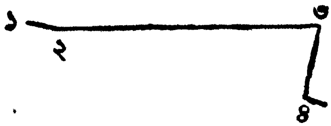
কিছু নয়। চার থেকে পাঁচ সময়কালের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ছয়টি পরিচ্ছেদে এই গভীর বেদনাবহ কালকে সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্ণনাকালে লেখকের সংযম, পাত্রপাত্রীদের চিঠিপত্রে-বাচনে-আচরণে পরিমিতিবোধ ট্র্যাজেডির দারুণ দুঃখভারের মর্যাদা সর্বত্র রক্ষা করেছে।

বিষবৃক্ষের কাঠামোরও অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং সেখানেও দেখা যাবে যে উপন্যাসের গঠন-বিষয়ের অনুধ্যানে বঙ্কিম কী পরিমাণে যত্নশীল ব্যক্তি ছিলেন। নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষণীয়:



এক থেকে দুই পর্যন্ত মাত্র exposition বা ঘটনাভাস। নবম পরিচ্ছেদে—কুন্দর বৈধব্য থেকে প্রকৃত ঘটনারম্ভ। দুই থেকে তিন কুন্দের বৈধব্য থেকে নগেন্দ্র ও কুন্দের পরস্পর আকর্ষণ ও কুন্দের হীরার কবলে পতন। তিন থেকে চার, একবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—নগেন্দ্র সূর্যমুখীর সম্পর্কের জটিলতা, কুন্দ-নগেন্দ্রের বিবাহ, সূর্যমুখীর সংসার ত্যাগ। চার থেকে পাঁচ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে চতুশ্চত্তারিংশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নগেন্দ্রের অনুশোচনা এবং সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন। পাঁচ থেকে ছয়, উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কুন্দের বিয়োগান্ত সমাপ্তি। সাত, দেবেন্দ্র-হীরার উপসংহার জ্ঞাপন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দুই থেকে ছয় পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল। নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখী উপন্যাসের ঘটনার মুখ্য ধারক হলেও কুন্দনন্দিনীই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। কুন্দের জীবনের এই প্রধান ঘটনাবহুল অংশের সময়কালও পরিমিত। সেই সময়কালকে সমানভাবে চল্লিশটি পরিচ্ছেদে বণ্টিত করে, কখনো চিত্রানুগ পদ্ধতিতে, কখনো দৃশ্যানুগত পদ্ধতিতে এবং কখনো নাট্যরসাশ্রয়ে উপন্যাসের পটকে পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে নানাভাবে। এ ব্যাপারে লেখক কতটা সফল হয়েছেন তা পরে আলোচ্য। কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা অধিকতর

নাট্যাশ্রয়ী বলে এর গতি আরো সরল। কপালকুণ্ডলার গঠন-কৌশলকে এইভাবে কল্পনা করা যায়



এক থেকে দুই, নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ ও বিবাহ। দুই থেকে তিন, মতিবিবি আখ্যান, নবকুমারের দাম্পত্য জীবনের সংকট, কাপালিকের পুনরাবির্ভাব। তিন থেকে চার, অতিদ্রুত ঘটনাস্রোতের catastrophe-র মোহানায় অবতরণ। রাজসিংহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পরিচ্ছেদাশ্রিত ঘটনাগুলি শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। রাজসিংহে ঘটনার শোভাযাত্রা বর্ণাঢ্য এইমাত্র। নতুবা, বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসেই ঘটনার গতিপ্রাবল্য প্রথমাবধি অনুভূত হয়। এই ঘটনাগতির স্বরূপ কী এবং বঙ্কিমমানসের কোন সূত্র থেকে এই ঘটনাধারা-প্রবণতার জন্ম সে-কথা কিছু পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এই সূত্র যেখানে শিথিল সেখানে উপন্যাসেও বঙ্কিম শিথিলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন মৃণালিনী। মৃণালিনীর জটিল আখ্যায়িকা এক প্রকার তাৎপর্যহীনতায় শেষ পর্যন্ত শিল্পকর্মকেই হানিগ্রস্ত করেছে। কেন করেছে সে-কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলা হচ্ছে।

ছয়

মননশীলতা-জনিত সুসমতার প্রয়াসকে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তৃতীয় লক্ষণ বলে আখ্যাত করেছি। বঙ্কিমের বহু জনপ্রিয় উপন্যাসগুলিতে এই সুসমতার অভাব এবং প্রথম দিককার শিল্পোৎকর্ষ সমন্বিত সৃষ্টিগুলিতে উক্ত সুসমতার সার্থকতা এই দুটি বিষয়ই এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। স্বভাবতই আমরা জানি যে মননশীলতা এবং মননশীলতা-জনিত সুসমতা এক কথা নয়। সুসমতা একটা শিল্পশ্রী। মননশীলতা মাত্র বুদ্ধিচর্চার ফসল। বঙ্কিমের রচনায় তথাকথিত রোমান্টিকতার উপাদান সহজেই সন্ধান করা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসু বঙ্কিমের যে পরিচয় আমরা জানি তাতে স্বভাবত বোঝা যায় যে বঙ্কিমের কল্পনার পরিমণ্ডলেও যুক্তি বা হেতু-জ্ঞানের অসদ্ভাব হবে না। কল্পনার দুরবগাহ লীলাকে তিনি সদাই কল্পনা-রসিকের মতো ধ্যানে ধারণ করতে চাইতেন। কিন্তু

কোম্‌তে-র উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে কল্পনার স্বাধীন স্বেচ্ছাবিহারকে হেতুরহিত বলে স্বীকার করতেও পারতেন না। সেই কারণে দেখা যায় যে রোহিণীর বেদনা তাঁর কল্পনাকে স্পর্শ করে। তিনি সেখানে জীবনের রণস্থলীতে শক্তি-সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে কল্পনায় অনুভব করার চেষ্টা করেন—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে বা যুক্তিতে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমের সমুদয় উৎকৃষ্ট উপন্যাসে—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ সর্বত্রই এই রীতি রক্ষিত হয়েছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের আচরণের ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস অথবা রজনীতে অমরনাথের আত্মচেতনামূলক স্বগত কথনে এই বিশ্লেষণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্কিম নায়ক-নায়িকায় আচরণে যেন কোনো অস্বাভাবিকতা না সঞ্চারিত হয় সে বিষয়ে খুবই সচেতন। বঙ্কিম উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থাপনের বেলাতেই এ-বিষয়ে স্পষ্টত অবহিত থাকতেন। সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আকস্মিক ঘটনার ব্যবহার বিদ্যমান বটে, কিন্তু আচরণের অসঙ্গতিতে কখনই তাঁর প্রধান উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা দুষ্ট নয়। বুদ্ধিদীপ্ত এই যুক্তিপ্রবণতা বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষাতেও ছায়াপাত করেছে। লক্ষণীয় যে বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা এবং তাঁর প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে তফাত কেবল এইখানে যে উপন্যাসের ভাষা অলংকৃত, তীব্র বিশ্লেষণ সচকিত উচ্চগ্রামের কল্পনার জন্য সদাপ্রস্তুত। তা না হলে প্রবন্ধের ভাষায় যে সতর্ক যুক্তিশীল নৈয়ায়িকতা তাঁর উপন্যাসের ভাষাও আত্মার দিকে তারই আত্মীয়। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পরীক্ষার যোগ্য

> কার্পাস বস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রলয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্ত সংযমে বিশেষ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সে বিশেষ ধর্মভীতা না হইয়াও এ পর্যন্ত সতীত্বধর্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবেই সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্ত সংযমের সদুপায়-স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে পুনর্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পর গৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিক দংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র

কখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

অনুচ্ছেদটির শেষ বাক্য হীরার দাসীত্বে নিয়োগ-বার্তা জ্ঞাপন। লক্ষণীয় যে, অনুচ্ছেদটির প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্য পর্যন্ত সমস্ত বাক্যগুলির মধ্যে কী পরিমাণ নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বিদ্যমান। উপন্যাসেও বঙ্কিম সদাসর্বদাই যেন সম্মুখে কোনো জিজ্ঞাসু প্রতিপক্ষকে কল্পনা করে রাখতেন। বাক্য-বিন্যাসে সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্কের ঠাট স্পষ্ট। তিনি যে শুধু তাঁর বাক্যরীতিকে বার্তাজ্ঞাপক বা সংবাদবহ করে তুলতে চাইতেন তাই নয়—কেন ঘটল ঘটনাটি তারও একটা কৈফিয়ত যেন দিতে ব্যস্ত হতেন। পাঠকের গল্প জিজ্ঞাসায় "তার পরের" যে উত্তর, এবং সমালোচকের প্লটের প্রশ্নে "কেন"-র যে উত্তর —এই দুই প্রশ্নেরই তিনি এক সঙ্গে উত্তর প্রদান করতে চাইতেন। অবশ্যই উল্লেখ্য যে এ-পদ্ধতির একটা সমূহ বিপদাশঙ্কা হল ; লেখকের নিরাসক্তি রক্ষা করা সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। রোহিণীর মৃত্যুর পরে বঙ্কিমের প্রদত্ত কৈফিয়ত এই কারণেই শিল্পসম্মত হয়নি। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল— এ ঔপন্যাসিকের প্রদত্ত ব্যাখ্যা কদাচ হতে পারে না। সমালোচকের ব্যাখ্যায় এ উক্তি যদিবা সম্ভব। এই ভঙ্গিই আবার লেখকের অনধিকার প্রবেশের সহায়ক হতে পারে। যেমন সীতারাম উপন্যাসে ললিতগিরির বর্ণনায় প্রাচীন হিন্দু ও বর্তমান হিন্দুর তুলনা।

বঙ্কিমের উপন্যাসের নায়ক-নির্বাচন উপন্যাসের সুসমতা রক্ষায় যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। বঙ্কিমের কোনো নায়ক বা নায়িকা ভাবাতিরেক-দুষ্ট নয়। যদিও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার মতো প্রচণ্ড বাসনাবেগে তারা আন্দোলিত হতে পারে— তথাপি শান্ত বা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা প্রশান্ত সমুদ্রের মতোই সুস্থির। সেদিক থেকে সমুদ্রের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের তুলনা করা চলে। এ-প্রসঙ্গে আরো বলা চলে যে, কোনো বঙ্কিমী নায়ক যেমন ভাবাতিরেক-দুষ্ট নয়, তেমন প্রখর মননশীল বা বুদ্ধিবাদীও নয়। অমরনাথই হয়তো কিছুটা এর ব্যতিক্রম। তারা শিক্ষিত বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি। সাধারণ স্তরের মানুষ নয় মাত্র এ-কারণে যে, সাধারণ জীবন থেকে তাদের আহরণ করা হয়নি। এ রকম নির্বাচনের ফলে বঙ্কিমের জীবন-বিষয়ক নিরীক্ষণ লেখকের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। প্রখর মননশীল নায়ক, যিনি বঙ্কিমের চিন্তার

প্রতিভূ হতে পারেন তিনি বঙ্কিমী উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে পতিত হয়ে অসাধারণ ব্যবহার করতেন। বঙ্কিমের লক্ষ্য কখনই তা ছিল না। বরঞ্চ সাধারণ বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষের সমস্ত বহিরাবরণের অন্তস্থিত যে মানুষ, তাকে যন্ত্রণামথিত অবস্থায় আবিষ্কার করাই তাঁর ঔপন্যাসিক বাসনা ছিল। সে কারণেই অমরনাথের আত্মসচেতনতার আতিশয্যকে বঙ্কিম যথার্থ শিল্পবিন্যস্ত করতে পারেননি। দুঃখদহনের যন্ত্রণা-উত্তীর্ণ মানুষই যথার্থ আত্মত্যাগের শক্তিসম্পন্ন—এই বিষয় অমরনাথের আত্মকথনের ফলে হালকা হয়ে গেছে এবং সেই লঘুকরণের জন্য একদিক থেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিক-রীতি অপরদিকে তেমনি অমরনাথের ত্যাগজনিত বেদনাও হয়েছে ফিকে। বঙ্কিম বিষয়বস্তুর অসাধারণত্ব পরিহার করে নায়ককে অসাধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন রজনীতে, আর এই ত্রুটিই আরো শিল্প-বিরহিত হয়ে দেখা দিয়েছে মৃণালিনীতে, যেখানে মনোরমাকে তিনি করে তুলতে গেছেন অনন্য কাব্যময় রহস্যস্বর্গবাসিনী, অসাধারণ। মনোরমার রহস্যময়তা উপন্যাসের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীতে অসঙ্গত। উপন্যাসের সুসমতাকে সব দিক দিয়ে ব্যাহত করেছে মনোরমা চরিত্রের উচ্চমার্গী কল্পনা। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমার চরিত্রের রহস্যময় দুরবগাহতার কাব্যব্যঞ্জনার বিষয়ে প্রশংসোক্তি করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিচারে কোনো কিছুরই একক ভালো মন্দ হওয়া-না-হওয়ার অধিকার নেই। সামগ্রিকতা ব্যতীত উপন্যাসের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরও বিচার সম্ভব হয়। কাজেই মনোরমার চরিত্রেরও বিচার উপন্যাসের সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোরমাকে রহস্যস্বর্গবাসিনী করে তুললে সে আর পশুপতি প্রসঙ্গে কোনো তাৎপর্যই সঞ্চার করতে পারে না—উপন্যাসেও কোনো উদ্দেশ্যসাধন তার দ্বারা হয় না। মৃণালিনী উপন্যাসের জটিল আখ্যায়িকাতে মনোরমাই জটিলতর গ্রন্থি—কোনো শিল্প-উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই। অমরনাথ এবং মৃণালিনীতে বঙ্কিমের অখণ্ড ঔপন্যাসিক সত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাব্য এবং উপন্যাসের প্রতি দ্বৈত আনুগত্য রাখতে গিয়েই এই উপন্যাস দুটিতে সুসমতার হানি ঘটেছে।

সুসমতা বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান গুণ। উপন্যাসের লজিক্যাল স্ট্রাকচার বা যুক্তিসিদ্ধ গঠন-রীতি থেকেই এই সুসমতার জন্ম। বঙ্কিম যত ধর্মবাদী হয়ে উঠছিলেন—যত তিনি অনুশীলনাদর্শকে মানব-মুক্তির অন্যতম পন্থা হিসেবে অনুভব করছিলেন, ততই বঙ্কিমের উপন্যাসে এই গুণের অভাব স্পষ্ট হচ্ছিল।

সাত

উনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাসের তালিকায় কপালকুণ্ডলা একটি আশ্চর্য নাম। অভিনব এবং দুঃসাহসিকতম বিষয়, এবং আয়াস-চিহ্নহীন শিল্পশ্রী কপালকুণ্ডলাকে একটি উজ্জ্বল রসলোকে উত্তীর্ণ করেছে। আমরা বঙ্কিমের এই উপন্যাসটির পৃথক আলোচনা করতে চাই। কারণ এই উপন্যাসে আর রাজসিংহে আমরা শিল্পী বঙ্কিমকে যেমন অমিশ্রভাবে পাই—আর বোধ হয় কোথাও তেমন পাই না।

সর্বপ্রথমেই কপালকুণ্ডলার যে-শক্তি পাঠককে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে তা হল strangenss. এ strangeness ভৌগোলিক strangeness নয়। পরিবেশ পরিবর্তনের সহজ কৌশলে যে অভিনবত্বের সঞ্চার হয় তাও এই strangeness-এর লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না। এর নিধান কপালকুণ্ডলার চরিত্রে। কপালকুণ্ডলার উপস্থাপনা থেকে নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন পর্যন্ত, চরিত্রের মৌল উপাদান এই বিচিত্রতা, অবিকম্প দীপ-শিখার ন্যায় সমান রহস্যালোক বিকিরণ করেছে। কপালকুণ্ডলার প্রথম উপস্থাপনাতেই এ-তাৎপর্য কেমনভাবে উপস্থিত নিচের উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ :

> ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখ-মণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘ-বিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ-রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহু যুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণী দেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

সমগ্র কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ন্যায় এ অংশটুকুকেও কাব্যময়, রোমাণ্টিক প্রমুখ নানা আখ্যায় আখ্যাত করা চলে। কিন্তু সে কবিত্বের উৎস কোথায় এ-প্রসঙ্গ প্রায়ই অনালোচিত থেকে যায়। কপালকুণ্ডলার রূপ বর্ণনায় বাংলা কাব্যের বা সংস্কৃত কাব্যের classic বর্ণনা-রীতিকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এমন কি দুর্গেশনন্দিনীর রূপ বর্ণনা-রীতিও পরিহৃত। সৌন্দর্য কোনো ব্যাখ্যাগম্য ব্যাপার নয়, কল্পনায় তার অধিষ্ঠান—এই সূত্রটির সাহায্যেও কপালকুণ্ডলার সম্যক্ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির সাযুজ্যে কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য নির্ণয়ও বোধ হয় পূর্ণ উপলব্ধির সহায়ক নয়। রোমাণ্টিকতা অথবা কাব্যময়তা এ সমস্ত তত্ত্বের সাহায্যে কখনোই সেই শিল্পের ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয় না যে শিল্প জীবন-রূপকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শিল্প শেষ পর্যন্ত জীবন-ব্যাখ্যাতা এবং জীবন কদাচ শিল্পতত্ত্ব অনুসরণ করে চলে না। তাই মাঝারি শিল্প প্রয়াসের ক্ষেত্রেই শিল্পগত ইজমের প্রশ্ন ওঠে, বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে ও প্রশ্ন নিরর্থক। কপালকুণ্ডলার উদ্ধৃত অংশে হিউম্যানিজম, গ্রীক সৌন্দর্য-রীতি থেকে শুরু করে ভারতীয় মহাশক্তিবাদ, তন্ত্র সকল কিছুই অভিজ্ঞ সমালোচক এই কারণে খুঁজে পাবেন যে এখানে জীবনের সেই গূঢ় শিল্পায়ণ ঘটেছে যা ঘটলে শিল্প জীবনের বিশ্বরূপ দেখাতে পারে। উদ্ধৃত অংশে প্রকৃতিকে মিলিয়ে মানবিক সৌন্দর্যকে দেখা হয়েছে। এবং মানবিক সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকৃতিকে আভাসিত করে দেখা হয়েছে। এই মিলিয়ে দেখার বিষয় বাংলা সাহিত্যে নতুন। নারীরূপ কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নয়, সে সৌন্দর্যও বিশ্বসৌন্দর্যের অংশীভূত—এ-কথা কপালকুণ্ডলাতেই প্রথম জানা গেল। এই সৌন্দর্যই কপালকুণ্ডলার চরিত্র। কিন্তু স্মরণীয় যে, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কবিত্ব তার গল্পে, ভাষায় বা কপালকুণ্ডলার চরিত্রে পৃথকভাবে কোথাও নেই। এ-কবিত্ব সমগ্র উপন্যাসের অন্তর্নিহিত কবিত্বে। সমগ্র ঘটনাস্রোত সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের অক্ষুণ্ণ নিরাসক্তিতে কপালকুণ্ডলার গঠন-রীতির বলিষ্ঠ সরলতায় এবং সর্বোপরি সমগ্র ঘটনার আশ্চর্য রূপকব্যঞ্জনায় এই কবিত্বের উৎস। শতবন্ধন-জাল-জটিল সমাজ জীবনে (কথাটি ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের) একটি স্বেচ্ছাবিহারিণী স্বাধীনতার প্রতীক নারীর গল্প এটি, অথবা এ-গল্প পাঠে এই বোঝা গেল যে সৌন্দর্যকে কখনো বন্দী করা যায় না ; কিংবা কপালকুণ্ডলা সেই মহামায়ার অংশ, নবকুমার মায়াভিভূত জীব—এই রকম নানাভাবে এই কাহিনীর ব্যাখ্যা করা চলে। যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের এটা লক্ষণ। কপাল-

কুণ্ডলার জীবন যেন সমুদ্র এবং অরণ্যের সারীভূত রূপ। দৈন্যে এবং ক্লান্তির জটিল এবং ক্লান্ত আমাদের জীবনে কপালকুণ্ডলা মুক্ত প্রকৃতির প্রতীক। কেননা প্রকৃতি ছাড়া মুক্তি-পিপসার প্রতিধ্বনি কোথায়? হয়তো এ অংশে রুশোর এমিলের প্রভাব কিছুটা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র রুশোর অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কাজেই রুশো বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসির কথা হয়তো তাঁর চিন্তার প্রস্তাবনায় কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমজীবনী পাঠে জানা যায় যে এ-ধরনের একটা কাহিনী কল্পনা বহুদিন ধরে লেখকের মানস-সঞ্চিত ছিল। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রকে বঙ্কিম নাকি একবার প্রশ্নও করেছিলেন এ সম্বন্ধে। কপালকুণ্ডলার শিল্প-সৌষ্ঠব এ বিষয়ে সাক্ষ্যও বটে। কেননা দীর্ঘ দিনের বিষয়-কল্পনা না থাকলে এমন সংক্ষিপ্ত, সরলরেখ গতি এবং ঘটনার ওপর অসামান্য দখল সম্ভব নয়।

আমরা বলেছি যে প্রকৃতি ছাড়া মুক্তি-পিপাসার প্রতিধ্বনি কোথায়? মুক্তি-পিপাসার আর্তিই কপালকুণ্ডলার মূল সুর। এবং কপালকুণ্ডলার বেদনা কপালকুণ্ডলার বলেই তা সাধারণ পথগামিনী নয়। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটার ন্যায় কপালকুণ্ডলার বেদনাও দৃঢ়বদ্ধ ও গভীর। আমরা দেখাব যে কপালকুণ্ডলার অপরাধবোধও তার জীবন-কাহিনীর এই মূল সুরকে কেন্দ্র করে। তৎপূর্বে জানা প্রয়োজন যে কপালকুণ্ডলার বিবাহের কারণ কী? আমরা পূর্বেই বলেছি যে কপালকুণ্ডলার ঘটনাগতির মধ্যে প্রথমাবধি একপ্রকার অনিবার্যতা বিদ্যমান। কপালকুণ্ডলার বিবাহও সেই অনিবার্যতা-প্রসূত। সহজ দয়াধর্মে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পলায়নের পথ নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলা অনিবার্য ভবিতব্যের মুখোমুখি হয়েছে। এরই পরিণতিতে অধিকারী কাপালিকের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে নবকুমারের সঙ্গে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার কোনো প্রেমজ আকর্ষণের পরিচয় আমরা উপন্যাসে পাই না। একপ্রকার আদিম এবং মৌলিক ভীতিবোধ থেকে কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে স্বামীত্বে বরণ করে সংসার পথ-যাত্রিনী হয়েছে। এই ভীতি কাপালিক সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার অজ্ঞতাজনিত ভীতি। কাপালিক অথবা নবকুমার এই দুইজনের কেউই কপালকুণ্ডলার কাছে পুরুষ বলে প্রতিভাত হয়নি। এর কারণ স্বভাবতই যৌনবোধ কপালকুণ্ডলার মধ্যে অনুন্মেষিত ছিল। দাম্পত্য জীবনে কপাল-কুণ্ডলার স্বামী সংসর্গলাভ ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না। বরঞ্চ এই জানি কপালকুণ্ডলার কোনো সন্তান-বাসনা ছিল না। সুতরাং

বিবাহ কপালকুণ্ডলার জীবনে শুধুমাত্র তীব্র বৈপরীত্যকেই আহ্বান করে আনল। শ্যামা যখন কপালকুণ্ডলাকে 'মেয়েমানুষের পরশপাথরে' সন্ধান দিয়েছিল তখন কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সে কী?' শ্যামা উত্তরে বলেছিল 'পুরুষ'—তারপরে বলেছিল—

"সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভালো লাগে কিনা লাগে ॥"

মৃন্ময়ী কহিলেন, "ভালো বুঝিলাম, পরশপাথর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভালো কাপড় পরিলাম; খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কানে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্যন্ত হইল। মনে করো সকলই। তাহা হইলেই বা কি সুখ?"

শ্যা। বলো দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল; প্রভাত বাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল; বলিলেন, "ফুলের কি? তাহা তো বলিতে পারি না। কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মতো কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা—তাই যদি না হইল; তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্র-তীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে কোথাও কপালকুণ্ডলাকে সংসার-বাসনাতুর বলে মনে হবে না—এ যেমন স্পষ্ট, তেমনি শ্যামার সুস্থ জীবন-বাসনার পটভূমিতে কপাল-কুণ্ডলাকে মর্বিড বা অসুস্থ বলে মনে হবে না এও তেমনি স্পষ্ট। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুখবোধের সূক্ষ্ম ইউটিলিটেরিয়ান তত্ত্বকে চেনে না। কাজেই সে বলে—ফুল ফুটিলে লোকের দেখে সুখ, কিন্তু ফুলের কী? এ তত্ত্ব কপাল-কুণ্ডলাকেই মানায় বটে, আয়েষাকে এ-তত্ত্ব মানাত না। ফুলের কী—বঙ্কিমের সমস্ত সুখবোধ কল্যাণবোধের সূক্ষ্ম তর্ককে কপালকুণ্ডলার মতো এমন ভাবে কেউ প্রশ্ন করেনি। বস্তুতপক্ষে কপালকুণ্ডলার যে আত্মবিসর্জনেচ্ছা শেষ দিকে প্রবল হয়ে উঠেছিল তার মূলে প্রত্যক্ষে ছিল বিধিলিপি-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ-

বোধ, পরোক্ষে স্থায়ী হয়ে যা সক্রিয় ছিল তা হল অরণ্যস্মৃতি। মুক্তি। আত্মার সঙ্গে কথোপকথনে দেখা যায় যে সেই মুক্ত জীবনে স্মৃতিই তাকে পীড়িত করেছে। এই প্রবল মুক্তিবাসনা ধীরে ধীরে কপালকুণ্ডলার মতো অনন্যসাধারণ নারীরও মানসিক ভারসাম্যের কেমন ব্যত্যয় ঘটাল তার প্রমাণ রয়েছে কপালকুণ্ডলার নিশাবিহারের মধ্যে। রাত্রে অরণ্যচারিণী কপালকুণ্ডলা সেই দুঃসহ প্রকৃতিবিরহের উপশম চাইত এই লোকাচার-বিরুদ্ধ নিষিদ্ধ পরিক্রমায়। সুতরাং লুৎফউন্নিসা যখন তাকে বলেছিল ধন, দাসদাসী, প্রতিপত্তি সবই সে দেবে—শুধু কপালকুণ্ডলা পথ ছেড়ে দূরে চলে যাক। তখন—

> কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন তথায় তো নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন,
>
> "তুমি আমার উপকার করিয়াছ কিনা, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধনসম্পত্তি দাসদাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমর সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোনো সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

বনচারী জীবনের পিছুটানকে কপালকুণ্ডলা পরিহার করতে পারেনি। নিয়তিবোধ বা কাপালিকের প্রভাব এ সবই সেই পিছুটানেরই বহিরঙ্গ-ব্যাখ্যা মাত্র। যে যন্ত্রণা এই বন্দী জীবনে, অথবা বন্দিত্বের অনুভবে, তার প্রমাণ কাপালিকের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পুনঃসাক্ষাতে যেমন স্পষ্ট এমন আর কিছুতে নয়। কাপালিককে কপালকুণ্ডলার যমদূত বলে ভ্রম হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমরা কে, যমদূত? তারপরেই কাপালিককে চিনতে পেরে কপালকুণ্ডলার উক্তি—না! না পিতা তুমি কি আমাকে বলি দিতে আসিয়াছ? এখানে আর কপালকুণ্ডলা ভীতও নয়, কাপালিক-পরাঙ্মুখও নয়। কেননা তখন কাপালিক পিতৃসম এই কারণে যে এই শতবন্ধন-জাল-জটিল জীবনের যন্ত্রণা থেকে যে তাকে পিতারই মতো আপন আলয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কাপালিক। এমন কি মৃত্যুও তখন মুক্তিরই প্রতিতুলনীয়। তাই বলিদানের প্রশ্নেও কপালকুণ্ডলার কণ্ঠস্বর কম্পিত কিনা সে-কথা আমাদের জানা নেই।

বরং শেষ পরিচ্ছেদে (পরের পরিচ্ছেদেও বটে) দেখা যায় যে কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, নিষ্কম্প। মৃত্যু অথবা জীবন কিছুর জন্যই তখন আর আগ্রহ নেই। সমুদ্রতীরের অস্ফুট সন্ধ্যালোকে যাকে স্থাপনা করা হয়েছিল, নিশাকালে নদীসৈকতে তাকেই শেষ পরিচ্ছেদে বিসর্জনমুখী দেখিয়ে কপালকুণ্ডলার জীবনের বৃত্তরেখাকে সম্পূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। সমগ্র কপালকুণ্ডলা-কল্পনা নিখুঁত। কেবল প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের একটি অংশ উপন্যাসে অব্যাখ্যাত থেকে গেছে। অধিকারীকে কপালকুণ্ডলা বলছেন, "যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, যখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?" এটা কখনকার ঘটনা? কে যেতে চেয়েছিল? কেন? অধিকারীর নিষেধের কারণ কপালকুণ্ডলা জানতে চাননি যখন, তখন মনে হয় এ ঘটনার তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। তথাপি ব্যাপারটি একটু স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

আরো দ্রষ্টব্য, বড়ো বড়ো ঘটনা এই উপন্যাসে ঘটেছে কিন্তু লেখক কোনো কৈফিয়ত দেননি। যে ধরনের তর্কপ্রাণ গল্পরীতি সাধারণত বঙ্কিম অনুসরণ করে থাকেন—কিছু পূর্বে বিষবৃক্ষ থেকে যার উদাহরণ আমরা দিলাম—এখানে সে জাতীয় বিশ্বাস উৎপাদনের প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। দিল্লীর-আগ্রার ঘটনা, সপ্তগ্রামের মন্থর জীবন অথবা অরণ্য পরিবেশ কোনো স্থানেই লেখকের কল্পনার ঋজু চাল এই ভেবে থমকে যায়নি যে পাঠক বিশ্বাস করবে কিনা। কল্পনার ঘন গাঢ় নির্যাস থেকে পাঠকের ওপর এক ধরনের অসীম আস্থা জন্মায়—যে বিশ্বাস পাঠককেও সর্বজ্ঞ বলে ভেবে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। কাজেই পাঠককে বোঝানোর কোনো প্রচেষ্টা এখানে ঔপন্যাসিকের নেই। শেষ দৃশ্যের শক্তিশালী অতিনাটকীয়তা—যার জন্ম বঙ্কিমের নাটকীয়তার আতিশয্য থেকে নয়, উপন্যাসের নাট্যস্রোত থেকেই যার অনিবার্য জন্ম—বঙ্কিমের আশ্চর্য বাকসংযমে সমৃদ্ধ। নবকুমারের অতিনাটকীয় চিৎকারের (যা নবকুমারের চরিত্র প্রসঙ্গে গভীর ভাবে চিন্তা করলে অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না) বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার মৃদু কণ্ঠে উত্তর—'তুমি তো জিজ্ঞাসা করো নাই'—বঙ্কিমের নাট্যবোধ ও চরিত্রানুভূতির চরম পরাকাষ্ঠা; বঙ্কিমের সংযমবোধেরও চরম পরাকাষ্ঠা। অন্যভাবে দেখা যায় যে মতিবিবির জীবন-স্পৃহা এবং কপালকুণ্ডলার সাংসার-নিরাসক্তি এই উপন্যাসে এক মনোগ্রাহী বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে। নবকুমারের ব্যক্তিত্বহীনতার বিষয়ে কিছু

লবঙ্গলতার সংসার, অথবা ইন্দিরার আশ্রয়দাত্রীদের সংসারের ক্ষেত্রে এ প্রকার পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতা যদিবা স্বাভাবিক, কৃষ্ণকান্তের উইলে এই বিচ্ছিন্নতা মোটেই সুখকর হয়নি। গোবিন্দলালের পলায়ন ক্ষেত্র প্রসাদপুর যেন একটি পরিত্যক্ত ভূখণ্ড। মফস্বলের সমাজকে বঙ্কিম অন্য উপন্যাসে ব্যবহারই করেননি।
একমাত্র বিষবৃক্ষ এ-রীতির উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। গোটা গোবিন্দপুর গ্রাম কমবেশি এই কাহিনীতে উপস্থিত। দেবেন্দ্র এবং হীরার আখ্যায়িকার সাহায্যে বিষবৃক্ষের কাহিনী পারিবারিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। গ্রাম্য বৈষ্ণবীর ভূমিকা, হীরার ইষ্টিরস উপশমাকাঙ্ক্ষী আয়ি বুড়ির ভূমিকা, দেবেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, তারাচরণের মতো গ্রাম্য মাস্টার এই সকল কিছুর একত্র মিলনে বিষবৃক্ষের পটভূমিকা বিস্তৃত হতে পেরেছে। গ্রন্থ হিসাবেও বিষবৃক্ষ বৃহদায়তন। ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। লক্ষণীয় যে শুধু পারিবারিকতার গণ্ডি অতিক্রম করাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল না—নতুন কালের ব্যবহারে পটভূমিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাও এ-ক্ষেত্রে শিল্প প্রয়াসের অঙ্গীভূত হয়েছে। শ্রীশ-কমলমণির কলকাতা বাসের দর্পণে—আপনাতে-আপনি-সুন্দর নতুন মধ্যবিত্ত দম্পতির ছবি। একান্নবর্তী পরিবার সম্বন্ধে বঙ্কিমের চিন্তার প্রচ্ছন্ন নিদর্শন। ওদিকে দেবেন্দ্রনাথে বোধহয় ইয়ং বেঙ্গলেরই দুষ্ট ছায়া। সমকালীন ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, নতুনকালের নানা টানাপোড়েন,—যার অনেকটাই মাত্র জনশ্রুতি—এই উপন্যাসের আকাশে বিভিন্ন সুরের সমাবেশ ঘটিয়েছে। কৃষ্ণকান্তের উইল এবং বিষবৃক্ষের ঘটনা প্রায় সমসাময়িক ; কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল অপেক্ষা বিষবৃক্ষে কাল-লক্ষণকে স্পষ্টতই স্ফুটতর করে তোলা হয়েছে। সীমিতভাবে হলেও এই কাল-লক্ষণে এবং পটভূমি পরিবেশে সমকালীন বাংলা দেশেরই এক খণ্ডকে উপন্যাসে উপস্থাপিত করার চেষ্টা।
বঙ্কিমের ব্যাপক সহানুভূতিও বিষবৃক্ষে যেমন রূপায়িত হয়েছে আর কোথাও তেমন নয়। বঙ্কিম পাপের চিত্র-অঙ্কনে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলে গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রসাদপুরের জীবনের কোনো আলেখ্য রচনা করেননি এ-কথা বিষবৃক্ষের প্রসঙ্গে অচল। দেবেন্দ্রের পাপাচারী জীবনের (ভিক্টোরীয় শুচি-বাদের যুগে যতটা সম্ভব ততটা) প্রতিচিত্র বঙ্কিম অঙ্কন করেছেন। এবং নীতিবাদী বঙ্কিম বিষবৃক্ষে পাপ-বিশ্লেষকের ভূমিকায় কখনো কখনো উপস্থিত থাকলেও এবং মাঝে মাঝে নীতি-প্রচারকের ভূমিকায় অবতরণ করেও,

দেবেন্দ্রের জীবনের জটিলতা, হীরার প্রেমাকাঙ্ক্ষা সমস্তই শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সকলের উপসংহারেও সেই শিল্পদৃষ্টিকে ব্যাহত করা হয়নি। ক্ষুদ্র, শিশু-সচকিত স্নিগ্ধ দাম্পত্য পুরী থেকে জমিদার কক্ষ, হীরার কুটির থেকে দেবেন্দ্রের উদ্যান সমস্তই বঙ্কিমের কল্পনায় সমানভাবে ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে বহির্দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সগোত্র ছিলেন। নগেন্দ্রের শয়নকক্ষ বর্ণনা এবং সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পরের বৃষ্টিমুখর দুর্দিনের বর্ণনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাকালে বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা বঙ্কিমের কালের স্বভাব। এর মূলে জীবনকে সমগ্রভাবে ধারণ করার প্রচেষ্টা। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমও সকল পাত্রপাত্রীর জীবনকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। রাজসিংহ ছাড়া এত বড়ো ক্যানভাস নিয়ে কাজ বঙ্কিম আর কখনও করেননি। (যদিও জটিলতায় সীতারাম এবং মৃণালিনী সকলকেই হার মানায়।) এবং সেই ক্যানভাস বঙ্কিম ব্যাপক ও গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ করেছেন, ছোট বড়ো নানান পোর্ট্রেটে।

আর একটি দিক থেকেও বিষবৃক্ষ বিশিষ্ট রচনা। হিউমার এবং কবিত্বের যুগপৎ প্রয়োগে বিষবৃক্ষের আবহমণ্ডল প্রাণস্পন্দনশীল। লেখকের সহানুভূতি যেমন সেই হিউমারের জননী, লেখকের কল্পনা তেমন সেই কবিত্বের ধাত্রী। দেবেন্দ্রের কক্ষ বর্ণনায় দু-বার যে পদ্ধতিতে তিনি তামাকু এবং আলবোলার স্তব রচনা করেছেন এবং স্ফটিকপাত্রে হেমাঙ্গী একশাকুমারী আর কল্লোলনিনাদিনী আলবোলা সুন্দরীর প্রেমভিক্ষার প্রতিযোগিতা বর্ণনা করেছেন তা বঙ্কিমের রসকল্পনার যোগ্য নিদর্শন। এই হিউমার-বোধ আপন বলিষ্ঠ প্রাণবত্তায় এমন সর্বাধিকারসম্পন্ন যে ঘটনাঘন পরিবেশেও এর সক্রিয়তা উপভোগ্য। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে কুন্দর প্রত্যাবর্তনকালে উদ্যান বর্ণনা উদ্ধৃতির যোগ্য :

> উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতা গুল্মরাজি পরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে প্রস্তররচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেতরক্ত নীল পীতবর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাত মধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে,

কাহারো কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাগুলি দুলিতেছে না; কেননা তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালো বর্ণ লুকাইয়া গলাবাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

এই প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ গদ্যভঙ্গিকে যেমন কখনো করেছে দীপ্ত তেমনি বঙ্কিমের কল্পনাও স্বচ্ছ আলোকরশ্মির মতো গদ্যকে করেছে দ্যুতিময়। এই দ্যুতিময়তা বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের গদ্যকে কেমন নাটকোচিত কাব্যের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে তার নিদর্শনও অনুধাবনযোগ্য:

নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষপথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ—দুপ দুপ শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে! যদি জানিতে পারিতে যে তুমি আবার এখনি সরিয়া অদৃশ্য হইবে এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র, দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সম্মুখে করিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড়ো দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

কুন্দনন্দিনীর ভবিতব্যের ইঙ্গিত শেষ বাক্যে বিধৃত। এবং তার আহত জীবনাকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণে স্পন্দনশীল সে পরিমাণে বঙ্কিমের গদ্যও কাব্যাবেগ-সম্পন্ন। সহজ অভিনিবেশেই দেখা যায় যে দুর্গেশনন্দিনীর দিগ্‌গজী বিদূষকতা পরিহার করে বঙ্কিম এসে দাঁড়িয়েছেন বিষবৃক্ষের সমাজ সচেতন, পরিবেশ সচেতন হিউমারে ও কবিত্বে। কপালকুণ্ডলার বিষয়বোধ থেকে সঞ্জাত ভাষা-গাম্ভীর্য বিষবৃক্ষে হতে পেরেছে লাবণ্যময়। যে ভাষা কপালকুণ্ডলায় বহন করেছে শুধু গভীর স্রোতের তীব্র কাব্যবেগ তা এখন বিষবৃক্ষে কাব্য, কাহিনী, নাটক, জীবনের প্রধান আবেগকে বহনক্ষম। যে-কোনো একজন ঔপন্যাসিকের ন্যায় বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও বাণীভঙ্গির বিবর্তনের সঙ্গে লেখকের জীবনবোধের সম্পর্ক—যা এক হিসাবে ব্যক্তি, সমাজ এবং সভ্যতা সংক্রান্ত বোধেরই বিবর্তন—নিবিড়ভাবে জড়িত। মৃণালিনী পর্যন্ত বঙ্কিমের ভাষা একমুখী। এ ভাষার শ্রেষ্ঠ ফসল কপালকুণ্ডলায়। দুর্গেশনন্দিনীতে ভাষায় যে সীমাবদ্ধতা তা হল ভাষার চালের ব্যাপারে বঙ্কিমের মতিস্থিরতার অভাবজনিত সীমাবদ্ধতা। এ

ভাষা বর্ণনায় যত সক্ষম, ঘটনার ভার বহনে ততটা নয়। কপালকুণ্ডলায় এই দোষই গুণ হয়ে দেখা দিল। এখানে ঘটনার ওপরে কোনো নির্ভর স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল ঘটনার প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় মনোযোগী হবার। বহির্বস্তুনিষ্ঠা নয়, অন্তঃপ্রকৃতিকে উদঘাটন করাই এই বর্ণনার লক্ষ্য। কাজেই ভাষার চালে কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। কিন্তু বিষবৃক্ষের ভাষা বিষবৃক্ষের পটভূমির মতোই সর্বতোমুখী হবার জন্য প্রয়াসী, যদিও বাস্তব বর্ণনায় তার চাল স্বচ্ছন্দ নয়। নিচের উদ্ধৃত গদ্যাংশ দুটি একই উপন্যাসের ভাষারীতির নিদর্শন। ভাষাভঙ্গিতে এক আপাত বৈপরীত্য—কিন্তু গদ্যরীতির ঐক্যসঞ্চারী অনুশাসন সূত্রও লক্ষণীয়:

(ক) বর্ষাকাল। বড়ো দুর্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার খুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিক বর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোল-পাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন।

(খ) সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বার পথে, ক্ষীণালোক, এক ছায়াতুল্য মূর্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্তি সূর্যমুখীর অবয়ব বিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে এ সূর্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়া প্রতি ধাবমান হইতে গেলেন।

উদ্ধৃত অংশ দুটির প্রথমটি একটি আখ্যানভাগের ভূমিকা, দ্বিতীয়টি একটি অংশের উপসংহার। প্রথমাংশের গদ্যের সারল্য এবং ঋজুতা লক্ষণীয়। লক্ষণীয় তার সমাস-বিরহিত, বিশেষণ-শূন্য ভঙ্গিমা। দ্বিতীয়াংশ সে তুলনায় ঘনবদ্ধ, সমাস-যুক্ত। প্রথমাংশে কাটা কাটা বাক্যাংশ। দ্বিতীয়াংশে দীর্ঘ

বিলম্বিত বাক্যস্রোত। এই সমস্তের কারণ এই যে, প্রথমাংশে গল্প কথনের প্রয়োজন—দ্বিতীয়াংশে একটি আবেগময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। বিষবৃক্ষেই বঙ্কিমী গদ্যের এই শক্তিশালী প্রকাশ। সুতরাং এ-দিক দিয়েও বিষবৃক্ষ তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ।

কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণতা একটা শিল্প প্রচেষ্টার শেষ কথা নয়। বিষবৃক্ষের শিল্পগত সংহতির মানদণ্ডেই সে তাৎপর্যের শেষ বিচার। সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হবে—দীর্ঘ পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদব্যাপী এই কাহিনীর মূল, জীবনের কোন্ গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটনের প্রেরণায় নিহিত? জীবনের সমস্যার কোন্ রূপ এই উপন্যাসে বিধৃত? সে-ক্ষেত্রে স্বীকার না করে উপায় নেই যে বিষবৃক্ষ সীমিত কল্পনার সৃষ্টি। সমগ্র উপন্যাসের পরিসর পূর্ণ হয়ে রয়েছে দুটি পলায়ন ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনীতে। এ-পরিসর পূর্ণ করার জন্য দীর্ঘ পত্রাবলী, কক্ষদৃশ্য বর্ণনার আতিশয্যও প্রয়োজন হয়েছে। তার কারণ গোটা ব্যক্তির সমস্যা সম্বন্ধে বিষবৃক্ষে বঙ্কিমের শিল্পগত ধারণা বা শিল্পীভাবনা স্পষ্ট ছিল না। কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে জাগ্রত উপচিকির্ষার মূল নগেন্দ্রের জীবনে কোথায়—কয়েকটি সংবাদ ছাড়া সে প্রশ্নের জবাব উপন্যাসে নেই। আমরা পূর্বে বলেছি যে উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য এখানে যে সব কিছুই matter to be shown বলে ধরে নিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের একটা ভালো কাজ করার প্রবণতা থেকে উপন্যাসের কথারম্ভ। ঘটনাচক্র—যার ওপরে বঙ্কিমের নির্ভর অনেক বেশি—যখন কুন্দ-নগেন্দ্রের সম্পর্ক জটিলতর করে তুলল তখন নগেন্দ্রের অনুশোচনার স্বরূপও—'কাজটা খুব অপরাধের হয়েছে'-এর বেশি কিছু নয়। 'আমার সূর্যমুখী কাহার এমন ছিল'—এই আর্তনাদে নগেন্দ্রের কোনো চারিত্র্যই প্রকাশিত হয়নি—যা প্রকাশিত হয়েছে তা মাত্র মর্মবেদনা। যদিও ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বমূলক কথা বলা হয়েছে—সেগুলোর বঙ্কিমী রীতিও অনুধাবনযোগ্য। তথাপি কুন্দকে অবলম্বন করে নগেন্দ্রের জীবনাচরণে, জীবনধারায় কি প্রতিক্রিয়া এল সেটাকে বস্তুগতভাবে লেখক দেখাননি। দেখানো সম্ভবও ছিল না। কেননা বঙ্কিম নগেন্দ্রের জীবনকে সকল দিক দিয়ে উপস্থিত করেনইনি। আমরা আগেই বলেছি যে মানুষ সম্পর্কময়। কি নগেন্দ্রের অন্তঃপুরের জীবন, কি তার গ্রামের সামাজিক জীবন—সে জীবন কি এই ধনাঢ্য জমিদারের বিধবা বিবাহকে বিদ্যাসাগর অথবা আইনের মুখ চেয়ে মেনে নিল, না ধনাভিজাত্যকে মেনে নিল—সে কথা এ উপন্যাসে কোথাও বলা নেই। কাজেই নগেন্দ্রের

অন্তঃপুরের ভিড় নগেন্দ্রের কাছে এবং সূর্যমুখীর কাছে তাৎপর্যহীন। গ্রামের পটভূমি নির্মাণের প্রচেষ্টাও মাত্র পটভূমি থেকে গেল। ফলে নগেন্দ্রের জীবনের দুটো দিক স্পষ্টত মিলিত হয়নি কোথাও। কোনো ঘটনাই এ-উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়নি। ফলে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি কোনোও বিশেষ তাৎপর্যে অম্বিত হতে পারেনি। এটা যে পরিমাণে মানুষের মতিভ্রংশ হবার এবং বিবেকোদ্ধার করার কাহিনী সে পরিমাণে একটা ব্যক্তিত্বের সমস্যা নয়। বিবেক এবং সূর্যমুখী উদ্ধারের পর কুন্দ পর্যায়ের প্রভাব নগেন্দ্রের জীবনে মিলিয়ে গেল। ওটা যেন একটা বিষবৃক্ষের ভুতুড়ে হাওয়া, সরে যাওয়ার পরে তার আর কোনো অস্তিত্ব রইল না। ঘটনাটি মাত্র ঘটনা না হলে, ব্যক্তিত্বের গূঢ় জটিলতার সঙ্গে জড়িত হলে স্বভাবতই এর চেহারা অনুরূপ হত। দুটি পলায়ন ও দুটি প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ বিলম্বিত ঘটনার সাহায্যে এই ফাঁক পূর্ণ করার প্রয়োজনও হত না। বাস্তব বর্ণনাও মাঝে মাঝে কৃত্রিম হত না।

কুন্দনন্দিনী প্রসঙ্গে আমরা অনেক চোখের জল ফেলে থাকি! 'কুন্দকুসুম অকালে ঝরিয়া গেল' বলে সমবেদনায় পূর্ণ হই। কিন্তু কুন্দের সমস্যারই বা স্বরূপ কী। কুন্দর জীবনাকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য কী? সে প্রথম থেকেই বঙ্কিমের অতিপ্রাকৃত বোধের কাছে বলি প্রদত্ত! যে স্বপ্ন সে দেখেছে তার জীবনের ঘটনাবর্ত শুধু সেই স্বপ্নের ইঙ্গিতকে সফল করার ট্র্যাজেডিচক্র। তাকে বলা হল দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে সাবধান হতে। সেই দুই ব্যক্তি তার জীবনে কেমন অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেল তার দিক থেকে কাহিনীর তাৎপর্য এইটুকু। যদি ঘটনাচক্রের এত বড়ো চাপ তাকে সহ্য করতে না হত তবে সে হতে পারত আর একটু বাঙ্ময়। হলে, তার জীবনের শুধু শেষ দৃশ্যের কাব্যময় ব্যঞ্জনার ওপরে নির্ভর করে তাকে অমরত্ব অর্জন করার পথে যেতে হত না। কুন্দের পাপবোধকে কুন্দের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হয়নি। সে শৈশবে মা হারিয়েছে, কৈশোরে স্বামী। দু-দু-বার তার সংসারের মূল ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে চরিত্রের কী বিবর্তন ঘটেছে সে-কথা কিছুই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। সে যেন শুধু সেই স্বপ্নবাণীর বিপরীতে ঘটনা-কর্ষণে কেমন করে চলে গেল, এই ব্যাপারটিকে রূপায়িত করার শৈল্পিক উপায়ক্রম। তার জন্ম যেন শুধু অদৃষ্টের ক্রীড়ণক হবার জন্য। ফলে সে যে পরিমাণে কেঁদেছে, সে পরিমাণেই কাঁদিয়েছে। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে

যে আক্ষেপোক্তি, তার মর্মার্থ হল—আহা শেষটা মারা গেল। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কুন্দ পূর্ণ হয়ে উঠল, জীবনের ভিতর দিয়ে নয়।

এই উপন্যাসের একটি অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র দেবেন্দ্রের ভিতরে আমরা সেই চরিত্রের নিহিত সমস্যার সাক্ষাৎ পাচ্ছি। তার ভালো-মন্দ সব কিছুকেই বঙ্কিম একটা অন্তরোদ্ভূত কারণে গ্রথিত করেছেন। বাইরের ঘটনার ওপর চরিত্রের দায় অর্পণ করে বসে থাকেননি। দেবেন্দ্র তার সমস্ত অন্তর্জীবন বহির্জীবনের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। তার উগ্র নব্যতন্ত্রী মনোভাবের মূল যেমন তার শিক্ষার অসঙ্গতিতে তেমনি তার চরিত্রের অসঙ্গতিতেও বটে। এবং এই চরিত্রের অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেবেন্দ্রকে বিচার করা যায় তখনই তাকে সমগ্রভাবে আমরা উপলব্ধি করি। যখন সুরেন্দ্র তাকে সুরা ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেন তখন দেবেন্দ্র-সুরেন্দ্রের বাক্য বিনিময় উপভোগ্য :—

দে ॥ আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোনো সুখই নাই।

সু ॥ তবে বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ করো।

দে ॥ যাহাদের বাঁচিয়া সুখ তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ।

দেবেন্দ্রের জীবনব্যাপী বিড়ম্বনার মূল তার বিপর্যস্ত দাম্পত্য জীবনে। নিঃসংকোচ পাপাচরণ ও সুরাসক্তি দেবেন্দ্রকে শেষ দৃশ্যের যে করুণ পর্যায়ে উপনীত করল তার অনেক পূর্বে যে কোথাও একটা রক্তে-মাংসে আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ মানুষ ছিল বঙ্কিম অল্প আঁচড়ে সে ব্যাপার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

নয়

সেদিক দিয়ে সামাজিক তাৎপর্য সৃষ্টির কৃতিত্ব বিষবৃক্ষের ভাগে থাকলেও, পরিণত শিল্প কৃষ্ণকান্তের উইল। গোবিন্দলালের প্রারম্ভ যদিও নগেন্দ্রের কাহিনীর অনুরূপ, তথাপি লেখক ভ্রমর, রোহিণী এবং গোবিন্দলালের জীবন-নাট্যকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছেন এ উপন্যাসে। পরিচ্ছেদ গণনায় কৃষ্ণকান্তের উইল বিষবৃক্ষের অপেক্ষা সামান্য পিছনে। দুটি খণ্ড মিলিয়ে কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৪৬, বিষবৃক্ষের সেক্ষেত্রে ৫০। কিন্তু এই কারণেই শুধু

কৃষ্ণকান্তের উইলের রচনারীতিতে আশ্চর্য সংযম বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা বলা হয় না। অনেকগুলি বড়ো ধরনের ঘটনা এ উপন্যাসে ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবলীলায় সে ঘটনাগুলির বীজ বপন করেছেন; ফল আহরণ করেছেন। সংক্ষিপ্তিবোধের প্রশ্নটা এখানে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই বঙ্কিম উপন্যাসের ঘটনাকে প্রায় কেন্দ্রমুখী করে পাঠকের গল্পচেতনারও আশ্চর্য পরিচর্যা করেছেন। ভাষার দিক দিয়ে বঙ্কিম আরো একপদ অগ্রসর হয়েছেন কৃষ্ণকান্তের উইলে। এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী হয়েছে আরো তীক্ষ্ণ কৌতুক-বোধ এবং সর্বত্র দ্যুতিময় কবিত্ব। পরিবেশ বর্ণনাকালে বঙ্কিমের আড়ষ্টতা কিছু বরাবরই থেকে গেছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে তা আমাদের পীড়িত করে না। কিন্তু নায়ক-নায়িকার বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বর্ণনায় বঙ্কিমের কৃতিত্ব কতখানি বেড়েছে কৃষ্ণকান্তের উইল তার প্রমাণ বটে। কৌতুকবোধকে জাগিয়ে তুলে তারপরে তাকে মুহূর্তে স্তিমিত করে ভারী সুরের অবতারণায় বঙ্কিম কতখানি সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ—রোহিণীর জল আনতে যাওয়ার কালে কোকিল ডাকায় বর্ণনায়। বঙ্কিমের বাগভঙ্গির বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষ্ণকান্তের উইলের স্থান নির্ণয়ের জন্য এই অংশটুকুর সাহায্য অপরিহার্য—

> কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—সে তখনই সে শরে বিদ্ধ হইয়া উলটি পালটি খাইয়া পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখির অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য-কারণের অনন্তশ্রেণী পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখির তত পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখি আবার ডাকিল কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ। "দূর হ! কালামুখো।" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল বড়ো অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একলা জল আনিতে যাইতেছিল তখন ডাকাটা ভালো হয় নাই। কেননা কোকিলের ডাক শুনিলে কতগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবন-সর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে। যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই। কি যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন

হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পুরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত শক্তির পরিচয় বিদ্যমান। শ্রোতা বা পাঠককে জিজ্ঞাসু ভেবে নিয়ে তার্কিক রীতিতে হেতুসহযোগে বাচ্যাবতারণা বঙ্কিমের বিশিষ্টতা এ-কথা পূর্বে আমরা বলেছি। এখানেও উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের প্রথমটিতে—'ক্ষুদ্র পাখিজাতি' এরকম বাক্যাংশে সে প্রবণতা যে অনুপস্থিত তা নয়। কিন্তু বাক্যাংশটি সমগ্র অনুচ্ছেদের অখণ্ড কৌতুকবোধের সঙ্গে এমনভাবে একীভূত হয়ে রয়েছে যে তার পৃথক প্রতিক্রিয়া কিছু জাগে না। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রোহিণীর হাহাকারকে—ডাকাটা ভালো হয় নাই এই মন্তব্যের মোচড়ে কৌতুক থেকে করুণে কেমন ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে তা লক্ষণীয়।

রোহিণী-ভ্রমরের কথা পরে বলা হচ্ছে, গোবিন্দলাল নগেন্দ্র অপেক্ষা অনেক পরিণত সৃষ্টি। নগেন্দ্রের দুঃখের কারণটা ছিল সূর্যমুখীর দুঃখ এবং গৃহত্যাগ। শেষোক্ত ঘটনা দুটি যদি না ঘটত তাহলে নগেন্দ্রের দুঃখের কারণ কিছু থাকত না। কেননা বিধবা বিবাহ আইনসম্মত এবং বহু বিবাহ ধর্মসম্মত। সূর্যমুখীর দুঃখও এ অবস্থায় অভিমানের বেশি ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। গোবিন্দলাল সেক্ষেত্রে যথার্থ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে পতিত। সে রোহিণীকে বিবাহ কোনো অবস্থাতে করতে পারে না। ভ্রমর সূর্যমুখীর মতো বৃথা অভিমানিনী নয়। বিবেকের দিক থেকে গোবিন্দলাল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রমরের প্রতি অনুগত—কামনার আকর্ষণে রোহিণীই তাকে টানে। যথার্থ আত্মা এবং দেহের বিরোধ। রিরংসাজাত পাপ চেতনায় গোবিন্দলালের বহ্নিমান সত্তাকে এ উপন্যাসে যথার্থ শক্তির সঙ্গে রূপময় করে তোলা হয়েছে। বঙ্কিমের কোনো নায়ক গোবিন্দলালের মতো স্পষ্ট নয়। মানুষের জীবন যে সব সময়েই ছক-অনুবর্তী নয় গোবিন্দলাল তার বড়ো প্রমাণ। বারুণী পুষ্করিণীর ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত গোবিন্দলালের আপ্রাণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, ও পরে নিম্নাভিমুখী অবতরণের অনিবার্য টানে গোবিন্দলালের পতন যাত্রা। সে পতন যাত্রাও একপ্রকার পাপ-বৈরাগ্যের শূন্যতায় ধূসর। হত্যার রক্তিম ছটায় সে ধূসরতার পরিসমাপ্তি। তারপরে সব কিছু গৈরিকের শেষ রঙে অনুরঞ্জিত হবার প্রস্তুতি। যন্ত্রণার বিন্যাসে ও শেষ পর্যন্ত শুদ্ধতার অভিমুখী প্রচেষ্টায় গোবিন্দলাল দস্তয়েভ্‌স্কির নায়কদের স্মৃতিবহ। এবং বঙ্কিমের নৈতিক চেতনার শিল্প-সার্থক

ব্যবহারের কালজয়ী প্রমাণ।

এর একটা কারণ গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্কের irony-র মধ্যে। যে গোবিন্দলালের দেহগত বাসনার উদ্দীপক, সে গোবিন্দলালকেই তার জীবনাকাঙ্ক্ষার শেষ পরিণাম বলে কল্পনা করে। গোবিন্দলালের যন্ত্রণার অংশীদার কেউ নেই। রোহিণীর পাশে গোবিন্দলালের চেহারার অর্থ পাঠকের কাছে সদাই এই যে, রোহিণীর তবু একটা ঠিক হোক বা বেঠিক হোক চাওয়ার বস্তু ছিল। গোবিন্দলালের চাইবার বস্তুটাও কত হেয়—বঙ্কিমের ভাবনানুসারে illogical। এই কাম্যবস্তুর অভাবে রজনীতে অমরনাথ সুখের সন্ধান পায় নি। আবার এই কাম্যবস্তুকে জীবনের ছকের বাইরে স্থাপিত করায় গোবিন্দলালের দুঃখ। সে যার জন্য দুঃখভোগ করল সেটা তার জীবনে দুঃখভোগ করার হেতু হওয়া উচিত ছিল না—এটাই তার দুঃখের হেতু। প্রশ্ন ওঠে গোবিন্দলালের সন্ন্যাস বিষয়ে। উপন্যাসের যে কোনো বিষয়ই গোটা উপন্যাসের প্রসঙ্গেই বিচার্য। অপ্রাসঙ্গিকতা থেকেই এ শিল্পকর্মের যা কিছু ত্রুটি। গোবিন্দলালের সন্ন্যাসের বিচারও সেই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেই হবে। হিন্দু বা অহিন্দুর প্রশ্ন এখানে ওঠে না। ভ্রমরকে ছেড়ে রোহিণীকে নিয়ে গোবিন্দলাল যেই প্রসাদপুর অভিমুখে যাত্রা করেছে সেই মুহূর্ত থেকেই তার সন্ন্যাস যাত্রার ভূমিকাও শুরু হয়েছে। কেননা আগেই বলেছি যে এ একপ্রকার পাপবৈরাগ্য। কথাটার অর্থ এই যে, যে আবেগে স্বীয় প্রেমাস্পদাকে নিয়ে প্রেমিক নির্জন যাত্রা করে সে আবেগ সে ভালবাসা গোবিন্দলাল-রোহিণী প্রয়াণের কালে কারো মনেই ছিল না। এই নিষ্প্রেম প্রবাস-যাত্রা দুজনের দিক থেকেই কেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল—বঙ্কিমের লেখনী সে প্রসঙ্গে যেমন সংক্ষিপ্তভাষী তেমনি লক্ষ্যভেদী। বারুণী ঘটনার পর থেকে একদিকে লোকাপবাদ, ভ্রমরের দৃঢ় উক্তি-প্রত্যুক্তি ও অভিমান প্রণোদিত উদাসীন ব্যবহার, অপর দিকে পিস্টির গয়নার ঘটনা, প্রভৃতি একে একে গোবিন্দলাল ও রোহিণীকে একই পথের দিকে চালিত করেছে। কোনো ব্যাপারই এই উপন্যাসে অকস্মাৎ ঘটেনি। বঙ্কিমের মননের সঙ্গে যে যৌক্তিক বোধের যোগ নিবিড়—সেই কার্যকারণ পরম্পরাবোধ এই উপন্যাসে যেমন শিল্প-সার্থক হয়েছে তেমন বোধ করি আর কোনো উপন্যাসে নয়। দেখা যায় যে, সেই নিষ্প্রেম প্রবাস-যাত্রাকালেই গোবিন্দলালের জীবন সম্বন্ধে সমস্ত স্বাস্থ্যবান অনুরাগ আসক্তিই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যা ছিল তা শুধু তীব্র দেহাসক্তি মাত্র। এটুকুও যখন

প্রসাদপুরের জনশূন্য পরিবেশে পিস্তলের আগুনে জলে গেল—তখন ভ্রমর এবং রোহিণী উভয়েই তার কাছে সমান অপ্রাপণীয়া। জীবন সম্বন্ধে সর্বৈব আসক্তির পরিসমাপ্তির পরই সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যের আরম্ভ। গোবিন্দলালেরও তাই। শুধু কাপড়টা রাঙিয়ে নেবার জন্য সে অপেক্ষা করেছে ভ্রমরের মৃত্যু পর্যন্ত। রোহিণীর মৃত্যুর পরেই পাপবৈরাগ্যের পালা শেষ হয়েছে।

পূর্ব অনুচ্ছেদে যে কার্যকারণ পরম্পরাবোধের কথা বলা হল সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই রোহিণীর হত্যার স্বাভাবিকতাও আলোচ্য। প্রশ্ন এই যে, রোহিণীর হত্যা bad art কিনা। এ প্রশ্নকে আমরা দু-দিক থেকে বিচার করব। গোবিন্দলালের দিক থেকে এবং রোহিণীর দিক থেকে। যদি হত্যাকার্যের ভূমিকা রচনায় উভয়ের একজনকেও আমাদের মনে হয় অসঙ্গত আচরণের দায়ে দোষী তবে এটাকে bad art বলতে আমাদের দ্বিধা থাকবে না। এ-ক্ষেত্রে প্রথম জিজ্ঞাস্য যে গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে যেভাবে আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় তাতে তাকে রোহিণীতে বিগতস্পৃহ বলে মনে হয় কিনা। না, তা মনে হয় না। /আমরা আগেই বলেছি যে স্পৃহা বলতে যদি দেহ-কামনা বোঝায় তার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু মহত্তর অর্থে কোন স্পৃহা রোহিণীতে গোবিন্দলালের প্রসাদপুর যাত্রার কালে ছিল না। ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাইরে এ-কথা গোবিন্দলাল রোহিণীকে গ্রহণ করার পরে বুঝেছিলেন এ-কথা বঙ্কিমের কথা। ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের একটু ভুল হয়েছে। উপন্যাসে হয়নি। ভ্রমরের কাছে বিদায় নেবার বহু পূর্বেই এ-কথা গোবিন্দলাল বুঝেছিলেন। ভ্রমরের 'ধর্ম নাই কি' এ-কথার জবাবে গোবিন্দলালের উত্তর 'বুঝি আমার তাও নাই' এ প্রসঙ্গে শেষ উক্তি। দ্রষ্টব্য যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হা ঈশ্বর বলে যখন গোবিন্দলাল কেঁদেছে তখন থেকেই ভ্রমর-রোহিণীর দ্বন্দ্ব গোবিন্দলালের মনে সক্রিয়। রোহিণীর শরীর স্পর্শের সময়েই এ চেতনা তার মনে স্পষ্ট হয়েছে। ভ্রমরের কাছ থেকে বিদায়কালীন নিচের উক্তিটি সেই দীর্ঘ সময় পোষিত চিন্তার পরিণাম।

> মনে পড়িল, যে যাহা ত্যাগ করিলেন তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন যাহা করিয়াছি তাহা আর এখন ফিরে না—এখন তো যাত্রা করিয়াছি। এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না।

সুতরাং প্রসাদপুর যাত্রার এবং ভ্রমরকে ত্যাগ করার বহু পূর্বেই ভ্রমর আর রোহিণীর অন্তর বাইরের ভেদ অথচ রোহিণীর অত্যাজ্যতা গোবিন্দলালের কাছে পরিস্ফুট হয়ে গেছে। এর পরে চিত্রা নদীর তীরে প্রসাদপুরে রোহিণী

গোবিন্দলালের জীবনযাত্রার বর্ণনা। রোহিণী গান অভ্যাস করছে, সঙ্গে ওস্তাদজী। গোবিন্দলাল নভেল পড়ছে। তুই কক্ষে তুইজন। তুই কক্ষে তুইজন বলে একটা ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় ডঃ সেনগুপ্ত করেছেন যে গোবিন্দলাল এবং রোহিণীর সম্পর্কের নিবিড়তায় বুঝি ক্লান্তি এসেছে। বর্ণনার নিম্নোক্ত অংশটুকু দেখা যাক :

(ক) নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কান মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালংকার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী তুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া একজন যুবাপুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য দেখিতেছেন।

(খ) সেই রজতস্ফটিকাদি নির্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেননা যে যুবক নিবিষ্ট মনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইতেছে।

এই যুবক গোবিন্দলাল। যুবতী রোহিণী। উদ্ধৃত বর্ণনা তুটি থেকে এ-কথা কিন্তু স্পষ্ট হয় না যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের কোনো শিথিলতা এসেছে। বা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে ছুটি পেতে ইচ্ছুক এমন কোনো সিদ্ধান্তও উক্ত বর্ণনা থেকে আহরণ করা চলে না। বরঞ্চ তুটি বর্ণনাতেই এ-কথা স্পষ্ট ভাবে রয়েছে যে যুবক যুবতীর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহশীল। 'গোবিন্দলাল মুক্ত দ্বারপথে রোহিণীর কার্য দেখিতেছেন'। রোহিণীর গীতাভ্যাসের জন্যই বরং গোবিন্দলাল সময় সংক্ষেপ মানসে নভেল পড়েছেন এমন ইঙ্গিত ওখানে স্পষ্ট। দ্বিতীয়াংশে তো পরিষ্কারভাবে বলাই হয়েছে যে 'যুবক নিবিষ্ট মনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে'। এখানে আর নভেল পড়ার কথার উল্লেখও নেই। গোবিন্দলাল যে রোহিণীতে নিবিষ্টচিত্ত সে কথাই বলা হয়েছে। যে প্রমত্ত স্পৃহায় গোবিন্দলালের সর্বস্ব বিসর্জন তার তখনও পরিনিবৃত্তি ঘটেনি।

এখানে একটি তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। 'উপন্যাসের মৃত্যু' নামক একটি প্রবন্ধে বর্তমান লেখক আনা-ভ্রনস্কির সম্পর্কের নিম্নাবতারণ ও আনার মৃত্যুর সঙ্গে রোহিণী-গোবিন্দলালের সম্পর্কের নিম্নাবতরণ ও রোহিণীর

হত্যার তুলনা করেছিলেন। তাতে একটি দৃশ্য নির্বাচন করে দেখানো হয়েছিল যে আনার চা খাওয়ার ভঙ্গিকে ভ্রনস্কির যে বিশ্রী মনে হচ্ছিল তা আসলে আনা সম্বন্ধে ভ্রনস্কির বিগত স্পৃহার প্রমাণ এর পর আনার আত্মহত্যা স্বাভাবিক পথ ধরেই এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রসাদপুরের কক্ষে গোবিন্দলালের নভেল পাঠ ও রোহিণীর সঙ্গীতচর্চার দৃশ্যের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছিল। তার কারণ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকেই তখন আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু মূল বই আরো খুঁটিয়ে পড়ে ঐ তুলনাকে পরিহার্য বলে মনে হচ্ছে। বরঞ্চ হত্যার ন্যায়সূত্র গোবিন্দলালের দিক থেকে এই : রোহিণী সম্বন্ধে গোবিন্দলালের প্রমত্ত স্পৃহা তখনও রয়েছে। কিন্তু সে স্পৃহার দেহগত সীমা গোবিন্দলালের কাছে স্পষ্ট। তা হলেও সে সীমার মধ্যেও এ স্পৃহা অধিকার-চেতনাশূন্য নয়। ভ্রমরের বিনিময়ে গোবিন্দলাল রোহিণীকে লাভ করেছে। গোবিন্দলালের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পত্তিবান মানুষও আছে। সে রোহিণীকে দেখে বিনিময়লব্ধ সম্পত্তির দৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে এদিক দিয়ে রোহিণীই তার শেষ সম্বল। ভ্রমরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মাধর্ম বোধও বিদায় নিয়েছে। এ-লোকের পক্ষে তখন সবই স্বাভাবিক। সুতরাং শেষ সম্বল রোহিণী প্রসঙ্গে যখন নিশাকর ঘটনার সূত্রপাত এবং জটিলতা এসেছে তখন সে রোহিণীকে হত্যা করেছে। তাই প্রবল ঈর্ষাই রোহিণী হত্যার কারণ। রোহিণীর সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ যে গোবিন্দলাল অন্তর দিয়েই শেষ পর্যন্ত অনুভব করতেন—সে আকর্ষণের গুণবিচার যাই হোক না কেন—তার একটা বড়ো নিদর্শন হল শেষ পরিচ্ছেদের নিচের অংশটুকু ;

> সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল ? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে,তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল তাহারা দুইজনে কথোপকথন করিতেছে।

এখন রোহিণীর দিক থেকেই বিষয়টি চিন্তা করা যাক। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের রসবিচার নির্ভুল। রোহিণী যে গোবিন্দলালের সঙ্গে স্বগ্রামত্যাগী হল সে গোবিন্দলাল যে প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দলালের খোলশ মাত্র এ-কথা

রোহিণী গ্রামত্যাগের মুহূর্তেই বেশ উপলব্ধি করেছিল। উপন্যাসে এ-কথা স্পষ্ট করে বলা না থাকলেও আকারে ইঙ্গিতে এ-কথা অনুমান করা চলে। রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীর তীরে প্রাণ সংশয়ের পর গোবিন্দলালকে বলেছিল—বড়ো তৃষ্ণা, সম্মুখে শীতল জল কিন্তু পান করার উপায় নেই। এই তৃষ্ণা প্রেম কিনা এ সম্বন্ধে সমালোচকেরা সন্দিহান হয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় রোহিণীর প্রসঙ্গে প্রেমের প্রশ্ন উত্থাপন করলে রোহিণীকে অনেকখানি সীমায়িত পরিসরের মধ্যে টেনে আনা হয়। রোহিণীর তৃষ্ণা কেবলমাত্র প্রেমতৃষ্ণা নয়। রোহিণীর তৃষ্ণাকে এক কথায় নাম দেওয়া যেতে পারে জীবনতৃষা। এ-ক্ষেত্রে প্রেমতৃষা জীবনতৃষার সম্যক্ পরিনিবৃত্তির সোপান মাত্র। প্রথম থেকেই রোহিণীর মনের মধ্যে এই পূর্ণ জীবন বাসনাই উপস্থিত। সে চোখের বালির বিনোদিনীর মতো মার্জিতরুচি নারী নয়। তথাপি বিনোদিনীর মতো তার তৃষ্ণাও শুধু প্রেমের তৃষ্ণা নয়। সে তার জীবন-বাসনাকেই তার জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী তার স্থূল ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছে।

> যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে করো ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপাল শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?

রোহিণীর এ মনোভাব হরলাল-আখ্যানের পরের কথা। রোহিণী উইল চুরি করতে রাজীও হয়েছিল হরলালের বিবাহিতা পত্নী হবার লোভে। এ দুটি মিলিয়ে দেখলে এটা স্পষ্ট হয় যে কাহিনীর প্রথম দিকে রোহিণীর মনে পূর্ণ জীবনবাসনাই সক্রিয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও রোহিণীকে প্রথম সংস্করণের পরে যে পরিবর্তিত করে চোর রোহিণীকে বর্তমান রোহিণীতে রূপান্তরিত করেছেন তাতে বোঝা যায় যে বঙ্কিম রোহিণীর এই অংশের ওপরে জোর দিতে চাইছেন। আনা কারেনিনার চরিত্র অঙ্কনের কালে টলস্টয়ও প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আনাকে এঁকেছিলেন নির্বোধ প্রগল্‌ভা, আড়ম্বরপ্রিয় মায়াবিনী তরুণী রূপে। মুদ্রিত গ্রন্থে আনার যে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিকৃতি তা টলস্টয় পরে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নির্মাণ করেন। এ সব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এক একটা চরিত্র এমন জীবনস্বভাবসম্পন্ন থাকে যে লেখকের সচেতন মনের প্রাথমিক অভিপ্রায়কে তারা পরাহত করে নিজ জীবনী শক্তিতে গড়ে উঠতে থাকে—শিল্পীর চেতন-অবচেতনের দ্বৈত লীলায়। এ ব্যাপারে লেখকের শিল্পবোধের সমগ্র অভিব্যক্তি

ঘটে। আর বা রোহিণীর চরিত্রে প্রথমাবধি হালকা সুর যোজনা করলে সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়াতো small matter। এই জীবনাকাঙ্ক্ষাতুরা রোহিণীরই ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি এল যে, গোবিন্দলাল যে বস্তু কামনা করছে সে রোহিণীর অন্তরে নেই, দেহে। বারুণী পুষ্করিণীর ঘটনার পর থেকেই তার এ বোধের সূত্রপাত। নইলে সে গিলটির গয়না ভ্রমরকে দেখাতে যেত না। সুতরাং বুদ্ধিমতী রোহিণীর পক্ষে প্রসাদপুরে পৌঁছে ঘটনার স্বরূপ উপলব্ধির আর কিছু বাকি ছিল না। রোহিণী গোবিন্দলালের সম্পত্তি। কিন্তু রোহিণীর প্রত্যাশা ছিল অন্য। অন্তত প্রথম দিকে। কিন্তু সে জানত সে প্রত্যাশা অপূরণীয়। কাজেই প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল অথবা নিশাকরে সূক্ষ্ম প্রভেদ তার পক্ষে সাজে না। এ কারণেই সে নিশাকর সম্ভাষণে গিয়েছিল। এর পরে হত্যার ঘটনা স্বাভাবিকভাবে এসেছে। সকল প্রত্যাশায় নিষ্ফল রোহিণীর নিশাকররূপ তৃণ সন্ধানের মধ্যেও রোহিণীর ঈষৎ ব্যঙ্গের সুর লক্ষণীয়। সে নিশাকরকে বলেছিল—একজনের জন্যে সে প্রসাদপুরে এসেছে। আর নিশাকরের জন্য সে নির্জন সাক্ষাতে এসেছে। এই বোধই তীব্র হয়ে উঠেছে মৃত্যুর মুহূর্তে। 'আমি তোমার কেহ নহি'—এই উক্তির মধ্যেই রোহিণীর জীবনের সকল ট্র্যাজেডি নিহিত হয়ে রয়েছে। রোহিণী বলেছিল, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী। এ আর প্রেমপিপাসিতার কথা নয়। দেহজীবা নারীর কথা। কৃষ্ণকান্তের উইলের অন্য দুটি প্রধান চরিত্রের মতো রোহিণী চরিত্রও বঙ্কিম প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। রোহিণী প্রথম উপস্থাপনা থেকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত এক অখণ্ড ন্যায়-পরম্পরায় গঠিত। সে ন্যায়-পরম্পরাকে খণ্ডিত করার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও ছিল না।

দশ

রাজসিংহ বঙ্কিমের এমন একখানি গ্রন্থ যার আলোচনায় সমালোচকের বিপথে যাবার আশঙ্কা স্বল্প। রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এ-ক্ষেত্রে পথ বেঁধে দিয়েছে। এবং রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস আলোচনার এমন একটা উচ্চতম নিদর্শন যে তারপরে আর রাজসিংহ সম্বন্ধে নতুনতর কিছু বলার প্রয়াস দুশ্চেষ্টা মাত্র। কেননা সে আলোচনা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি নিয়ে শুরু করতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করতে হবে। রাজসিংহ উপন্যাসের গঠন, তার ঘটনাগতি, চরিত্র-নির্মাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই সুন্দরতম

ব্যাখ্যাতা।

আমরা তাই এ আলোচনায় রাজসিংহ উপন্যাসের ইতিহাসরস বিষয়েই আমাদের বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখব। আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথেরই অপর একটি প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র সহায়তা আমরা গ্রহণ করব। ঐতিহাসিক রস নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে একটা কথা হল ইতিহাস এবং জনশ্রুতির সম্পর্ক। ইতিহাসতত্ত্ব-ইতিহাসরস নয়। উপন্যাসের কারবার রসকে নিয়ে, তত্ত্বকে সে সাহায্যার্থে আহ্বান করতে পারে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আজ যদি নবীন ঐতিহাসিক মহাভারতের কৃষ্ণ-বলরাম বিষয়ে অনেক নবীন তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করে তাহ্লেও বেদব্যাসের মহাভারতের বিলুপ্তি ঘটবে না। ইতিহাসবেত্তা নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের তথ্যের প্রামাণিকত্বকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেবেন। ইতিহাসবেত্তার তথ্য-বিস্মৃতিকে কেউ ক্ষমা করবে না এও সত্য কথা। কিন্তু যখন কোনো ঔপন্যাসিক ইতিহাসের কোনো খণ্ডাংশকে বিষয়ীভূত করে উপন্যাস রচনা করেন তখন তার কাছে ঐতিহাসিক বিষয়ানুগত্য আশা করি কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসায় অক্ষম হয়ে সার ফ্রান্সিস পালগ্রেভ বলেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের এবং গল্পের উভয়েরই শত্রু। অর্থাৎ ইতিহাসকে রক্ষা করতে গিয়ে গল্প এবং গল্পকে বাঁচাতে গিয়ে ইতিহাস এই শ্বশুরকুল পিতৃকুল উভয়েরই সর্বনাশ ঘটে।

স্বভাবতই এ আলোচনায় স্কটের আইভানহো আদর্শ নয়। কেননা যাঁরা নাকি ইওরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা যুগের সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তাঁরা যেন স্কটের আইভানহো পড়া থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয়ই সে জাতীয় উপন্যাস নয়। একটা জাতির উত্থান-পতন, ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের পতন অভ্যুদয় কেমন করে বিজড়িত হয়ে যায় ওঅর অ্যাণ্ড পীস নিশ্চয় তারই প্রমাণ। এবং ইতিহাসের মূল সুরকে বিকৃত না করে ইতিহাসের ঘূর্ণ্যমান চাকার রন্ধ্রপথে কেমন করে ঔপন্যাসিক স্বীয় কল্পনাকে বিকশিত করে তুলতে পারেন ওঅর অ্যাণ্ড পীস তারও প্রমাণ বটে। বলা বাহুল্য ওঅর অ্যাণ্ড পীস ইতিহাস-রসাশ্রিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখন ধ্রুপদী মর্যাদার অধিকারী। কট্টর ঐতিহাসিক ও গোঁড়া সাহিত্য প্রেমিক (জানি না এ দুই বস্তুই সম্ভব কিনা) উভয়েই টলস্টয়ের এই শ্বশুরকুল-পিতৃকুল রক্ষার (কথাটা রবীন্দ্রনাথের) অপূর্ব ক্ষমতায় ও মহাভারতকল্প ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

টলস্টয় ইতিহাস ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বলেছেন :

> The life of man is twofold—one side of it is his own personal experience, which is free and independent in proportion as his interests are lofty and transcendental, the other is his social life as an atom in the human swarm which binds down with its laws and forces him to submit them. For although a man has a conscious individual existence, do what he will, he is but the inconscient tool of history and humanity.

এইটুকুর জন্য অবশ্যই টলস্টয়ের সাক্ষ্য প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু ঠিক এর পরের বাক্য অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে মানুষের জীবনে অদৃষ্টের এবং অনিবার্যতার বিষয়টিকে টলস্টয় কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন :

> The higher he stands on the social ladder, the more numerous the fellow being whom he can influence, the more clearly do we perceive the predestined and irresistible necessity of his every action.

টলস্টয়ের জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কীর্তি বা যে কারণেই হোক না কেন মানুষের স্বাধীন সত্তা যতই সামাজিক ভাবে বড়ো জীবনকে আঁকড়ে ধরে ততই তার জীবন অনিবার্য ইতিহাসের নিয়মের বশীভূত হয়। এই নিয়মের বাইরে স্বাধীন মানবিক সত্তার অস্তিত্ব সে পরিমাণেই বিদ্যমান যে পরিমাণে তার interests are lofty and transcendental. ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে বোধহয় এ ধরনের স্বাধীন মানবিক সত্তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন প্লেটো ক্যারাটিয়েভ—যে স্থূল সাধারণ মানুষটির সঙ্গে নায়ক পিয়োরের বন্দীযাত্রার কালে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

টলস্টয়ের ইতিহাস ব্যাখ্যায় একটা প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপনযোগ্য। সামাজিক জীবন এবং মুক্ত ইচ্ছাময় জীবন বলে যে দুই ভাগ তিনি করেছেন তা বাস্তবে কতখানি সম্ভাব্য। বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ঘূর্ণনের কালে ব্যক্তির স্বাধীন বিমুক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কি একেবারে অস্পষ্ট থাকা সম্ভব? উক্ত ক্যারাটিয়েভ চরিত্রটির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষে আরো নানাভাবে

টলস্টয় হয়তো এ-কথা বোঝাতে চেয়েছেন—কিন্তু কার্যকারণ প [illegible] ই টা [illegible] যে ব্যক্তি এবং সম্রাট সকলেই ভেসে যায় এ-কথাকে টলস্টয় অ [illegible] পাল্টাতে পারেননি।

বলা বাহুল্য বঙ্কিমের এ-জাতীয় কোনো ইতিহাসদৃষ্টি ছিল না। তিনি মানুষের দ্বৈত জীবনের স্বরূপকে স্পষ্টত উপলব্ধির কোনো চেষ্টা করেননি; কিন্তু তাহলেও উপন্যাসের সাক্ষ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে বঙ্কিমেরও ইতিহাস চেতনা অনুরূপ খাতেই প্রবাহিত। যেমন মবারক-দরিয়ার উপাখ্যান। জেবউন্নিসার আখ্যান। জেবউন্নিসা যতক্ষণ অহংসর্বস্ব অন্তঃপুরচারী, লোভের, সংকীর্ণতার এবং শক্তিমদমত্ততার প্রতিভূ ততক্ষণ সে ইতিহাসের চালক এবং ইতিহাসের দ্বারা চালিত বটে। যে মুহূর্তে জীবনের আঘাতে ভাগ্য বিপর্যয়ের নিদারুণ দুঃখ রজনীতে তার সকল অহংকারের, প্রতিপত্তি-প্রিয় অভীপ্সার মূলে টান পড়েছে—সে যেখানে চাষার মেয়ের মতন কাঁদছে—সেখানে সে আর ইতিহাসের ঘটনার নিয়ামক জেবউন্নিসা নয়। প্রকৃতপক্ষে সে তখন সাধারণ নারী। নিরভিমান সাধারণ অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষকে ইতিহাস স্পর্শ করতে পারে না—যদি না বাইরের ঘটনার জাল তার ওপর বিস্তৃত হয়। যেমন চন্দ্রশেখর। জেবউন্নিসার কান্নার মুহূর্তে ইতিহাসের বৃহৎ দায় থেকে তার মুক্তি ঘটেছে। এটা তার মনুষ্যত্বেরও মুক্তি বটে।

টলস্টয় এবং বঙ্কিম উভয়েই ইতিহাসকে নিজ ব্যাখ্যায় আলোকিত করার পক্ষপাতী। সে ব্যাখ্যা তথাকথিত কল্পনা-শাসিত বলে তাকে ছোট করা যাবে না। কেননা এ-ক্ষেত্রে কল্পনা উৎকৃষ্ট মননসঞ্জাত বুদ্ধির বা অন্তর্দৃষ্টির নামান্তর। নেপোলিয়নের চেহারা টলস্টয় যেমন দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিকেরা সে বিষয়ে সকলেই কি একমত? ঐতিহাসিক প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা চলে যে অ্যাবট-এর লেখা নেপোলিয়নের জীবনীতে যে নেপোলিয়নকে পাই তার সঙ্গে বোরোদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে টলস্টয়ের আঁকা নেপোলিয়নের সাদৃশ্য কোথায়? সেনাপতি কুটজভের ভূমিকা নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে কী ছিল তার সম্বন্ধে টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত কোন্ ঐতিহাসিকের সঙ্গে মেলে, কার সঙ্গে মেলে না, তার কি কোনো স্থিরতা আছে? আসলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের অনুশাসনের মর্যাদা ঔপন্যাসিক সদাই মেনে চলবেন এ-রকম প্রত্যাশা কেউ করেন না। নিজ অন্তর্দৃষ্টি তথা কল্পনায় ঔপন্যাসিক এ-ক্ষেত্রে স্বাধীন। প্রশ্ন—কতখানি স্বাধীন? ইতিহাসের সত্যের যে কাঠামো, তার ব্যত্যয় না করা পর্যন্ত কতক্ষণ স্বাধীন?

পর্যন্ত ইতিহাসের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি লঙ্ঘন না করছেন, নেপোলিয়ন অথবা যুদ্ধবিমুখ, কুটজভ দেশদ্রোহী এমন কোনো সিদ্ধান্ত অচল। কেননা এখানেন লোক-মানব-বিধৃত সত্যকে তিনি আঘাত করলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বলা যায় যে ঔপন্যাসিকের স্বাধীন কল্পনা ইতিহাসের বৃহৎ সত্যের তটভূমিতে বাঁধা। নদী যেমন স্বেচ্ছাগামিনী হয়েও তটবন্দী, ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্পনাও তাই। সুতরাং রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচারও হবে সেই দৃষ্টিতেই। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় যে পদ্ধতিতে রাজসিংহ উপন্যাসের ইতিহাস-বিষয়ক ত্রুটি নির্দেশ করেছেন তাতে ইতিহাসের বিষয়ে বঙ্কিমের জ্ঞান আরো উন্নতির অপেক্ষা রাখত এ-কথা বোঝা গেল। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নটি খুবই সমীচীন। কবে জানা যাবে যে একটা বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তাদের শেষতম কথা বলা আজই হয়ে গেল? কোনোদিনই না। কাজেই প্রশ্নটা অন্যদিক থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কী ইতিহাস বঙ্কিম পরিবেশন করেছেন সেটা বিবেচ্য নয়—কী পদ্ধতিতে ইতিহাসের মূল সুরকে তিনি মানব-জীবনের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে মিলিয়েছেন—সেটাই বিচার্য। বলা যেতে পারে ঔরঙ্গজীবের সময়কাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণাবলী সক্রিয় হতে শুরু করল। বলা যেতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের মধ্যেও সে কারণের মূল অনেকখানি নিহিত ছিল। মনে হতে পারে যে ঔরঙ্গজীবের ন্যায় প্রবলপ্রতাপ মুঘল সম্রাটকে যেন বেশ কিছুটা অসহায় করে অঙ্কিত করা হয়েছে কিন্তু তার জন্যে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি সংগ্রহে কোনো লাভ নেই। বোরোদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন এবং কুটজভ উভয়কেই মনে হবে যুদ্ধের ব্যাপারে এ দুটো লোক একেবারেই বাহুল্য। যে বিপুল জনসমষ্টি সেই প্রান্তরে জড়ো হয়েছে তাদের প্রতিটি অংশের সম্মিলিত ও সমষ্টিগত চেহারাকে যেমন সেই বিপুল জনসমাবেশ চেনে না, তেমনি ঐ সেনাপতি এবং সম্রাটও চেনেন না। এর দ্বারা নেপোলিয়নকে হেয় করা হচ্ছে না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের পরিণতি যখন ঘটতে থাকে তখন তার সুবিপুল ঘূর্ণাবেগে সে অধ্যায়ের রচয়িতারাও কেমন অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায় সেটা দেখানো টলস্টয়ের উদ্দেশ্য ছিল। ঔরঙ্গজীবকে মুঘল অন্তঃপুরে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও উপস্থাপিত করেছেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা রাজসিংহ উপন্যাসের জনক। এই জনকেরও আর উপন্যাসটি দুই পরিচ্ছেদ অগ্রসর হবার পর সাধ্য

ছিল না যে ঘটনা প্রবাহ প্রত্যাহার করে নেয়। জেবউন্নিসা উদি·

ব্যাপারেও তাই। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাপারে স্বভা

উপাদান সক্রিয় হতে থাকবে। তারই সূত্রপাত জেবউন্নিসায় ও উদি·

মুঘল হারেম ও অন্তঃপুরের নানামুখী বিভিন্ন জটিলতার ব্যাপারকে স্পষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে কার্যকরী করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

ত্রুটি অবশ্যই জেবউন্নিসায়। জেবউন্নিসাকে এখানকার আলোকে বি

করে বঙ্কিম-সৃজিত চরিত্রের পৃথক মর্যাদায় বিচার করলে ইতি

জেবউন্নিসাকে হারিয়ে উপন্যাসের জেবউন্নিসাকে লাভ করা যায়।

নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের ক্ষতি।

যে রাজপুত-নীতি ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দা

রাজপুত-নীতিও ঔরঙ্গজীবের উগ্র অহং-এর ফল—বঙ্কিম এই রকম বুঝেছি

তিনি বুঝেছিলেন যে সম্রাটের প্রতাপাতিশয্যে ঔরঙ্গজীব বিদ্রোহীকে কি

সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যোধপুরীকে দেবার্চনা করতে দিতেন

তিনি সম্রাটের মহিমায় সেটা মঞ্জুর করতেন বলে। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় যে মুঘল সম্রাটকে ধর্মান্ধরূপে পাই তাকে বঙ্কিম এইভাবে রূপায়িত করেছেন। বলা যায় না কি ইতিহাসের প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অমান্য না করে বঙ্কিম মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একগুঁয়ে এবং জেদী ঔরঙ্গজীবকে, ধূর্ত ঔরঙ্গজীবকে রাজসিংহ উপন্যাসে ঠিক ভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং নানা কিছুর মধ্যে যেমন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অনুসন্ধান করা হয় বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় তার কোনোটিকেই অস্বীকার করা হয়নি। বরং নেপোলিয়নের মতোই মহামান্য মুঘল সম্রাটও কেমন ইতিহাসের ক্রীড়নক সাধারণ মানুষ সেটাই দেখানো হয়েছে। মনে রাখা দরকার টলষ্টয়ের হাতে ছিল Segur-এর Napoleon's Russian Compaign-এর মতো গ্রন্থ। বঙ্কিমের হাতে টড, অর্মা, মনুসী প্রভৃতি উপাদানগ্রন্থের সীমাবদ্ধতার কথা এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে। মবারক-জেবউন্নিসা কাহিনীর একটি পৃথক তাৎপর্য আছে। বিশেষত মবারকের চরিত্রকল্পনায় সে তাৎপর্য ধরা পড়ে। মবারকের প্রেমের সাফল্য তাকে সুখী করতে পারেনি। পুরুষের ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতম অংশ তার কর্মপ্রতিভা। সেখানে সে আহত হলে প্রেমের রক্ত রাগে সে ঔজ্জ্বল্য হারানোর দুঃখ ঘোচে না। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের যে দায়িত্ব অপালিত থেকে গেল সে দুঃখের বিমর্ষতাটা মবারককে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেছে। অপরদিকে

পঙ্কাবলম্বনসা বঙ্কিমের পিতৃদ্রোহিণী নায়িকা। চঞ্চলকুমারীর ম্লান পিতৃআনুগত্যের …নায়িকায় জেবউন্নিসার পিতৃ ইচ্ছা লংঘন উজ্জ্বল হয়েছে বটে—কিন্তু তা জয়ী … পারেনি।

এগারো

…র, রজনী, আনন্দমঠ, সীতারাম প্রমুখ বঙ্কিমের অন্য সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে … পৃথক আলোচনা করলাম না। এর কারণ এগুলিকে আমরা অনালোচ্য …নে করি এমন নয়। আমরা বঙ্কিম-প্রতিভাকে প্রধানত বুঝতে চেয়েছি …ন্সের শিল্পস্রষ্টা হিসাবে। যে চারখানি উপন্যাস আমরা আলোচনা করলাম …র শিল্পী-জীবনের সম্যক্ শক্তির (এবং দুর্বলতার) দিক থেকে তারা …নিধিস্থানীয়। বঙ্কিম যে কারণে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রসস্রষ্টা হিসাবে …য়ী মর্যাদা পাবেন সে কারণগুলির সবকটিই আমাদের আলোচিত গ্রন্থে …ত

আমরা যা আলোচনা করলাম তার মূল কথা এই যে, বঙ্কিম ভারতবর্ষের জীবনকে, তার বহুকালগত জীবনাচরণকে নবকালের ঘাত-প্রতিঘাত সমেত উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন ও করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের সমস্যারম্ভের মূলে রয়েছে জীবনযাপনের মূলসূত্রগুলিতে কোনো না কোনো প্রকার ব্যত্যয়। বঙ্কিমের কালে এই বিষয়বস্তুর যে মূল্য ছিল তার সীমার বাইরে এসেও যে বঙ্কিমের সাহিত্যকর্মের মূল্যহানি হয়নি এর কারণ জীবনকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম দু-হাতে ছুঁয়েছিলেন। মানুষের যন্ত্রণাকে, বাসনাকে, বাসনার অচরিতার্থতা-জনিত অশ্রুকে বঙ্কিম কখনও ছোট করে দেখেননি। বরং মানুষের জীবনযাপনে, কর্মে, ধ্যানে এদের প্রভাব কতখানি বস্তুত অপরিহার্য সে-কথাই বলেছেন তাঁর সৃজিত চরিত্রের মাধ্যমে। জীবনই সত্য এবং জীবনাতীত জীবনাতীতই থাকে তা নিয়ে জীবনের কোনো সান্ত্বনা নেই—সচেতন ভাবে বঙ্কিম এ-কথা বলেছিলেন। তাই "তিনিই আমার ভ্রমর, ভ্রমরাধিক ভ্রমর" গোবিন্দলালের সন্ন্যাস-জীবনের এই উক্তিতে পৃথিবীর ভালবাসার অমর স্মৃতিই প্রতিধ্বনিত হয়। তাই শৈবলিনীকে ভালবাসে কি না সন্ন্যাসীর এই জিজ্ঞাসায় প্রতাপ যখন ভীমগর্জন করে বলে ওঠে—তাহা তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী—তখনও সেই জীবন-স্মৃতিই শেষবার কথা কয় প্রতাপের কণ্ঠে। জীবনকে বোঝবার অনলস বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টায় বঙ্কিমের শিল্প প্রচেষ্টার ও নৈতিক সচেতনতার মূল্য।

হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি হিসাবে তাঁর লক্ষ্য বিষয়ের আন্তর সত্তাকে বিষয়ীর নিজের স্বায়ে আবিষ্কার, ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর লক্ষ্য বিষয়-ব্যক্তি-ঘটনার অন্তরকে নিজ মননের স্নায়ে প্রতিফলিত করা। একই লক্ষ্যভেদের পদ্ধতি কাব্যে কবির স্নায়ে, উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের স্নায়ে সক্রিয়। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য-কর্মের মূল সূত্রই হল জগৎ-জীবনের সমগ্রতাকে শুদ্ধভাবে ধারণ। এই প্রয়াসে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টিই তাঁর সহায়। কবিত্ব বা ঔপন্যাসিকত্ব এ সমস্ত একেবারে এ প্রসঙ্গে বাইরের কথা। এই অন্তর্দৃষ্টি বুদ্ধদেববাবু ন্যায়তই বলতে পারেন কল্পনা। কিন্তু এ-কল্পনা বিষয়ানুরঞ্জিনী নয়। বিষয়-স্বরূপ উদ্ঘাটিনী। রবীন্দ্রনাথ যে versatile হবার জন্যই কখনও ছবি, কখনও গান বা কখনও গল্প, কখনও উপন্যাসে হাত দেননি, তাঁর কোনো কিছুই যে একটা কিছু হয়েও আর একটা কিছু হবার জন্য নয়, জানি না এ-কথা আমরা কবে বুঝব। কবে বুঝব শিল্পসূত্রে জীবনের নিহিত সমগ্র শুদ্ধ স্বরূপকে ধারণ করার যন্ত্রণাবেগেই তাঁর বার বার সমুদ্রাভিযান এবং সে সমুদ্র জীবন? তাঁর উপন্যাসের ত্রুটি আবিষ্কারে এই যে সরলীকরণ—কবি আর কথাশিল্পীর অসঙ্গতি—এর উদ্ভব হচ্ছে ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দৃষ্টিকে না বোঝা থেকে। ব্যক্তির জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তার অস্তিত্বের যে যন্ত্রণা—সেটাকে সমাজ সভ্যতা নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সেই শুদ্ধতাকাঙ্ক্ষী যন্ত্রণাকে উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। তাই বুদ্ধদেববাবু যখন বলেন—"ভিতরকার কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পে", তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য—তখন বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গোরার টানাপোড়েনের সহযোগী কি রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব? চতুরঙ্গের শচীশ ও দামিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক নিরীক্ষাও প্রশ্রয় পাচ্ছে কবিত্বের কাছ থেকে? কুমু গান জানে এবং বিপ্রদাস সেতার বাজায় বলেই কি যোগাযোগের জীবন-নাট্যের অপরিহার্য টানকে কবিত্বের টান বলব? রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকারা রবীন্দ্রনাথের বাংলায় স্বগত চিন্তা করেছে শুধু এই দেখেই কি মনে করব যে তাঁর উপন্যাস কবি-স্বভাবের অনুকূল? নাকি দেখব যে বাংলা উপন্যাসে উপন্যাসের একটা নতুন মানে তিনি নিয়ে এলেন জীবনোৎসারিত ঘটনার মানসিক তাড়নায় পাত্রপাত্রীর নানা আক্ষেপে, নানা মোচড়ে, নানা মোড় ফেরায়—যেখানে হয়তো ঘটনার রূপ পাল্টেছে (এ-বিষয়ে আমরা পূর্বে বলেছি) কিন্তু তা "ছল" (বুদ্ধদেববাবুর উক্তি) নয়।

দুই ॥ "কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে নৌকাডুবির কৃত্রিমতা।" যেন নৌকাডুবিতে কবিত্বকে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুটা উদ্দীপিত করতে পারতেন তাহলেই কেটে যেত উক্ত উপন্যাসের কৃত্রিমতা। অথচ একটু মনোযোগী হলেই বুদ্ধদেববাবু দেখতে পেতেন যে নৌকাডুবির ব্যর্থতার কারণ তার কাহিনীর ঘটনা-বাহুল্যের মধ্যে বা কাহিনী-রসের মধ্যে নেই। বাইরের দিক থেকে জটিল এই কাহিনী অন্তরের দিক থেকে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বাইরের দিক থেকেই সরল—ভিতরে ভিতরে এর প্রক্রিয়ার নানামুখী জটিলতায় উপন্যাসের প্রাণ, সেখানেই এ কৌতূহলের স্রষ্টা, নৌকাডুবিতে এটি ঘটেনি। এখানে আকস্মিক ঘটনা থেকে যে সমস্যা উদ্ভূত হল তার মূল ব্যক্তিমানসের গভীর উৎসে নয়, ব্যক্তিত্বের গোটা সমস্যার সঙ্গে তার কোনো যোগ আছে কিনা তাও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি। এ-কারণেই এটা খুব সীমিত ব্যাপার।

তিন ॥ "...আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি ঘরে বাইরের আতিশয্য।" রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে নিখিলেশের আর্তনাদকে অথবা বিমলার স্বভাবানুযায়ী উচ্ছ্বাসময় আত্মকথনকে বুদ্ধদেববাবু মনে করেন কবিত্বের আতিশয্য। তিনি ভুলে গেলেন যে এখানে তিনজন পাত্রপাত্রী আত্মকথনে রত। তারা তাদের চরিত্রের ন্যায় রক্ষা করে নিজেদের ব্যক্ত করবে এখানে এটাই কাম্য। নাটকের উদ্দিষ্ট ভাবপ্রবণ কোনো চরিত্রের জন্য আমরা নাট্যকারকে ভাবপ্রবণ বলি না। বরঞ্চ ঘরে বাইরের ব্যর্থতার মূল সন্ধান আর একটু অভিনিবেশের সঙ্গে করলেই দেখা যায় যে প্রস্তাবিত বিষয় থেকে পশ্চাদপসরণের ফলেই এই উপন্যাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। যে ত্রিমুখা চাপে উপন্যাসের ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় থাকত, রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের বেলায় সে ভারসাম্যের ব্যত্যয় ঘটালেন। ফলে এই উপন্যাস নষ্ট হয়েছে। উপন্যাস নষ্ট হওয়ার পর তাকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের শুশ্রূষা প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি যে কবিতা সর্ব-রোগহর বিশল্যকরণী নয়। সর্বোপরি, বিশল্যকরণীও অমূল-লতা নয়। তিনি এ উপন্যাসের দৃঢ়বন্ধ মৃত্তিকায় কবিত্বকে প্রোথিত করে, উপন্যাসের সমগ্রে তাকে মিলিয়ে দিতে পারেননি। শিল্পের গূঢ় নিয়ম নিয়তির মতোই দুরতিক্রম্য। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকেও আত্মবলি দিয়ে তার অবহেলার খেসারত পোয়াতে হয়।

চার ॥ ঠিক সে কারণেই "তার কথাসাহিত্যের একটা বড়ো রকমের প্রতিপত্তির

কারণ তাঁর কবিত্বগুণ" এ-কথাটার অর্থও খুব পরিষ্কার নয়। এই লক্ষ্যহীন, দুর্বল বাক্যে বুদ্ধদেববাবু যে 'প্রতিপত্তি' কথাটি ব্যবহার করেছেন তার অর্থ কী? তিনি যদি বলতেন যে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান মূল্যের কারণ তাঁর কবিত্বগুণ, তাহলে তাঁর বক্তব্যের যা হোক একটা অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তিনি বলেছেন 'বড়ো রকমের প্রতিপত্তি'। কার কাছে প্রতিপত্তি? বুদ্ধদেববাবুদের মতো অগ্রণী পাঠকদের কাছে? আমার ধারণা তাঁর শ্রেণীর পাঠকেরা কেউই তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রতিপত্তির কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধানত কবিত্বের উল্লেখ করবেন না। আর প্রতিপত্তি কথাটি তো আশ্চর্য কথা। শেক্‌স্‌পীয়রের কালে তাঁর নাটকেরও একটা বড়ো রকমের প্রতিপত্তির কারণ ছিল—অন্তত সে আমলের প্রাকৃত দর্শকমণ্ডলীর কাছে,—শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের খুন-জখম, ভূত প্রেত, ডাইনী প্রভৃতি। নিশ্চয় এই প্রতিপত্তির কারণটাই শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের সাফল্যের কারণ নয়। বুদ্ধদেববাবু কি সে জন্যই সাফল্য কথাটি পরিহার করে প্রতিপত্তি কথাটি ব্যবহার করেছেন?

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শেষরক্ষারও ব্যত্যয় যেখানে যেখানে ঘটেছে—গোড়ায় গলদই সেখানে একমাত্র কারণ। কবিত্ব সেই গোড়ায় গলদের ফল। কারণ নয়। চোখের বালি, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ—বলা যায় গোরা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রধান উপন্যাসেই শেষরক্ষা হয়নি। উপন্যাসের সমাপ্তিতে এই দুর্বলতার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় দায়ী করব। কিন্তু তাঁর সমস্ত উপন্যাসের যে স্বভাব তাকে ভুলে যাব না। ভুলে যাব না রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার স্বভাবকে। বিষয়কে—অন্তত উপন্যাসে—নিরীক্ষাশালায় নিক্ষেপ করতে রবীন্দ্রনাথ সদাই ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্য দেখা যায় যে ব্যক্তি-স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ যে রকম পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন আর কোনো বাঙালী ঔপন্যাসিকের সে রকম সাহস নেই। এই পরীক্ষার প্রমাণ নিখিলেশ, কুমু, শচীশ। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্নেই বরং বলা যায় যে শরৎচন্দ্র-বিষয়ক জনশ্রুতিটা ভুল। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা রবীন্দ্রনাথই উত্থাপন করেছিলেন—শরৎচন্দ্র তাকে চাপা দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, সব নিরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের শেষ হয়নি। সব নিরীক্ষা শেষ করার ক্ষমতাও রবীন্দ্রনাথের ছিল না। যেগুলো অসমাপ্ত সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতাও যেমন প্রকট—সবলতাও তেমন। যে বলিষ্ঠতায় তিনি যোগাযোগের বিষয়কে ধরেছেন, বিষয়বস্তুর সেই উত্থাপনা। বলিষ্ঠতা

সদাই স্মরণীয়। পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। আমাদের ধারণা জটিলতার দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় গোরা ন্যূন বলেই গোরার উদ্দিষ্ট সাফল্য রবীন্দ্রনাথের করতলগত হইয়েছে। যোগাযোগ এবং চতুরঙ্গে বিষয় ছিল শিল্পীর কাছে দুরতিক্রম্য গৌরীশৃঙ্গ। তাই সেখানে এসেছে ব্যর্থতা। পরিসমাপ্তিতে দুর্বলতা। কিন্তু এটাও তো ঠিক কথাই যে সুগোল এবং নিখুঁত পরিসমাপ্তিই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের সার কথা নয়। জীবনের মতো শিল্পেও ব্রাউনিঙের আপ্তবাক্য ব্যর্থ নয়। প্রচেষ্টার গভীরতায় ও তাৎপর্যেও শিল্পীর একটা বড়ো রকমের বিচার বটে। আর রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাও সেই কারণেই আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকদের কাছে যথেষ্ট শিক্ষাদাতা—যাকে বর্তমানের বাঙালী কথাশিল্পীর বৃহৎ অংশ সাফল্য-ব্যর্থতাসমেত এড়িয়ে চলেছেন। তারা বুঝলেন না যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় প্রশ্নকে বিশিষ্ট রূপে উত্থাপিত করতে।

তিন

এই আলোকেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বাণী-ভঙ্গিমাও আলোচিত হওয়া উচিত। যেহেতু উপন্যাসের ভাষা শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভাষা বিষয়ে কিছু আলোচনা আমরা করেছি এবং পরে গোরা প্রমুখ উপন্যাসের বিষয়ে এ-আলোচনা বিস্তৃত ভাবে করার বাসনা রইল, সেহেতু এখন শুধু এ-আলোচনার প্রসঙ্গটুকু ধরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হব। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্য-ধর্মিতা বিদ্যমান। এবং এও জানি যে কাব্যধর্মিতা ও কাব্য এক কথা নয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিপিকার গদ্য এবং ক্ষুধিত পাষাণের গদ্যের প্রতিতুলনা করে দেখিয়েছেন যে লিপিকার সরল গদ্যের মধ্যেও যে কাব্য, তার মূল খুঁজতে হবে লিপিকার আত্মায়। আমরা যখনই কোনো গদ্য-রচনায় কবিত্বের কথা বলে থাকি সেটা এই আত্মার ব্যাপার। কাব্যধর্মী ছোপের ব্যাপার নয়। অতিথি গল্পের বিষয়বস্তুতে রয়েছে কবিত্ব। কপালকুণ্ডলার মতো কাব্য সেখানে সমস্ত শিল্পসৃষ্টি প্রক্রিয়ারই নিয়ামক। যে প্রেরণায় ও নিষ্ঠায় সেখানে শিল্পকর্মকে ধারণ করা হয়েছে সে প্রেরণা ও নিষ্ঠা কাব্যোৎসারিত। এই প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নয়। সেখানে পুরোদস্তুর ব্যক্তিস্বরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর-পরিক্রমা বিদ্যমান।

সে কারণে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষায় যেমন মুড অনুযায়ী বহুচারিতা, উপন্যাসের ভাষার আদর্শ তা নয়। কৌতুকে, ব্যঙ্গে, স্বচ্ছন্দ-বলতায়, রসোজ্জ্বলতায় ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ নানা চাল দেখিয়েছেন। কখনো কৃত্রিম গাম্ভীর্যে কৌতুকময় (প্রায়শ্চিত্ত), কখনও সরল নিরলংকার কাব্যে সমৃদ্ধ (মণিহারা)। ছোটগল্পের নানা মুড অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গদ্যের এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে—বুদ্ধদেব বসুর গল্পগুচ্ছের আলোচনা এ প্রসঙ্গে বার বার স্মরণীয়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষায় দেখা যায় অন্য গুণ। ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তির সঙ্গে অপূর্ব আত্মীয়তা রক্ষা করে চলে এই ভাষা। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর প্রয়োজনে এ-ভাষা উচ্ছ্বাস এবং প্যাশনকে প্রশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যধর্মিতায় প্লাবিত হয়নি। বরঞ্চ ঔপন্যাসিকের দৃঢ় অনুশাসন এর সর্বত্র উপস্থিত। উপন্যাসের প্রয়োজনেই এ হতে পারে উপমাময়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—

> সকলে দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনোও মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমা প্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনি মাধুর্যের তাগিদে

এবং আমরা দেখেছি যে প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের উপমাময়তা কতখানি অর্থবহ হতে পেরেছে। (পরবর্তী অধ্যায়ে গোরা আলোচনা দ্রষ্টব্য) এবং এটাও ঠিক কথা যে রবীন্দ্রনাথের গদ্যোপমা তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলে। তাহলে উপন্যাসে নিশ্চয় উপন্যাসের বক্তব্য পরিস্ফুট করাই তার কাজ। কিন্তু জানি এ-বক্তব্যে বাইরের ঘটনা প্রধান নয়। কাহিনীগামিনী চিন্তা নয় তাঁর। বরং মনেরই বিচিত্র আক্ষেপ, তাড়না, যন্ত্রণা, মোচড় তাঁর বিষয় বা বক্তব্য। কাজেই এখানেও তাঁর ভাষায় উপমাপ্রদানের পদ্ধতিতে মনেরই সূক্ষ্মতার অভিব্যক্তি ঘটে। পাত্র-পাত্রীর মনের টান ফুটে ওঠে ভাষায়। যেখানে সে টান কৃত্রিম, সেখানে ভাষাও কৃত্রিম। যেমন শেষের কবিতা। যেখানে সে টান জোরালো সেখানে ভাষাও বেগবতী। যেমন চতুরঙ্গ।

চার

চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম

উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্র-পাত্রীকে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনীর ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তাঁর শক্তি এবং শক্তির সীমা দুয়েরই আভাস পাওয়া গেল। অথচ এর জন্যে রবীন্দ্রনাথকে আগাগোড়া নতুন হতে হয়নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতম লেখাও নয় চোখের বালি। সেদিক দিয়ে বরঞ্চ নষ্টনীড় অনেক সাহসিক পদক্ষেপ। তথাপি চোখের বালিতেই জানা গেল রবীন্দ্রনাথ আর বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি লিখবেন না। জানা গেল যে বাংলা উপন্যাসের তখনও-পর্যন্ত-প্রচলিত ছক ভেঙে তিনি এবার এগোবেন।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ ছায়া চোখের বালিতে দৃশ্যমান, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে ছায়া বিলীয়মান এবং অবসন্ন। যদি পুরনো কালের অনুসরণে আমরা বিষয়বস্তুর আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই কৃষ্ণকান্তের উইলের সঙ্গে চোখের বালির বিষয়ের সাদৃশ্য বর্তমান। একটি বিবাহিত দম্পতির জীবনে একটি নারী, যে বিধবা, সে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল এবং নিজের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল এটাই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু আমরা আগেও বলেছি যে এভাবে বিষয়বস্তু বিচার সম্ভব নয়—এখানেও আলোচনা করে দেখাব যে এই দৃশ্যত সাদৃশ্যেরও কোনো অর্থ নেই। যদিও কৃষ্ণকান্তের উইলের বেড়াল মারতে গিয়ে ভ্রমরের নিজের মাথায় লাঠি মেরে বসার মতো এ-উপন্যাসেও খাঁচার ভিতর থেকে মরা পাখি আবিষ্কারে ইঙ্গিত দানের চেষ্টা বিদ্যমান; যদিও মুগ্ধা নায়িকা আশার সঙ্গে বিনোদিনী-ভাবাতুর মহেন্দ্রের দাম্পত্য প্রেমের লীলায় মুগ্ধ ভ্রমর ও গোবিন্দলালের চুম্বনদৃশ্যের কথা মনে পড়বে, যদিও বিনোদিনীর আচারে-ব্যাবহারে লজ্জাশীলা গ্রাম্য বধূর চেয়ে প্রেমবাসনাতুরা প্রগল্‌ভা রোহিণীর ছায়া অধিক স্পষ্টতর, তথাপি এ সমস্তই বাইরের ব্যাপার। বিধবা হলেই ক্ষুধিতহৃদয়া হবে—বিশেষ যদি যুবতী হয়—এ হল বাংলা নভেলের ত্রিকালগত ধারণা। রোহিণী থেকেই সে ধারণা চলে আসছে। এবং সেই সব উপন্যাসসম্ভব বিধবাদের উপন্যাসে উপস্থাপিত করার কৌশলটিও লক্ষণীয়। ভ্রমরের সুখ দেখে রোহিণীর মনে ক্ষুধার জ্বালা জাগ্রত হয়েছে। তারও মনের মধ্যে, সম্মুখে এক দম্পতির পূর্ণ জীবন দেখে, সুখ বাসনার সঞ্চার হয়েছে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই—

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময়

মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জলিয়া উঠিল।… …

তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। যেদিকে চায় তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।

স্মরণীয় যে রোহিণী এই ভাবেই চিন্তা করেছিল—গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী আমাপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী? সুতরাং এখানেও বিনোদিনীর উপস্থাপনাতে রোহিণীর ছায়া মনে আসে। আবার গিলটির গয়নার প্রসঙ্গে রোহিণীর যে ব্যাপিকা মনোভাব—মহেন্দ্রর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহারে বিনোদিনীতেও তারই স্মৃতি। রোহিণীর নির্লজ্জতা আর বিনোদিনীর নির্লজ্জতা একই সূত্রে যেন বিধৃত হয়ে রয়েছে এ-কথা কখনো কখনো না মনে হয়ে যায় না। রোহিণীর অপরের সর্বনাশের ইচ্ছা এবং বিনোদিনীর সকল কিছুর ধ্বংস বাসনা তুলনীয়:

ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকে সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদের পরাস্ত, ধূলি-লুন্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

লক্ষণীয় যে রোহিণী এবং বিনোদিনী উভয়েই নিজ জীবনের নিরুপায় তৃষ্ণার কথা স্মরণ এবং স্বীকার করেছে। বারে বারে বিভিন্নভাবে। বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের সংসার ছেড়ে যুগল যাত্রায় রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসাদপুর যাত্রার কথা স্মরণীয়।

শুধু এইটুকুতে নয়, আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে উপন্যাসের জটিলতায় গ্রন্থিবৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু কিছু গত শতাব্দীর জের তখনও রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। চিঠি ধরা পড়া, অসতর্ক প্রেম-ঘন-মুহূর্তে অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া এ-সবই সেই আকস্মিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীলতা এ-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনা-লক্ষণ একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনা ও লক্ষণ। ছায়া যেটুকু বঙ্কিমের তা

যত দীর্ঘ হোক উপন্যাসের স্বাধীন ছন্দকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে চোখের বালি সম্বন্ধে এবং এই সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার নিজেই ব্যাখ্যা করতেন এ-কথা সুবিদিত। বঙ্কিম যেমন উপন্যাসের গতিকে থামিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কৈফিয়ত দিতেন—কেন এরূপ ঘটিল রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেভাবে ব্যাখ্যা দিতেন না, কিন্তু গুরুনির্ভর দেশে গুরুব্যাখ্যা না হলে বোধহয় আশ মেটে না। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই যে এ-ব্যাখ্যা নির্ভুল হতে পারে না এ-নিদর্শনও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত চোখের বালির টীকা গ্রহণেও এই গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।

এই ভ্রান্তিসৃজনী বিবৃতিটির জন্যই চোখের বালিকে বহু অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এখনি আমরা আলোচনা করব যে এই বিবৃতিটির একটি কথাও সত্য নয়। এই ক্ষুদ্র মন্তব্যের ফলে চোখের বালি সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশার পাহাড়ে চড়ে বসে। অথচ চোখের বালিতে তার সমর্থন নেই। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীর সূত্রে যে-সব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হল মায়ের ভূমিকা সে অভিজ্ঞতা রচনায় কতটুকু দায়ী? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন যে মায়ের ঈর্ষা সমস্ত ব্যাপারটাকে দারুণ করে তুলেছে—ঈর্ষার সে জাতীয় কোনো স্থায়ী ভূমিকা ছিল কিনা? চোখের বালি দুটি প্রশ্নেরই না-বাচক উত্তর দেবে। রাজলক্ষ্মীর গ্রাম-বাস গমনের পশ্চাতে অবশ্যই পুত্রের প্রতি বিরক্তি, এবং আশার পুত্রবধূ হিসাবে অক্ষমতা প্রধানত তার মূলে। এখানে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, বিশেষ বিনোদিনীর আতিথেয়তায়-সেবায় আশার বিপরীত তুলনা রাজলক্ষ্মীর মনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ঈর্ষার ভূমিকা এইটুকুই। বিনোদিনীকে রাজলক্ষ্মী গ্রাম থেকে প্রত্যাগমনের সময় কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেন নিয়ে এলেন, নিয়ে আসার পশ্চাতে কোনো আজ্ঞা, কোনো উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং মায়ের ঈর্ষায় বিনোদিনীকে আশার বিকল্প হিসাবে (মহেন্দ্রের বধূর বিকল্প নয়, পুত্রবধূর বিকল্প) কলকাতার বাড়িতে আনা হল এ-কথা

মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।·· ···

তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায় তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।

স্মরণীয় যে রোহিণী এই ভাবেই চিন্তা করেছিল—গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী আমাপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী? সুতরাং এখানেও বিনোদিনীর উপস্থাপনাতে রোহিণীর ছায়া মনে আসে। আবার গিলটির গয়নার প্রসঙ্গে রোহিণীর যে ব্যাপিকা মনোভাব—মহেন্দ্রর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহারে বিনোদিনীতেও তারই স্মৃতি। রোহিণীর নির্লজ্জতা আর বিনোদিনীর নির্লজ্জতা একই সূত্রে যেন বিধৃত হয়ে রয়েছে এ-কথা কখনো কখনো না মনে হয়ে যায় না। রোহিণীর অপরের সর্বনাশের ইচ্ছা এবং বিনোদিনীর সকল কিছুর ধ্বংস বাসনা তুলনীয়ঃ

ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকে সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যে যাহা চায় তাহাতেই বাধা? কোনো কিছুতেই কি সে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। সুখ যদি না পাইল তবে যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়, যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত সম্ভবপর সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদের পরাস্ত, ধূলি-লুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।

লক্ষণীয় যে রোহিণী এবং বিনোদিনী উভয়েই নিজ জীবনের নিরুপায় তৃষ্ণার কথা স্মরণ এবং স্বীকার করেছে। বারে বারে বিভিন্নভাবে। বিনোদিনী এবং মহেন্দ্রের সংসার ছেড়ে যুগল যাত্রায় রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসাদপুর যাত্রার কথা স্মরণীয়।

শুধু এইটুকুতে নয়, আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে উপন্যাসের জটিলতায় গ্রন্থিবৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু কিছু গত শতাব্দীর জের তখনও রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। চিঠি ধরা পড়া, অসতর্ক প্রেম-ঘন-মুহূর্তে অপরের দৃষ্টিগোচর হওয়া এ-সবই সেই আকস্মিক ঘটনার ওপর নির্ভরশীলতা এ-কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এ-সমস্ত ঘটনা-লক্ষণ একান্ত ভাবে বাইরের ঘটনা ও লক্ষণ। ছায়া যেটুকু বঙ্কিমের তা

যত দীর্ঘ হোক উপন্যাসের স্বাধীন ছন্দকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজে চোখের বালি সম্বন্ধে এবং এই সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখার নিজেই ব্যাখ্যা করতেন এ-কথা সুবিদিত। বঙ্কিম যেমন উপন্যাসের গতিকে থামিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কৈফিয়ত দিতেন—কেন এরূপ ঘটিল রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেভাবে ব্যাখ্যা দিতেন না, কিন্তু গুরুনির্ভর দেশে গুরুব্যাখ্যা না হলে বোধহয় আশ মেটে না। অথচ প্রতি ক্ষেত্রেই যে এ-ব্যাখ্যা নির্ভুল হতে পারে না এ-নিদর্শনও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত চোখের বালির টীকা গ্রহণেও এই গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। সেই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে।

এই ভ্রান্তিসৃজনী বিবৃতিটির জন্যই চোখের বালিকে বহু অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। এখনি আমরা আলোচনা করব যে এই বিবৃতিটির একটি কথাও সত্য নয়। এই ক্ষুদ্র মন্তব্যের ফলে চোখের বালি সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশার পাহাড়ে চড়ে বসে। অথচ চোখের বালিতে তার সমর্থন নেই। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীর সূত্রে যে-সব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হল মায়ের ভূমিকা সে অভিজ্ঞতা রচনায় কতটুকু দায়ী ? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেছেন যে মায়ের ঈর্ষা সমস্ত ব্যাপারটাকে দারুণ করে তুলেছে—ঈর্ষার সে জাতীয় কোনো স্থায়ী ভূমিকা ছিল কিনা ? চোখের বালি দুটি প্রশ্নেরই না-বাচক উত্তর দেবে। রাজলক্ষ্মীর গ্রাম-বাস গমনের পশ্চাতে অবশ্যই পুত্রের প্রতি বিরক্তি, এবং আশার পুত্রবধূ হিসাবে অক্ষমতা প্রধানত তার মূলে। এখানে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষার ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন, বিশেষ বিনোদিনীর আতিথেয়তায়-সেবায় আশার বিপরীত তুলনা রাজলক্ষ্মীর মনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ঈর্ষার ভূমিকা এইটুকুই। বিনোদিনীকে রাজলক্ষ্মী গ্রাম থেকে প্রত্যাগমনের সময় কলকাতায় বাড়িতে নিয়ে এলেন। কেন নিয়ে এলেন, নিয়ে আসার পশ্চাতে কোনো আশা, কোনো উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং মায়ের ঈর্ষায় বিনোদিনীকে আশার বিকল্প হিসাবে (মহেন্দ্রের বধূর বিকল্প নয়, পুত্রবধূর বিকল্প) কলকাতার বাড়িতে আনা হল এ-কথা

কী প্রমাণে বিশ্বাস করা যায়? যদি ধরা যায় যে তখনও মায়ের ঈর্ষা কার্যকরী ছিল, কেননা বিনোদিনীকে মহেন্দ্র দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলাতে রাজলক্ষ্মী বললেন—'ও বেহারি তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক যা হউক আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনও পাই নাই।' তা হলেও এ ঈর্ষার মূল্য কতটুকু? প্রথম কথা এটা ঈর্ষা না অভিমান? বৃদ্ধবয়সে সেবা-বাসনাতুরা শাশুড়ীর অভিমানের সুরই এরই এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে অধিকতর। এ অভিমানের ভূমিকা এ-উপন্যাসের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে একটা সামান্য অংশ দাবি করতে পারে—তার বেশি নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মায়ের ঈর্ষা। মায়ের ঈর্ষা হলে পুত্রের ওপর অপরের অধিকারকে—এখানে বধূর অধিকারকে বিচলিত করার একটা সচেতন প্রয়াস, অথবা অচেতন বাসনা সদাই লক্ষ্য করা যেত। রাজলক্ষ্মীর উদ্ধৃত উক্তি থেকে দেখা যায় এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যেই তাঁর ছিল না। শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর একটা অধিকার মনে মনে সাব্যস্ত করে আছেন। আশা সেদিক দিয়ে তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছে। বিনোদিনীকে দিয়ে তিনি সেই সাধটুকু মেটাতে চান। শাশুড়ী হিসাবে পুত্রবধূর ওপর তাঁর অধিকার-চেতনাই এখানে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মা হিসাবে নয়। কাজেকাজেই, বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্রের মধ্যে কোনো ছায়া বিস্তার করে এ-জাতীয় চিন্তা রাজলক্ষ্মীর ছিল না। রাজলক্ষ্মী যে বিনোদিনীকে আশার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলেন—('তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থঘরে ছিলে—আজকালকার চাল-চলন জানো না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিও')—তার মধ্যেও রাজলক্ষ্মীর ব্যর্থ শাশুড়ীর অধিকার-চেতনাই প্রকট। বিনোদিনী একমাত্র তাঁরই অনুগত থাকুক। আশার ব্যাপারে তার যেন আকর্ষণ না থাকে এই ছিল রাজলক্ষ্মীর অভিপ্রায়। পুত্রবধূ হিসাবে আশার ব্যর্থতা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূর সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই ভূমিকাটুকু মাত্র রাজলক্ষ্মী পালন করেছিলেন। 'মায়ের ঈর্ষা' কথাটা অনেক বড়ো কথা। সে ঈর্ষাকে উপন্যাসে ব্যবহার করতে হলে যে জাতীয় মর্মদাহী সহ্যাতীত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়তে হয়, রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই তার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ-উপন্যাসে তাঁর লক্ষ্য তা ছিল না। তাঁর ব্যাখ্যাই এই বিচার-বিভ্রাট ডেকে এনেছে।

কাজেই বিনোদিনী যখন বলছে যে নিজের মনকে সবাই চেনে না। রাজলক্ষ্মীও

চিনতেন না, যখন বলছে—'নিজের মনও সবাই জানে? তুমি কি কখনও তোমার বউয়ের দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি'—তখন বিনোদিনীর অভিযোগের জন্য উপন্যাস প্রস্তুত নয়। কেননা পূর্বে বিনোদিনী যখন আশার অবর্তমানে মহেন্দ্রের সেবার ভার গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়েছিল, তখন রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হয়েছিলেন, বিনোদিনীর কথায় সমাজ নিন্দার আভাস দেখে। মহেন্দ্রের মতো ভালো ছেলে কোথাও নেই, এবং তার সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু বলে তো জিভ খসে যাক—এমনই গভীর পুত্র-গৌরব তাঁর ছিল। কাজেই বিনোদিনী মহেন্দ্রের সে জাতীয় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এ-ধরণের দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই বিনোদিনীকে তিনি মহেন্দ্রের সেবার ভার নিতে বলেছিলেন। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজলক্ষ্মীর পরের আচরণটিও লক্ষণীয়। মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর সঙ্গ একাকী লাভ করার জন্য ব্যাকুল, এবং বিনোদিনী মহেন্দ্রকে এড়িয়ে যাবার জন্য কাজের ছল সৃষ্টি করে উঠে যেতে চাচ্ছে তখন মহেন্দ্র মাকে বলছে 'মা এইমাত্র অনুতাপ করিতেছিলে উঁহাকে খাটাইয়া মারিতেছ, আবার এখনই কাজে টানিয়া লইয়া চলিলে?' উত্তরে তখন রাজলক্ষ্মী বলছেন—'আমাদের লক্ষ্মীমেয়ে যে কাজ করিতেই ভালবাসে।' বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য হলে নিঃসন্দেহে রাজলক্ষ্মীর আচরণ অন্যরূপ হত। এবং সে আচরণ মহিনের যাতে কষ্ট না হয় এ-বোধ থেকে উৎসারিত হত না।

তাছাড়া অন্যদিক থেকেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা সত্য হয়, নচেৎ নয়। বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে বোঝাল যে মানুষ তার নিজের মনকে সব সময় জানে না, সবটা জানে না। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে অজ্ঞাতে ছেলের মন ভোলানোর জন্যই ব্যবহার করেছেন—এটা বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে স্পষ্ট করে অবিচলিতভাবে বলেছিল। আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি বিনোদিনীর অভিযোগ সত্য। তাহলে এটা স্বাভাবিক যে রাজলক্ষ্মীর আচরণে বিনোদিনীর উক্তির পর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এবং মহেন্দ্রের ও বিনোদিনীর পরবর্তী জটিলতর পরিস্থিতির জন্য রাজলক্ষ্মী (নিজের কাছে নিজে ধরা পড়েছেন বলেই) সমুদয় ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করবেন অথবা নিজের মনের সঙ্গেই যুদ্ধ করবেন নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য। রাজলক্ষ্মীর আচরণে ব্যবহারে তিলমাত্র সে লক্ষণ নেই। তাঁকে মরণাপন্ন দেখেও মহেন্দ্র বিনোদিনীর

সন্নিধানে চলে গেল এই অভিমানাহত মূর্তিতেই বরঞ্চ তাঁকে আমরা দেখতে পাই।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথিত মায়ের ঈর্ষা এই উপন্যাসের নিদারুণতার স্রষ্টা নয়। অথচ এই ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায় অনুসরণ করে চললে উপন্যাসটির প্রকৃত চেহারা আমাদের নজরে পড়ে। তখন হয়তো আর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের যাবতীয় চাহিদা—যথা ঈর্ষা-জট প্রভৃতির দাবী—চোখের বালি মেটায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস হিসাবে এ-উপন্যাসের মর্যাদার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। সে কারণেই কোনো উপন্যাসকে কোনো প্রকার লেবেল মেরে বিচার করে বা বিচার করে লেবেল মেরে দেওয়া অসঙ্গত। যে উপন্যাসই হোক না কেন জীবনের একটা সমস্যা—তা সে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার সমস্যাই হোক, বা চরিত্রের নিজের কোনো উপলব্ধির সমস্যাই হোক—সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেই সমস্যার সঙ্গে গ্রথিত করে উপন্যাসের শিল্পবিচার বাঞ্ছনীয়।

জিজ্ঞাসাহীন সমালোচনায় এক কথায় এ-সমস্যা কী তা ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। মহেন্দ্রের জীবনে বিনোদিনীঘটিত সংকটই এই সমস্যার উপন্যাসধৃত চেহারা। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আমরা জানি যে একেবারে বহিরঙ্গ-বিষয়ক। বিস্তৃত রসসন্ধানী আলোচনায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনের ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র বলে আখ্যাত করেছেন মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের টানাপোড়েনকে। প্রকৃত ব্যাখ্যার কাছাকাছি গেলেও, এ মন্তব্যও জিজ্ঞাসা-সাপেক্ষ। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক উপন্যাসের ঝড়ের কেন্দ্র না উপন্যাসের ঝড়ের পরিণাম? অর্থাৎ এই কেন্দ্র থেকে ঝড় উদ্ভূত হয় নি। ঝড় উদ্ভূত হয়েছে অন্যত্র। সেই ঝড়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সমস্যা। এরা উপন্যাসের মূল ঘটনার পাত্রপাত্রী। কিন্তু ঘটনার স্রষ্টা নয়। ঘটনার সৃষ্টি। বাস্তবিক পক্ষে এইখানেই উপন্যাসের মূল শিল্পরহস্যটি নিহিত রয়েছে। ঘটনা প্রবাহের স্রষ্টা বিনোদিনী। এবং বিনোদিনীকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বিহারী। বিনোদিনীর সংকটের ফলেই মহেন্দ্রকে সংকটাপন্ন হতে হয়েছে।

এ-কথাটির আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। শুধুমাত্র চরিত্র ব্যাখ্যা করে উপন্যাস আলোচনা কদাচ সমাপ্ত হতে পারে না। যে জীবন উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সেই জীবনের বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সম্পর্কে

সেই জীবন-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে উপন্যাস সংক্রান্ত কিছুই ব্যাখ্যাত হতে পারে না। উক্ত জীবন-বৈশিষ্ট্যের ধারক শেষ পর্যন্ত মানুষের মন। তাই সেটা স্থিতিধর্মী নয়। অন্তর-বাহির, উভয়ের আঘাতেই তা পরিবর্তনমুখী হতে পারে। তখন সে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যকে যাচাই করে নিতে চায়। উপন্যাসের আলোচনায় এই সমগ্রের আলোচনা দরকার। মহেন্দ্রকে শুধুমাত্র আত্মাভিমানী মূঢ় (ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি) বললে এই কারণেই তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হল না।

মহেন্দ্র যেভাবে এই উপন্যাসের মূল ঘটনা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিনোদিনী-বৃত্তান্ত পর্যন্ত জীবন যাপন করেছে, সে অবধি তার জীবনকে বলা চলে মোটামুটি পরিবার-কেন্দ্রিক জীবন। তার মা, তার বন্ধু, তার বৌ—এই অধিকার চেতনাই এই জীবনযাত্রার ফল। এখানে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলছেন যে কোন কিছুর জন্যই তাকে কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এর ফলে মহেন্দ্রের মনে অনায়াস-লব্ধ অধিকারের সামগ্রীগুলোর ওপর একটা দারুণ অবহেলাবোধও আছে। অধিকার-স্ফীত বিত্তশালী ব্যক্তির যেমন অনায়াসে অর্জিত ধন সম্বন্ধে অপ্রকাশ্যে একটা অবহেলাবোধ থাকে, মহেন্দ্রেরও মা, বৌ সম্বন্ধে সেই ধারণাই ছিল। এদিক থেকে মহেন্দ্রের মনে আমাদের কিম্ভূতকিমাকার মধ্যবিত্ত অধিকার-বোধের ছায়া পড়েছে। সে, অবলীলাক্রমে শিশু যেমন সন্দেশ দেখে আবদার ধরে, সেইভাবে আশাকে দেখেই বিবাহ করার সংকল্প ঘোষণা করেছে। সে অবলীলায় আশার জন্য মাকে, বিনোদিনীর জন্য আশাকে এবং বিনোদিনী ও আশার জন্য বিহারীকে পরিহার করেছে অথবা করতে চেয়েছে। জগৎ সংসার যেন তার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে—এই অন্যায় অধিকার-বোধই মহেন্দ্রের চরিত্রের মূলকথা।' এবং এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকৃত পক্ষে তার জীবন-বৈশিষ্ট্যেরই ফল। সে যে ভাবে অবলীলাক্রমে বিনোদিনীকে বিয়ে করব না বলেছিল সেই ভাবেই অবলীলাক্রমে আশাকে বিয়ে করব বলে। কারো রাজী-অরাজীর প্রশ্ন সে মানে না, সম্ভবত খোঁজও রাখে না সে প্রশ্নের। মহেন্দ্রের জীবনের এই ছকে বিনোদিনী একটা প্রথম এবং প্রবল প্রতিক্রিয়া। বিনোদিনী শুধু আত্মীয়া নয়, নারী নয়, সে একটা ব্যক্তি। আর সকলে যেখানে স্নেহাতিশয্যে তার আতিশয্যকে সৃষ্টি করেছে—সৃষ্টি করেছে তার অধিকার বোধকে—আর সকলে যেখানে ব্যক্তিত্ব বিবর্জিত হয়ে মহেন্দ্রের প্রসাদপ্রার্থী—বিনোদিনী সেখানে তার কৃপাকণা-

ভিখারিণী নয়। সে অনায়াসে কাছে আসতে পারে, অনায়াসে দূরে যেতে পারে। সে অতি সহজে নিষ্ঠুর কৌতুকে মহেন্দ্রের মাথাধরার ব্যথাকে যথাস্থানে আঘাত করতে পারে। এই বিনোদিনী মহেন্দ্রের অভিজ্ঞতার মানুষগুলো থেকে পৃথক বলেই বিনোদিনী সম্বন্ধে তার মূল্য বোধের প্রশ্ন ওঠে। এবং মহেন্দ্রের বিনোদিনীর প্রতি মনোভাবের অন্তত একটা নৈতিক ব্যাখ্যা না থাকলে মহেন্দ্র গোবিন্দলাল থেকে পৃথক হবে কী করে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে মূল্য দিতে গিয়ে চারিদিকের মূল্যহীনতাকে পরিহার করে যেতে চেয়েছে। আত্মসম্বিতের অভাবে এই মূল্যহীনতা যে তারই প্রজাবৃন্দ, তারই রাজ্যপাট এই কথাটা শুধু সে বোঝেনি। ফলে তার যাত্রাও হয়েছে উদ্দেশ্যহীনতায় খণ্ডিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একবার ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণ করব। তিনি বলেছেন, "সে (মহেন্দ্র) যে সত্য সত্যই আন্তরিকতার সহিত চিত্তজয়ের চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নহে, এবং বিনোদিনী যে অনিবার্য বেগের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাও ঠিক নয়"—সুতরাং বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনাতে সে ঈর্ষা-কাতর হয়ে আত্মদমনেচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছে এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য। তাহলে এই প্রতিযোগিতা-পরায়ণ ঈর্ষাকেই মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ঘটনা সমন্বিত উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি বলতে হয়। আমাদের মনে হয় উদ্ধৃতাংশের শেষাংশ সত্য নয়। মহেন্দ্র চিত্তজয়ের চেষ্টা করেছে সত্য, বিনোদিনীর আকর্ষণও অনিবার্য মনে হয়েছে তার কাছে এও সত্য। বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষে এর একটা কারণ অনুসন্ধান করা চলে। আশার চারুপাঠ এবং বিনোদিনীর কপালকুণ্ডলার মধ্যে এই জীবনগত তার-তম্যের ব্যাপারটির ইঙ্গিত হয়তো আছে। বিনোদিনীর মার্জিত বাগবৈদগ্ধ্য যে সূক্ষ্ম রুচি ও অনুভূতিশীলতারই পরিচায়ক এ-ইঙ্গিতও বিদ্যমান। এইগুলো যখন বিনোদিনীর তারুণ্যশ্রীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মহেন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে তখনই মহেন্দ্র বিনোদিনীর মূল্যকে আবিষ্কার করবে এ-রকম একটা আশা বিনোদিনীর ছিল। কিন্তু আমরা জানি যে বিনোদিনীর আকর্ষণ তার কাছে তার পূর্বেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মনে রাখা দরকার যে বিনোদিনী নিজে বাস্তবিকপক্ষে তাকে আকর্ষণ করেনি। কেননা বিনোদিনীর মহেন্দ্রের সম্বন্ধে ব্যঙ্গবোধ প্রেমিকার পরিহাস-রসিকতা নয়। ওভিকলোন-কাহিনীতে বিনোদিনীর ব্যবহারে সেই ব্যঙ্গ, মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনীর উক্তি—মাটি হইবার

ক্ষমতা থাকা চাই—এবং আরো নানাবিধ সংখ্যাতীত আচরণে ও উক্তিতে বিনোদিনীর এই শাণিত ব্যঙ্গের মনোভাব স্পষ্ট। মহেন্দ্রের জীবনের প্রতি, জীবনধারা ও পদ্ধতির প্রতি বিনোদিনীর সমালোচনা থেকেই এই ব্যঙ্গের মনোভাবের জন্ম। এটাই প্রথমে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। মহেন্দ্রের কাছে এ-ব্যাপার অভিনব। কেউ যে তাকে সাধারণ বলে মনে করে, কেউ যে তার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকে, এই রকম ব্যঙ্গ করে, এ-অভিজ্ঞতা তার ইতোপূর্বে হয়নি। অথচ বিনোদিনী যদি নিশ্চেষ্ট না থাকত, যদি সে সত্যই সাধারণ হত তাহলে মহেন্দ্রই বরং অচিরে তাকেও বিহারী, আশা ও রাজলক্ষ্মীর মতো তার রাজ্যপাটের একজন মনে করে শান্ত হয়ে যেত। মহেন্দ্রের সাম্রাজ্যে জিজ্ঞাসাহীন আনুগত্যে বিনোদিনীও মিশে থাকত। বিনোদিনী তা থাকেনি।

কেন থাকেনি? মহেন্দ্রের জীবনযাপনের ধারা ও পদ্ধতিকে সে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতো বলে। বিনোদিনীর দীর্ঘ ব্যবহারে এ-সমালোচনা যেমন ফুটে উঠেছে, তার পত্রেও তেমনি তা সাপের মতো তীব্র রোষে বিষ ছড়িয়েছে। মহেন্দ্রের আশৈশব জীবনযাত্রা প্রণালীকেই সে সর্বত্র আঘাত করেছে। এর কারণরূপে ব্যাখ্যা করা হয় বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগের সম্ভাবনা বা অনুরাগবোধ। ঈর্ষা বা অনুরাগবোধকে একটা উপন্যাসের ঘটনাসমূহের চালিকাশক্তি বলে আখ্যাত করা আর রোগ লক্ষণকেই রোগ বলে ঘোষণা সমান ভ্রান্তিকর। সুতরাং বিনোদিনী মহেন্দ্রে আশ্রয় খুঁজে পেল না কেন এর জবাবে শুধু বিহারীকে দেখিয়ে দিলেই চলবে না, দুটো ব্যাপারই এক মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে। বিনোদিনীর স্বতন্ত্র মর্যাদাকে কেউ উপলব্ধি করুক বিনোদিনীর জীবনোৎকর্ষের ফলে এ পিপাসা বিনোদিনীর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিল। মহেন্দ্রের রাজ্যপাটের মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল না। মহেন্দ্র বিনোদিনীর বশ্যতা স্বীকারেই সুখী হবে এমন ধারণাই মহেন্দ্রের প্রথমে ছিল। কিন্তু বিহারী বিনোদিনীর শান্ত স্বাতন্ত্র্যকে প্রথমাবধি মূল্য দিয়েছে। দমদমে চড়ুইভাতির দিনে বিহারী-বিনোদিনীর আলাপনে বিহারীর কাছে বিনোদিনীর এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক একটা মূল্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং আবিষ্কৃত যে হয়েছে সেটা বিনোদিনীর কাছে অজানা ছিল না। মহেন্দ্রের জীবনযাত্রার মধ্যেই এই নারীর পৃথক স্বতন্ত্র মূল্যকে উপলব্ধি না করার অভ্যাসটুকু সঞ্চিত হয়েছে। নিঃসম্পর্ক বিহারীর সে ক্ষেত্রে কোনো দাবি বা অধিকার—(মহেন্দ্র যে সম্বন্ধে প্রথমে ভ্রান্তভাবে সচেতন স্নে জাতীয় দাবি, ছিল না। পরস্পরকে শ্রদ্ধার এবং উভয়ের

ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করার ভিতর দিয়ে বিহারী-বিনোদিনীর সম্পর্কের সূত্রপাত। মনে রাখতে হবে এর আগেই বিহারী বিনোদিনীকে বলেছে যে তাকে সাধারণ বলে মনে করে না। সে সমস্ত ভিড়ের মধ্যে বিনোদিনীর কাছেই নতুন পথের আশা করে। দমদমের চড়ুইভাতির দিনে শৈশবস্মৃতিচারিণী বিনোদিনীকে দেখে বিহারীর মনোভাব লক্ষণীয় :

(ক) বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুক-তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি নতুন মানুষ দেখিতে পাইল।

(খ) বিহারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, 'প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেইটাই সত্য।' বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না—প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল। বিনোদিনী এ পর্যন্ত এ সকল কথা এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই—বিশেষ কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই—আজ অজস্র কলকণ্ঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমস্ত প্রকৃতি যেন নব-বারিধারায় স্নাত, স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ বাক্য একটি উপমা। আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গদ্য-ভঙ্গির আলোচনায় বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ব্যবহৃত উপমা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বিষয়ার্থকেই স্পষ্ট করে। 'নব বারিধারায় স্নাত প্রান্তরের' উপমা এর একটি সার্থক উদাহরণ। প্রান্তরের বিশুষ্কতা বোধে তার এত দিনের মহেন্দ্রের সাহচর্য সম্বন্ধে সমালোচনার মনোভাবটি স্পষ্ট। 'নব বারিধারায়' বিহারীর কাছে নিজ ব্যক্তিত্বের সহজ অভিব্যক্তির প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দ্যোতিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য বিহারীর কাছে নিজ ব্যক্তিমূল্যের উপলব্ধি বিনোদিনীকেই আত্মাবিষ্কারে প্রবুদ্ধ করেছে। স্বভাবতই এই পর্যায় থেকেই বিনোদিনীর আত্মার যন্ত্রণার আরম্ভ। নইলে এ পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অধ্যায়ে বলা যায় বিনোদিনীতে রোহিণীর ছায়াই কিছুটা উপস্থিত। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে মাত্র পুরুষ হিসাবেই তার ছলাকলা বিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেছে। নিশাকর প্রসঙ্গে রোহিণীর যা মনোভাব

ছিল মহেন্দ্র প্রসঙ্গে বিনোদিনীর মনোভাব প্রথমে তার থেকে পৃথক কিছু নয়। লক্ষণীয় যে এ-প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রথম দিকে মহেন্দ্র এবং বিনোদিনী উভয়ে উভয়কে যে দৃষ্টিতে দেখত তার একটা সাধর্ম বিদ্যমান। বিনোদিনী শুধুই নারী, মহেন্দ্র শুধুই পুরুষ। দমদমে চড়ুইভাতির দিনে বিহারীলালের কাছে নিজ মূল্য আবিষ্কারের পর বিনোদিনী আত্মসচেতন হয়েছে। এবং মহেন্দ্রও এইবার বুঝতে পেরেছে যে বিনোদিনী তার কাছে অনায়াসলভ্য ব্যাপার নয়। এইবার ঈর্ষা প্রভৃতির কথা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারীলাল এই তিনজনের ব্যক্তিত্বের মৌল প্রশ্নের সঙ্গে উপন্যাসের সমস্ত সমস্যাকে ব্যক্তিত্বগুলির পরস্পর সংঘাত সম্পর্কজাত এবং স্বনিয়ম সম্ভূত বলে উপলব্ধি না করে ঈর্ষার প্রশ্ন অবান্তর।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মহেন্দ্রকে আকর্ষণ করার কোনো প্রয়োজন বিনোদিনীর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর পর থেকেই বিনোদিনীর আকর্ষণ মহেন্দ্রের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপার এবং মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ব্যাপার এ উপন্যাসের ঘূর্ণি-বায়ুর প্রাণকেন্দ্র নয়, এ দুটো ব্যাপারেরই মূল বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বে। অপরের কাছে নিজের প্রকৃত মূল্যের উপলব্ধি হোক এই প্রাণময়ী পিপাসা তার মূল কথা। সে মূল্য কেবল মিঠাই প্রস্তুত করায় নয়, রুমালে নাম তোলায় নয়, পশমের গলবন্ধ বোনায় এবং সেবাময় ব্যবহারে নয়। বিহারী যখন এইভাবে বিনোদিনীর স্নেহবোধকে জাগ্রত করল তখন থেকেই বিহারী এই উপন্যাসের ঘটনার বা ঘটনাজাত মানসিক ঝঞ্ঝাবাত্যার স্রষ্টা। এখন দেখা যাক যে মহেন্দ্রের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ কী?

এরও যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করা যায় যে ঈর্ষা—তাহলে শুধু লক্ষণ-বিচারই হবে। এ-ক্ষেত্রেও মহেন্দ্রের গোটা জীবনের প্রসঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপকে বুঝতে হবে। প্রথম দিকে তার মনোভাব যাই হোক ধীরে ধীরে সে বিনোদিনীর মূল্য অনুভব করেছে। এবং মহেন্দ্র নিজের ভালোত্বের অহংকারকে সগর্বে আঘাত করে বলেছে যে 'আমি ভালো নই, কিন্তু আমি ভালবাসি'। এ ভালবাসায় আন্তরিকতা নেই এ-কথা মিথ্যা। বরঞ্চ বিনোদিনীর প্রেমে সে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে এ-কথা মনে রাখলে তার আন্তরিকতাকে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। তার সংকট এইখানে যে এই প্রেম তাকে কোথাও উত্তীর্ণ হতে দিল না। এ-কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু দিল না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে তার সারা জীবনই এ-পথে বাধা। বিহারী সম্বন্ধে জাগ্রত

মনোভাব বিনোদিনীকে যতই যন্ত্রণায় টেনে নিয়েছে—যতই সে-যন্ত্রণার শুদ্ধতাকাঙ্ক্ষীরূপ মহেন্দ্রের কাছে স্পষ্ট হয়েছে ততই মহেন্দ্র নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেছে এবং এই অক্ষমতায় বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে গিয়ে বারে বারে নিজের পঙ্গু চেহারার উপলব্ধিই মহেন্দ্রের উদ্দেশ্যহীন কার্যাবলীর স্রষ্টা। কাজেই এলাহাবাদের ঘটনায় যখন মহেন্দ্রের কাছে নিজের পরাজয় স্পষ্ট হয়েছে তখনও সে সমান উদ্দেশ্যহীন থেকে গেছে। উপন্যাসের এই পর্যায়ে দেখা যায় মহেন্দ্র এইবার বাড়ি ফিরবে। অমিতব্যয়ী সন্তান এইবার অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু প্রশ্ন—মহেন্দ্রের কোনো পরিবর্তন হল কি? যেমন বিহারীর জীবনে একটা সঠিক নতুন সুর এল, বিনোদিনী উত্তীর্ণ হল তার যন্ত্রণা থেকে, মহেন্দ্র সে ক্ষেত্রে কী লাভ করল সমুদয় অভিজ্ঞতা থেকে? কিছুই না। গোবিন্দলাল যেমন বলেছে যে তুমি কে রোহিণী, যে তোমার জন্য আমি ভ্রমরকে ত্যাগ করেছি, মহেন্দ্রেরও তেমনি মনে হল বিনোদিনী স্ত্রীলোক মাত্র। এবং এরই জন্য সে মাকে কাঁদিয়েছে, স্ত্রীকে কাঁদিয়েছে। এর পরে নতমস্তকে স্বস্থানে প্রস্থান।

এইটাই উপন্যাসের ক্রটি। মহেন্দ্র পাপকর্মের চেতনা নিয়ে ফিরে গেল। সঙ্গে রইল অনুশোচনাবোধ। বড় জোর সে আর এমন কর্ম করবে না। কিন্তু কোন্ বিশ্বাস তার ভাঙল, কোন্ বিশ্বাস তার গড়ল এ-সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। ফলে বিনোদিনীঘটিত অধ্যায় যেন তার জীবনে একটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল মাত্র। আগেই বলেছি যে গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাসেই শেষরক্ষা করতে পারেননি। এখানে সেই ক্রটি মহেন্দ্রকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে। অনেকে ওপর ওপর আলোচনায় এ-কথা বলে দিতে পারেন যে বিনোদিনীর বিধবা বিবাহে অসম্মতিটাও রবীন্দ্রনাথের আর এক ক্রটি। কিন্তু সেটা ক্রটি বলে পরিগণিত হত অন্য উপন্যাস হলে। বিনোদিনীর চরিত্রের সঙ্গে এই অসম্মতিটা বরং আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে, সেটা যে-কোনো সমালোচকেরই চোখে পড়ার কথা। এখানে মোটেই ত্যাগজনিত উচ্ছ্বাস নেই। বিনোদিনী আজীবন ব্যবহৃত হয়েছে। আশা তাকে ব্যবহার করেছে, রাজলক্ষ্মী তাকে ব্যবহার করেছে, মহেন্দ্র তাকে ব্যবহার করেছে। আজন্ম বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহারের সঙ্গে স্বার্থের চেহারা সে মিশিয়ে ফেলেছে। কাজেই নিজের পরম স্বপ্নকে সে আর ব্যবহার করতে চাইল না। এর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত যন্ত্রণা তাকে একটা প্রশান্ত নিরাসক্তির মাঝখানে নিয়ে গেল। কিন্তু এ

জাতীয় কোনো উত্তরণ মহেন্দ্রের নেই। তার কারণ মহেন্দ্রের অনুশোচনা দ্বন্দ্বময় যন্ত্রণার স্তরে উঠেও নেমে গেল। মহেন্দ্রের একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে সব কিছুর মতো ক্ষমাও চাইলেই পাওয়া যাবে। আশার ব্যক্তিত্বহীনতা এর প্রথম কারণ। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব এর দ্বিতীয় কারণ। আশাকে যদি কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমরের ভূমিকায় পেতাম তাহলে মহেন্দ্রের এই প্রত্যাবর্তন এত মসৃণ হত না। ভ্রমরের ব্যক্তিত্ব আশার পক্ষে থাকাও সম্ভব নয়। কেননা ভ্রমর সংসার জীবনে একেশ্বরী। তার রাজলক্ষ্মীর মতো শাশুড়ী নেই। কাজেই গোবিন্দলালের অন্যায় বোধকে সে সহজেই আঘাত করতে পেরেছে। বধূ জীবনের শতবন্ধনে আশার পক্ষে সেটা সম্ভব হয়নি—সম্ভব ছিল না। কাজেই আশা তাকে কোনো দ্বন্দ্বে ফেলল না। বিনোদিনী রোহিণী নয়। কাজেই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনো নির্জন প্রসাদপুরে নিয়ে যেতে পারল না। তাছাড়া—আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি এই অহংকারে সে বিনোদিনীকে ভোগের সামগ্রীও করে তুলতে পারল না। সুতরাং তার পাপবোধ তীক্ষ্ণ হবার কোনো অবকাশ ছিল না। যেটুকু দাম্পত্যবিধি লঙ্ঘিত হয়েছে তার জন্য আশার অভিমান সূর্যমুখীর অভিমানের স্তরেও ওঠেনি। মহেন্দ্রকে একমাত্র জবাবদিহি করতে হতে পারত তার মনের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মোহভঙ্গে তার অধিকার চেতনারই পুনরাগমন ঘটেছে। যেটা মাঝে দু-এক লহমার জন্য বিদায় নেব-নেব করেছিল সেটাই আবার ফিরে এসেছে। মহেন্দ্রের জীবনের দিক থেকে এর পক্ষে যত যুক্তিই দেখানো যাক না কেন, শিল্পে এটা নিঃসন্দেহে ত্রুটি।

এবং মহেন্দ্রের এই রূপায়ণগত অসঙ্গতির জন্যই বিহারীলালের ব্যক্তিত্বও খানিকটা অকিঞ্চিৎকর মনে না হয়ে যায় না। মহেন্দ্রের হাত থেকে বিহারীর মুক্তিতে পাঠকচিত্ত যতই মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলুক না কেন, এ-প্রশ্ন জাগ্রত না হয়ে যায় না যে এই মহেন্দ্রে এই বিহারী এতকাল একীভূত হয়েছিল কী করে। সম্ভবত এর একমাত্র জবাব কোনো কিছুর মতো মানসিক সম্পর্কগুলিও স্থিতবস্তু নয়। বিনোদিনীর সংঘর্ষেই এই সম্পর্কের যাচাই হল। তখনই বিহারী চারদিকের আবরণ কাটিয়ে মুক্তির আকাশে ডানা মেলে দিতে শিখল। মহেন্দ্রের পক্ষীরাজ ঘোড়ার পক্ষচ্ছেদ হল।

এই উপন্যাসের আশা-বিহারীর সম্পর্কটি বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিণাম-সঞ্চারী। দেখা যায় যে আশা সম্বন্ধে একটা দূরত্ব-মিশ্রিত প্রীতি এবং

বিশ্বাস-মিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ বিহারীর বরাবর ছিল। হয়তো উভয়ের ব্যক্তিত্বে একটা সাধর্ম বিদ্যমান ছিল বলেই এটা ঘটেছে—উভয়েই সম্পর্কিত সকলকে খুশি ও সুখী করতে চায়। একে তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিণাম-সঞ্চারী করে উপন্যাসে ব্যবহার করায় রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসে সংকট যদি কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্ত থেকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়ে থাকে তবে তা হল ক্রন্দনরতা আশাকে বিনোদিনী সান্ত্বনা দিচ্ছে দেখে বিহারীর পরিতৃপ্তি বোধের মুহূর্ত। এই মুহূর্তের আনন্দে বিহারী সেই বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারণ করেছে যা বিনোদিনীকে মুহূর্তে করে তুলেছে জ্বালাময়ী। বিহারী বলল—বিনোদ বোঠান, আশাকে তুমি দেখিও। সে সরলা কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতেও জানে না।

আগেই বলেছি বিনোদিনীর মনে ব্যবহৃত হওয়ার বিরুদ্ধে দারুণ ক্ষোভ ছিল। এই উক্তির প্রতিক্রিয়ায় তার নিজ জীবনের সেই ক্ষুব্ধ চেহারা আত্মপ্রকাশ করল।

> শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন সেই জন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেই জন্য বিনোদিনীকে তাঁহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে !

বিনোদিনীর সংহার-মূর্তি এরপর থেকেই শক্তিশেল উদ্যত করেছে। এবং সে যে মহেন্দ্রের ব্যাপারে ছলাকলার কিছু বিস্তার করেছে সেটার প্রেরণা কতকটা এই ঘটনায় উপস্থিত। বিনোদিনীর জটিলতার সৃজনে এই দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সম্পর্ক একটা ভূমিকা পালন করেছে।

পাঁচ

গোরা এমন একখানি উপন্যাস যার আলোচনা নানা দিক থেকে নানাভাবে হতে পারে। বলা বাহুল্য, উপন্যাসটির সর্বতোমুখী সাফল্যই এর কারণ। কাজেই আমাদের সর্বৈব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ-আলোচনা কোনো না কোনো দিকে

শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এ-আশঙ্কা মনে নিয়েই গোরার শিল্পকর্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে বলেছি যে গোরা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র উপন্যাস যেখানে তিনি শেষ রক্ষা করতে পেরেছেন। তখন আমরা একটা মন্তব্য করেছিলাম যে এর কারণ হচ্ছে এই যে গোরা বিষয়বস্তুর দিক থেকে গভীর মূল্যের অধিকারী হয়েও চোখের বালি, যোগাযোগ, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাস অপেক্ষা জটিলতার দিক থেকে উচ্চাভিলাষী নয়। শচীশ-দামিনী এবং কুমু-মধুসূদনে, এমন কি নিখিলেশ-বিমলাতেও রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষার বিষয় ছিল অত্যন্ত জটিল। এই উপন্যাসগুলিতে কেউ না কেউ প্রচলিত জীবন-বিন্যাসের কতকগুলো ধারা-ধরনকে আঘাত করেছে। এবং স্বাধীন মুক্ত ব্যক্তিসত্তার পক্ষ থেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কুমুর প্রশ্ন, নিখিলেশের প্রশ্ন সে দিক থেকে ব্যক্তির নিজস্ব জীবন ধারণা প্রসূত স্বাধীন প্রশ্ন। এ-প্রশ্ন যেমন জটিল তেমনি দেশ-কালের নিয়মেই নিরুত্তর। (গোরায় সমস্যার এই জাতীয় জটিলতা নেই। সেদিক থেকে এ অনেকাংশে সরল। তার কারণ(গোরার সমস্যা তার ব্যক্তি জীবনের সমস্যা হলেও সে সমস্যার একটা জাতীয় মূল বিদ্যমান। সমস্যার একটা সর্বজনীন চেহারা গোরা উপন্যাসে উপস্থিত রয়েছে। সেই জন্যই এই উপন্যাসে দেখা যায় যে গোরার সমস্যা কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে। নিজের জন্য নয়, গোরা বিনষ্ট মূল্যবোধের উদ্ধার সাধন চেয়েছে সকলের জন্য। তার ফলে প্রত্যেকেই গোরাকে বুঝতে চেয়েছে, গোরার অসামান্য যন্ত্রণাকে, তীব্র আবেগকে সকলেই কম বেশি করে সহানুভূতির চোখে দেখেছে। এটা রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক। কুমুকে মধুসূদন কুমুর ন্যায়ে উপলব্ধি করতে চাইলে যোগাযোগ উপন্যাসের টানাপোড়েন সৃষ্ট হতে পারে না। নিখিলেশকে সন্দীপ উপলব্ধি করতেই চায়নি। মহেন্দ্রের পক্ষে বিহারীর ভূমিকা উপলব্ধি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ গোরা উপন্যাসে অন্তত পক্ষে আনন্দময়ী-পরেশবাবু-সুচরিতা-বিনয়- ললিতা এদের সকলেরই মধ্যে গোরাকে উপলব্ধি করার সচেতন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসটি শেষ অবধি সমান আগ্রহোদ্দীপক থেকেছে এই কারণে যে প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে উপলব্ধি করার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব, নিজ নিজ

জীবনাচরণ। কেমন করে গোরা সকলকে উপলব্ধি করল এবং সকলে গোরাকে উপলব্ধি করল এটাই এ-উপন্যাসের সমস্যা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অন্য উপন্যাসের তুলনায় গোরা জটিলতার দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষী নয়। নিরীক্ষার বিষয়ের দিক থেকে উচ্চাভিলাষের কথাই অবশ্য বলা হচ্ছে। নতুবা অন্যদিক থেকে আবার গোরার ব্যক্তি সমস্যার মূলরূপের এইভাবে সরল ব্যাখ্যা করে তাকে অগভীর বলা যাবে না। বলা যাবে না বেগহীন। বরঞ্চ এ সরল বলেই তীব্রতায় এবং মানসিক আক্ষেপ ও টানাপোড়েনে অন্য সমস্ত উপন্যাসকে ছাড়িয়ে গেছে। গোরার যন্ত্রণার বলিষ্ঠতায় এই গুণগত সমৃদ্ধি ঘটেছে। বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই যন্ত্রণাকে উপলব্ধি না করলে গোরা চরিত্রে এর প্রতিফলন সম্ভব হত না। আমরা গোরা আলোচনায় প্রথমে দেখাবো যে রবীন্দ্রনাথের মন নানাভাবে এই যন্ত্রণাকে তখন উপলব্ধি করছিল। তারপর দেখাবো যে এই যন্ত্রণাকে উপযুক্ত আধারে স্থাপন করার প্রস্তুতিও তখন রবীন্দ্রমানসে নানাভাবে সমাপ্ত হয়েছে। জীবনগত প্রস্তুতি এবং শিল্পগত প্রস্তুতির এই উপযুক্ত মাহেন্দ্রক্ষণে 'গোরা'র জন্ম। বলা যেতে পারে যে ১৮৯০ থেকে গোরার প্রস্তুতি রচনা শুরু হয়েছে। দেশ নামক বৃহৎ ব্যাপারটা অবশ্য ছিন্নপত্রের কালেই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু দেশের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা সর্বপ্রথম বৃহৎ আকারে দেখা দিল মেঘ ও রৌদ্র গল্পে। যে একাকিত্বের যন্ত্রণা গোরায় শিল্পসুন্দর ভাবে দেখা দিল তারই পরোক্ষ প্রস্তুতি এই গল্পে। এই গল্পটির বিষয়বস্তুর এবং শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ আমরা রবীন্দ্রনাথের দেশবোধকে উপলব্ধির জন্যই প্রয়োজন মনে করি।

বলা বাহুল্য ছিন্নপত্রের কালে গ্রাম বাংলার রূপটি রবীন্দ্রনাথের কাছে নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ প্রকৃতি এ-কালে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বহু সূত্রে স্পর্শ করে। কিন্তু শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বভাব অনন্যসাধারণ বলে রোমান্টিক কল্পনাচারিতায় তিনি শুধু সেই প্রকৃতি-চেতনাকে সঞ্চিত করলেন না, প্রকৃতি এবং মানুষকে মিলিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করলেন নিজের মধ্যে। এই প্রশ্ন সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর শিল্পী স্বভাবের সমগ্রতা-সন্ধানী-বোধ উপস্থিত। তারই ফলে দুই বিঘা জমির ভূমিহারা কৃষকের যন্ত্রণা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চেহারা তাঁর কাব্যের বিষয় হতে বাধে না। পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমির

মতো এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার বিষয় নিয়ে লেখা কাহিনী-কবিতা বা কবিতায় গল্পকে ধারণ করার চেষ্টা এ-যুগে আর লক্ষিত হয় না। গল্পগুচ্ছের বৃহৎ পরিসরে তাদের সকলেরই ঠাঁই মিলেছে। পলাতকার কালে গল্প লেখা যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন আবার কবি দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে রূপকে ছন্দে ধরতে চেয়েছেন পলাতকায়।

'দুর্বুদ্ধি' গল্পগুচ্ছের যুগের আর একটি গল্প যাতেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ চেহারাকে রূপায়িত করেছেন জলন্ত স্পষ্টতায়। এই সমস্ত গল্পে-কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের নানা বিকার, তার সীমাবদ্ধ জীবন-চেতনা এবং জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রগুলির বাধ্যতায় তার অসহায় পুরুষকারের কথা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনাও নানা ভাবে প্রকট হয়েছে এ-সময়ে। দুর্বুদ্ধি গল্পের কথা এ-প্রসঙ্গে অসহায়তার ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিসের দারোগা এই গল্পের একটা প্রধান চরিত্র। স্টেট নামক একটি বৃহৎ যন্ত্রের পুলিস একটি যন্ত্রাংশ। এবং সে স্টেটও যেহেতু আমাদের সমাজ-বহির্ভূত একটা ব্যাপার (আত্মশক্তির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তাই এই দারোগা কোনো অর্থে-ই মানুষ নয়। না স্বদেশী সমাজের অর্থে, না বিদেশী অর্থে। সাধারণ মানুষ হিসাবে গল্পের নায়ক—এখানে গল্পের 'আমি'—দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষের নিজ জীবনের দুঃখের মূল্য মানুষের কাছে অসীম। এই দুঃখ তার চিৎবৃত্তির বিস্তার সাধন করে। দুঃখের হোমানলে পুড়িয়ে তাকে শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যায়। দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়কের কন্যা-বিয়োগ গল্পের সুবিধাবাদী মেরুদণ্ডহীন নায়ককে সেই দুঃখের প্রসাদ খানিকটা এনে দিল। ফলে নিজ দুঃখে আর্দ্র মনের সহানুভূতিতে সে একদিন সর্পদষ্ট মৃত সন্তানের পিতার ওপরে অত্যাচারপরায়ণ দারোগার হৃদয়হীন নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে। এইটাই তার দুর্বুদ্ধি। কেননা বহু কালের অনভ্যাসে মধ্যবিত্ত পৌরুষ যে পরিমাণে ফোঁস করে উঠল—সে পরিমাণেই দ্রুত দারোগার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চাইল। মধ্যবিত্তের ক্ষণিক শুভেচ্ছার ক্লীব চেহারা পরিস্ফুট হল। 'মেঘ ও রৌদ্র' এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত পটে ধৃত গল্প। যে দেশ-দৃষ্টি, খণ্ডিত অস্তিত্বের যে চেতনা গোরা উপন্যাসে আরো সুগভীর তাৎপর্যে বিকশিত এই ছোট গল্পে তারই অঙ্কুর। বস্তুত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি তার না-হোক দশটি পরিচ্ছেদ, কিছু ঘটনা-বাহুল্য এবং মনোবেদনায়, ব্যঙ্গে ও ভাবাতিরেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের

ইতিহাসে একটি অক্ষুণ্ণ গৌরবের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো এ-কথা ঠিক যে ছোট গল্পের কাঠামোর কঠিন অনুশাসনের মর্যাদা গল্পটি রাখতে পারেনি, হয়তো এও সত্যি যে এই গল্পে লেখক বহুবার গল্পের ভিতরে প্রবেশ করেছেন, তার মধ্যে দু-একবার হয়তো অনধিকার প্রবেশ, তবু গল্পের সঙ্গে আমাদের এক সময়ের জাতীয় চরিত্র ও দেশকালের চেহারা এমনভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের এই বহুপঠিত গল্পটির আলোচনা করা বোধ হয় কেবলমাত্র লেখনী কণ্ডূয়ন নয়। এই গল্পের মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে মধ্যবিত্ত জীবনের খণ্ডায়নের ব্যাপারটিকে রবীন্দ্রনাথ কী রূপে দেখেছিলেন। 'মেঘ ও রৌদ্র' রবীন্দ্রনাথের সেই শ্রেণীর গল্প যেখানে কবি মানবিক আবেগের তাড়নায় গল্পের শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। দুর্বুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের যে শ্রেণীর গল্প, অর্থাৎ গল্পের মূল লক্ষ্য ঘটনার মানবিক মর্মান্তিকতা বর্ণনা, মধ্যবিত্ত জীবনেও ঔপনিবেশিক নিঃসহায়তার আক্ষেপ অঙ্কন—মেঘ ও রৌদ্রও সেই ধরনের অনন্য গল্প।

গল্পটির রচনাকাল বাংলার তের-শ দুই সাল। সময়টি জাতীয় ভাবাকাশে নবগ্রহ সমাবেশের যুগ। কংগ্রেসের জন্ত হোক বা না হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের অতি প্রত্যক্ষ প্রভাবেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবাদী সন্ত্রাসবাদে আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের গণ-বিস্তৃতি কল্পনা করা এঁদের পক্ষে যদিও সম্ভব ছিল না, তথাপি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যতীত উদ্ধার নেই, এ-সত্য মধ্যবিত্ত সমাজের কল্পনাপ্রবণ অংশ অনুভব করেছিল।

কিন্তু এ-আলোচনার পূর্বে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের কাঠামো সূত্রাকারে বর্ণিত হওয়া দরকার বোধ হয়। শশিভূষণ গল্পের নায়ক। ক্ষীণজীবী, স্বল্পদৃষ্টি বাঙালী ইন্‌টেলেকচুয়ালের চরিত্র। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট ইন্‌টেলেকচুয়ালের মতো সেও গ্রামবাসী। গিরিবালা, দশম বর্ষীয়া নায়িকা, শশিভূষণের···সখি বলাই সঙ্গত। এই সংবেদী কাহিনী গল্পটিতে একটি করুণ আবহ সঙ্গীতের মতো সর্বদাই বেজে চলেছে। আর এর সঙ্গে ছড়িয়ে আছে ইংরেজ সাম্রাজ্যগর্বীর ঔদ্ধত্য, পরজাতিক বণিক শক্তির হাতে দেশী গ্রামীণ সমাজের প্রেস্টিজের ও স্বল্পোন্নত যন্ত্রশক্তির নির্মম, নিষ্ঠুর পরাজয়; এবং জনসাধারণের বিমূঢ়তা তৎসহ দেশী সামন্তবর্গের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভূমিপ্রণত সেলাম গল্পটির মধ্যে একের পর এক বা একসঙ্গে ছায়াপাত করেছে।

এদিক দিয়ে গল্পটি আমাদের জীবনের এক বিমূঢ় আর্তির আর তজ্জনিত চাঞ্চল্যের প্রতীক হয়ে রইল। বলা যেতে পারে গল্পে জাতীয় পটভূমির

বিস্তারে এবং ঋজুবাচনের সঙ্গে অসহায় দেশপ্রেমিকের ব্যর্থতার যাতনায় গল্পটির ভিতরে 'গোরা' রচনার বীজ নিহিত। একই দেশকালের ধারণা এখানে সবে অঙ্কুরিত। ওখানে তা বনস্পতির মর্যাদায় পূর্ণ। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী বিচারবক্তার প্রতি কবির মনোভাব মোটেই অপ্রকট থাকেনি। নীলদর্পণ রচনার সময়েও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সেন্স অফ জাস্টিসের প্রতি আস্থা ছিল এ-প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারানীর হৃদয় প্রজাপুঞ্জের দুঃখে সতত কাতর, এক্সিকিউটিভ যাই হোক না কেন, এই সিপাহী-যুদ্ধোত্তর ভাবনায় লেখকবর্গ কিছুটা আচ্ছন্ন ছিলেন এ-কথা ঠিক। বলা বাহুল্য চাকুরি-প্রাণ মধ্যবিত্তের আর্থিক নির্ভরতাই এর একমাত্র মূল নয়—ইংরাজী পাঠশালার বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশীও এর মূলে। তবে সেই সেন্স অফ জাস্টিসের প্রতি বিশ্বাসের ভিত টলেছে এ-সাক্ষ্যও নীলদর্পণে পাই।*

মধ্যবিত্ত কংগ্রেসী আবেদন-নিবেদনের পালা শুরু হবার আগে—অনেক আগে থেকেই জাতির শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারা বয়ে চলেছিল এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য। নীলকরদের বিরুদ্ধে নদীয়ার দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন (১৮৬০) এবং আরো খণ্ড খণ্ড ঘটনা এর সাক্ষ্য। 'জ্যোতি-দাদা'র উদ্যোগে স্থাপিত সঞ্জীবনী হিন্দুমেলায় সাহেব পুলিসদের সঙ্গে ইষ্টক যুদ্ধ বা সভার কাহিনী এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। ১৮৭৪-৮০ সালের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক 'শরৎ-সরোজিনী'র বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র যে পরিচয় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মারফত আমরা পাই তাতেও দেখি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যতীত সাফল্য নেই এমন দেশপ্রেমাত্মক ইঙ্গিত। এর মধ্যে দ্বিতীয় নাটকের অভিনয়ের জন্যই ইংরাজ সরকার দেশীয় রঙ্গালয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করে। এ-কথা দুটি বলার উদ্দেশ্য এই যে সে-সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্তবৃত্তি এবং জনতার প্রতিরোধবৃত্তি কোন্ পন্থার পন্থী হয়েছিল তা বিবৃত করা। দিগম্বর বিশ্বাস এবং বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস যে ভাবে বাস্তবে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন আর উপেন্দ্রনাথ যে ভাবে নাটকে রোমাণ্টিক বিপ্লবী উন্মাদনার তথা সন্ত্রাসবাদিতার উদ্গাতা হয়েছিলেন, লক্ষ্য করলেই তার মধ্যে একটি পার্থক্য নজরে পড়বে। তা হল এই যে আন্দোলনের স্বরূপ ও বেগবত্তা নির্ণয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, তথা বাঙালী মধ্যবিত্তের অক্ষমতা। নিশ্চয় এ-কথা অপ্রাসঙ্গিক নয়, যে অসহায় বিক্ষোভের পাদপীঠে

* সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে উক্তি স্মরণীয়।

সন্ত্রাসবাদের জন্ম, উপেন্দ্রনাথ তার প্রথম লেখক। এভাবে সে-সময়ে বাস্তবে ও সাহিত্যে, ঘটনার তির্যক ও ঋজু দুই রূপ আমরা দেখি।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' সাহিত্যে জাতীয় বেদনার উৎস-সন্ধানের প্রথম সার্থক চিহ্ন—কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার আংশিকতা সত্ত্বেও। এবং এ-আংশিকতা নানাভাবে দূর হয়েছে পরবর্তীকালে গোরা উপন্যাসে। নৈবেদ্যের কবিতা রচনার কাল এই গল্পটির রচনাকালের কাছাকাছি। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় যন্ত্রণার মৌল ভাবভূমিতে সৃষ্ট কবিতার সঙ্গে ঐ একই ভাবভূমিতে গঠিত গল্পের একটি স্বাভাবিক পার্থক্য আছে। দেশপ্রেমাত্মক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি abstract ভাবাদর্শী এবং ভগবৎনির্ভর। কিন্তু এ-শ্রেণীর ছোট গল্পে এক কথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন জাতীয় বাস্তবতার স্বরূপ-ব্যাখ্যাতা। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনেকখানি প্রত্যক্ষ, ব্রিটিশ প্রজার প্রাকৃত ঘৃণার দীপ্তিতে সুস্পষ্ট-রূপে পাই। দেশপ্রেমী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্তের আত্মিক প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ ঋষি। নৈবেদ্যের যে-কোনো সনেটই এর প্রমাণ। কবির গল্প উপন্যাসে ফরুসর্দারকে দেখি, (গোরা-চরঘোষপুরে) সে সটান লাঠি চালিয়ে নীলকর সাহেবের হাত ভেঙে দিয়েছিল। এই রক্তমাংস সমন্বিত ক্রোধকে লিরিকে বা লিরিকাল সনেটে ধরা যায় কিনা—সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ধরেননি। মেঘ ও রৌদ্রে সেই জাতীয় ক্রোধ-বিক্ষোভ ঠাঁই পেয়েছে।

এখন আমরা শশিভূষণ, মেঘ ও রৌদ্রের নায়কের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করব। শশিভূষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধর। সে যুগের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল। তার দুর্বলদৃষ্টি ভ্রূকুঞ্চনকে লোকে ভাবত ঔদ্ধত্য। ইংরাজি শিক্ষা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে কেমন করে সম্পর্কশূন্য করে ফেলেছিল, শশি-ভূষণের একক নৈঃসঙ্গ্য তারই চিহ্ন। শশিভূষণ জনতাকে এড়াতে চাইতেন—'বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে স্বাভাবিক' এই মনোবৃত্তিতে। তাঁর আইনজ্ঞান ছিল। শুধু ছিল যে তা নয়, আইনের সর্বশক্তিমত্তায় উনবিংশ শতকের এই বিচ্ছিন্ন ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রথমে বিশ্বাসীও ছিলেন। হয়তো আদালতের ধর্মাবতারকে তার সাধনার ন্যায়াধিকরণ বলেই মনে হত। স্বভাবতই সকল প্রকার ইহ-কর্মের প্রতি অনাস্থাশীল, নব্য ইতিহাসের পানপাত্রে ফরাসী-বিপ্লবের ভাবমন্ত্রের আসব-পায়ী এই যুবক তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে সকল ঔপনিবেশিক বিক্ষোভের মুক্তি খুঁজবে এতে আশ্চর্য কি। শশিভূষণ হয়তো

হিতবাদী, বা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষকের কথা পড়া মধ্যবিত্ত যুবক। ফলে কৃষকজনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত না থেকেও সে জমিদারী জটিলতার শিকার এই বিমূঢ় মানুষগুলি সম্বন্ধে মানবিক সমবেদনা অনুভব করত। এই মানবিকতাবাদ উনবিংশের বুর্জোয়া শিক্ষালব্ধ পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদ। এই শিক্ষার আলোকেই সে নিজের বিষয় সম্পত্তিতেও নিস্পৃহ ছিল।

শশিভূষণের কাব্যবোধ কিন্তু জীবন থেকে প্রয়াণের মাধ্যম। কেননা যে জ্ঞানচর্চার আড়ালে নিজেকে উহ্য করে রাখার দিকে তার আগ্রহ, তার ভিতরেও আমরা এক যুগবৈশিষ্ট্য-চিহ্নিত মধ্যবিত্তের সাক্ষাৎ পাই। টুর্গেনিভের নিহিলিস্ট চরিত্র বাজারভেও এমন ধারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসক্তি, বিরক্তি কেবল তার কাব্যে। আমাদের শশিভূষণ কাব্যের ভক্ত এবং গিরিবালার প্রীতি-মুগ্ধ।

গল্পের উদ্দিষ্ট এবং অভীপ্সিত ঘটনাজাল বিস্তৃত হবার আগেই শশিভূষণের শান্তদৃঢ় নিস্পৃহতার ফলস্বরূপ নায়েব হরকুমারের সঙ্গে প্রজা শাসন নিয়ে বিবাদ হল। এইখান থেকে মেঘ ও রৌদ্রের নাটকীয় ঘটনাত্রয় ও শশিভূষণের প্রতিক্রিয়ার শুরু। শশিভূষণ গ্রাম ছাড়ি-ছাড়ি করছে এমন সময় জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়ল গ্রামে। ব্যাপারটি যেন নিস্তরঙ্গ ডোবায় প্রকাণ্ড একটি প্রস্তর খণ্ড। তারপর সাহেবের মেথরের সঙ্গে নায়েবের সংঘাত—সাহেবের কুকুরের জন্য চারিসের ঘৃত-আবদার এবং সাহেবের হুকুমে প্রকাশ্য জনারণ্যে মেথরের হাতে হরকুমারের লাঞ্ছনা, মেঘ ও রৌদ্রের পাঠকেরা সবই জানেন।

শশিভূষণ এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ করল। ব্রাহ্মণ্যের জাত্যভিমান অসৎ ঘুষখোর সাহেবের কাছে কিছু নয়, অত্যাচারের এই চারিত্র ও এই স্বরূপই তখনকার মতো আমাদের আর শশিভূষণের ভরসা। প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতীক অবশ্যই হরকুমার হোন এ-অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয় এই উক্তির মধ্যে ভারতীয় যা-কিছুর প্রতি সাহেব-লোকদের মনোভাবে যে ঔপনিবেশিক স-বুট দাপটের দেখা মিলত তার ছবি যথাযথ ফুটেছে। মেথর যে হরকুমারের বিরুদ্ধে সাহেবের কাছে নালিশ করবেই এর মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতি 'অন্ত্যজে'র ঘৃণা না হোক সহানুভূতির অভাবের সাক্ষাৎ পাই। নালিশের চরিত্রটি অন্তত বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় সমাজের ব্যর্থতার পরিচয় এতে সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যগর্বীর দাপটের যে বৈশিষ্ট্য এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা কিন্তু অত্যাচারের একটা

প্রাথমিক রূপ। এই অমানবিক লাঞ্ছনার চোট দেহে যতটা তার থেকে অনেক বেশি মনে। কাপুরুষ হরকুমার হয়তো দ্বিধায় এ-লাঞ্ছনা পকেটস্থ করতেন। কিন্তু শশিভূষণ তখন গ্রামের তিলমাত্র বিবেক। স্বভাবতই শশিভূষণের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যজনিত মর্যাদাবোধ হরকুমারকে উত্তেজিত করল। লক্ষ্য করলেই এটা ধরা পড়ে যে প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের যে বীজ অঙ্কুরিত হল তা যেন একান্তই আইনাশ্রয়ী। ইংরাজের বিচারবত্তার প্রতি যে আস্থা শশিভূষণের তা এক কালের সমস্ত শেক্‌স্‌পীয়র-বার্ক-মেকলে-বায়রন পড়া বাঙালীর। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু অন্তরে ছিল ইংরাজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু এই 'law and order-এর দরোয়ানিতে' বিশ্বাস যে বেশিদিন আর রাখা চলে না শশিভূষণের অভিজ্ঞতা থেকে তখনকার দিনের অসংখ্য শশিভূষণ এই কথাই শিখল। এই ব্রাহ্মণ-ঘটিত আখ্যানের কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ বিষয়ের ওপর স্থাপিত 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধ লেখেন। তাতে সামাজিক প্রেস্টিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন।* আইনের বৃহৎ যন্ত্রের রন্ধ্রগত শনি শশিভূষণের ন্যায়পিপাসা অকালে মিটিয়ে দিল, যেমন গোরায় গোরার আইনের কাছে সুবিচার প্রার্থনার আশা অচিরে মিটে গিয়েছিল। এই নব্য-ইতিহাস পড়া যুবক এই কথাটি বোঝেনি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাসানুদাস জমিদার-নন্দন বিদেশী পণ্যপতির স্বার্থরক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের ইঙ্গিতের অপেক্ষা রাখেন মাত্র। আর শশিভূষণের আইনজ্ঞান যথেষ্টই ছিল, কেবল কাণ্ডজ্ঞানের একটু অভাব ছিল। কারণ হরকুমার তোরাপ নয় বা ফরুসর্দার নয়—সুতরাং হরকুমার শম্বুকের মতো গুটিয়ে গেলেন।

এ-ঘটনা যখন ঘটছে তার পরবর্তীকালই বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যুগ। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের যে অভিজ্ঞতার স্তরগুলি পার হয়ে ক্ষিপ্ত মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় এখানে তারই সুস্পষ্ট কয়েকটি স্তর চিহ্নিত হয়েছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা ভেঁজে রাতারাতি বার্ক হবার প্রয়াসে চিত্তের যে চাঞ্চল্যের প্রকাশ তাই ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভের আশ্রয় নিয়েছিল।

---

*কোনো মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে কোনো সাহেব পাদুকাঘাত করেছিলেন। মফস্বল বাংলায়ও হয়তো এ-জাতীয় ব্রাহ্মণ অবমাননার দৃষ্টান্ত দুর্লভ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে প্রেস্টিজ কর্মনির্ভর। ব্রাহ্মণের কর্ম-চ্যুতির পর প্রেস্টিজেরও অবসান ঘটেছে। তাই অপরের পক্ষে অপমান সহজ হয়েছে।

ষ্টিমারের সঙ্গে নৌকার প্রতিযোগিতার যে ঘটনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে তাও সবিশেষ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। দেশী গ্রামীণ অনুন্নত যন্ত্র ইওরোপের পণ্যবিপ্লবের অভূতপূর্ব যন্ত্রশক্তির সঙ্গে কী অসম প্রতি-যোগিতার মধ্যে পড়ল মেঘ ও রৌদ্রের এই ঘটনাটি তারই প্রতীক। দেশী নৌকা গুলি করে ডুবিয়ে দেওয়ার সঙ্গে দেশী তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়ার খুব বেশি পার্থক্য নেই। এই সঙ্গে দেশী শিল্প প্রচেষ্টার যে-কোনো ব্যর্থতার কথাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। 'জীবন স্মৃতি'তে বর্ণিত সেই নবোদ্ভাবিত গামছার কলের, বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টিমার কোম্পানির সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানির ব্যর্থ প্রতিযোগিতার কাহিনী এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুদ্ধ তেজস্বী মানবতার জন্য এই অসম প্রতিযোগিতার যেদিকে প্রভুত্বের মদগর্ব সেদিকে ক্রুদ্ধ দৃকপাত করেছিলেন।

গল্পে প্রভুত্বগর্বী ইঙ্গ-শক্তির এই দ্বিতীয় অত্যাচারের রূপ প্রথমটি অপেক্ষা অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ, অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিক, ফ্লোটিলা ষ্টিমার কোম্পানির সঙ্গে উক্ত অক্ষম প্রতিযোগিতার কথা কবির মনে এ-ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। কেবল সামন্তযুগীয় মর্যাদাবোধই ধূল্যবলুণ্ঠিত হল তা নয়, এই পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যশক্তি তার চেয়ে বড়ো এক ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে এদেশে এসেছে—এই তত্ত্বের আভাসও এই ঘটনায় আছে। শশিভূষণের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করার মতো। এখানেই ঘটনার ক্ষুরধার স্পর্শে সে প্রথম অনুভব করল যে ক্ষুধার সঙ্গে খাদ্যের মতো, ক্রোধের সঙ্গে শাস্তির একটা আশু সম্বন্ধ থাকা দরকার। আইনের মন্দ গতিতে শশিভূষণের শান্ত রক্ত টগবগিয়ে উঠল। এই আইনের পরিণামে সে বিস্মিত না হয়ে এবারে বিচলিত হল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত কিন্তু কেন্দ্রীয় গুণসম্পন্ন। জেলেদের জাল শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুপ্রবর কেটে দিলেন। যা তাঁর কাছে ক্রীড়া তা অপরের কাছে পীড়া। শশীভূষণ এই তৃতীয় ঘটনায় আর আইন খুঁজলেন না, পুলিসে গেলেন না—সাহেবকে প্রহার করলেন। প্রহার ক্রিয়ার বিশেষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বালকের মতো, পাগলের মতো, শশিভূষণ মারিতে লাগিলেন।' (গোরাও মোকদ্দমায় ব্যর্থ হয়ে অন্য ঘটনায় পুলিসকে প্রহার করেছিল।) বালকের মতো, কেননা তোরাপ, বিষ্ণুবিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস ফকুসর্দারের আন্দোলন ও সংগ্রামের শিক্ষা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্রহণ করেনি। বালকের মতো, কেননা বিক্ষোভের জলন্ত মুহূর্তের অরাজনৈতিক পদক্ষেপে শশিভূষণ, ক্ষুদিরাম কানাই

সকলেই যে একক। বালকের মতো, কারণ আঘাতের প্রাথমিকতায় সকলেই যে অক্ষম।

আর পাগলের মতো, যেহেতু বিক্ষোভের চণ্ডমুহূর্তে ঔপনিবেশিক দাসরক্তও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সন্ত্রাসী মাত্রেই সে উদ্দীপনায় পাগল। ক্রোধের সঙ্গে শাস্তির নিকট-সম্পর্ক-চিন্তা আবেগ-কম্পিত মুহূর্তের চিন্তা। তার মধ্যে বয়স্কের মননের স্থৈর্য নেই, ফলে তোরাপেরা মারে এবং ধরা পড়ে না—শশিভূষণেরা মারে এবং My mission is over বলে ধরা পড়ে। তোরাপের মার দর্শককে প্রবুদ্ধ করে, শশিভূষণের মার বালকের এবং পাগলের মতো বলেই শুধু সহানুভূতি আনয়ন করে আর কিছুই নয়। তাই সন্ত্রাসবাদকে লোকে সমবেদনা জানিয়েছে কিন্তু এ-রাজনীতিকে জনতা জীবনস্থ করেনি। জেলে যাওয়ার কালে শশিভূষণের যে নৈরাশ্যমণ্ডিত উক্তি তাও সন্ত্রাসবাদী বা নিহিলিস্টেরই নৈরাশ্যের সদৃশ। 'অপরাধীর সংখ্যা জেলে পরিমিত, জেলের বাইরে অপরিমিত এ সিদ্ধান্তে শশিভূষণের বিক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের পরিচয় মেলে। অবশ্যই শশিভূষণ চার অধ্যায়ের অতীনের মতো সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত নয়—কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যে-ঐতিহাসিক ঘটনান্তর পার হয়ে বাঙালী যুবক সন্ত্রাসবাদী হল শশিভূষণে তার নিশ্চিত স্বাক্ষর। গোরার কারাবরণের সঙ্গে এই অংশের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান তা সহজেই নজরে পড়ে। গল্পের সঙ্গে সোনার সুতোর মতো জড়িয়ে আছে গিরিবালার কাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে গল্পের সঙ্গে গিরিবালার যোগাযোগ কতখানি অনিবার্য এবং কতখানি আরোপিত। এক অজাতযৌবনা, দশমী কন্যার অকাল বিবাহ শশিভূষণের সাহেব প্রহারের পূর্বেকার বিচলিত চিত্ততার জনক এ-কথা বললে শশিভূষণকে সবটা ব্যাখ্যা করা হয় না, না বললেও আবার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থাকে। শশিভূষণ ও গিরিবালার অসম সাথীত্বও বাল্যপ্রণয়ের অভিশাপকে এড়াতে পারেনি। গিরিবালা ও শশিভূষণের পুনর্দর্শনের অধ্যায় যদি চেখভের হাতে পড়তো তাহলে চেখভ নিশ্চয়ই লিখতেন যে জটিলতার এবার থেকেই শুরু। রবীন্দ্রনাথ তা না করে একেবারে বিপুল লিরিক ভাবাবেগে শশিভূষণের অসংগঠিত ব্যক্তিগত বিক্ষোভের পরের অনিবার্য সিনিসিজমের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছেন। বিধবা গিরিবালাকে দেখে শশিভূষণের অশান্ত নৈরাশ্যের উপশম হল। গল্পের এই অংশে নিঃসন্দেহে শিল্পবুদ্ধির ব্যত্যয় ঘটেছে এবং রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বাস্তবকে পরিহার করে উর্দ্ধপ্রয়াণ করেছেন। গিরিবালা ও শশিভূষণের

পুনর্মিলন হৃদয়ের কোন্ ধর্মের ভিত্তিতে হল তা গল্পের পরেও অবোধ্য থাকবে। গিরিবালা বিধবা। কিন্তু তার সংসার-ভূমিকা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল না। গিরিবালার বাড়িতে কারামুক্তির পর শশিভূষণের আশ্রয়ের স্বরূপই বা কী তাও ঠিক বোঝা গেল না। মিলনের অশ্রু-বাষ্পোচ্ছ্বাসে গিরিবালা, গল্পের প্রথম থেকেই যেমন জানলার বাইরে, গল্পের শেষেও তেমনি গল্পের বাইরেই রয়ে গেল।

কিন্তু জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে শশিভূষণের বিক্ষোভের মুহূর্তে যেমন সন্ত্রাসবাদিতার জন্মকাল সূচিত হয়েছে, গল্পের উপসংহারে তেমনি তার মরণও সংকেতায়িত হয়েছে। কেননা গিরিবালার আহ্বানে আর যাই থাক সংগ্রামের সংকেত নেই—শুশ্রূষা বা সান্ত্বনা থাকতে পারে। সেই শুশ্রূষায় এবং সান্ত্বনায় শশিভূষণের ব্যক্তি-জীবনের আর্তিই লক্ষণীয়—জাতীয় মানসের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকা হিসাবে ব্রিটিশ কলোনি সেখানে স্থান পায়নি। ফলে শশিভূষণ গল্পের শেষে কিছুটা নঙর্থক না হয়ে গিয়ে পারেনি।

এর কারণ এই যে শশিভূষণ কর্মময় জীবনে, কিংবা সে-জীবনের ক্রমপরিণতি ও বিস্তৃতিতে আস্থাশীল ছিল না। গোরার প্রবল পুরুষকার শশিভূষণের নয়। তাই গোরা যেমন চরঘোষপুরের মুসলমান প্রজাদের সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সশ্রদ্ধ-সংবাদ রাখত শশিভূষণ তা রাখত না। ফলে শশিভূষণের আইনানুগ প্রতিবিধান-প্রয়াসে হিতবাদ এবং শারীরিক বিক্ষোভ প্রদর্শনে মধ্যবিত্তের একক সন্ত্রাসবাদী-প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টা যখন বিড়ম্বিত হল তখন সে অতটা নিরাশ হয়ে পড়ল।

নিহিলিস্টদের-অ্যানার্কিস্টদের একটা 'যেনতেন' দর্শন ছিল। রাষ্ট্র, প্রেম, ব্যক্তি সম্বন্ধে তাদের একটা সংজ্ঞা নির্দিষ্ট রাখার চেষ্টা ছিল। শশিভূষণরা সেই শ্রেণী-ভুক্ত রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী নয়। এ উপনিবেশের কেরানী-উকিল-মাস্টার অধ্যুষিত মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম স্তর মাত্র। সুতরাং এর যেমন দুর্বলতা তেমন আন্তরিকতা। শশিভূষণে তা সর্বদাই প্রতিফলিত হয়েছে। গোরা উপন্যাসে গোরাকেও রাষ্ট্র ভাবনায় বিশেষ ভাবিত দেখা যায় না। তার কারণ পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

মেঘ ও রৌদ্রের গল্প রচনার সময় থেকেই গোরা রচনার মানসিক প্রস্তুতি পর্ব। এই গল্পে যেমন ঘটনার বিস্তার, যেমন বিলম্বিত লয়, যেমন প্রকৃতি-মানুষ-সমাজ ও ব্যক্তির একত্র প্রতিফলন তা উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত। সর্বোপরি এখানেই

প্রথম জাতীয় বেদনা, তার পরাধীনতার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ সাহিত্যভাত হয়েছে। গোরায় যে মহাকাব্যোচিত বিস্তার এবং গোটা ভারতের মর্ম ও কর্মের প্রতিনিধিত্বের পরিচয় মেলে তার সূত্রপাত মেঘ ও রৌদ্রে। সেদিক দিয়ে গল্পটির সার্থকতা অনন্য। মেঘ ও রৌদ্রের যে শৈথিল্য তা মহাকবির জাতীয় বেদনায় অতি উত্তেজনা-জনিত। এই বেদনাকে গড়ে পিঠে সাজিয়ে গোরা-রচনা। গোরায় যা স্বর্গ বা মহীরুহ, ১৩০২ সালের অনধিকার প্রবেশ ও মেঘ ও রৌদ্র গল্পে তাই উদীয়মান বা অঙ্কুরিত।

গল্পে শশিভূষণের উপসংহারে যে শিল্পগত ত্রুটি গোরা তা থেকে অনেকটা বেঁচেছে এ-কথা কিছুতেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার হতে পারে না যদি না আমরা ঐ শিল্পগত ত্রুটির মূলীভূত কারণটি তুলে ধরি। ব্যক্তি হিসাবে শশিভূষণের সমস্যার উৎস আমাদের নিশ্চয় সন্ধান করতে হবে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে। শশিভূষণ গ্রামবাসী ব্যক্তি হয়েও গ্রামের সমাজ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত নয়। সে শহরের শিক্ষিত যুবক। সেদিক থেকে উনিশের শতকের ইংরাজি শিক্ষার ফলস্বরূপ গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার মর্মগত সম্পর্ক একেবারেই শূন্য। সেই শূন্যতার বোধ তার মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার জন্য তার কোনো যন্ত্রণা আছে কি না তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। শূন্যতাটাকে ভরাট করবার জন্য সে দুটো বস্তুর আশ্রয়ী, এক বই, দুই গিরিবালা। এর ফল হয়েছে এই গিরিবালার প্রেম তার কাছে তার বই-এরই মতো আশ্রয়প্রার্থনার শিবির। তাই সে যখন বৃহৎ ঘটনাচক্রের মধ্যস্থলে গিয়ে দাঁড়ালো তখন গিরিবালা রইল মুলতুবী। আবার সে যখন বৃহৎ ঘটনাবর্তের উপসংহারে কারাগৃহ থেকে ফিরে এল তখন গিরিবালাও পরিশিষ্টের মতো ফিরে এল। গ্রামে গিরিবালার কৈশোর-প্রেমেরও যেমন স্থিতিশীল রূপ, সেই প্রেম শশিভূষণকে যেমন কোথাও উত্তীর্ণ করেনি, উপসংহারে গিরিবালার বাড়িতেও শশিভূষণ এবং গিরিবালা যে কোথায় উপনীত হল তাও তেমন বোঝা গেল না। তার কারণ শশিভূষণের সমস্ত জীবনটাই উদ্দেশ্যহীন। সে গ্রামের জীবনের দিকে তাকিয়েছে ক্লান্ত হয়ে, সে গ্রামের ঘটনাচক্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্রুদ্ধ হয়ে, এই দুয়েরই মূল্য শেষ পর্যন্ত খুব বেশি নয়।

অথচ গোরা সেদিক থেকে পরিণত কল্পনার সৃষ্টি। গোরা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রনাকে উপলব্ধি করেছে। এবং লেখকের পক্ষ থেকে উপলব্ধির মূলটা রয়েছে ১৯০৫-এর বাংলা দেশের দেশব্যাপী আলোড়নে। এই বিচ্ছিন্নতার এবং ব্যবধানের

মাঝখানে যে সেতুবন্ধন প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ সেটা সে-সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন :

> আমি যে একা আমি নহি, আমার যেমন এই ক্ষুদ্র শরীর তেমনি আমার যে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের সুখদুঃখময়চিত্ত যে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি যে আমারই চিত্তের উন্নতি, এই একান্ত সত্য আমরা যতদিন না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে অবতীর্ণ-হইয়াছি—ততদিন কেবলই আমরা ভয়ে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বহুদিনের দাসত্বে পিষ্ট, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট কেরানী সহসা অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিসর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কী। তাহার কারণ তাহারা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালীর সহিত এক বলিয়া অনুভব করিয়াছে।

লৈখিক ক্রিয়াপদগুলি সরিয়ে দিলে এটিকে গোরার বক্তৃতা বলা যেতে পারে। (গোরার মধ্যে প্রথমাবধি দেখা যায় সে নিজেকে বিস্তারিত করতে চাইছে। জীবনের ভগ্নাংশরূপ তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে বলে সে বুঝেছে যে আমাদের সমাজের প্রাচীন প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। তবেই আবার জীবন ভগ্নাংশতাকে পরিহার করে বিস্তৃত পূর্ণতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। এই কারণে গোরা নিজের মূল মেলে দিতে চেয়েছে ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন তার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক, কামার, মুটে-মজুর, হিন্দু-মুসলমান নিচুতলার লোকজনদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করতে চেয়েছে। দেশের সেই বৃহৎ স্বরূপের সন্ধানই গোরার সন্ধান। এই সন্ধানের পথে নানা বাঁক, নানা বঙ্কিম দুরতিক্রম্যতা। গোরা খ্রীষ্টান দাসী লছমিয়ার হাতে জল খায় না। কিন্তু চরঘোষপুরে গিয়ে মাধব চাটুজ্যে, যে দারোগার বন্ধু, তার বাড়িতেও জল খায় না। বিমূঢ় রমাপতিকে ফেলে রেখে সে চলে যায় সেই নাপিতের বাড়ি জল খেতে, যেখানে পিতৃহারা মুসলমানের ছেলে মানুষ হচ্ছে—যে নাপিত হিন্দুর হরি ও মুসলমানের আল্লার মধ্যে কোনো তফাত দেখে না। কিন্তু মাধব চাটুজ্যে আর ফরুসর্দারের তফাতটা সে জানে। গোরা অবশ্য ওখানেও নাপিতের হাতে জল খায়নি। ঘটি মেজে নিয়ে নিজের হাতে জল তুলে খেয়েছে। কিন্তু

মাধব চাটুজ্যের জল যে অস্পৃশ্য এটা সে বুঝেছে। লাঞ্ছিত দেশবাসীর পক্ষাবলম্বনে ও তার জন্য কারাবরণে গোরার ক্ষোভ নেই, কিন্তু গোরা কদাচ রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা দিল না—এটাও আবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রের থেকে সমাজ আমাদের কাছে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই স্বদেশী সমাজ বাইরের রাষ্ট্র-শক্তির ধাক্কায় ভেঙে পড়েছে। শক্তির আয়োজনটা শুরু করতে হবে সমাজের শক্তি উদ্ধারের ভিতর দিয়ে। এবং সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রথম শর্ত তাকে চেনা, জানা, ভালবাসা। সেই সমাজের ব্যর্থতায় চতুর্দিকে পরিকীর্ণ ভাঙাচোরা মানুষগুলোকে কাছে টানা। গোরার যাত্রা এইপথে। সে আহত মুসলমান ডিমওয়ালার দুঃখে একাত্ম হতে চেয়েছে। সে ছুতোর-কামারের ছেলেদের নিয়ে ক্রীড়াসংঘ করেছে। সে হিন্দু-হিন্দু করলেও পরেশবাবুর পায়ের কাছে চলে যাবার বীজ তার মধ্যেই ছিল। সে বীজ শুধু তার জন্মরহস্যে নেই।

এই প্রবল কর্মপরায়ণ এবং প্রবল তর্কপরায়ণ ব্যক্তিটিকে এই আলোকেই অনু-ধাবন করতে হবে। মানুষ যে কেবল হজম করার যন্ত্র এবং কাপড় টাঙাবার আলনা নয় বিদ্যাসাগর-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলেছেন। Hero কে? এই কথার জবাবে কার্লাইলের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে "তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন—যে সত্য, দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধি-কাংশের অগোচরে চারিদিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অনন্তরাজ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব; কর্ম-দ্বারা অথবা বাক্য-দ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অনন্তরাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।"* গোরার প্রচণ্ড তর্কপরায়ণতা চারিদিকের তুচ্ছতা, ব্যর্থতা এবং মূঢ়তার মাঝখানে একটি সজীব মনের আলোড়নের অভিব্যক্তি। তর্কের জন্যই গোরা কখনও তর্ক করেনি। যন্ত্রণামথিত পুরুষকারের হাহাকার গোরার সমস্ত কর্মে এবং বাক্যে প্রতিফলিত। সে পুরুষকারের বাস্তব মূর্তি রবীন্দ্রনাথ কোথায় প্রত্যক্ষ করলেন তা নিয়ে নানা অনুমান আছে। কেউ মনে করেছিলেন বিদ্যাসাগর চরিত্রের কর্মিষ্ঠ গতিবেগ ও অনন্য পরতন্ত্রতাকে রবীন্দ্রনাথ গোরা কল্পনার ভিত্তি ভূমিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সম্প্রতি শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বিশ্বভারতী পত্রিকায় গোরা কল্পনায় ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়ের

*আত্মশক্তির স্বদেশী সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জীবনকথার প্রভাব ও তৎসংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির উল্লেখ করে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছেন। বিদ্যাসাগর অথবা ব্রহ্মবান্ধব যিনিই গোরা কল্পনার ভিত্তি হোন না কেন, এখানে একটা কথাই স্বতঃস্বীকার্য। টলষ্টয় তাঁর সমস্ত ভাবলোকের বাস্তবাংশে রুশিয়ার ডিসেম্বি্ষ্ট আন্দোলনের উদার আলোক-রাশিকে ধারণ করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কালের বাংলা দেশের যুক্তি-বুদ্ধি-হৃদয়ের নবজাগরণকে অন্তর দিয়ে অনুধাবন করেছেন, তার সীমাবদ্ধতাকেও শিল্পীর মতো উপলব্ধি করেছেন। চারিদিকের এই ভগ্নাংশরূপের যন্ত্রণার মূল খুঁজতে গিয়ে সে নিজের ভগ্নাংশরূপকেও আবিষ্কার করেছে সুচরিতার সংস্পর্শে এসে। যে তিনটি লোকের কাছে সে স্পষ্ট হতে চেয়েছে এবং যে তিন জন তাকে ভাল-বেসেছে তারা হলেন আনন্দময়ী, পরেশবাবু এবং সুচরিতা। এর মধ্যে সুচরিতার প্রশ্ন স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের এই অধ্যায়েই গোরার সমস্ত যন্ত্রণা চূড়া স্পর্শ করেছে।

এই উপন্যাসের সমস্ত শিল্পকর্মের অংশে উপন্যাসের মৌল কল্পনার প্রসাদ কেমন-ভাবে উপস্থিত ও কেমন করে নানা দিক থেকে উপন্যাসটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবার তারই আলোচনা করা যাক। আমরা এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেছি কোনো উপন্যাসের শিল্পকর্মের মহিমা একমাত্র সে উপন্যাসের নৈতিক তাৎপর্যের সম্পর্কেই উপলব্ধি করা যায়—অন্য কোনো ভাবেই নয়। সে কারণেই উপন্যাসে উত্থাপিত নৈতিক প্রশ্নাবলী বা নৈতিক গভীরতার বিষয়টির পৃথক অনুসন্ধান অথবা উপন্যাসটির শিল্পমহিমার স্বতন্ত্র সূত্রানুসন্ধান দুইই ভ্রান্ত কাজ। প্রকৃত সমালোচক কদাচ এই খণ্ডিত পথের পথিক হন না। কেননা তিনি জানেন যে উপন্যাসে উত্থাপিত নৈতিক আগ্রহের গভীরতা আছে অথচ উপন্যাসের আঙ্গিক-রূপে তার কোনো অভিব্যক্তি ঘটল না, কিংবা আঙ্গিকরূপের উজ্জ্বল সৌকর্য সত্ত্বেও উপন্যাসের কোনো নৈতিক গভীরতার সাক্ষাৎলাভ হল না, এই উভয় ক্ষেত্রেই (যদি এতাদৃশ অসম্ভব ঘটনা ঘটেই) শিল্পহীনতার নিদর্শনই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কোনো উপন্যাসের শিল্পময় রূপ যদি যথেষ্ট চিত্তগ্রাহী হয় তবে তা জীবনের অমেয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করেই হতে পারে—নচেৎ নয়। নৈতিক প্রশ্নের বেলায় শূন্যতা অথচ শিল্পকৌশলে সম্পন্নতা—এ শশবিষাণ অলীক কল্পনাতেই সম্ভব। তার কল্পনাতেই ত্রুটি আছে। আঙ্গিক রূপের ত্রুটি বা গুণ নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন পরিশেষে সে

আলোচনা লেখকের জীবনবোধের অপূর্ণতার বা পূর্ণতার দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে।

এ-কারণেই সম্ভবত এমন কথা বলা হয় যে উপন্যাসের প্রতিটি অংশে, স্তরে এবং পর্যায়ে তার সমগ্রতারই প্রতিফলন ঘটে থাকে। অর্থাৎ যেহেতু লেখকের জীবন সচেতনতা বা নৈতিক বোধ উপন্যাসের চিত্র, চরিত্র, নাটক, কাব্য ইত্যাদির মাধ্যমেই রূপান্তরিত হয়ে থাকে সেই হেতু কোনো একটিরও পৃথক আলোচনাতে উপন্যাসের সামগ্রিক বক্তব্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এ প্রাসঙ্গিকতা না মানলে কন্‌রাড কেন জাতীয়তায় পোল এবং ভাষাভিজ্ঞতায় ফরাসীর কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজীকে তাঁর উপন্যাসরাজির ভাষা হিসাবে নির্বাচন করলেন তা বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না কেন কমল (শেষ প্রশ্নে) এবং গোরা তথাকথিত তার্কিক চরিত্র হয়েও এত পৃথক। কেনই বা একটির ক্ষেত্রে আমাদের পাওনা বাস্তবতার সঙ্গে ভাবপ্রবণতার অসম সংযোগের শিল্পবিনাশী প্রয়াস, আর একটির ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শের যোগ্য মিলন।

গোরা উপন্যাসের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাগুলো আরও গভীরভাবে বিবেচ্য। আমাদের পণ্ডিতী আলোচনার ক্ষেত্রে গোরাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে আলোচনা কদাচ হয় নি। সেই জন্যই বোধ হয় যখন অন্য কোনো রসিক মহল থেকে বলা হয় গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস তখন সাধারণ বাঙালী উপন্যাস-পাঠক ঈষৎ বিব্রত বোধ না করে পারেন না। বস্তুত গোরা সার্থকতম বাংলা উপন্যাস এই উক্তির সঙ্গে 'গোরার চরিত্রে জীবন রহস্যের প্রকাশ ঘটেনি' অথবা 'পরেশবাবু এবং আনন্দময়ী পিঙ্গল এবং রক্তহীন' এই সমস্ত উক্তি নিচয়ের মাঝখানে পাঠকের দিশাহারা হবার কথা। এ-ক্ষেত্রে আমরা "গোরা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই শুধু নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে"—এ-কথা মেনে নিয়ে এর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

গোরা উপন্যাসে শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে প্রথমেই গোরা-র প্রধান মৌল প্রশ্নগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান কর্তব্য। এই মৌল প্রশ্নগুলির সঙ্গে উপন্যাসকারের বাস্তবতাবোধের দোষ-গুণের প্রশ্ন বিজড়িত। প্রতিটি মোটামুটি সার্থক উপন্যাসই আমাদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু মোটামুটি সার্থক উপন্যাসের সঙ্গে একটি মহৎ উপন্যাসের তফাত 'এই খানেই যে

মহৎ উপন্যাসের কাজ শুধু উপন্যাসকারের বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান নয়, পাঠকের বাস্তব-সচেতনতার পরিধিকে সম্প্রসারিত করা, তাকে শুদ্ধ করাও তার কাজ বটে। এ-কাজে ব্যর্থ হলে সে রচনা মহৎ উপন্যাসের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। এবং উপন্যাসের বনিয়াদী পাঠক সমাজ জানেন যে বাস্তব সচেতনতার এই শুদ্ধীভবন ও সম্প্রসারণ উপন্যাসের ব্যবহৃত চরিত্রের বাস্তব, ইতিবাচক এবং ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোনো গূঢ় তাৎপর্য সৃজন ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই গোরা চরিত্রে ইতোপূর্বে অনাবিষ্কৃত কোন্ বাস্তব ইতিবাচকতা উপস্থিত?

গোরা চরিত্রের মেরুদণ্ড তার "দেশপ্রেম" (এই শব্দটিকেই সমালোচকেরা ব্যবহার করেছেন)। কিন্তু এ-কথাও আমাদের জানা আছে যে এই দেশপ্রেমের স্বরূপ বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত দেশপ্রেম থেকে পৃথক। গোরা-র আগে পর্যন্ত বাংলা নাটক-নভেলে দেশভক্তি ছিল দেবীভূত মাতৃভক্তিরই নামান্তর। গোরার রচনাকাল ও প্রকাশকালও এই বন্দেমাতরম্ প্রসঙ্গে অতিভক্তির কাল। কিন্তু গোরার দেশপ্রেম দেশমাতৃকা সম্বন্ধে কোনো ভাবানুভূতি নয়। দেশের মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধেই তার আগ্রহ। এবং এটাই তার দেশপ্রেম। সেই কারণে গোরা কখনই সন্দীপের মতো দেশজননীর কথা বলেনি। সে সুচরিতা অথবা পানুবাবু এদের সকলের কাছে ভারতবর্ষের কথা বলেছে। গোরার যন্ত্রণাটা আসলে ভারতবর্ষ সন্ধানের যন্ত্রণা। বাবুকালচারের অপরিহার্য ফল হিসাবে গোরা এ কথাটা ঠিকই উপলব্ধি করেছিল যে সে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন। যেটাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, বলেছিলেন শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই, সেই খণ্ডীভবনের যন্ত্রণার পূর্ণ নিদর্শন গোরা।

সেই খণ্ডীভবনের পরিণামস্বরূপ জীবনযাত্রার অসঙ্গতি মহিম এবং পানুবাবুতে যেমন, গোরাতেও তদপেক্ষা কম কিছু নয়। সে চরঘোষপুরের মুসলমান প্রজাদের পক্ষ নিয়ে পুলিসী জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অথচ লছমির হাতে জল খেতে তার আপত্তি। সে সমগ্র ভারতের সন্ধানী অথচ ব্রাহ্মদের জাতিভেদহীন জীবনাদর্শকে পশ্চিমী অনুকরণ বলে মনে করে। কিন্তু পানুবাবু বা মহিমের অসঙ্গতি থেকে এটা পৃথক এই কারণে যে তার মধ্যেই একমাত্র এই অসঙ্গতির যন্ত্রণা বিদ্যমান এবং এই অসঙ্গতি থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য নিজের অভ্রান্ত সত্তার খোঁজে সে অনলস। তার উত্তরণই গোরা উপন্যাসের বিষয়। এই উত্তরণের পথে এসেছিল সুচরিতার প্রেম। গোরার দেশানুভূতির সঙ্গে সুচরিতা সংক্রান্ত

প্রেমের বোধের প্রথমে সংঘাত ও পরে সমন্বয় সন্ধান গোরার জীবনের প্রধান ঘটনা। গোরার কাছে গোরার জন্মরহস্যের বৃত্তান্ত উন্মোচিত হওয়ার পরে একই পথে তার দুটো প্রশ্নেরই মীমাংসা হল।

এইভাবে আরো দেখা যায় যে উপন্যাসের সকল কিছুই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুবৃহৎ উপন্যাসের এই অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য তার বহিরঙ্গ নির্মাণেও নানাভাবে ছায়াপাত করেছে। নানা দিক থেকে সেটিকে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই উপন্যাসের আলোচনায় আমরা প্রথমেই যেটিকে গুরুত্ব প্রদান করবো সেটি হল গোরা উপন্যাসের গঠনে উপন্যাসে ব্যবহৃত সময় বা কালখণ্ডের তাৎপর্য। এখানে অবশ্য প্রথমেই ব্যক্ত করা প্রয়োজন যে সময় বা কালখণ্ড বলতে লেখক বাংলা দেশের ইতিহাসের কোন্ অংশকে গোরা উপন্যাসে ব্যবহার কারছেন সে কথা বোঝানো হচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন অধিকতর সহজ। গোরা উপন্যাসের ঘটনা ঘটতে কত সময় ব্যয়িত হয়েছে এবং তা উপন্যাসের দিক থেকে কোনো তাৎপর্যবহ কি না। উপন্যাসের ঘটনায় ব্যয়িত সময়কালের বৈশিষ্ট্যগুলি এই ঃ

(ক) এই সুবৃহৎ উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার সময়কাল ছয়মাস মাত্র। শ্রাবণ মাসের এক সকালে উপন্যাসের ঘটনার প্রারম্ভ এবং মাঘ মাসের মধ্যেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার উপসংহার ঘটেছে।

(খ) এর মধ্যে বর্ষা থেকে হেমন্তের এই কয় মাসের জন্য একবিংশ পরিচ্ছেদ ব্যয়িত হয়েছে। একবিংশ পরিচ্ছেদে গোরার আত্মচিন্তায় হেমন্ত-রজনীর উল্লেখ আছে। ("আজ এই হেমন্তের রাত্রে নদীর তীরে নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।") উপন্যাসের বাকি পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদ হেমন্ত থেকে শীতের মধ্যভাগের অন্তর্বর্তী কালে ঘটেছে। এই অতিপরিমিত সময়ই উপন্যাসের মূল ঘটনার কাল।

(গ) এবং পূর্বে কথিত কালখণ্ডের শেষাংশে একমাস গোরা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত ছিল না।

(ঘ) উপন্যাসের এই অতিপরিমিত কালখণ্ডে প্রত্যক্ষ ঘটনাই উপন্যাসের সম্বল। উপন্যাসের স্ফীত কলেবর নায়ক-নায়িকার অতীত ইতিবৃত্ত কথনের জন্য বা চিন্তাসূত্রের অতীতানুসরণের জন্য হয়নি। একমাত্র হরিমোহিনীর কাহিনী ছাড়া কোথাও সে আয়োজন দেখা দেয়নি। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি হয়তো

সাধারণভাবে দেখতে গেলে এমন কিছু মূল্যবান নয়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের শিল্পগত প্রয়োজন সিদ্ধিতে এরা নানাভাবে সহায়ক হয়েছে। সেগুলি এই :

(ক) ঘটনাকালের পরিসর সীমিত বলেই উপন্যাসের গতিতে এক সাবলীল খরস্রোত সদাসর্বদা বিদ্যমান। অথচ ঘটনাকালের পরিসর-স্বল্পতা উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। উপন্যাসের অতিরিক্ত কোনো অতীত ঘটনা গোরা উপন্যাসে নেই তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর ছক পেরিয়ে গোরা যখন উপসংহারে সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হল তখন এ-কথা না মনে হয়ে যায় না যে গোরা যেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে উপনীত হল। মাত্র কয়েক মাসের পরিসরে তথাকথিত হিরোয়িক ঘটনা সমাবেশ পরিহার করেই অগাধ জীবনের এই বিপুল প্রতিবিম্ব রচনা করা হয়েছে।

(খ) এবং এইভাবেই গোরা যথার্থ এপিক উপন্যাসে পরিণত হতে পেরেছে। কল্পনার একমুখী গতি রসপরিণামশীল বলে এপিক উপন্যাসে ভাষাগত অখণ্ডতা এবং সংহতি সর্বদাই নিখুঁতভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে। এপিক উপন্যাসে হিরোয়িক ইম্প্রেশন প্রধান কথা। এই ইম্প্রেশন, অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত ভাষা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। গোরা উপন্যাসে ঘটনাকালের পরিসরস্বল্পতা কল্পনার একমুখী অনুপ্রাণিত গতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ফলে উপন্যাসকে কোনো পরিচ্ছেদে বা কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রেই শিথিল বা শ্লথ হতে হয়নি। উপন্যাসের ভাষায় যে কবিত্ব এবং যে চিত্রকল্পরাজির সাক্ষাৎ মেলে, যা আমরা এখনি আলোচনা করব, তা আসলে পূর্বোক্ত কল্পনার সংহতি এবং তার একমুখী রসপরিমাণশীল গতিরই ফল। ঘটনাকালের পরিসরস্বল্পতা এই কল্পনাগত সংহতি ও অখণ্ডতা নির্মাণে সাহায্য করেছে এবং তারই ফলে এপিক উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা-সম্পদে গোরা উপন্যাস অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত—বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রধান বক্তব্য এটাই।

গোরা যে মহাকাব্যোচিত বা এপিক জাতীয় উপন্যাস এ-কথা গোরা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের সময়েও সমালোচকেরা মনে রেখেছেন। কিন্তু সম্ভবত মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে তা আংশিক বলেই গোরার বিচারে নানা ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মহাকাব্যোচিত ঘটনা সমাবেশই কোনো উপন্যাসকে (বা কোন কাব্যবস্তুকে) মহাকাব্যোচিত বা মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত এই আখ্যায় ভূষিত করে না। বস্তুত মহাকাব্যের

সার্থক ইম্প্রেশন সৃষ্টির জন্য দান্তের আশ্চর্য রচনা থেকে সমালোচকেরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার কথা স্মরণে রাখলে কোনো এপিক সৃষ্টির কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কী চাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। মহাকাব্যের ফলশ্রুতি পাঠকমানসে সঞ্চারিত করাই যদি এপিক উপন্যাস লেখকের কর্তব্য হয় তাহলে বিষয়ের বিন্যাসের দিকে লেখককে অধিক দৃষ্টিশীল হতে হয়। নিশ্চয় টলস্টয়ের ওঅর অ্যাণ্ড পীস উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহ রাজারাজড়া প্রভৃতির কাহিনী বর্ণিত আছে বলেই বা বহু বর্ণাঢ্য ঘটনার শোভাযাত্রায় উপন্যাসটি পরিপূর্ণ বলেই ওঅর অ্যাণ্ড পীস মহাকাব্যোচিত উপন্যাস নয়। সমগ্র উপন্যাসের রসপরিণামে মহাকাব্যের আস্বাদ লভ্য বলেই উক্ত উপন্যাস মহাকাব্যোচিত।

এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কী এই মহাকাব্যোচিত রসপরিণাম? এ-প্রসঙ্গে ভারতীয় মহাকাব্য (যেমন মহাভারত) সম্বন্ধে পণ্ডিত সমালোচকেরা অলংকার শাস্ত্রসম্মত যে আলোচনার পন্থা নির্দেশ করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। মহাকাব্য শেষ পর্যন্ত শান্তরসপরিণামী। মহাভারতের মহাপ্রস্থানের ট্রাজেডির মধ্যেও (ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত) সেই শান্ত রসেরই জাগরণ। বস্তুত মানবজীবনের বিশাল উত্থান-পতন, তার ব্যাপকতা এবং গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতার বোধ থেকেই এর শান্তরসপরিণামী আস্বাদের জন্ম। অনেক রূঢ়তা, ক্রূরতা, তামসিকতা রাজসিকতার পরে, বহু অশ্রু এবং রক্তের শেষে মহাপ্রস্থানের অধ্যায়ে না পৌঁছলে, আত্মনিগ্রহের যন্ত্রণায় না উপনীত হলে, জীবনের সুসমতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হত না। পূর্ণ জীবনবোধই এই সুসমতার জনক। এবং এইখানেই নৈতিক গভীরতার নিধান।

মহাকাব্য যেমন, মহাকাব্যোচিত উপন্যাসেও তেমনি ঘনীভূত নৈতিক চেতনা শিল্পকর্মের অতিরিক্ত, অথবা বাইরে থেকে সংযোজিত কোনো বস্তু নয়। উপন্যাসের শিল্পকর্মেই এর অভিব্যক্তি। অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে উপন্যাসের ভাষার ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যময়। টিলিয়ার্ড সাহেব তো এ-বিষয়ে সুকঠিন নিয়মের পক্ষপাতী। মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা ব্যতিরেকে কোনো রচনাই (বিষয়-মহিমা থাকলেও) 'মহাকাব্যোচিত' এই মর্যাদায় চিহ্নিত হতে পারে না। টিলিয়ার্ড বলেছেন—

If an author treats his subject 'heroically'. if he can maintain the pressure of his will, he will densify his

language and persuade us in so doing that his work was conceived and carried through with intense energy and application. And, in the easy and fluid medium of prose fiction it is a lack of intensity that so often presents itself as the reason why a work; admirable in other ways, can not be considered as an epic.

গোরা উপন্যাসের ভাষায় এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার সাক্ষাৎ মেলে। অবশ্যই এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার মূলে রয়েছে পূর্বকথিত অন্তর্নিহিত গতিবেগ। গোরার চরিত্র, তার যন্ত্রণা, নবকালের ভারতবর্ষ এবং গোরার অগ্রণী মনে খণ্ডিত অস্তিত্বের বেদনা—জীবনের স্থায়ী সূত্রানুসন্ধানের জন্য তার তীব্র আকুলতা এই অনুপ্রাণিত ঘনবদ্ধতার জন্মদাতা এবং গোরার ইতিবাচকতা যে আমাদের স্বকালীন ফ্রাসটেশনের অনেক দূরের ব্যাপার, বিশ্বাসভঙ্গের নয়, গোরার যন্ত্রণা যে বিশ্বাস অর্জনেরই যন্ত্রণা গোরা উপন্যাসের আলোচনাকালে সে কথাও স্মরণীয়। কল্পনার সেই সুদৃঢ় অনুশাসন, যার বিদ্যমানতায় আমরা (অন্য সব দিক বজায় থাকলে) একটা উপন্যাসকে মহাকাব্যোচিত এই আখ্যা দিতে পারি গোরা উপন্যাসের ভাষায় তা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান কাব্যপুস্তকের বেলায় যেমন আমরা দেখেছি যে কবিজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কবি-ভাবনার বিশিষ্ট অনুষঙ্গে একটি বিশেষ চিত্রকল্প পর্যায়ের প্রতি কবির পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। গোরা উপন্যাসের ভাষায় ঔপন্যাসিকের কল্পনার সেই তাৎপর্যপূর্ণ একটি চিত্রকল্পের প্রতি পক্ষপাতের সাক্ষাৎ মেলে। এই চিত্রকল্পটি নদী, সমুদ্র, তরী, তরঙ্গ এবং কূল উল্লঙ্ঘন সংক্রান্ত কোনো চিত্রকল্প। গোরা উপন্যাস থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে।—

(ক) কম্পাস ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে—তখন মনে হবে জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সংকীর্ণতা—কেবল না হক ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো।

(খ) এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্বুদের মতো মিলাইয়া গেল।

(গ) ডুবে মরতে পারি কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে।

(ঘ) আর সমস্ত ভুলে কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে।

(ঙ) এই জনসাধারণের সঙ্গে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটা বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়।

(চ) এই একটা বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নূতন বন্যা যেন আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল।

অবশ্য এইভাবে যদি নদী, তরঙ্গ, তরী, সংক্রান্ত উপমা বা চিত্রকল্পের তালিকা করা যায় তাহলে তার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত নিরূপণ করা মুশ্‌কিল। যখনই এই উপন্যাসে ঘটনাস্রোত জটিল এবং বঙ্কিম হয়ে উঠেছে লেখকের ভাষা হয়ে উঠেছে আবেগান্বিত, তখনই এই জাতীয় চিত্রকল্পের আধিক্য লক্ষ্য করার বিষয়।

(ক) দু-নৌকায় পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকা থেকে তাকে পা সরাতে হবে। এতে আমারই কষ্ট হোক আর তারই কষ্ট হোক।

(খ) হোক অন্যায় আর তা ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এই স্রোতেই যদি কোন একটা কূলে তুলিয়া দেয় তো ভালো, আর যদি ভাসাইয়া দেয় তলাইয়া দেয় তবে উপায় কী!

এবং উক্ত দুই উদ্ধৃতির মধ্যবর্তী চার পাতায় 'আকাশ ভাঙিয়া যাওয়া' 'পরিপূর্ণ বেগে বন্ধনমুক্ত মন' 'পথিক প্রবাহ' প্রভৃতি চিত্রকল্পের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। এবং এর পরেই ব্যবহৃত অনুরূপ চিত্রকল্প লক্ষণীয়:

স্বদেশের সেই সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী সুনিশ্চিত সুগোচর তার আনন্দ, তার বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল যা বন্যার স্রোতের মতো জীবন মৃত্যুকে এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারছি।

এই নদী-প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পগুলির সঙ্গে গোরা উপন্যাসের শিল্পপ্রাণের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। গোরা-চরিত্রের মৌল গতিবেগ—যা নদীর মতো দীর্ঘ-পথবাহী, আবর্তসংকুল, এবং সমুদ্রসন্ধানী—স্বভাবতই নদী-প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্প-গুলিতে আপন সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছে। নিজের চতুষ্পার্শ্বকে অতিক্রম করে যাওয়ার পথের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বেদনা-যন্ত্রণা, বারম্বার ফিরে ফিরে নিজেরই সম্মুখীন

হওয়া, তাই গোরা উপন্যাসের বীজ-কল্পনা। যেহেতু মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা ব্যবহার, চিত্রকল্পসৃজন, এবং সব কিছুই, একটা অখণ্ড কল্পনাবিন্দু থেকে, এক অনাহত প্রয়াসে উৎসারিত ব্যাপার তাই গোরা উপন্যাসের স্থায়ী চিত্রকল্প পর্যায়েও নদী প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পেরই সুপ্রয়োগ ঘটেছে।*

এবং এই সঙ্গেই আখ্যানভাগের কোনো অংশের পটভূমিকা হিসাবে নদীর ব্যবহারও বিশেষ লক্ষ্য দাবি করতে পারে। উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদ এবং অষ্টবিংশ-উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের কথা এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয়। উক্ত দুটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে গোরার আত্মচিন্তা এবং দ্বিতীয়টিতে বিনয় ও ললিতার স্টিমারে কলকাতা প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের দিক থেকে দুটি পরিচ্ছেদই ঘটনাধারার নব রূপান্তরের স্রষ্টা।

একবিংশ পরিচ্ছেদের বিষয় গোরার আত্মজিজ্ঞাসা। এই আত্মজিজ্ঞাসারই পরিণতিতে দেশের আত্মার সন্ধানে গোরা কলকাতার বাইরে কিছুদিনের জন্য পরিভ্রমণে বেরুবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল। গোরার জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে নদীর পটভূমিকাগত সংযোগ এবং সংঘাত সমগ্র পরিচ্ছেদে এক নানা রাগে মিশ্র আবেগের সৃষ্টি করেছে। আবেগের এই ঘনত্ব গোরার নিজেকে উপলব্ধির সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলেই নদী এবং গোরা এই পরিচ্ছেদে একার্থ হয়েছে।

—আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রলোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি নিস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতি গ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষ দৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

—আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল।……

—নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য

* গোরা উপন্যাসের উপসংহারের কিছু পূর্ব পর্যন্ত এ জাতীয় উপমার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তার পৃথক তালিকাও দেওয়া যায়—সম্ভবত তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-উপমার বোধকরি সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যবহার ঘটেছে বিনয়কে লিখিত পরেশবাবুর পত্রে।

সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল। সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে, কী ছায়া ফেলিয়াছে। সেখানে নির্মল নীলাকাশের নিচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া।

—আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

নদীর রূপবতী পটভূমিতে গোরার নবার্জিত অভিজ্ঞতার সংযোগ সংঘাতেই এ অধ্যায়ের ভূমিকা নিঃশেষিত নয়। নিজের অন্তরে এবং বাহিরে আত্মবিস্তার ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টাই গোরা চরিত্রের মূল কথা। সেইজন্য 'প্রকৃতিকে গোরা স্বীকার করিয়া লইল' উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের বক্তব্য এই। কিন্তু প্রেম ও প্রকৃতি চেতনা সঞ্জাত এই নবার্জিত অভিজ্ঞতা একটু পরেই এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল অবিনাশের আগমনে এবং এখান থেকেই গোরা গ্রাম বাংলা পরিক্রমণের সিদ্ধান্তে আসে। সুতরাং নদী যে শুদ্ধ অনুভূতির সৃষ্টি করছে গোরার মনে, পরিবেশের বাস্তবতা তাকে আঘাত করে। বুদ্ধি এবং অনুভূতির টানাপোড়েনই শুধু লক্ষণীয় নয়। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজের অজানিতে নিজের সৃজিত মূর্তির সম্মুখীন হয়। আধুনিক মন নিজের এই প্রতি মুহূর্তের নবরূপান্তরের বেদনা ও বিস্ময়ের রেখায় দীর্ণ। গোরার যন্ত্রণা তারই প্রতিনিধি। তাই এইখানে গোরা একক। চারিদিকে যখন 'শশকের সংহতি' তখন 'সিংহের নৈঃসঙ্গ্য' যন্ত্রণাময় অথচ সত্তার অভ্রান্ত রূপের সন্ধানও ক্লান্তিহীন। ব্যক্তি মানুষের এই সমস্যায় প্রকৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে মহৎ শিল্পীরা সদাই ঐকমত্যে পৌছান। প্রকৃতির ভূমিকা পবিত্র শুশ্রূষাকারিণীর ভূমিকা নয়! প্রকৃতি বরং ব্যক্তিত্বের সামনে গূঢ় থেকে গূঢ়তর প্রশ্নই সদাসর্বদা তুলে ধরে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে নদীর ভূমিকাও তাই।*

আবার ২৮-২৯ পরিচ্ছেদেও বিনয় ও ললিতার স্টিমার ভ্রমণের পটভূমিকাও নদী। কিন্তু ২১শ পরিচ্ছেদে সে পটভূমিকার যে তাৎপর্য ২৮-২৯শ পরিচ্ছেদে তথা বিনয়-ললিতার একত্র প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সে তাৎপর্য অন্যরূপ। ললিতার প্রেমের অনুভূতিতে গোরার অতিপ্রভাব থেকে বিনয়ের মুক্তি পরবর্তী ঘটনা।

*হেমচন্দ্রের "সেই ভূগনে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মুরতি"……প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিকে নিজের প্রতিধ্বনি করে তোলা। বড়ো কবির কাছে প্রকৃতি গভীর জিজ্ঞাসাকে সূচিত করে।

কিন্তু জাগ্রত বুদ্ধির তাড়নায় জীবনের প্রচলিত ছক থেকে ললিতার মুক্তি-প্রয়াসের মধ্যে যে অস্বাভাবিক আবেগ বিদ্যমান তাকে স্বাভাবিক সুসমতার স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্যই নদীর ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। উপন্যাসের এই অংশটুকুকে নদীবক্ষ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। বিনয়ের জীবনের এই চূড়ান্ত মুহূর্ত তার মধ্যে যে দার্শনিকতাটুকু সৃষ্টি করল এক মাত্র নদীর মধ্যেই তার প্রতিরূপ।—

—আজ একই রাত্রে বিনয় তাহার একদিকের শূন্যতা এবং আর একদিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের সৃজন প্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু এই সন্ধিকালের সংশয়কে পরিহার করে বিনয় এবং ললিতা প্রভাত-আলোক কম্পিত নদীকূলের ন্যায় এক নূতন অনুভূতির উপকূলে উপনীত হল। নদী সেই উপনায়নের উপযুক্ত সহায়।

—ইহার পরে দুইজনের আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পর-প্রান্তে আসন্ন সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনোদিন দেখে নাই। আলোক তাহাদের এমন করিয়া কখনও স্পর্শ করে নাই। আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময় নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুইজনের চিত্তের চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল।

বস্তুত ললিতার আচরণে আপাত অস্বাভাবিকতা সত্বেও এই অংশে যা আমাদের অভিভূত করে তা হল সমস্ত ঘটনাংশটির নৈতিক তাৎপর্য। ব্রাউনলো সাহেবের ঘটনা এর সঙ্গে জড়িত না থাকলে ললিতার বিনয়ের সঙ্গে কলকাতা গমন এতটা লক্ষ্যভেদী হত না। এই নৈতিক তাৎপর্যকে অধিক ঘনীভূত করার কাজে নদী-প্রকৃতি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এইভাবেই একটা সার্থক উপন্যাসে লেখকের নৈতিক সচেতনতার বীজের পরিণতি ঘটে তার ঘটনা, ঘটনাংশ, চরিত্র, বর্ণনা, এবং ভাষার সঙ্গে তুলনীয় শাখাপ্রশাখা পল্লব কুঁড়ি এবং ফুলে।

এইভাবেই যদি উপন্যাসের মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসের সর্বাংশের বিচার করি তাহলে দেখা যাবে যে গোরা উপন্যাসের যেগুলি ত্রুটি বলে

প্রতিভাত হয়েছে সেগুলি আংশিক বিচারের ফলেই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দুর্বল উদ্ভাবনী শক্তি, অথবা 'জীবন রহস্যের যেটা প্রধান কথা বিস্ময়কর অতর্কিততা' গোরায় নেই এ-কথাগুলি সেই আংশিক বিচারেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। গোরার উপন্যাস-শিল্পের পরীক্ষায় দেখা যায় যে এ-ধরনের 'বিস্ময়কর অতর্কিততা' লেখকের শিল্প অন্বেষার অঙ্গীভূত নয়। বরঞ্চ বিস্ময়কর অতর্কিততায় যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা রয়েছে লেখক তাকে বরাবর পরিহার করতে চেয়েছেন। যদি গোরার প্রধান ঘটনাংশগুলিকে অথবা পরিচ্ছেদগুলিকে নিরীক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উপন্যাসের কোনো অংশ থেকেই নাট্যরস নিষ্কাশনের চেষ্টা লেখক করেননি। যদিও এই উপন্যাসে একটা আশ্চর্য গতি আছে, যদিও কোথাও এ-উপন্যাস অতীত সূত্রসন্ধানে পশ্চাদনুসরণ করেনি, তথাপি গতির ফলস্বরূপে অনুভূত সেই আবেগের জন্য উপন্যাসের ঘটনাবলীতে কোথাও নাট্যরসসম্মত কৌশলের প্রয়োজন হয়নি—যে প্রয়োজন বঙ্কিমের উপন্যাসে ঘন ঘন হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গোরার জন্মবৃত্তান্তের কথা বলা যেতে পারে। এ নিয়ে একটা ভুয়ো নাটকীয় কৌতূহল রচনার প্রয়াস উপন্যাসের কোথাও নেই। উপন্যাস আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক জানেন যে গোরা মেমসাহেবের সন্তান। কিন্তু তাতে উপন্যাসের আকর্ষণের কোনো হানি হচ্ছে না। কেননা উপন্যাসটা সত্যিই গোরার কাছে গোরার জন্মবৃত্তান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার গল্প নয়। সমস্তটা একটা যুগের। একটা দেশ বা জাতির চঞ্চল জীবনে যখন স্বীয় সত্তার নিগূঢ় প্রশ্নগুলিই নানা আকারে মূর্তি গ্রহণ করতে থাকে তখনকার প্রশ্নগুলিই এ-উপন্যাসের প্রধান কথা। গোরার প্রতি মুহূর্তেই গোরার কাছে জিজ্ঞাসার নব নব চিহ্ন—সে জিজ্ঞাসা তার নিজেরই কাছে। এই প্রতি মুহূর্ত পেরিয়ে নিজের জন্মবৃত্তান্তের মুখোমুখি হয়ে তবে সে পরম উত্তরের কাছে উপনীত হয়। এখানে উপন্যাসের ছকে বিস্ময়কর অতর্কিততার কোন স্থান নেই। উদ্ভাবনী শক্তিরও কোনো ভূমিকা নেই।*

আর এই প্রসঙ্গ (গোরার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে লেখক অযথা কোনো কৌতূহল রচনা করতে চাননি) স্মরণে রাখলে আনন্দময়ীর সমুদয় ব্যবহারের একটা

* রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবন শক্তিতে দৌবল্য রয়েছে গোরা থেকেই এ-উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। যেমন উপন্যাসে পানীয় জলের ভূমিকার কথা বলা যায়। লছমির হাতের জল, রামদীনের দুধের জল এবং চরঘোষপুরের পুকুরের জলের কথা বলা চলে—কিন্তু বস্তুত এ-জাতীয় উপন্যাসে উদ্ভাবন নৈপুণ্যের ভূমিকাই অকিঞ্চিৎকর।

উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, নচেৎ তাঁকে পিঙ্গল এবং রক্তহীন বলেই মনে হবে।* আনন্দময়ী এবং পল্লীসমাজের বিশ্বেশ্বরীর প্রতিতুলনায় বিশ্বেশ্বরীকেই বরং সেই জাতীয় আদর্শ জীব বলে মনে হয় যাঁরা পিঙ্গল এবং রক্তহীন। কেননা বিশ্বেশ্বরীর আদর্শীভূত মূর্তির কোনো বাস্তব ভিত্তিভূমি নেই, কিন্তু আনন্দময়ীর মুখ থেকে উপন্যাসের প্রথমাংশেই গোরার জন্মবৃত্তান্ত শোনবার পর আনন্দময়ীর সমস্ত আচরণের এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কথাগুলোকে কেবল কোনো আদর্শ চরিত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলে মনে হয় না। মনে হয় জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে এর জন্ম। ঠিক তেমনি পরেশবাবুর প্রহেলিকাকে আর প্রহেলিকা বলে মনে হবে না যদি পরেশবাবুর নিঃসঙ্গতার বিষয়ে আমরা অবহিত থাকি। সুচরিতা, ললিতা এবং শেষ পর্যন্ত পরিজনবর্গ-পরিহৃত এই ব্যক্তিটির একাকীত্ব সাধারণ স্তরের নয় বলেই এই ব্যক্তিত্বের বিপুল যন্ত্রণার সূক্ষ্ম কম্পন সহজে ধরা পড়ে না। তাই সুচরিতাকে 'ললিতা আমার ঘর থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে এসেছে' এ-কথা বলতে গিয়ে 'পরেশবাবুর কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া যায়' অথবা আনন্দময়ীর কাছ থেকে ললিতা সম্বন্ধে আশ্বাস পাবার পর 'ললিতার বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে এই প্রথম পরেশবাবুর চিত্ত সংসারের মধ্যে এক জায়গায় একটা কূল দেখিতে পাইল এবং যথার্থ সান্ত্বনা লাভ করিল' এই সমস্ত অংশ আমাদের অগোচর থেকে যায়। অগোচর থেকে যায় এই সাধারণ তথ্যটি যে গোরার সমস্ত অস্থিরতার পটভূমিতে পরেশবাবুর শান্ত-দৃঢ়তা উপন্যাসের ছকে একটা সুসমতা আনয়ন করেছে। হয়তো পরেশবাবুর সঙ্গে বরদাসুন্দরীর দাম্পত্য জীবনে যে অসঙ্গতি তার দিকে অধিকতর আলোকসম্পাত করলে পরেশবাবুর নিঃসঙ্গতাকে আরো বাস্তব করে তোলা যেত এমন ধরনের একটা অভিযোগ তোলা যায়। এবং এও হয়তো বলা যায় যে কৃষ্ণদয়াল এবং আনন্দময়ীর মধ্যে গোরাজনিত ব্যবধানকে যতটা প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে, বরদাসুন্দরী এবং পরেশ বাবুর সম্পর্ককে ততটা প্রত্যক্ষ না করানোর ফলেই পরেশবাবুকে শুধুই আদর্শ-সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে সর্বপ্রকার নাটক পরিহার রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য, এবং মহাকাব্যোচিত উপন্যাসের আংশিক যাথার্থ্যের আতিশয্য অপেক্ষা টোটালিটির বা সামগ্রিকের অনুভূতি সৃজনই বড়ো

---

* সে ভাবে না দেখলে রবীন্দ্রনাথের আলোচিত বিদ্যাসাগর জননী ভগবতীকে পিঙ্গল বলে মনে হয়। কিন্তু তা যে হয় না, তার কারণ সে চরিত্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেই সত্য। আনন্দময়ীও তাই।

কথা। পরেশবাবু এবং বরদাসুন্দরীর পরস্পর সম্পর্কে লেখকের শৈথিল্য এই সামগ্রিকতার অনুভূতি সৃজনে প্রতিবন্ধক হয়নি এটাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য। কেননা এ-আলোচনায় দেখা যায় যে উপন্যাসে পরেশবাবুর ভূমিকা আনন্দময়ীর মতো প্রত্যক্ষ নয়। ললিতা বা সুচরিতা-নিরপেক্ষ ভূমিকা পরেশবাবুর নেইত যেমন আনন্দময়ীর আছে। সম্ভবত সে কারণেই পরেশবাবু এবং আনন্দময়ীর একত্র বিচার সঙ্গত হবে না।

আসলে গোরার যন্ত্রণাই এই উপন্যাসের সমুদয় ঘটনার জনক। গোরার চরিত্রে এবং আচরণে সে যন্ত্রণার নৈতিক রূপ সুস্পষ্ট। তাই গোরার তার্কিকতা গোরা থেকে বিশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপার নয়! তার অনন্যসাধারণ দৈর্ঘ্য, ঝড়ের গতিতে হাঁটা, বাঘের থাবার মতো পাঞ্জা, চওড়া হাড়, টেবিলে ঘুষি-মারা এবং তার্কিকতা তার চরিত্রেরই বিভিন্ন রূপ। তেমনি এই উপন্যাসের সময়কালের পরিসর স্বল্পতায় অথচ গতির উত্তেজনায়, ভাষার ঘনবদ্ধ রূপে, চিত্রকল্পে এবং ঘটনাংশ নিয়ন্ত্রণের কৌশলে, যে-কল্পনায় গোরা বিধৃত সে কল্পনারই নানা প্রকাশ ঘটেছে।

এবং এইভাবেই একটা উপন্যাসের শিল্পকর্মের সঙ্গে সেই উপন্যাসের নৈতিক সচেতনতার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকে। আবার এইভাবেই গোরা উপন্যাসের গঠন বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিকের ব্যাখ্যা সম্ভব। আপাত বিচারে দেখা যায় যে এই উপন্যাসে আশ্চর্য সব বৈপরীত্যের সমাবেশ। বুদ্ধিমান পাঠক দেখে থাকেন এদিকে কৃষ্ণদয়ালবাবু, ওদিকে পরেশবাবু, এদিকে আনন্দময়ী, ওদিকে বরদাসুন্দরী। গোরা এবং পানুবাবু। ললিতা এবং সুচরিতা। আবার আনন্দময়ীর স্বামী ও কৃষ্ণদয়ালবাবুতে যে বৈপরীত্য, পরেশবাবু ও বরদাসুন্দরীতে ঠিক ততখানি বৈপরীত্য। গোরায় প্রচণ্ড আবেগের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি, সুচরিতায় শান্ত সমাহিত ভাব। বিনয় স্থিরবুদ্ধি, ললিতা চঞ্চল এবং আবেগপ্রবণ। স্বভাবতই এ-ব্যাপার অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন কারো হাতে ঘটলে সীমাবদ্ধ কল্পনায় সমস্তটা হয়ে দাঁড়াত কৃত্রিম যান্ত্রিকতা। এখানে অন্যপক্ষে, ধরিয়ে না দিলে এই বিপুল বৈপরীত্যের সমাবেশ দৃষ্টিপথে আসে না। পরেশ-বাবুকে পৃথকভাবে পিঙ্গল, রক্তহীন যদি বা বলা চলে—এই পুরো কাঠামোর মধ্যে তাঁর স্থান সেই কারণে সম্পূর্ণ শোভন এবং সঙ্গত। রসিক পাঠক তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ন্যায্যতই বলেন যে, গোরার সমস্যার বিস্তৃত গভীরতা গোটা উপন্যাসে সেই শক্তি, যার ফলে পটের বিশালতার বোধ পাঠকের মনে

সদাজাগরূক থাকে। এই বিশালতাবোধের জন্য এই বৈপরীত্যেই মনে হয় সুসমতা এবং ভারসাম্য।

গোরা আলোচনার উপসংহারে গোরার উত্তরণের বিষয় কিছু আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। গোরা সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে শরণ নিল। তার বক্তব্য এই যে পরেশবাবুর কাছেই সেই মুক্তির মন্ত্র আছে। পরেশবাবুর নির্ভীক সত্যনির্ভরতায় একদিক থেকে পরেশবাবুরও মুক্তি ঘটেছে। বরদাসুন্দরীর কলকাতা ত্যাগ এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পরেশবাবুর সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুক্তির পূর্ণরূপ। গোরার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কারাবরণের সংবাদ শুনে ব্রাউনলো সাহেবের কুঠির নাটকের পূর্বেই বিনয়ের এবং ললিতার কলকাতা আগমনে যে আলোড়ন সৃষ্ট হল তা পরেশবাবুকেও নানাভাবে স্পর্শ করেছে। গোরা সেই বিমুক্ত সত্তাটির উদ্দেশেই প্রণাম জানিয়েছে। অবশ্য পরিমাপের দিক থেকে ছোট কিন্তু ব্যঞ্জনায় বলিষ্ঠ অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এমন একটি চরিত্রের দেখা গোরা চরঘোষপুরে পেয়েছিল, যা তার কাছে অবিস্মরণীয় থাকা উচিত ছিল। সেই সাধারণ মানুষটিও জানে হিন্দুর হরি এবং মুসলমানের আল্লা সমান। সে তার অসামান্য লৌকিক বুদ্ধির সাহায্যেই এই পরম মানবিক উপলব্ধিতে পৌচেছিল এবং মুসলমানের ছেলেকে অস্পৃশ্যতার দোহাই দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়নি। সে অবশ্য ভারতবর্ষের দেবতাকে সন্ধান করেনি। সন্ধান করেছে স্বগ্রামের মানুষকে। কিন্তু গোরার জীবনে, এক মুহূর্তের জন্য হলেও, সে পরিণামগর্ভ সাক্ষাতের ফলেই গোরার কারাবরণের ব্যাপার পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ গোরা কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রায়শ্চিত্তের চিন্তার মুহূর্তে অথবা পরেও এ-প্রমাণ একবারও দিল না যে সেই চরঘোষপুরের অধ্যায় তাকে কোনো বৃহত্তর জিজ্ঞাসায় নিয়ে গেল কিনা।*

গোরার যাত্রা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের দেবতার সন্ধানে—গোরাকে আমরা ভালবাসি বলে এ-কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ-ব্যাখ্যা দিতেই পারেন যে সে-দেবতা মানুষের মধ্যেই। কেননা পরেশবাবুর কোনো সমাজে স্থান নেই এ-কথার মানে হচ্ছে সকল দেবালয়ের দ্বার বন্ধ যখন, তখন মানুষের মাঝেই তাকে সন্ধান করতে হবে। হয়তো লছমির হাতে জল খেতে চাওয়ায় তারই ইঙ্গিত। এমনও হতে পারে যে সে ইঙ্গিতকে আমরা স্বীয়

* গোরার সমাজবোধ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা শরৎচন্দ্র অধ্যায়ে পুনরালোচিত হবে।

কল্পনার সাহায্যে বড়ো করে তুলেছি মাত্র—কিন্তু সেটাও কি গোরা আমাদের ভালবাসাকে কতখানি আকর্ষণ করেছে তার প্রমাণ নয় ?

ছয়

গোরার দেশ-সন্ধানের যে স্পষ্ট ভূমিকা উপন্যাসে উপস্থিত তারই একটা অন্যরূপ ঘরে বাইরে উপন্যাসের সমস্যা। ঘরে বাইরে রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষাশীল উপন্যাসগুলির অন্যতম এবং এই নিরীক্ষার ব্যর্থতার কথাও সুবিদিত। ঘরে বাইরে উপন্যাসের কবিত্বের আতিশয্য অথবা সন্দীপ চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্যায় ব্যবহার—এই প্রকার নানা কিছুকে 'ঘরে বাইরে'র ব্যর্থতার কারণরূপে অনুমান করা হয়। কিন্তু আমরা পূর্বে বলেছি যে ব্যক্তিত্বের সমস্যা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বাইরের দিক থেকে এই সমস্যাকে বিচার করতে যাওয়া এক রকম নিরর্থক। বিমলা নিখিলেশের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাটিকে স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে উপলব্ধি করুক, নিখিলেশের এই ছিল অভিপ্রায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত নিখিলেশ সমাজ শৃঙ্খলমুক্ত বিমলার কাছে নিজেকে যাচাই করতে চেয়েছে। স্বভাবতই এই পরীক্ষায় অভিনবত্ব বিদ্যমান। কিন্তু পরীক্ষার সূচনাতেই আমরা দেখি যে বিমলা নিখিলেশের গভীরতা অপেক্ষা সন্দীপের ফেনিলতাতে যখনই আসক্তির লক্ষণ প্রকাশ করেছে, তখনই নিখিলেশের আর্ত হাহাকার কাব্যময় ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। নিখিলেশের পরীক্ষার দুঃসাহসকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে বাস্তবনিষ্ঠ পরিপূরক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারলে এই হাহাকার পরাজয়মুখী পুরুষকারের হাহাকারে পরিণত হতে পারত ঘরে বাইরে উপন্যাসে তার একান্ত অভাব।

এই ত্রুটির মূল খুঁজতে হবে প্রধানত সন্দীপ চরিত্রে। সন্দীপের কোনো ব্যাপারই আমাদের কাছে স্বচ্ছ নয়। সন্দীপের চরিত্রের লোভার্ত স্থূলতার ব্যাখ্যা কোথায় সন্ধান করব আমরা ? রবীন্দ্রনাথ তথা নিখিলেশের সন্দীপের সমালোচনাটি কোথায় প্রযোজ্য তা বোঝাও মুশ্‌কিল। সন্দীপের রাজনীতি তার চরিত্রের ফলে বিকৃত, না তার চরিত্র তার রাজনীতির বিকারের পরিণতি ? যদি এমন হয় যে সন্দীপের রাজনৈতিক মত্ততা লেখকের মতে তার চরিত্রেরই নগ্ন লোভাতুরতার পরিণাম তাহলে বইখানি হয়ে ওঠে প্রতিনায়ক বনাম নায়কের দ্বন্দ্বঘটিত কাহিনী। আর যদি এমন হয় সন্দীপের স্থূলতা এমন একটা অভ্যাস, ভ্রান্ত রাজনৈতিক আদর্শ পালনের জন্যই যা দেখা দিয়েছে তাহলে

যেমনই হোক আদর্শের একটা বোধ সন্দীপে উপস্থিত থাকতই। সে ক্ষেত্রে শিল্পরূপের অন্য পরিণতি আমরা লাভ করতাম। রবীন্দ্রনাথ সে জায়গায় দু-ভাবে সন্দীপকে দুর্বল করেছেন। সন্দীপের রাজনীতি ভ্রান্ত। সন্দীপের চরিত্রে স্থূলতা। এ-অবস্থায় উপন্যাসের ঈপ্সিত যন্ত্রণা সৃষ্টি করা দুরূহ। এখানে "বাল্মীকির দোহাই" অপ্রাসঙ্গিক।

এমন যদি হত একটা বলিষ্ঠ চরিত্রের ব্যক্তি একটা ভ্রান্ত রাজনীতির শিকার হয়েছে, তাহলে উপন্যাসে সন্দীপকে নিরীক্ষার যন্ত্র, বিমলাকে নিরীক্ষাশালার গিনিপিগ এবং নিখিলেশকে বিভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকের বেশে আমাদের দেখতে হত না। সন্দীপের ঘোষিত রাজনীতি সম্বন্ধে নিখিলেশের বিমুখতাকে ঈর্ষা মনে হত না। বিমলাকেও শেষ পর্যন্ত টাকার থলির প্রসঙ্গে সব বুঝতে হত না। এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্বভাবানুযায়ী নায়কের আত্মদানে জটিলতার মীমাংসাসাধনও প্রয়োজন হত না।

সাত

চতুরঙ্গ ঘরে বাইরের আগে রচিত। চতুরঙ্গের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। জ্যাঠামশাই শচীশ দামিনী ও শ্রীবিলাস ইহার চারি অংশ।" কিন্তু বইখানির এই চারি অংশের জন্যই একে চতুরঙ্গ নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ-কথা মেনে নিলে বইটির প্রতি সুবিচার করা হয় না। বরঞ্চ নায়ক-নায়িকার জীবনের দিকে তাকালে চতুরঙ্গ আখ্যার তাৎপর্য বোঝা যায়। এবং সেদিক দিয়ে জগমোহন সম্বন্ধে শ্রীকুমারবাবুর যে একটা অভিযোগ—জগমোহন অংশ অনাবশ্যক দীর্ঘ—তার উত্তরও মেলে। বইখানির প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী। শচীশের জীবনের সুস্পষ্ট চারটি পর্যায়। জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, দামিনী এবং সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীর জীবনেও অনুরূপ চারটি ভাগ বা পর্যায়—গুরু লীলানন্দ, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ এবং শ্রীবিলাস। চতুরঙ্গ নাম এই দিক দিয়ে সার্থক।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শিল্প কৌশলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘটনার মুখাপেক্ষী রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই নন। তবু অন্যান্য উপন্যাসে ঘটনার একটা স্বাভাবিক গতিকে তিনি বজায় রেখেছেন। ঘটনার মূল প্রবাহকে ক্ষুণ্ণ করার দরকার সে সব ক্ষেত্রে হয়নি। এ-উপন্যাসে দেখা যায় যে ঘটনা-প্রবাহকে একেবারেই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। চতুরঙ্গের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলে এর

কারণ কিছুটা অনুমান করা চলে। চতুরঙ্গের প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনীর জীবনের বিভিন্ন ছকে ঘুরেছে। প্রতি ছকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় ছকগুলোই একটা একটা করে ভেঙেছে। এই ভাঙার ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। ছকগুলো গড়ে উঠেছে কেমন করে এটা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেননি। জগমোহনের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর কাছে শচীশ কী ভাবে উপনীত হল, কী ভাবে সে আবিষ্ট হয়ে পড়ল রসকীর্তনে তার কোনো ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসে দেওয়া হয়নি। মধ্যবর্তী স্তরটিকে লেখক সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে, উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন। আবার শচীশের ফের মতের বদল হওয়া ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়নি। ফের মতের বদল হইয়াছে—এই মন্তব্যেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই মধ্যবর্তী স্তরগুলি এই উপন্যাসে ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা প্রয়োজনীয় একটা ছক থেকে আর একটা ছকে উপনীত হয়ে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাত্র পাত্রীদের মথিত করেছে তাকে রূপায়িত করা। সে দিক থেকে অস্তিত্বের ভিন্নমুখী সমস্যার টানাপোড়েনে শচীশ দামিনী কী ভাবে জ্বলেছে এবং নিভেছে সেটাই এ-উপন্যাসে বড়ো কথা। মধ্যবর্তী স্তরগুলোকে উপেক্ষা করার জন্যই এ-উপন্যাসকে আংশিকতা দুষ্ট বলে কারো কারো মনে হয়েছে।

এই ভুল ধারণা থেকেই জগমোহন অধ্যায়কে ভুল বোঝা হয়। জগমোহন যে উপন্যাসে একটা দীর্ঘ স্থান অধিকার করে রয়েছে সেটা শুধু শচীশের উপর তার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে চতুরঙ্গের চারতলার জগমোহনই হচ্ছে ভিত্তিভূমি। এই ভিত্তিভূমিটিকে শক্ত না করলে উপন্যাসের চারতলা বাড়িটি তাসের প্রাসাদের মতো গুঁড়িয়ে যেত। জগমোহন আখ্যায়িকা এই কথা বোঝায় যে উপন্যাসের কাঠামো সম্বন্ধে, সংস্থান-কৌশল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কত গভীর ছিল। প্রকৃত পক্ষে জগমোহনেই উপন্যাসের সমস্যার আরম্ভ। জগমোহনের নীরস নাস্তিক্য বুদ্ধির মধ্যে যে মানুষের সমস্ত শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত, সে সেখান থেকে কী আহরণ করল এটা লক্ষণীয়। নীরস বুদ্ধিচর্চায় জীবনের খাত পূর্ণ হতে পারে না—এবং জীবন যে ছকে-ফেলা ব্যাপার নয় জ্যাঠামশাই জগমোহন অধ্যায়ে সেটা পরিস্ফুট। জগৎসংসার যে সত্যি নিউটনের গাণিতিক নিয়মে চলে না, সেটা যে শুধু মিল্ বেন্থামের তত্ত্ব পরীক্ষার ল্যাবরেটারি নয়, এটা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট।

অসহায়া আশ্রিতা ননীকে সামাজিক মঙ্গলের নিমিত্ত বিয়ে করতে চাইলেই যে তাকে বিয়ে করা যায় না, এবং মানুষের মন যে যুক্তি পরম্পরাকে অনুসরণ করেই সর্বত্র চলে না, সেটা ননীর আত্মহত্যা এবং শেষ চিঠিতে পরিস্ফুট। নীরস বুদ্ধিচর্চার ভাঙন আরও কোন্ কোন্ দিক থেকে আসে শচীশের সঙ্গে জগমোহনের বিচ্ছেদে এবং ননীকে জগমোহনের আশীর্বাদ করতে চাওয়ায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে জগমোহনের উক্তি, জগমোহনের তৈরি করা ছকের ভাঙন কোনদিক থেকে আসছে তার ইঙ্গিতবহ :

> মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়োবয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

জগমোহন যে নিজের খণ্ডিত অস্তিত্বকেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন এই উক্তি তারই ইঙ্গিত। ননীর মৃত্যু জগমোহন এবং শচীশ উভয়ের কাছে তাদের তৎকালীন জীবনধারার ভয়াবহ অংশিকতাকে স্পষ্ট করে তুললো। জগমোহনও যে এদিক থেকে হরিমোহনের উল্টোপিঠ এটাও এখানে পরিস্ফুট। জগমোহনের মৃত্যুটা বাইরের ঘটনা। স্বভাবতই এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো মাথা-ব্যথা নেই। ননীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনের ছক ভেঙে পড়েছে।

এর পরের অধ্যায়ে আমরা শচীশকে দেখেছি লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে। নাস্তিক শচীশ পুরোদস্তুর গুরুবাদী। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জগমোহনের ছক ভেঙে পড়ার প্রতিক্রিয়াতেই শচীশের লীলানন্দ অধ্যায়ের জন্ম। এই প্রতিক্রিয়াকে সরেজমিনে দেখানো হয়নি। শ্রীবিলাসের মতো আমারও হঠাৎ খবর পেয়েছি যে শচীশ পৌছে গিয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছকে। মরুবালু থেকে সুধাশ্যামলিম কূলে পৌছনোর স্তর পর্যায়ের পরম্পরা আমরা জানি না। বাস্তবিকপক্ষে এ-উপন্যাসের পক্ষে জানানো খুব প্রয়োজনও নয়। লীলানন্দ স্বামীর কীর্তন বাসরের অধ্যাত্মরসের স্রোতও অচিরে শচীশের কাছে তার ভগ্নাংশ স্বরূপ নিয়ে প্রকট হল। এ ছকও দেখা গেল শচীশের মনের মধ্যে ভেঙে গেল। মনের মধ্যে ভেঙে যাওয়াটাই আসল কথা এখানে। কেননা ছকগুলির অস্তিত্বও প্রকৃতপক্ষে মনের মধ্যেই।

শচীশের পক্ষে এই দ্বিতীয় পর্যায় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে ননী যেমন শচীশের কাছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকারসাধনের একটা

সংখ্যা মাত্র—দামিনীও তেমনি লীলানন্দের মাতোয়ারা অসংখ্য জীবকুলের একটি জীব মাত্র—শচীশ প্রথমটা এইরকম মনে করতে চেয়েছিল। কিন্তু দামিনী ননী নয় বলেই সে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। সে যে আশ্রমবন্দী হয়েছিল এটা প্রকৃতপক্ষে তার বিবাহিত জীবনেরই জের। আশ্রমের ছককে যখন দামিনী ক্রমশই ভাঙতে লাগল তখন দামিনীর নিজস্ব চেহারা ক্রমশই ফুটে উঠতে লাগল শচীশের কাছে। শচীশও ননীবালা এবং দামিনীর প্রতিতুলনা করেছিল। এ সম্বন্ধে তার দিনলিপির খাতায় সে লিখে রেখেছিল—

> ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি…যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি। সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক… সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়াছে।

দামিনীর এই মর্ত্য-বসন্তের ধাক্কায় রসের স্বর্গলোকের লীলানন্দী ছক ভাঙতে লাগল শচীশের মনে। রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকিতে রূপকের পাত্রটাই যে কাত হয়ে পড়েছে এ-কথাও স্পষ্ট হতে লাগল। শচীশ যে মুহূর্তে দামিনীকে দূরে সরিয়ে রেখে সাধনাকে বিপদমুক্ত করতে চেয়েছে সে মুহূর্তেই শচীশ দ্বিতীয় ছকের ভগ্নাংশস্বরূপকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এর পর নবীনের স্ত্রী—দামিনীর মতো সেও আশ্রমবাসিনী—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা প্রচলিত ছকের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সে ঘটনার সুযোগ নিলে অবশ্যই উপন্যাসের দিক থেকে ত্রুটি বলে পরিগণিত হত। কিন্তু এ ঘটনাও জগমোহনের মৃত্যুর মতো বাইরের একটা ধাক্কা মাত্র। শচীশের মনে তখন আশ্রমের ছক দামিনী অনেক পূর্বেই মুছে দিয়েছে। এবং এই মুছে দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশ্লেষণ বাদ দেননি। প্রত্যেকটি স্তরকে সযত্নে পার হয়েছেন লেখক। গুহার ঘটনার পর থেকে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা পর্যন্ত এই ছকের ভাঙন সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পর দামিনীর শচীশের কাছে আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাস সঙ্গত। এই উচ্ছ্বাসময় আত্মনিবেদনের জবাবে শচীশ বলেছিল—তাই হবে। সংক্ষেপে এর পর পুনরায় শচীশের মত পরিবর্তন হয়ে গেছে এটা আমাদের জানানো হল। বলা বাহুল্য মত পরিবর্তনের হেতু বলা হয়েছে। বিস্তৃতভাবেই

বলা হয়েছে লীলানন্দ স্বামীর অধ্যায়ে। পরিবর্তনের পরিণাম কী হল তাও দেখানো হল পরবর্তী অধ্যায়ে। শুধু পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পূর্ণ বর্ণনা অনুপস্থিত থেকেছে। শেষ অধ্যায়ে দেখা গেল শচীশের জিজ্ঞাসার যন্ত্রণা তখনও নিঃশেষ। সে নাস্তিক্য-আস্তিক্য-বুদ্ধি-ভক্তির চতুঃসীমার প্রতি প্রাচীরে মাথা ঠুকেছে। সকলই প্রাচীর। এবং দামিনীর স্নেহ সেবাও তখন আর তাকে ধরে রাখতে পারে না। সমগ্র না হয়ে উঠলে মুক্তি নেই। অথচ মুক্তির পথে, অংশের মধ্যে, বারে বারে সেই মুক্তির অনুভবে বন্ধনের যন্ত্রণা। চতুরঙ্গের শেষ অধ্যায়ে দেখা গেল বিবিক্ততার যন্ত্রণায় মথিত নায়ক সকল pressure group-এর বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলেছে। শচীশের কথা না বুঝতে পারলেও দামিনী শচীশকে বুঝতে পেরেছিল। অর্থাৎ যন্ত্রণাদীর্ণ শচীশকে সে উপলব্ধি করেছে।

চতুরঙ্গের ভাষায় এই যন্ত্রণার শুদ্ধতার প্রসাদ বিদ্যমান। এই যন্ত্রনা প্রাথমিক পরিচয়ে সাধারণের অবিশ্বাস উৎপাদন করবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই বিশ্বাসের সর্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীবিলাসের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে কৌতুকের প্রচ্ছন্ন ছটাকে ব্যবহার করেছেন। শেষ অধ্যায়ে যখনই শচীশের যন্ত্রণার সর্ত পরিপূরিত হয়েছে কৌতুকের প্রচ্ছন্ন ছটাও মিলিয়ে গেছে করুণ দিগন্তে। এখানে প্রত্যাশিত কবিত্ব এসে স্থান জুড়ে বসেনি। উপন্যাসের ভাষায় এবং রচনাশিল্পে সমগ্রের বিশিষ্ট আবহাওয়াই ব্যক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের নিহিত বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে আশ্চর্য উপমা এবং চিত্রকল্প। কিন্তু এ কবিত্ব প্রকাশের লীলামাত্র নয়। এই সমস্ত গদ্যবৈভব কেমন ভাবে দামিনী এবং শচীশের জীবনরূপকের প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষণীয়। এ-অংশ পৃথকভাবে পড়লে অবশ্যই চমকিত হতে হয় অপ্রত্যাশিত ঝংকারে। অথচ সমগ্র উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে-এ কথা না মনে হয়ে পারে না যে ভাষার এই তীব্র টানকে সৃষ্টি করেছে শচীশের জীবনের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার জ্বালা। এ-অভিজ্ঞতাও যেমন একদিনে গড়ে ওঠেনি, গদ্যের এই বেগও তেমনি উপন্যাসের প্রথম দিক থেকে দেখা যায় নি। তা যদি যেত তাহলে তাকেই বলা যেতে পারত আচমকা ঝাঁকুনি বা jerk। এখানে এটা jerk বলে পরিগণিত না হয়ে উপন্যাসের স্বাভাবিক টানেরই পরিণতি বলে মনে হয়। নিম্নের উদ্ধৃতিটি আলোচনার যোগ্য :

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই,

এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি, তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে। কোন্ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া যে পৌছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ের ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখাচখির দল ভারী গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরা-পুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ের উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

এই সমগ্র অংশের তাৎপর্যকে কিছুতেই আংশিক উদ্ধৃতির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। একক বিচ্ছিন্ন পংক্তির উদ্ধৃতিতে বড়ো জোর রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব করার শক্তি কতখানি ছিল তাই প্রমাণিত হয়। অনন্যসাধারণ রবীন্দ্রমনীষা যে অন্তত ঢাকের দায়ে মনসা বিকানোর জন্য উপন্যাসে কবিত্বের আয়োজন করেন না এই প্রাথমিক বিশ্বাসটুকু আমরা ন্যায্যত দাবি করতে পারি। এ-কথা যদি না বোঝা যায় যে উদ্ধৃতাংশে দুই বিপরীত ভূ-প্রকৃতি দুই মনোভাবের সূচক, তবে অবশ্যই এখান থেকে অপ্রত্যাশিত কবিত্বের চমকপ্রদীপ্ত লাইন খুঁজে বার করা সম্ভব। কিন্তু যদি এ-কথা উপলব্ধি করা যায় যে দামিনী এবং শচীশের তৎকালীন অবস্থাটা প্রতিফলিত হয়েছে দুই ভূ-চিত্রে, এ শুধুই হ্যাঁ-না এর খেলা নয়, নয় পৃথিবীর দ্বান্দ্বিক চেহারা বোঝাবার কৌশল-মাত্র—বরঞ্চ দামিনীই সেই ব্যর্থতা যে দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলে ধরেছে আর শচীশ পেরিয়ে গেছে তৃষ্ণার ভূখণ্ড—তাহলে এই চিত্রকল্পের যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। এবং এ-কথাও সত্য যে এই মনোভাবের আদি-মধ্যের ইতিহাস যদি আমাদের না জানা থাকত, যদি অজ্ঞাত থাকত কেমন করে তারা গিয়ে পৌছিল

এই পর্যায়ে তবে এ-অংশ আকস্মিকতা-দুষ্ট বলে মনে হত। আমাদের অনুভূতি ও চেতনা কোনো ভাবে শচীশ-দামিনীর জীবন সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ করত না। সে হিসেবে এই বিস্তৃতি লাভের ক্ষেত্র সারা উপন্যাসে প্রস্তুত ছিল বলে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। চতুরঙ্গের এই শেষ অঙ্কের আবেগের জন্য আগের তিন অঙ্কের প্রস্তুতি ছিল বলেই এই সমস্তের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে চাইছিলেন তাও নিটোলভাবে পূর্ণ হল। (নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শচীশের পায়ের কাছে দামিনীর আত্মনিবেদন ও মুক্তি প্রার্থনায় (আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের বড়ো জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।) শচীশ বলেছিল—তাই হইবে। তারপর শচীশ যখন বিস্তৃত বেদনাকে বক্ষে ধারণ করে অনুভব করল এ-বাঁধনও খোলা দরকার তখন সে নিজে মুক্তি প্রার্থনা করল দামিনীর কাছে—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি ত্যাগ করিয়া যাও। দামিনী বলল—তাই আমি যাইব।) শচীশের 'তাই হইবে' থেকে দামিনীর 'তাই আমি যাইব', এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সেই নিটোল বৃত্তের আশ্চর্য অঙ্কন। এই বৃত্তের এক অর্ধাংশ লীলানন্দ স্বামীর অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অর্ধাংশ দামিনীর সেবায়। জগমোহনে এবং লীলানন্দে মিলে দুই অর্ধে তৈরি হয়েছিল আর এক বৃত্ত। দুই বৃত্তের চারি অর্ধেও চতুরঙ্গের 'চারি অংশ'।

উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি দামিনীর মৃত্যু-ঘটিত উপসংহার। শচীশ নিজ জীবনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিয়েছে সে প্রশ্নের উত্তর শচীশের কাছে আছে কিনা আমরা জানি না। জানা আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় নয়। শচীশের যন্ত্রণা আমাদের কাছে প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়েছে কিনা এটাই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য উপন্যাসটি প্রধানত শচীশের সমস্যা বলেই, শুধু শচীশ-দামিনীর সমস্যা নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ শচীশের পরীক্ষাটিকে সম্পূর্ণ করার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেই কারণে শচীশের শেষ রূপান্তরের পর রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন উপন্যাসের বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিল্পের নিজ নিয়মের টানে দামিনী তখনই সৃষ্টি করে বসেছে আর এক নতুন ছক। এই ছক হল শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের ছক। এবং এই অধ্যায়েই দামিনীর মৃত্যুতে গল্পের পরিসমাপ্তি। অথচ এই বিবাহিত জীবনের নতুন ছকের ভিতরে দামিনীর পরীক্ষা তখনও বাকী। শিবতোষবাবুর সঙ্গে, দাম্পত্য জীবনে, সে

কোনো দিন নিজের অন্বয় ঘটাতে পারেনি। তার সমস্ত জীবন ব্যাপারটি এরই প্রতিক্রিয়ার ফল কি না সে-কথা উপন্যাসে নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয়নি। কাজেই শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনে শিবতোষের ভূমিকা নেই বলে তার সমস্ত জিজ্ঞাসা নিভে যায় কি না এটা একটা বড়ো প্রশ্ন। শচীশকে দামিনী কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারবে না—এই অক্ষমতাটুকু উপলব্ধি করার পর সে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেছে। দামিনীর প্রশ্ন জীবনকে ঘিরেই তীব্র। উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা সে দেবে না। শচীশ যে পথের যাত্রী সে পথ নির্জনতার পথ, নৈঃসঙ্গ্যের পথ। শচীশের অনন্যপরতন্ত্রতা দামিনীর অবলম্বন হলে এ উপন্যাস হয়ে উঠত দুই অনন্বিতের সংঘাত—যার যোগফলে আমরা শূন্য ছাড়া আর কিছু পেতাম না। দামিনী হয়তো বুঝতে পারল যে শচীশকে সে ভালবাসে বলেই শচীশকে মুক্তি দেওয়া তার কর্তব্য। এই মুক্তি দেওয়াই তার মুক্তি পাওয়া। তাহলে তার মুক্তির স্বরূপটি কী? অথবা সে মুক্তিই চায়নি, বন্ধনই চেয়েছে, শুধু হয়তো বৃহত্তর বন্ধন? যে ভাবেই হোক দামিনীর মৃত্যু উপন্যাস সমাপ্তির ছেদচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দামিনীর স্বাধীন সত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। বলা যায় শচীশ এবং দামিনী, এই দুই অরণি কাষ্ঠের সংঘর্ষে সে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার একটিকে নেপথ্যে সরিয়ে দিয়ে অগ্নিশিখাকে দীপে পরিণত করলেন।

উপন্যাসের চিত্রকল্প উপন্যাসের বাস্তবলোকের দান। প্রুস্তের উপন্যাসে ব্যাধির চিত্রকল্প তাঁর উপন্যাসের প্রেমের ভাবভূমি থেকে উদ্ভূত। আমরা আগের পরিচ্ছেদে 'গোরা' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পের যৌক্তিকতা ও শৈল্পিক তাৎপর্য আলোচনা করেছি। 'চতুরঙ্গে' প্রধান চিত্রকল্পগুলি দ্বন্দ্বময় জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। সে দ্বন্দ্ব শূন্যের সঙ্গে পূর্ণের দ্বন্দ্ব, অন্বিতের সঙ্গে বিবিক্তের দ্বন্দ্ব। দামিনীই সে দ্বন্দ্বের মীমাংসা খুঁজে পেল সেই তৃষ্ণার দরথাস্তের শূন্যতার শেষে অসংখ্য পাখির পদচিহ্নে ভরা জলরাশির কূলে।

আট

যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা উপন্যাসের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় করেছি। এখন আমরা যোগাযোগ উপন্যাসের সংকট কোন্ রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছে সে প্রসঙ্গেই আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত রাখবো। সাধারণত সকল

সমালোচকই যোগাযোগ উপন্যাসের প্যাটার্ন সম্বন্ধে একমত। মধুসূদনের অধিকার চেতনা এবং কুমুর স্বাধীন সত্তার বিরোধ থেকেই যে এ-উপন্যাসের শিল্পগর্ভ টানাপোড়েনের জন্ম এ-কথা সমালোচকদের দৌলতে সুপরিজ্ঞাত। উপন্যাসটির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘ কাল-খণ্ডকে এই উপন্যাসে ব্যবহার করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামকরণের মধ্যেও সে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল। এবং সেই প্রসঙ্গে এ কথাও পরিষ্কার হয় যে নারী-পুরুষের সমানাধিকারবাদের প্রশ্নই এ-উপন্যাসের প্রধান প্রশ্ন নয়। আসলে আমরা যেমন পূর্বে বলেছি সমস্ত ব্যাপারটা দুটো পৃথক জীবনযাত্রার ব্যাপার। এবং এই পৃথক দুটি জীবনযাত্রাকে ঠিকমতো বিচার করতে গেলে দেশ-কালের প্রসঙ্গও স্বাভাবিক।

আমরা বলেছি যে আপাতত আমরা এই উপন্যাসের ত্রুটির প্রসঙ্গেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। দুই পৃথক জীবনযাত্রার প্রশ্ন আলোচনায়, সেই কারণে আমরা সর্ব প্রথমে এই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি যে চরিত্রের কল্পনাগত দৈন্য সেই মধুসূদন চরিত্রটির কথা আলোচনা করব। মধুসূদন সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয়—উপনিবেশের হাটের বণিক-আত্মা মধুসূদনের চরিত্রে যেমন পরিস্ফুট তার ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অভিজ্ঞান ততটা নয় অর্থাৎ সে টাইপ হিসাবে যতখানি সার্থক ইনডিভিজুয়াল হিসেবে সে ততখানি ব্যর্থ। যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাড়ির অন্দরমহল ও বহির্মহলকে চিত্রিত করেছেন সেই দ্বন্দ্বকে মধুসূদনের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারেননি। কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক যেন মধুসূদনের মনের অন্দরমহলের ব্যাপার—যে মহলে ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন প্রাচীর, ক্রমাগত পাতা-কেড়ে-নেওয়া নিমগাছ, অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ধোঁয়ার ঝুলে কালো ঘর, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্নধামা প্রভৃতির একত্র সমাবেশ। শুধু কুমুর ঘরখানি "কাঁথা গায়ে দেওয়া ভিখারীর মাথায় জরিজহরৎ দেওয়া পাগড়ী।" সুতরাং এই যার অন্দরমহলের চেহারা সেই মধুসূদন অবশ্যই কোথাও না কোথাও একটা দ্বন্দ্ব সৃজন করবেই যে দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে মধুসূদন ত্রিমাত্রিক হতে পারে না। অথচ বণিকবৃত্তিসম্পন্ন মধুসূদনকে রুচিহীন এবং স্থূল করে গড়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বাইরের চেহারাকেও পরিস্ফুট করে তুললেন না। যে দৌর্দণ্ড প্রতাপের সাহায্যে সে তার অধিকারচেতনাকে গড়ে তুলেছ তার কোনো পরিচয় না থাকায় সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মনোভাবের পুতুল। এমন

কি নিপুণ ব্যবসায়ী হয়েও স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য যে-স্থূল পদ্ধতি সে গ্রহণ করলো তাতে তার ব্যবসায়ের নৈপুণ্যের কথা জনশ্রুতিই থেকে গেল।

কুমু মধুসূদনের সংসারে আশার পর থেকে মধুসূদনের চিত্তচাঞ্চল্য সে কারণে একটা অব্যাহত দ্বন্দ্বের পর্যায়ে উঠতে পারল না। ব্যবসায়ী মধুসূদনের ছায়া অবশ্য মাঝে মাঝে পড়েছে। কিন্তু সে ছায়া কখনো শীর্ণ, কখনো দুর্বল। কুমুর সঙ্গে সংঘর্ষে মধুসূদন কখনো অতি সহজে নিজের সত্তার বণিক অংশকে প্রকাশিত করেছে, কখনো বা অতি সহজে এমন কথা বলেছে যে-কথা বলার ক্ষমতা মধুসূদনের কোথা থেকে অকস্মাৎ এল তা বোঝা যায় না। "এইখানেই আমি বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাকো তবেই যাব, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।" এ-উক্তি যদিও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমের আখ্যানের পুরুষ চরিত্রের মূল কথা, তথাপি এ-কথা মধুসূদনকে মানায় না। মনে হয় আরোপিত। কেননা অন্য ক্ষেত্রে নিখিলেশ, মহেন্দ্র, এরা যে ধরণের ব্যক্তি—মধুসূদন তা থেকে পৃথক। মধুসূদন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নায়কের বৈষয়িক দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। একমাত্র মধুসূদনের বৈষয়িক-জীবিকা-কর্মের দিক রবীন্দ্রনাথ সকারণেই তুলে ধরেছেন। তাই তুলে ধরা স্পষ্ট হত যদি রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের বৈষয়িক কর্ম-জীবনের নীতি-সূত্রকে উপন্যাসে প্রথম থেকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। কতকগুলো বলিষ্ঠ বর্ণনায় ব্যবসায়ীদের টাইপ হিসাবে মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র। ফলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে লোভ, স্বেচ্ছাচার, অধিকারবোধ প্রভৃতির প্রতীক—যে প্রতীকের ওপর কুমুর শান্ত সুদূর সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া দমকা বাতাসের মতো মাঝে মাঝে এসে পড়েছে। স্পষ্টই রবীন্দ্রনাথ এটা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এই বাইরের জীবন ও ভিতরের জীবনকে একত্রে বিজড়িত করে যখনই দেখতে চাওয়া হয়েছে তখনই উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়েছে কৃত্রিমতা। বেঙ্কটশরণমের কাছে হাত দেখানোর অধ্যায় তার বড়ো প্রমাণ। এই সম্পত্তিবাদী ব্যক্তিটির যে দুর্বলতা প্রতিপন্ন করার জন্য হাবুলের মতো বালকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃজন, সেই দুর্বলতা প্রতিপালনের জন্যই তাকে বেঙ্কটশরণমের কাছে নিয়ে যাওয়া। সে দুর্বলতা হল হারানোর ভয়। স্বভাবতই এর মূল্য খুব বেশি নয়। এবং মধুসূদনের চরিত্রে প্রথমাবধি হারানোর ভয়টা প্রবল। একারণে কুমুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে বা কুমুকে অবলম্বন করে অন্তর্দ্বন্দ্বে একটা সমগ্র ব্যক্তির যন্ত্রণার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। যাকে পাওয়া গেল সে একটা লোভার্ত দুর্বল চেহারার পরাজয়-ভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি।

এই সংকীর্ণ অধ্যায়ের পরিণামে কুমুর পরীক্ষাও সীমিত হয়ে গেছে। কম বেশি করে মধুসূদন যেখানে সমাধানমুখী বা আপসমুখী হয়েছে, সেখানে তার গলায় কুমুর কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতে পেয়েছি। ফলে দ্বন্দ্ব হয়েছে স্তিমিত।

এর কারণ মধুসূদন সত্যিই নিজ ইতিহাস রচনাকারী বণিকবীর নয়। একটা সৎ বাণিজ্যব্রতী যে আবেগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, গড়ে তোলে সুনামের সুদীর্ঘ ইতিহাস (বাডেনব্রুকস অথবা ফরসাইট সাগা স্মরণীয়) স্বভাবতই সে দৃঢ়তা, সে আবেগ, সে সততা মধুসূদনের নয়। এই ব্যক্তি উপনিবেশের হাটের কাঞ্চনসন্ধিৎসু মাত্র, যার কোনো বিবেক নেই, নীতি নেই। বলা বাহুল্য আমাদের জীবনে স্বাধীন শিল্পপতির কোনো ভূমিকা উপস্থিত থাকলে কুমু-মধুসূদনের সমস্যার গভীর রূপকে সত্য করে তোলার দায় কেবল কুমুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হত না। এর ফলে অবশ্য এই খণ্ডিত উপন্যাসের উপসংহারে একটা সুবিধা হয়েছে। কুমুর দিক থেকে যাই হোক, মধুসূদনের সীমাবদ্ধ পরিসরে এ-উপসংহার মানিয়ে গেছে; মধুসূদন তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী পেতে চলেছে। এ-উত্তরাধিকারীকে সে হারাতে চায় না। কুমুর দিক থেকে যে মীমাংসা হয়নি সে কথা তো সর্বজন বিদিত। অবশ্য শোনা যায় সে পরীক্ষার নাকি তখনও অনেক বাকি ছিল। এই অসমাপ্তির জন্য উপন্যাসটি খণ্ডিত।

এখানে বিষয়বস্তুটা ছিল এমনই দেশকালাধীন যে মধুসূদনের এই অপরিপূর্ণতা অনিবার্য। টমাস মানের বাডেনব্রুকস অথবা গলস্ওয়ার্দির ফরসাইট সাগায় যে ব্যবসায়ী পরিবারের কথা আমরা পড়ি তারা এক একটা জাতির মনোলোকের প্রতিবিম্ব সহজেই বহন করতে পারে। কেননা সেখানকার বণিক-জীবনও জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। ফলে সোম ফরসাইট ও আইরিন ফরসাইটের যে বিরোধ তাকে গলস্ওয়ার্দি নায়কের দিক থেকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন। সেখানে স্বামীর অধিকার চেতনা মধুসূদনের মতো স্থূল কর্কশ পথে আবির্ভূত হয় নি। সে অধিকার চেতনাতেও জাতীয় সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং সংস্কৃতি-মনস্কতা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আমাদের সদাই মনে হয় যে এই দুই স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে-বিচ্ছেদে সোম ফরসাইট সম্পূর্ণ নির্দোষ, এবং স্বামী হিসাবে সে ফুলমার্ক পাওয়ার উপযোগী। কিন্তু আমরা ভালবেসে ফেলি আইরিনকে। এই দ্বৈত পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জয়ী হতে পরেননি। মধুসূদন থেকে গেল লোভী ব্যবসায়ী এবং স্থূল স্বামী। হয়তো বাডেনব্রুকস

বা ফরসাইটদের মতো একটা স্বাধীন জাতীয় বণিক জীবনকে এই উপনিবেশের পটে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এই দেশকালাধীন অনিবার্যতাই যোগাযোগের ভারসাম্যের বিনষ্টির মূলে। একে সংযত করার জন্য কুমুর ওপর প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে বেশি। কুমুর পরীক্ষা যে তাৎপর্যপূর্ণ সে আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি।

আসলে একটা জাতির জীবনার্থ এবং জীবনযাপনের ধারার ওপরে সে জাতির উপন্যাসের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের ভূমিকায় আমাদের ঔপনিবেশিক পটে অন্যতর কিছু আশা করা অসঙ্গত। আমরা অবশ্যই উপনিবেশের জটিলতাকে মুশ্‌কিল-আসান বলে ব্যবহার করতে চাই না। কেননা উপনিবেশ তো পৃথিবীতে নানা স্থানেই হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশের পটেও বাংলাদেশের সাহিত্য এমন শক্তি সঞ্চয় করেছিল কী করে—যে শক্তি নিজ সীমার মধ্যে থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ? তার কারণ ভারতবর্ষের মহান সভ্যতার ভিতরেই অনুসন্ধেয়। সেই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে ভিলেন বা ঐ জাতীয় চরিত্রাঙ্কনে ভারতবর্ষ চিরকাল বিমুখ। যে-সমস্ত চরিত্রে ভারতবর্ষের বিপুল ঐতিহ্যের ধারণা সক্রিয় এবং যারা জীবনের পূর্ণাদর্শকে কোনো দিক থেকেই ভগ্নাংশ করে ফেলেনি, বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্রশালায় তাদের স্থান সবার ওপরে। কুমু, ভ্রমর, আনন্দময়ী এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগের ঔপন্যাসিক সার্থকতার দায় তাই কুমুর ওপরেই শেষ পর্যন্ত বর্তিয়েছে।

যোগাযোগেও রবীন্দ্রনাথের নাটকের আদর্শ কার্যকরী। মধুসূদন যেন যন্ত্রপুরীর সেই রাজা। বাইরের দিক থেকে যে প্রচণ্ড, অধিকারবাদী। কুমু বাইরের দিক থেকে দুর্বল। কিন্তু তার অন্তরের শক্তিতে সে বিশিষ্ট। সে শক্তির প্রধান কথা সৌন্দর্য এবং স্বাধীনতা। আইরিনের বেলায় যেমন লেখক অপরের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে জীবন্ত করতে চেয়েছেন—কুমু লেখকের সে দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা

এক

কোনো বাংলা উপন্যাস যদি গভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকে তা হল চোখের বালি। যে সমস্ত নারী চরিত্রের স্রজন-কর্তা হিসাবে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হয়ে থাকে তারা সকলেই হয় বিনোদিনীর ভগ্নাংশ, আর নয় বিনোদিনীর কাঠামোয় অন্য শরীরের রূপরঙ। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই চরিত্রটিকে অনুধাবন করেছিলেন। চোখের বালি বেরুনোর প্রায় এক যুগ পরে শরৎচন্দ্র যখন সমাজ-বিগর্হিত প্রেমকে উপজীব্য করে তাঁর উপন্যাসাবলী প্রকাশ করতে লাগলেন, যখন দেখা গেল যে প্রতিপত্তির সাফল্যে এবং জনচিত্ত দখলে তাঁর স্রজিত নারী চরিত্রগুলি বিনোদিনীকে বহু পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের লেখক চারিত্র্যের ভিতরেই এই মনোহরণের সাফল্যের বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তৎপূর্বে কী অবস্থায় শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস পাঠকের চিত্ত জয় করলেন সেটা আলোচিত হওয়া দরকার।

বাঙালী উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র নৌকা-ডুবিতে ছাড়া আর কোথাও ব্যাপকভাবে স্পর্শ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা সে কারণ কতকটা ব্যাখ্যা করেছি। এখন পাঠকদের দিক থেকে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করব। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি শিক্ষার প্রথম দিন থেকে যে পাঠকমণ্ডলীর পরিধি দিনে দিনে বেড়ে চলছিল তার চেহারা মোটামুটি এক। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্মী পাঠক—জাতির ভবিষ্যৎ রচনাকারী কীর্তিগর্ভ পাবলিক। তার কর্মসূত্রের সঙ্গে মর্মসূত্রের প্রত্যক্ষ গ্রন্থিবন্ধন বিদ্যমান ছিল। ন্যায্যতই ইংলণ্ডের এই পাঠকমণ্ডলীর চেহারা উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছে। জাতির কর্মময় যুগের সর্বব্যাপী আগ্রহ, সাম্রাজ্যের অবসর-স্তিমিত দিনে সীমিত হতে বাধ্য। রুচি, নীতি, বিবেকের প্রশ্রান্ত আশ্রয়ে সমস্ত বিক্ষোভকে আবৃত করে আত্মগোপনের যুগ এটা। এ যুগেই কীটসের চিঠি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, বেরিয়েছে কেটে ছেঁটে সেক্‌সপীয়রের পারিবারিক সংস্করণ। সেদিক থেকে বাংলা দেশের দুই শতাব্দীর পাঠকমণ্ডলীর

গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পরিমাণগত পরিবর্ধন হয়েছে মাত্র। পাঠক-সচেতনতা ঔপন্যাসিকের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলালের ঘরের দুলাল-এর লেখক ও প্রতি সংখ্যা 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা পত্রিকা পড়ে কী অভিমত দিলেন তা জানবার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। সেই সময় থেকে শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে পাঠক-জনতা (Reading-public) গড়ে উঠেছে তা স্পষ্টত দু-ভাগে বিভক্ত। একভাগে সচেতন পাঠকমণ্ডলী ও আর একভাগে গল্পপিপাসু সাধারণ পাঠক সমাজ। এই শেষোক্তদের অনুক্ত অনুরোধেই লিখিত হয়েছে দামোদরবাবুর মৃন্ময়ী (কপালকুণ্ডলার পরবর্তী অধ্যায়)। সে-যুগের পাঠকমণ্ডলীর বৃহত্তর অংশ মৃন্ময়ীতেই গল্পস্পৃহার নিবৃত্তি খুঁজে পেত। এই শেষোক্ত পাঠকমণ্ডলীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। প্রতি দেশে প্রতি যুগেই এই ধরনের বিস্তৃত পাঠক সমাজের দেখা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে এরাই হলেন চলিষ্ণু ধারার বিস্তৃততম খাত যেখানে গভীরতা কম, বেগ কম, কিন্তু প্রশস্ততা বেশি। এই পাঠকমণ্ডলী উপন্যাসের কাছ থেকে কোনো বৃহত্তর প্রশ্ন আশা করেন না, প্রচলিত চিন্তা এবং জীবনযাত্রার প্যাটার্নকে কোনো রকম নিরীক্ষা বা পরীক্ষার ভিতর পতিত দেখতে চান না। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জন্য ঔপন্যাসিকের সহানুভূতিকে এরা খুব মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এক কথায় জীবনকে বিস্তৃত জটিল পটে দেখার ব্যাপারে এদের উৎসাহ কম, সেই কারণে এই ধরনের অ্যাভারেজ পাঠকমণ্ডলী সব সময়েই বিগত যুগের ঔপন্যাসিক ধারার রক্ষক কিন্তু নবীন ভবিষ্যতের জনক নন।

শরৎচন্দ্র যে কালে লেখনী ধারণ করেছিলেন তার প্রাক্কাল এবং সমকাল এই দিক থেকে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অনড় হয়ে পড়েছিল। কেননা রবীন্দ্রনাথের সাহসিক নিরীক্ষা এবং সৎসাহসিক সার্থকতা বাঙালী অ্যাভারেজ পাঠকমণ্ডলীর আত্মীয় ছিল না। স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দেশকালের পটে বারে বারে স্থাপিত করেছেন তাকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধির জন্য জনজীবনের ব্যাপক রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। শতবন্ধন-জাল-জটিল, খিন্ন-অপরিতৃপ্ত আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনে, গ্রামে এবং শহরে, পরিবারে এবং সমাজেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর শেষ বাঁধন সহজে ছিঁড়ে পড়েনি এবং পড়ে না। ফলে উপন্যাসের দর্পণে ব্যাপক পাঠকমণ্ডলী যখন আত্মপ্রতিবিম্ব দেখতে চাইতেন তখন রবীন্দ্রনাথের দিকে চাইলে স্বভাবতই আশ মিটতো না, চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তাই এই সময়কার উপন্যাস প্রচেষ্টায় তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।—

(ক) উপন্যাসে রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিক প্রসাদের তরলীকরণের প্রচেষ্টা। প্রেম-বিরহ মিলনকে উপজীব্য করে এঁদের উপন্যাস প্রচেষ্টা। মুখ্যত ভারতীয় লেখকবৃন্দ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখেরা এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন।

(খ) রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি মনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অক্ষম অনুসরণ ও তারও একটি তরলীভূত রূপসৃজন এ-যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য। নরেশ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু সৃষ্টি এর মধ্যে পড়ে।

(গ) এই ধারারই পাশাপাশি আর একটি ধারাও এই যুগে ক্রমশ সুস্পষ্ট হচ্ছিল। তা হল গল্পের ভিতর দিয়ে পাঠকশ্রেণীর পরিতোষণ বা entertainment। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নরেশ সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু রচনা এই পর্যায়ে পড়ে।

মোটামুটি এই ত্রিধারার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং পরে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবুর রাজপথ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নির্বাচনে গোরাকে অনুসরণ স্পষ্ট। শুধু গোরার বিশাল পট ও পটবিধৃত জীবনের তাৎপর্য নেই এ-উপন্যাসে। নিটোল করে সম্পূর্ণতার বোধ সঞ্চারে উপেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাজপথে সে বোধ উপস্থিত। নরেশবাবু, চারুবাবু এবং প্রভাতবাবুও তর্কপ্রাণ বুদ্ধিকেন্দ্রিক উপন্যাস অপেক্ষা মোটামুটি পারিবারিক গল্পেই মুক্তি অনুভব করতেন। নরেশবাবু যৌন-সমস্যামূলক উপন্যাসের চেয়ে অভয়ের বিয়ের মতো স্নিগ্ধ চিত্তহারী গল্পে সফল হয়েছিলেন বেশি।

সমকালীন উপন্যাস সাহিত্যের প্রয়াসে মনোহরণের ঝোঁক অল্প স্থলেই অতিক্রান্ত হয়েছে। উপন্যাস-লেখক হিসাবে প্রভাতবাবুর রমাসুন্দরীর সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা রত্নদীপের সাফল্য এবং সম্ভাবনা দুয়ের কথাই স্মরণীয়। রত্নদীপের প্রধান বলিষ্ঠতা এবং নীতি সচেতনতা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। রাখালের সাহায্যে লেখক যে কথাটি রূপায়িত করতে চাইলেন তা হল এই যে মানুষের পাপ করবার ক্ষমতার সীমা মানুষের মনই রচনা করে শাশ্বত নীতিবোধের সহজাত উত্তরাধিকারে। রাখাল যে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রবঞ্চনায় নেমে যেতে পারে না সেটার কারণ বৌ-রানীর চরিত্র সম্বন্ধে তার অনুভূতির আন্তরিকতা। বৌ-রানীর পতিপ্রেমের ব্যাপারটি রাখালকে স্পর্শ করে বলেই অনধিকারীর অবমাননায় সে নিজেকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করে না। রত্নদীপ বাংলা

সাহিত্যের সেই ধরনের শেষ সার্থক উপন্যাস—যা বঙ্কিমী পাপ-পুণ্য বোধের ওপর স্থাপিত; শেষ প্লটপ্রধান উপন্যাস—যেখানে পাঠকের মূল আগ্রহ কী হয় শেষটা তা জানতে চাওয়ায়। তথাপি রাখালের দ্বৈত সত্তাকে ব্যবহার করায় কিছুটা সাফল্যের প্রসাদ পাওয়া গেল; বিপুলতর সম্ভাবনার প্রত্যাশা না মিটলেও এ কথা সত্য। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের সাহিত্যকর্মের মধ্যে রত্নদীপের স্থান উচ্চে। ব্যক্তিকে একটা নির্দিষ্ট পটে স্থাপিত করে ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পরীক্ষা করা রবীন্দ্রনাথ-সম্মত পদ্ধতি। রাখালকে সে পরীক্ষায় স্থাপন করাও হয়েছিল। শুধু যে মনন এবং চিন্তা-শীলতা থাকলে সে পরীক্ষার শিল্পরূপকে বিশিষ্ট করে তোলা যেত প্রভাতবাবুর ক্ষেত্রে তার অভাব ছিল। রত্নদীপে প্রভাতবাবু এই ত্রুটিকে বুঝতে দেননি বৌ-রানীর ওপর আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট রেখে। বিষয়বস্তুর মধ্যে শিল্পসম্ভাবনা আবিষ্কার করা যদি সাধু-সমালোচনা সঙ্গত ব্যাপার হয় তাহলে বলা চলে যে এই ধরনের নৈতিক সমস্যার নিগূঢ় আকর্ষণ প্রভাতকুমারের সমকালবর্তী এবং পরবর্তী অন্য কোনো লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে ছিল না। শরৎচন্দ্রের অসংখ্য উপন্যাসের কথা ভেবেও এ মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

দুই

রত্নদীপের একক সাফল্য ছাড়া চারুবাবুর অবাস্তবতা, নরেশবাবুর মনস্তত্ত্ব এবং তার আগের মণীন্দ্রলাল বসুর রোমান্টিকতা—এসব কিছুই বাঙালী পাঠকের আত্মীয়কল্প বিশ্বমায়া সৃজনে সফলকাম হতে পারেনি। না পারার হেতুও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতীর যুগের রোমান্টিকতা এবং মনস্তত্ত্বপ্রীতি জাতির মর্মমূলের সঙ্গে গ্রথিত ছিল না। এগুলো যেন স্পষ্টতই বঙ্গীয় আধারে বিদেশী সাহিত্যের প্রসাদ। এ যে-পরিমাণে ছিল অর্জিত অধ্যয়নের ফল সে-পরিমাণে লেখকদের স্বীয় অভিজ্ঞতার দান নয়। কৃত্রিমতা এ-যুগের সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। স্বভাবত অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠকের মনোরাজ্যে তখন অরাজকতা। তাঁরা না পারছেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে, না পাচ্ছেন উপরোক্ত লেখকবৃন্দের কাছে প্রাণের প্রতিধ্বনি। উপরোক্ত লেখকবৃন্দও রবীন্দ্রনাথের শিল্পগত সাফল্যকে, আধুনিক সমালোচকদের কারো কারো মতো, মনে করেছিলেন হয় কবিত্ব, নয় মনস্তত্ত্বের পরিণাম। পুরো রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটি অনুধাবন করতে না পারার জন্যই এখনও যেমন রবীন্দ্রনাথ থেকে সংগ্রহ করা

হয় ভঙ্গি তখনও কেবল কাপড় রাঙিয়ে যোগী হবার বাসনা ছিল অনেকের। ফল হয়েছিল আরো মারাত্মক। দেশকালের নিয়মকে লঙ্ঘন না করেই শিল্পবুদ্ধির বিকাশ ও পরিণতি ঘটে থাকে। ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের অধিকাংশ লেখকের শিল্পবোধের প্রেরণাকেন্দ্রে সদাই ছিল বিদেশী হাওয়ার দোলা। সেই দোলায় কেমন করে ফুল ফোটাতে হয় তা জানতে গেলে মৃত্তিকামূলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় প্রয়োজন। তা এঁদের কারো ছিল না। ওদিকে পাঠক সমাজেও মনস্তত্ত্ব বা রোমান্টিক কাহিনী অপেক্ষা ভিন্নতর চাহিদা অপেক্ষা করছে। আমাদের গ্রামীণ জীবনবোধ এবং জীবনাচরণের সূত্রগুলির জট দুইই আমাদের কাছে ছিল দুশ্ছেদ্য, এও যেমন সত্য, এক-শ বছরের কলকাতাশ্রয়ী নবকালের সংঘর্ষে তারা হয়ে পড়েছিল নানা সমালোচনার বিষয়, এও তেমন সত্য। তখনকার পাঠকমণ্ডলীর মনোভাবে দুই লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল। এক, আমাদের জীবনাচরণ সম্বন্ধে, পুরনো মূল্যবোধগুলি সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ সমালোচনার বোধ ; দুই, কোনো প্রকার ইতিবাচক মনোভাবের অনুপস্থিতি বশত বহুকালের বন্ধন-সূত্রগুলি সম্বন্ধে মমতাবোধ। এই হ্যাঁ এবং না-এর কাটাকুটি খেলার শূন্য মনোভাবের আশ্চর্য প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক জয়মাল্য দিয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণ এখানে।

এই হ্যাঁ এবং না-এর কাটাকুটি খেলা তাঁর বহুল পরিমাণে জনপ্রিয় অথচ গৌণ সৃষ্টিগুলির মধ্যে অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট। যেখানে একজনের পাশে আর একজনকে দাঁড় করিয়ে হ্যাঁ এবং না-এর বৈপরীত্য সৃজন করেন শরৎচন্দ্র। তাই দিগম্বরীর পাশে নারায়ণী কিংবা হেমাঙ্গিনীর পাশে কাদম্বিনী অথবা এলোকেশীর পাশে অন্নপূর্ণাকে রেখে শরৎচন্দ্র সহজেই পাঠকমনের পরিচর্যা করতে পেরেছেন। এই হ্যাঁ এবং না-এর উভয় কুল রক্ষা করতে গিয়ে তিনি যখন একান্নবর্তী পরিবারের সংকটকে ব্যবহার করতে গেছেন তখন সেই সংকটের তটভূমিকে স্পর্শ মাত্র করে তিনি অপূর্ব মমতায় আবার তার সযত্ন শুশ্রূষা করেছেন। অশ্রুগলিত আনন্দে দেশবাসীর জয়ধ্বনি তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে লাভ করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা যে তাঁর শিল্পের দৈন্য এবং সংকটকেই সূচিত করছে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন না। কেননা দেশ-কাল এবং পাত্র-পাত্রীকে গভীর অভিনিবেশ ও তাৎপর্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কখনও ধরবার চেষ্টা করেননি। ব্যক্তিত্বের মূল থেকে উৎসারিত কোনো সমস্যা তাঁকে কখনও বিচলিতও করেনি। সেই কারণেই স্বাভাবিকতা

কখনও শরৎচন্দ্রের স্বধর্ম নয়। আতিশয্যের সম্পর্কগুলিকে পরিমাপ করবার কোনো বিধিনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই বলে সেই সব অপার মুক্তির প্রাঙ্গণে শরৎচন্দ্রের শক্তির বিপুল বিকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক অপেক্ষা অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর (দেবর জায়া) ছেলের সম্পর্ক তাঁকে আগ্রহান্বিত করে বেশি। নারায়ণীর সঙ্গে তার নিজের ছেলের স্বাভাবিক সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে দেবর রামের সঙ্গে স্নেহাতিশয্যের সম্পর্কে শিল্পী হৃদয়ের সাড়া শরৎচন্দ্র বেশি অনুভব করেন। মা এবং ছেলে অথবা স্বামী-স্ত্রী অথবা এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যস্থিত টানাপোড়েন—যেখানে শিল্পীর পরীক্ষা আরো গভীর এবং জটিল (যেমন কুমু-মধুসূদন বা মহেন্দ্র-রাজলক্ষ্মী)—শরৎচন্দ্র প্রায় সময়েই পরিহার করেছেন। (সহজ হওয়াই যে ভয়ানক কঠিন কর্মভার এবং সহজের পরীক্ষাতেই যে শিল্পের প্রকৃত পরীক্ষা, শরৎচন্দ্রের সে জ্ঞানের অভাব তাঁর অপেক্ষাকৃত প্রধান শিল্প প্রচেষ্টাতেও কেমন প্রকট তার বড়ো প্রমাণ পল্লীসমাজ উপন্যাসের জ্যাঠাইমা চরিত্রে। পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তি জীবনের ন্যায়-শৃঙ্খলার কতখানি অভাব একটা চরিত্রের রূপায়ণে অনুভব করা যেতে পারে জ্যাঠাইমা চরিত্র তার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন। জ্যাঠাইমা নিজের সন্তান বেণী ঘোষালের সম্পর্কে কতখানি আগ্রহান্বিত সে-নিদর্শন উপন্যাসে অনুপস্থিত (মাতা পুত্রের কোনো সাক্ষাৎকার নেই), কিন্তু রমা ও রমেশ প্রসঙ্গে যে-কোনো ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও ভূমিকা অসীম। এমনও যদি হত যে বেণী ঘোষালের মতো পুত্র মাতার (বিশেষ এমন মাতার) সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করেছে বলেই সে মা পুত্র সম্বন্ধে সাধারণত নীরব, তাহলেও একটা প্রশ্ন থাকে যে এই মায়ের ব্যর্থ মাতৃত্বের জন্য একটা প্রচণ্ড বেদনাবোধ থাকবে না? হয়তো জ্যাঠাইমার মধ্যে সে আক্ষেপের একটা স্বর বিদ্যমান; কিন্তু তা এতই অগভীর যে রমেশ প্রসঙ্গে এসেই মুছে যেতে পারে। শরৎচন্দ্র দেখলেন না যে রমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের সামনে সমাজের যে বাধাকে তিনি আতিশয্যে বড়ো করে তুললেন সেই একই বাধা তো জ্যাঠাইমার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। সমাজপতি বেণী ঘোষালের মা আর রমেশের জ্যাঠাইমায়ে যে দ্বন্দ্ব তাও তো অল্প শক্তির দ্বন্দ্ব নয়। বেণী ঘোষালের ছক থেকে জ্যাঠাইমার বেরিয়ে আসার মতো স্বাতন্ত্র্যের উৎস কোথায় তাও রয়ে গেল অস্পষ্ট। জ্যাঠাইমাও তো পল্লীসমাজেরই মা। কী করে তিনি এড়িয়ে এলেন সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পিছুটান? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেলে না।

স্বভাবতই এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। বলা যেতে পারে যে কিছুক্ষণ আগে ভারতী এবং উত্তর-ভারতী যুগের লেখকদের প্রসঙ্গে এক কৃত্রিমতার অভিযোগ তোলা হয়েছে। আবার শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে সেই অভিযোগই তৈরি হল। তাহলে একটা কৃত্রিমতাকে পাঠকেরা পরিহার করল অথচ আর একটাকে গ্রহণ করল সাগ্রহে—কেন? তার কারণ শরৎচন্দ্রের কৃত্রিমতা আমাদের আহত জীবনকে, আমাদের ক্ষুব্ধ বোধকে শুশ্রূষা করেছে নিপুণ ভাবে। 'রমলা'র নায়ক-নায়িকাদের থেকে জ্যাঠাইমাকে বিশ্বাস করতে আমরা বেশি প্রস্তুত। রোগ শয্যাশায়ী ব্যক্তি যেমন করে চিকিৎসকের কৃত্রিম আশ্বাসকে বিশ্বাস করে, জাতীয় জীবনের এক অদ্ভুত শূন্য মানসিকতায়, আমরাও বিশ্বাস করেছি শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের এই কৃত্রিমতা অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে দুই ক্ষেত্রে। এক, যেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে চরিত্র এবং প্যাটার্নকে গড়ে তুলতে গেছেন সেখানে। জ্যাঠাইমাকে আনন্দময়ীর মতো গড়ে তুলতে গেলে জ্যাঠাইমার চরিত্রে যে ন্যায় এবং যুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন শরৎচন্দ্র কখনও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। গৃহদাহকে নষ্টনীড় বা ঘরে বাইরের আদর্শে দাঁড় করাতে গেল ব্যক্তিত্বের যে প্রবল টানাপোড়েনের সৃষ্টি করতে হয় সে ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্রের চরিত্রশালার বাইরের ব্যাপার। দুই নম্বর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা শরৎচন্দ্রের শিল্প প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে ক্ষুণ্ন করেছে তা হল অকারণ মননপ্রদীপ্তি সঞ্চারের প্রচেষ্টা। শেষ প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

বস্তুতপক্ষে যখন বাংলা উপন্যাস-পাঠক সমাজ পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবল জিজ্ঞাসা সে বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর অ্যাভারেজ অংশকে স্পর্শ করতে পারছে না, অথচ যখনও তিরিশের যুগে রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারকে নানাভাবে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বিস্তার ও গভীরতার সূচনা হয়নি এই রকম ধরনের অবস্থায়, দুই অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়টুকুতে শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকমণ্ডলীকে অধিকার করেছিলেন। মানুষের সম্বন্ধে গভীর ভালবাসার বোধ শরৎচন্দ্রের নৈতিক সম্পদ বলে, কোনো জীবনদর্শন ব্যতিরেকেই, কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় না দিয়েও শরৎচন্দ্র পাঠকের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হননি। এ-ভালবাসা কতকাংশে শিল্পমূল্যের প্রতিদান কতকাংশে শরৎচন্দ্রের করুণাময় মনের মূল্যশোধ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, উপন্যাস করুণাময়দের উপযুক্ত রঙ্গভূমি নয়! এ-কথা

এই জন্য যথার্থ যে উপন্যাসের সহানুভূতি শুধু সহানুভূতি নয়, উপন্যাসের কল্পনাও শুধু কল্পনা নয়। ঔপন্যাসিকের সহানুভূতির পশ্চাতে থাকে কল্পনার সুদৃঢ় সহযোগিতা, আবার কল্পনার পশ্চাতে থাকে সহানুভূতির গভীর সমর্থন। সহানুভূতি, কল্পনা এবং মনন এই তিনটিকে একই আধারে মিশ্রিত করতে না পারলে উপন্যাসের পানপাত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শরৎসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনায় এই তিন প্রসঙ্গের বিচার বাঞ্ছনীয়।

তিন

শরৎসাহিত্যের সাফল্য প্রসঙ্গে সাধারণত আমাদের সমালোচকেরা নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করেন:

(ক) নিষিদ্ধ সমাজ-অনুমোদিত প্রেমের বিশ্লেষণ।

(খ) আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কার প্রভৃতির কঠিন সমালোচনা।

এখন এই কারণগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির তাৎপর্য অনুধাবন করা যাক।

সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্রই প্রথম উপন্যাসের উপজীব্য করেননি। বরং বলা যেতে পারে যে স্বদেশে ও বিদেশে উপন্যাস সাহিত্যের গোড়া পত্তনের কাল থেকেই নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখিত হয়েছে। রোহিণীকে গোবিন্দলাল ভালবেসেছিল এমন প্রমাণ কৃষ্ণকান্তের উইলে বহু ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। সে ভালবাসার স্বরূপ কী এবং তার প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব কী সে কথা স্বতন্ত্র। চোখের বালিতে বিনোদিনীর বিহারীর প্রতি ভালবাসা নিঃসন্দেহেই ভালবাসা এবং নিষিদ্ধ ভালবাসা। নিষিদ্ধ ভালবাসার বিষয় ঔপন্যাসিকের একটি এমন পরীক্ষাগার যেখানে সারা জীবনে তাঁদের একবার না একবার যেতেই হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগুনতি উদাহরণ এবং বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু সৃষ্টিকে এর প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা চলে। আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভারি, চন্দ্রশেখর বা নষ্টনীড়—নিষিদ্ধ প্রেমই যেন ঔপন্যাসিকের বীক্ষণাগার। সত্যই বীক্ষণাগার—কেননা নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়টির সঙ্গে উপন্যাসের মর্মসূত্রের একটি নিবিড় যোগ বিদ্যমান। এই যোগ ব্যক্তি সচেতনতার সঙ্গে গ্রন্থি-বদ্ধ। সচেতন ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিকের প্রধান আগ্রহ। নিষিদ্ধ প্রেম

ব্যক্তিকে প্রচলিত জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও গতানুগতিক বিন্যাসের বিপরীত মুখে স্থাপন করে। ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র রূপকে পরীক্ষা করার বিপুল অবকাশ এই ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় রোমান্সের নিষিদ্ধ প্রেম অপেক্ষা ঔপন্যাসিকদের ব্যবহৃত নিষিদ্ধ প্রেমের তাৎপর্য অনেক গভীর। এবং এই গভীরতাটুকুর জন্য উপন্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধারের কোনো বিকল্প নেই। মধ্য যুগের নিষিদ্ধ প্রেমের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই প্রেম সম্বন্ধে কোনো দ্বন্দ্ববোধ ছিল না। নিষেধটা আরোপিত ছিল বাইরে থেকে। রোমিও-জুলিয়েটের পরস্পর প্রেমে কোনো সংশয় ছিল না। নিষেধ বা গোপনতা প্রয়োজনীয় হয়ে ছিল বাইরের বাধার জন্য। কিন্তু ভ্রনস্কি এবং আনার প্রেমের মধ্যে যে নিষিদ্ধতা, সে নিষিদ্ধতা বাইরের দিক থেকে প্রকাণ্ড নয়। মনের দিক থেকেই সে বাধা অতিকায়। ব্যক্তি সচেতনতার একটি আশ্চর্য পরিণাম হল এই যে মানুষ বুঝল সমাজ নামক ব্যাপারটি লোকসমষ্টির যোগফলে বিরাজিত নয়। সমাজই বলা হোক, বা জীবন সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রচলিত মানই বলা হোক, এ-সমস্ত কিছুর বাঁধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানসের নিভৃতে। সেই বাঁধনে টান পড়ে' ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট চেহারা কেমন করে ফুটে ওঠে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ সদাই সেই প্রক্রিয়ার সন্ধানী। অথচ রোমিও এবং জুলিয়েট-এর প্রেমবৃত্তান্তটির মতো গল্পের মূল আকর্ষণ গোপন দুঃসাহসিকতায়। সেখানে বিপন্নতার বোধকে ব্যবহার করা হয় প্রতি পদে। কিন্তু কেউ কখনো মাদাম বোভারির প্রণয়-লিপ্সার শাস্তিস্বরূপে অসংখ্য সামাজিক মানুষকে বিচার সভায় জড়ো করবে না, কোনো বংশ মর্যাদায় আঘাতের আক্রোশে হত্যা করতে ছুটবে না কেউ প্রেমিককে। বড়ো জোর সে হয়তো কেলেংকারির গল্প করবে ড্রয়িং রুমে বা চণ্ডীমণ্ডপের আসরে। হয়তো মন্তব্য করবে। কিন্তু কোনো নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে—এগুলি প্রধান নিয়ামক ব্যাপার নয়। ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদীর্ণতাই উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমকে উপলব্ধি করার প্রধান সূত্র। কেবলমাত্র প্রেমের নিবিড়তা বা গভীরতা বা ঐ জাতীয় কিছুকে প্রতিপন্ন করা উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন সম্পর্কের যোগফল স্বরূপ ব্যক্তির মৌল-সত্তাকে কেমন করে আলোড়িত করেছে এ-ঘটনা, তাই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

নিষিদ্ধ প্রেমের এই বিশিষ্ট তাৎপর্য একমাত্র উপন্যাসের কাঠামোয় ধরা যায়, আর কিছুতে নয়। কেননা বিভিন্ন সম্পর্কের, বিভিন্ন পর্যায়ের, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা

রুচিসমূহের ইতিহাসের, পরিবেশের নানা চাপের ফলে যে ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে এবং যাকে নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিমুখে স্থাপন করা হয়, তাকে উপন্যাসের স্থিতিস্থাপক শিল্পরূপে সমগ্রভাবে ধরা যায়। কখনো কথকতায়, কখনো নাট্য রসাশ্রয়ে, কখনো বিশ্লেষণে, কখনো লেখকের স্বগতভাষণে, কখনো টীকায়, কখনো অপরকে কথা বলিয়ে, কখনো অপরকে ভাবিয়ে ও নিজে ভেবে ঔপন্যাসিক এই সমগ্রতার সাধক। সমগ্র মানুষটার প্রসঙ্গেই নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপারটি অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে বিধবা বিনোদিনীকে দিয়ে এ-পরীক্ষার ব্যাপারে গভীর সার্থকতা রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদিনী এবং শরৎচন্দ্রের অসংখ্য নায়িকা-কুলের মধ্যে একটা আপাত সাদৃশ্য বিদ্যমান সে-কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শরৎচন্দ্র গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বিনোদিনীর চরিত্রের প্যাটার্নের বাইরের সীমারেখাকে অনাহত রেখেছিলেন। বিনোদিনীর মতো বাকপটু, রসিকা, গৃহকর্মনিপুণা, সেবাপরায়ণা এবং পরকে আপ্যায়নে-শুশ্রূষায় পারদর্শিনী শরৎচন্দ্রের সমুদয় নায়িকা। নায়কের শরীরের শুশ্রূষায় কাতর ও ব্যাকুল চিত্ততা রবীন্দ্রনাথের বহু নায়িকার পরিচয়-সূত্রের অন্যতম। শীর্ণশরীর শচীশের জন্য দামিনীর উৎকণ্ঠা দেখে শ্রীবিলাসের ব্যঙ্গোক্তিতে দামিনীর উত্তর এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। দামিনী বলেছিল যে মেয়েরা শরীরের স্রষ্টা বলেই সম্ভবত শরীরের ওপর মায়া তাদের অধিক। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নায়িকাই সেদিন থেকে বিনোদিনীর ছায়ায় গঠিত। রবীন্দ্রনাথও এই চরিত্র বিন্যাসের জন্য বঙ্কিমের কাছে ঋণী। রোহিণী ও বিনোদিনীতে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যায় রোহিণী মাঝে মাঝে বিনোদিনীতে পরোক্ষ এবং সুদূর প্রভাবসম্পাতী। রোহিণীও গৃহকর্মনিপুণা, রন্ধনে দ্রৌপদীবিশেষ, ফুলের গহণা, খেলনা রচনায়, চুল বাঁধার বিভিন্ন কৌশলে অদ্বিতীয়া। সম্ভবত এ-চরিত্রগুলিকে এমনভাবে পরি-কল্পনার মূলীভূত উদ্দেশ্য এদের ব্যক্তিসত্তার সম্যক পরিস্ফুটন। অন্যসব দিক থেকে যে সুস্থ এবং সমগ্র, "নিষিদ্ধ প্রেম" তার পূর্ণবৃত্ত জীবনে কেমন করে বৃত্তভঙ্গ ঘটায় এটা বোঝানো এই জাতীয় পরিকল্পনার কারণ। এই চরিত্রগুলি অন্য দিক থেকে গুণগত উৎকর্ষের অধিকারী না হলে এদের প্রচলিত জীবন-বিন্যাস পরিহারের ঘটনা আমাদের আকর্ষণ করে না। রোহিণী-বিনোদিনী এবং শরৎচন্দ্রের নায়িকাকুল এদিক থেকে এক সূত্রে বাঁধা। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে অনুধাবন করেছিলেন একান্তই তাঁর রেখাসীমার দিক থেকে।

ফলে বিনোদিনীর বহিরঙ্গ সাদৃশ্য যতটা তিনি নিখুঁত ভাবে রূপায়িত করেছেন, বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের মূলগত সমস্যাকে তিনি ততটা উপলব্ধি করেননি। আমরা চোখের বালির আলোচনায় দেখিয়েছি যে বিনোদিনীর সমস্যা প্রকৃত-পক্ষে প্রেমাতুরা নারীর সমস্যা নয়। সারা জীবন যে অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে সে নিজের গোটা জীবনের সেই কঠিন ছকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে বিহারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবকাশে। আমরা এও দেখিয়েছি যে বিহারীর বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার মধ্যেও বিনোদিনীর ব্যক্তি-স্বরূপই কেমন সক্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্র ব্যক্তির এই নিগূঢ় প্রশ্নকে ততটা উপলব্ধি করেন নি। ✓

করেননি বলে ঐ সমাজ-বিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেম শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডলে ব্যবহার করেছেন অনেকবার, কিন্তু এটা প্রতিবারই তাঁর কাছে থেকে গেছে একটা সহানুভূতি প্রকাশের ঘটনা মাত্র, তদপেক্ষা অধিক তাৎপর্য সৃজনে তা থেকে গেছে অপারগ। রমা সম্বন্ধে জ্যাঠাইমার শেষ বক্তব্য হয়তো শরৎচন্দ্রের উক্তি এবং শরৎচন্দ্র চাইতেন যে এই উক্তি সকলের হোক। এই সাধু ইচ্ছার মানবিকতাকে আমরা যতই মর্যাদা দিই না কেন উপন্যাসের লক্ষ্য এখান থেকে অনেক দূরে নিবদ্ধ থাকা উচিত! রমার কথাই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক। রমা পল্লীসমাজের মেয়ে। সুতরাং পল্লীসমাজের যা কিছু জট তার মধ্যে থাকবে হয় এটা স্বাভাবিক, আর নয় পল্লীসমাজের জটগুলিকে সে চেনে, জানে সেই জটের মধ্যে সেও বন্দী, কিন্তু জটের গহন দুর্ভেদ্যতার সঙ্গে তার একটা দ্বন্দ্ব আছে এটা স্বাভাবিক। প্রথমোক্ত সম্ভাবনায় বিপদের ও ব্যর্থতার ঝুঁকি নেই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত সম্ভাবনাকে শিল্পে রূপায়িত করা দুরূহ প্রক্রিয়া। লক্ষণ মিলিয়ে শুধু জীবনকে চিনলেই হবে না, জীবনকে জানার ব্যাপারে যে গভীর মনন এবং অন্তর্দৃষ্টি অপরিহার্য সেটাই এ-প্রসঙ্গে আসল কথা। রমা কি পল্লীসমাজকে জানে? সেই সমাজ তার মনের মধ্যে কি কোনো দ্বন্দ্ব সৃজন করেছিল, না, সে শুধু সে-সমাজকে মানে। সে শুধু অভ্যস্ত জীবনের দাসী মাত্র। এ-অবস্থায় রমেশকে দেখামাত্রই যখন তার প্রেমের বোধে জোয়ার এল তখন থেকেই তার মনের মধ্যে শুরু হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার দ্বন্দ্ব। কী তার ব্যক্তিসত্তা, কোন্ বিশিষ্ট প্রশ্ন অঙ্কুরিত হচ্ছিল তার মনে এ-সবের কোনো পরিচয় নেই। এবং এইভাবেই সমাজের প্রভাবই বা কেন তার মনে বারে বারে সক্রিয় হচ্ছে—সে কি যে-কোনো ভাবে সমাজের

একটা মানে খুঁজে বার করেছে, এ-সব প্রশ্নেরও কোনো সদুত্তর নেই। কাজেই রমা যখন রমেশের বীরত্বে, সৎকার্যে সপ্রশংস নীরবতা পালন করে, রমেশের পল্লী উন্নয়নের প্রচেষ্টার খোঁজ খবর নেয় তখন সেটা হয়ে ওঠে প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র। তার মনোলোকে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না তার স্বরূপ, বুঝতে পারি না তার উৎস। জ্যাঠাইমা রমাকে কী আলোক দিয়েছেন? আশ্চর্য সেই আলোক, যে আলোক যিনি দিলেন এবং যাঁকে যাঁকে দিলেন কাউকেই আমরা চিনতে পারলাম না। কাজেই এ ভাবে যাঁকে দুরধিগম্য করে গড়ে তোলার জন্য শরৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা তার দুরধিগম্যতার প্রাসাদও এক নিমেষে ভেঙে পড়ল তারকেশ্বরের এক দিবসের রোমান্টিক প্রয়াণে। সেবায়-মমতায় রমা এই অংশে শরৎচন্দ্রের পাঠক-চিত্ত-তোষিণী শক্তির চমৎকার,বোধ হয় সর্বোত্তম প্রতিভু হিসাবে দেখা দিয়েছে। তারকেশ্বরের রমা যেন পল্লীসমাজের রমার কেউ নয়। হয়তো লেখকের ধারণা ছিল পল্লীসমাজের ছকের বাইরে চলে যেতে পারলে রমা-রমেশের সম্পর্কের সম্ভাবিত রূপের একটা চিত্রাঙ্কন এবং তার সহায্যে পল্লীসমাজের ফ্রেমের মধ্যে এদের অনিবার্য পরিণতির বিয়োগান্ত রূপকে স্ফুটতর করা যাবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এ-কৌশল খুবই জনপ্রিয় এবং সে হিসেবে লক্ষ্যভেদী হয়েছে। কিন্তু ছক জিনিসটা বস্তুতই লুডোর ছক নয়। একটা থেকে বেরিয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তারকেশ্বরের বাসা-বাড়িতে একটি রাত্রির সেবা-যত্নের স্মৃতি রমা এবং রমেশ উভয়কেই কোন্ অর্থে প্রভাবিত করল তার কোনো ইঙ্গিত উপন্যাসে উপস্থিত নেই। এ-যেন প্রেম প্রীতির ধর্মশালায় কিয়ৎক্ষণের জন্য আশ্রয় গ্রহণ। তারকেশ্বরের বাসাবাড়িতে রমার ব্যবহারে মনে হয় যে তার কাছে পল্লীসমাজ নামক ব্যাপারটি যেন কুঁয়াপুর গ্রামেরই নিজস্ব ব্যাপার। সেই গ্রামের বাইরে গ্রামের পাত্র-পাত্রীরা নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের ওপর আর সে পল্লীসমাজের প্রভাব থাকে না। অথচ রমার মনের মধ্যে যদি সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির জট দৃঢ়বদ্ধ না থাকে তাহলে বাইরের দিক থেকে বেণী ঘোষাল এবং তারিণীর মূল্য কতটুকু! আর তার সমাজসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বেরই বা করুণ অর্থগৌরব কোথায়? যদি এমন হয় যে রমা জানে যে সমাজপ্রদত্ত সংস্কারগুলির বাস্তবিক কোনো অর্থ নেই, অথচ সেই সমাজের মুখ তাকিয়েই তাকে মনে মনে রমেশের পক্ষাবলম্বন করতে হচ্ছে, এবং সামাজিকভাবে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে হচ্ছে তাহলে সে ক্ষেত্রে রমার

বেদনারই বা মূল্য কতটুকু, আর রমার ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যই বা কী, সেই কারণেই শেষ অধ্যায়ে রমার কাশীবাস বড়োজোর আমাদের করুণার্দ্র সহানুভূতিরই উদ্রেক করে, আর কিছু নয়। যাকে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা জটিল ও দুরধিগম্য বলেছেন, সেই জটিলতা এবং দুরধিগম্যতা শিল্প-সার্থক জটিলতা নয়, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের শক্তির অভাবজনিত জটিলতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। যে মুহূর্তে শরৎচন্দ্র বুঝেছেন যে এই উপন্যাসের আধারে বংশানুক্রমিক শত্রুতার ব্যাপারটিকে রমার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিজড়িত করা গেল না, সেই মুহূর্তেই পারিবারিক রেষারেষি হয়ে দাঁড়িয়েছে পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত সংকীর্ণতার সামগ্রী। অথচ রমাকে সেই সংকীর্ণতার শিকার হিসাবে ব্যবহার করলে রমা এবং রমেশের প্রেমের অংশকে উপন্যাসের পটে ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং মুহূর্তেই পারিবারিক রেষারেষির ব্যাপার গৌণ হয়ে গিয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়াল পল্লীসমাজ। অথচ বেণী ঘোষাল এবং তারিণীর মাধ্যমে প্রকাশিত পল্লীসমাজ একটা অনিবার্য অন্ধ শক্তিও নয়। মহাশক্তিশালী অন্ধ যন্ত্রের মহিমাও তার নেই। সেই যন্ত্রেরই ক্রীড়নক হয়ে রমা রমেশকে দেখা-না-পাওয়া মাত্রই আঘাত করছে এবং দেখা-পাওয়া-মাত্রই ভালবেসে বিগলিত হচ্ছে। এই দোলাচলবৃত্তি দ্বন্দ্ব নয়। একে বড়োজোর মতিস্থিরতার অভাব বলা যেতে পারে। সুতরাং এই উপন্যাসের পটে রমার প্রেমেরও যেমন কোনো ব্যক্তিসত্তাশ্রয়ী গভীর মূল নেই, রমার আঘাতেরও তেমনি কোনো প্রাচীন সংস্কার অনুগামী অনিবার্য ভূমিকা নেই। তাই তারকেশ্বরের বাসাবাড়ি এখানে প্রক্ষিপ্ত, আদালতে রমার সাক্ষ্যদান এখানে অযথা করুণ রসের উৎস।

অনুরূপ অসঙ্গতি এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় সাবিত্রী এবং কিরণময়ীর ক্ষেত্রেও। সতীশ এবং সাবিত্রীর মেসবাড়ির জীবন উপন্যাসের দুর্বলতম বনিয়াদ। সাবিত্রীর আত্মসংযমকে অমানুষিক বলে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে। এই মনে হওয়ার হেতু এই যে আমরা সাবিত্রীর অতীত জীবনটাকে জানি না। রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্র কখনই মানুষের গোটা জীবনের প্যাটার্নকে ধরতে চাননি বা ধরেননি। সেইজন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বহু কেন-র উত্তর নেই। এর ফলে শরৎচন্দ্র তাদের সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত রচনা করেছেন বটে কিন্তু নিখুঁতভাবে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কম। সাবিত্রী কেন অত চমৎকার কথা বলতে পারে অথবা কেন তার এই অমানুষিক সংযম

তা উপস্থাপিত করা হয়নি এবং প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। টাইপ এবং ইনডিভিডুয়ালের দ্বন্দ্বের ব্যাপার শরৎচন্দ্র কখনও অভিনিবেশের সঙ্গে ধরবার চেষ্টা করেননি। ফলে তাঁর বাঈজীরা কখনও বাঈজী নয়, তাঁর ঝিয়েরা কখনও ঝি নয়, তার দিদিরা কখনও দিদি নয়, কিন্তু সকলেই একটা অন্য কিছু হয়ে সার্থক হতে চায়। অর্থাৎ বৌদিরা হয় মায়ের মতো, জ্যাঠাইমা হলেন গুরুর মতো, মেসের ঝি হল আদর্শ প্রেমিকার মতো। এটা অসঙ্গতি বলে বিবেচিত হ'ত না যদি শরৎচন্দ্র চরিত্রের প্রতিষ্ঠা সাধনের জন্য সর্বাংশে সচেষ্ট থাকতেন। সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বের এমন কিছু প্রমাণ আমরা পেলাম না যার ফলে কলকাতার মেসবাড়ির সমস্ত আবহাওয়া মন্ত্র-শান্ত ভুজঙ্গের মতো সতীশ এবং সাবিত্রীর প্রেমের আকাশ রচনায় ব্যস্ত থাকবে। সাবিত্রীর চরিত্রকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে প্রমাণ করা হল না, শুধু অন্যদের তার সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাটা কী সেটাকেই ব্যবহার করা হল। অপরের মাধ্যমে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা উঁচুদরের সাহিত্য-কৌশল নয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী সতীত্ব ধর্মের মূল্য সম্বন্ধে এত সচেতন যে তাহারা প্রথম বয়সের পদস্খলনের জন্য আজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করিয়াছে।" মাত্র একটা অপরাধবোধের ওপরে শরৎচন্দ্রের প্রধান দুটি চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত এ-কথা বললে শরৎচন্দ্রের সীমিত কল্পনাকেই স্পষ্ট করে দেখানো হয়। বিশেষ করে এই অপরাধবোধের যখন কোনো গতিশীল ভূমিকা নেই, এগুলোর কাজ যখন শুধু চরিত্রগুলিকে স্থিতিধর্মী করে তোলা অর্থাৎ সর্বৈব ব্যক্তিত্বের নির্বাপণ, তখন উপন্যাস-শিল্পের বিষয় হিসাবে তারা কোনো গভীর মূল্যের অধিকারী থাকে না। সাবিত্রীর উপস্থাপনায় যে ত্রুটি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিরণময়ীর সমগ্র জীবনে তা উগ্রতর। কিরণময়ীর একটা অধ্যায়কেও যদি সত্য বলে ধরা যায় তাহলে তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ প্রস্তুতি প্রয়োজন। অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে স্থূল প্রেমলীলায় যাকে মনে হয় ইতরশ্রেণীর রমণী, দিবাকরের সঙ্গে তর্কে তাকে মনে হল মননশীল বৈদগ্ধ্যের আশ্চর্য অধিকারিণী। কিরণময়ীর সমস্ত আচরণগুলি যেন এয়ার-টাইট কম্পার্টমেণ্টে বিভক্ত। তার ফল হয়েছে এই যে কিরণময়ীর শেষ পরিণতির শোচনীয়তা আমাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। কেননা যে নারী ইতর তার জন্য আমাদের কোনো দুঃখ নেই। আবার যে নারী মননশীলা, তার এবম্বিধ আচরণের কোনো মূল্য খুঁজে পাই

না। শুধু অভূতপূর্ব বলিষ্ঠ প্রেম ঘোষণার জন্য কিরণময়ীকে যদি তেজস্বিনী বলে ভেবে নিই তাহলে কিরণময়ীর ব্যর্থ পরিণামের একটা ট্র্যাজিক অর্থগৌরব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে ঘোষণাও আদ্যন্ত সমর্থনহীন। শুধুমাত্র "অনেক রহস্যই অমীমাংসিত থাকে" এই বলে কিরণময়ীকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

'নিষিদ্ধ প্রেমের" বিষয়-সংবলিত উপন্যাস হিসাবে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। অচলার সমস্যা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয় হবার উপযুক্ত। সুরেশ এবং অচলার সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ায় একটি যথার্থ প্রশ্নেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। অচলার যন্ত্রণাকে শরৎচন্দ্র রূপদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-উপন্যাসের প্রধান সম্বল। অচলার অনুশোচনার আগুনে তার সমস্ত ক্ষণিক বিভ্রান্তি পুড়ে গেছে—পাঠক তার সতীত্বকে দৈহিক বলে মনে না করে, মানসিক বলে গ্রহণ করে। সুতরাং এই উপন্যাসটিকে আমরা নিষিদ্ধ প্রেমকে অবলম্বন করে লেখা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উপন্যাসের পাশে রেখে তুলনা করে দেখতে পারি। তাতে গৃহদাহের প্রকৃত মর্যাদার হানি হবে না। পক্ষান্তরে এ-জাতীয় উপন্যাসের একটা মান খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা বিষয় পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এ-জাতীয় সমস্যাকে যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন লেখকেরা সাধারণত সমস্যার একটা সমগ্র রূপ উপস্থিত করেছেন। নায়িকারা শুধুই পত্নী নন, জননীও বটে। অর্থাৎ একটা নারী-জীবনের সম্ভাব্য দুটো বাঁধনই সে-ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপার এই জীবন-বিন্যাসের ওপরে যে প্রতিক্রিয়া সৃজন করে তা আরো গভীর এবং অর্থবান। আমাদের সাহিত্যে নারীকে আমরা এমতাবস্থায় মাত্র পত্নী হিসাবে উপস্থিত করেছি। ফলে সতীত্বের বদ্ধ সংস্কার ছাড়া আর কোনো দৃঢ়মূলে নিষিদ্ধ সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের আঘাত এসে পড়ে না। এর একটা গভীর অসুবিধা আছে। সাধারণত এই ধরনের উপন্যাসে দেখা যায় যে স্বামীর জীবনযাত্রার কৃত্রিমতা বা ব্যক্তিত্বের যান্ত্রিকতার ফলে পত্নীর জীবনে একটা প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। পত্নীর মনে সেই ছকের কোনো প্রতিষ্ঠা না থাকায় যে প্রেমাখ্যানের শুরু তার যন্ত্রণা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার তর তম বিচার স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব। সে-ক্ষেত্রে কারেনিনকে অথবা মঁশিয়ে বোভারিকে আমরা বলতে পারি ক্ষীণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আনা অথবা এমার মনে স্বামীদের বিচার করার অবকাশ বর্তমান। কিন্তু এই বিচারে অক্ষম নারী সদাই যেখানে অচ্ছেদ্য

সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা, সেটা হল সন্তানের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই নারীর সবকিছুকে যাচাই করে দেখা সম্ভব। তা নইলে শুধু দৈহিক শুচিতাবোধের মূল্য কতটুকু? আর একজনের দাম্পত্য-নীতিবোধের অটলতাই বা কতটা গভীর প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারে? কিরণময়ীর পাশে সুরবালা অথবা অচলার পাশে মৃণাল এই প্রসঙ্গে মাত্র সামাজিক নীতির ব্যক্তিগত প্রতীক।

এবং এই সমগ্রতার অভাবেই অচলার দোলাচলবৃত্তি নিরর্থক। কেননা প্রথম থেকেই লেখক যেন বড়ো সতর্ক এই কথাটি বোঝানোর জন্য যে সুরেশ একান্তই মুহূর্তমায়া সৃজন করেছিল। তা যদি হয়, অচলার মনের মধ্যে যদি সুরেশ বদ্ধমূল না হয় তবে শুধু দৈহিক শুচিতাবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে যতটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব ততটা অবশ্য শরৎচন্দ্র এগিয়েছেন। কিন্তু "নিষিদ্ধ প্রেমের" বিষয় তো শুধু দৈহিক শুচিতাবোধের প্রশ্ন নয়। এর মূল ব্যক্তিস্বরূপের নিভৃত মৃত্তিকায়। ব্যক্তিত্বের গভীরে এর ক্ষেত্র। এবং সেখান থেকে উৎসারিত না হলে এ-সমস্যা কখনো জ্বলন্ত হতে পারে না। সুরেশ এবং অচলার সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনো রকম প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই উপন্যাস আরম্ভ হবার কয়েক পাতার মধ্যেই সুরেশ এবং অচলার ব্যবহারে আতিশয্য সৃজন এই কারণেই শিল্পসম্মত হয়নি। প্রথম থেকেই অচলা সুরেশ সম্পর্কে "ব্যাধভীত হরিণী এবং সুরেশ যেন তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়"। সুরেশ তার আগের দিন পর্যন্ত ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বিমুখ। এবং সে অচলার সঙ্গে কথাবার্তায় দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। সে হঠাৎ এক লহমায় ব্রাহ্মবাড়িতে অচলা হাতে করে দিলে খেতে রাজী হল। এ শিল্প-সঙ্গতি রক্ষার কোনো নিয়মকেই পালন করে নি। শরৎচন্দ্র সুরেশকে দিয়ে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করিয়েছেন এইভাবে যে "একদিনের ভূমিকম্পে অর্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে"। কিন্তু সুরেশের ব্যাখ্যা ছাড়াও উপন্যাসে একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করেই সেই ব্যাখ্যা আমাদের প্রত্যয়কে গড়ে তোলে। শরৎচন্দ্র জীবনের আকস্মিকতাকে শিল্পে আনতে গিয়ে শিল্পের ন্যায়কে লঙ্ঘন করেছেন। ফলে এক রাত্রির অনিদ্রাতেই ঘটনাটা যা দাঁড়াল তা এই:

> একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্যন্ত স্নানাহার নাই—গত রাত্রে এতটুকু ঘুমাইতে পারে নাই—তাহার পায়ের নিচের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে

তাদের অনেক, অনেক উপরে—তাহার উন্মাদ ভঙ্গিতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোনোমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল—বেহারাটা—

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চকণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে অমনি তীব্র স্বরে কহিতে লাগিল, দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা, দিন, ঘণ্টা, মিনিট দিয়েমহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থান কালের অতীত! তুমি ভূমিকম্প দেখেছ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—

এবং এর পরেই সুরেশ কর্তৃক অচলাকে আলিঙ্গন। শরৎচন্দ্র নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে এ অতিশয় দুর্বল অংশ। কাজেই সুরেশকে উন্মাদ বিশেষণে ভূষিত করে শেষ পর্যন্ত সে উন্মত্ততার কারণ ব্যাখ্যায় চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুরেশের আতিশয্যের হেতু হিসাবে তিনি শেষরক্ষার জন্য দেখিয়েছেন গ্রীষ্মাধিক্য, অধিক বেলা পর্যন্ত স্নান এবং আহারের অভাব ও পূর্ব রাত্রের অনিদ্রা। অতএব সুরেশের আকস্মিক আতিশয্য কিছুটা সর্দিগর্মির ব্যাপারের মতো পূর্বাভাসরহিত। এই সুরেশকে অচলা ভালবেসেছিল। কিন্তু সে বিয়ে করেছিল মহিমকে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় গৃহদাহ প্রসঙ্গে বলেছেন যে মহৎ চিত্তে অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া গৃহদাহের মূল বিষয়। শুধু অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রতিক্রিয়া বললে আমরা অবশ্যই ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু মহৎ চিত্ত কথাটিতে আমাদের বড়ো আপত্তি। অচলা এবং সুরেশের সাহায্যে বরং আমরা এই সিদ্ধান্তে সহজে আসতেপারি যে দুর্বল চরিত্র ব্যক্তিদের পাপানুশোচনার চিত্র গৃহদাহ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

শুধু যদি শরৎচন্দ্র এই কথাটি মনে রাখতেন, অযথা বর্ণারোপের ভাবালুতার প্রশ্রয় না দিতেন তবে গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের তো বটেই বাংলা সাহিত্যেও একটা অসামান্য কীর্তিস্তম্ভ বলে পরিগণিত হত। অযথা বর্ণারোপের মূলে রয়েছে উপন্যাসের কাঠামোর অসঙ্গতি, এবং সেই অসঙ্গতির মূলে রয়েছে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অস্পষ্ট ধারণা। যে দোলাচলবৃত্তির কথা অচলা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে তাকে উপন্যাসে প্রমাণিত হবার কোনো সুযোগ শরৎচন্দ্র দেননি। সুরেশ সম্বন্ধে অচলার আগ্রহ কতটা এটা প্রতিপন্ন করতে গেলে সুরেশ-বিরহিত পরিবেশ অচলার পক্ষে এ-উপন্যাসে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। উপন্যাসের প্রথমাংশে অচলাকে কটূক্তি করার পর সুরেশের বিদায় ও ইত্যবসরে মহিমের ও

অচলার বিবাহে সে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সুরেশকে মহৎ প্রতিপন্ন করার জন্য ফয়জাবাদের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ডে সুরেশের ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণের কাহিনী সৃজন ও সে-কথা সংবাদপত্রে পাঠ করার পর অচলার শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টির সম্মুখে অকস্মাৎ সুরেশের অবির্ভাবে সে সুযোগ নষ্ট হল। এদিকে মহিমের জন্যও অচলাকে কোথাও অপেক্ষা করতে হল না। অচলার পাশে পাশে সুরেশের সতত উপস্থিতির ফলে সুরেশ অচলাকে অভিভূত করতে সক্ষম সেটা বোঝা গেল। বোঝা গেল না সুরেশ কতখানি অচলার সত্তার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অচলার পক্ষে এটা যদি শুধু অন্ধ আবেগ হয় তা হলে আর সুরেশের জন্য ফয়জাবাদের মহত্ত্ব রচনার দরকার হয় না। যদি এটা অচলার প্রেম হয় তাহলে বিস্তৃততর এবং গভীরতর পরীক্ষায় তাকে স্থাপন করা দরকার। অচলা জীবনধর্মের কোন্ বৃহত্তর আবেগে সুরেশকে ভালবাসল তা এ-উপন্যাসে কোথাও স্পষ্ট নয়। সুতরাং মহিমের সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা-বোধের স্বরূপ কী এবং সুরেশ সম্বন্ধে তার আকর্ষণবোধের অর্থ কী এ-সম্বন্ধে কোন ধারণা অচলার নেই, অচলার স্রষ্টারও নেই। অস্থিরমতি ব্যক্তির সর্ববিধ দৌর্বল্যে অচলা চিহ্নিত। কাজেই সুরেশের ক্ষেত্রেও সুরেশের কেউ নেই এই নিঃসহায় অবস্থার সাহায্যে তার প্রতি অচলার এবং পাঠকের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা শরৎচন্দ্রের মৌল অসঙ্গতিরই ফল।

এই সমস্ত অসঙ্গতির ফলে বোঝা গেল না কেন অচলা সুরেশকে দীর্ঘ রেলযাত্রায় তাদের সঙ্গী হতে বলেছিল। কাজেই অচলা যখন সুরেশের পা জড়িয়ে ধরে মহিমের জন্য ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে "কোথায় তিনি? তাকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছ? রোগা মানুষকে খুন করে তোমার—" তখন অচলার উচ্ছ্বাসময় উক্তিতে পীড়া অনুভব না করে উপায় থাকে না। বিশেষ করে রোগা মানুষকে খুন করা প্রসঙ্গটি হাস্যকরও বটে। যেন অচলার মহিমের প্রতি সহানুভূতি শুধু মহিম রুগ্ন বলেই। শরৎচন্দ্র অবশ্য এই উক্তির সাহায্যে মহিমের প্রতি অচলার আকর্ষণের বোধে যে কোনো খাদ নেই সেটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু যখন মহিম রোগা হলেই মহিমের প্রতি সহানুভূতি বাড়ে এবং সুরেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেই সুরেশের কাছে থেকে যেতে হয়, তখন বড়োজোর সে চরিত্রকে আমরা বলতে পারি সেবা-ধর্মে উৎসর্জিত প্রাণ। উক্ত দুই ক্ষেত্রেই অসুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতিকে, নারীর স্বাভাবিক জীবনাচরণ-বিধিকে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন প্রেমানুভূতির প্রকাশ-মাধ্যমরূপে। এই

অতিব্যবহৃত শরৎচন্দ্রীয় ছক অন্তত এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতার জন্যই অভ্যস্ত কৃত্রিম কৌশলে অচলার দোলাচলবৃত্তিকে শরৎচন্দ্র রূপায়িত করতে গেছেন। জরে অচেতন সুরেশকে মৃত বলে মনে করে অচলার যে ভাবনা তাও এই কারণে অচলার পক্ষে যথার্থ হয়নি। সুরেশের জন্য তখন অচলার যে চিন্তা তার মূল সূত্র এ-উপন্যাসে কোথাও লেখক স্পষ্ট করে তোলেননি। সেখানে অচলার ভাবনার মূল বক্তব্য এই যে "যে তাহারই জন্য এত বড়ো দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া, হতাশ্বাসে এমন করিয়া, এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জনা করিতে পারে না এতবড়ো কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে।" এখানেও অচলার সহানুভূতিই প্রধান কথা। এই শুধু এখানে বোঝা গেল যে সেই অল্পসংখ্যক কঠিন হৃদয়ের মধ্যে অচলা পড়ে না। এ রোহিণী বা বিনোদিনীর জীবন-পিপাসা নয়, আনা কারেনিনা বা মাদাম বোভারির প্রচলিত ছকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও নয়, এ বাস্তবিকপক্ষে একটি দুর্বল নারীর অপরাধচেতনার গল্প—যে নারী লৌকিক সম্ভ্রমের অনুরোধে যার সম্বন্ধে তার বিতৃষ্ণার পাত্র পূর্ণ হয়েছে অনিচ্ছায় তারই শয্যা-সঙ্গিনী হয়। সুতরাং অচলার ভুল এবং ভুল সংশোধনের জন্য অনুতাপ এই দুয়েরই কোনো নৈতিক ভিত্তিভূমি নেই।

সুতরাং সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন প্রেমের ব্যবহার শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ঘন ঘন ঘটলেও, সেগুলির তাৎপর্য অধিক নয়। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রকে তিনি এমন সব মোটা দাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন যেখানে বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যান্ত্রিক। সেই যান্ত্রিকতাকে পরিহার করার জন্য পাঠকদের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার আয়োজনেই শরৎচন্দ্রের ষোলো আনা চেষ্টা নিয়োজিত। মহৎ ঔপন্যাসিকেরাও পাঠকদের কাছ থেকে তাঁদের সৃষ্টি চরিত্রাবলীর জন্য সহানুভূতি প্রত্যাশা করে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এবং শরৎচন্দ্রের ছায়ানুসারী চল্লিশ-পঞ্চাশের বাঙালী ঔপন্যাসিকের তফাত এইখানে যে মহৎ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রদের সাহায্যে যেটা করে থাকেন, শরৎচন্দ্র এবং তার অনুসারীরা সেটা করতে চান পাত্র-পাত্রীদের জীবনের কতকগুলো অবস্থার সাহায্যে। আমাদের সহানুভূতিটা জাগ্রত হয় চরিত্রদের জীবনের কতকগুলি পরিস্থিতি প্রসঙ্গে। দেবদাসের যক্ষ্মা, সুরেশের নিউমোনিয়া—এবম্বিধ হাজার রকমের পরিস্থিতি (জ্ঞানদার মুখে

সিঁদুর মেখে বসাও এই পর্যায়ে পড়ে) সৃষ্টি করে পাঠকদের চোখের অশ্রুবাহী শিরার ওপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে শরৎচন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গত দুই দশকের ঔপন্যাসিকদের তফাত এইখানে যে এ-প্রসঙ্গে অন্তত শরৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা ছিল খাঁটি এবং আন্তরিক। এ-যুগের শরৎ-ছায়ানুসারীরা সে-ক্ষেত্রেও কেমন কৃত্রিম, বর্তমান গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সে-কথা আলোচনা করা যাবে।

উপন্যাসের অন্বিষ্ট যে সমগ্র জীবনবোধ সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ধারণার ব্যত্যয় নানা ভাবে তাঁর উপন্যাসের শিল্পকর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত পরিস্থিতি-প্রিয় মনোভাবের উত্তম অভিব্যক্তি তাঁর সমাজ আবিষ্কারের চেষ্টাতেও প্রতিফলিত। মাত্র আন্তরিকতা বা শুভেচ্ছা যে ঔপন্যাসিকের প্রধান সম্বল হতে পারে না এটা তারই প্রমাণ। এখন আমরা শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ চেতনার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রয়াস পাব।

চার

আংশিকতাই একজন ঔপন্যাসিকের প্রধান ক্রটি। যে পটবিধৃত জীবন সার্থক উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্ত সেই পট অথবা বিধৃত জীবনে আংশিকতা সমস্ত শিল্পকর্মকে নষ্ট করে। শরৎচন্দ্র কেমনভাবে এই পটবিধৃত জীবনকে শিল্পে ব্যবহার করেছেন তার ভিতরেই প্রকাশিত তাঁর মানসোৎকর্ষ। উপন্যাসের বিচারে সেই মানসোৎকর্ষের বিচার হয়। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজবোধের পূর্ণ চেহারা নানাভাবে নানা উপন্যাসে উপস্থিত থাকলেও প্রধানত পল্লীসমাজ, পণ্ডিত মশাই ও অরক্ষণীয়ায় ব্যবহৃত সমাজচিত্র শরৎচন্দ্রের খ্যাতির কারণ। আমাদের আলোচনা পল্লীসমাজে-ব্যবহৃত সমাজচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। গ্রাম্যসমাজকে ব্যবহার বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। স্বর্ণলতার গ্রামকেন্দ্রিক পারিবারিক উপন্যাসে, রমেশ দত্তের সমাজ ও সংসারের চিত্রে গ্রামের ব্যবহার আমরা দেখেছি। কিন্তু গোটা দেশীয় জীবনের অংশ হিসাবে গ্রাম্যজীবনের উপস্থাপনা এবং তাকে শিল্পসূত্রে গেঁথে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো লেখকের হাতে ঘটেনি। গল্পগুচ্ছের অসংখ্য গল্প এবং গোরা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রাম্যসমাজের সমুদয় অবস্থার উপলব্ধি যে ভাবে হয়েছিল তার তাৎপর্য শরৎচন্দ্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ-কথা সকলেরই জানা আছে যে স্বদেশী যুগে স্বদেশী সমাজ-

বিষয়ক নানা চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের সমাজের পঙ্গু অবস্থা কেমন করে আবার নব স্বাস্থ্যের সঞ্চারে পরিপূর্ণ হবে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে ভেবেছেন। আমাদের গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধে চার্লস মেটকাফের মূল্যায়নের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারও কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রনিরপেক্ষতা যে আমাদের প্রাচীন সমাজের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির একটা দিক এবং নিজের ভিতর থেকেই আয়ু সঞ্চয় করে বেঁচে থাকবার একটা অদম্য ক্ষমতা প্রাচীন গ্রাম্য-সমাজের ছিল এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। "রাজলক্ষ্মী" নয় "সমাজ-লক্ষ্মী"ই ছিলেন আমাদের উপাসনার লক্ষ্য। সমাজের সেই হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার সঙ্গে মতানৈক্যের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু কার্য-কারণ সূত্রকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্যার গোটা রূপকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস এ-কথার মহৎ সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন এক রাষ্ট্রশক্তির বৈশ্য-শকট-চক্রের তাড়নায় অনিবার্যভাবে আমাদের প্রাচীন গ্রামসমাজ হয়েছে পরাভবমুখী। রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে যা আকৃষ্ট করে তা হল অনাত্মীয় রাষ্ট্রশক্তির সামনে প্রাচীন গ্রাম-জীবনের প্রতি মুহূর্তের পরাভব, লাঞ্ছনা এবং যন্ত্রণা। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের মেথর যখন ব্রাহ্মণ হরকুমারকে কান ধরে ঘোড়দৌড় করালো, সেই ঘটনার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতি-ভেদ-কণ্টকিত গ্রামে ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মণের প্রতাপের পরাভব অপেক্ষা অধিক গভীর বলে মনে হয়েছে। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে অপমানিত নায়েবের সমস্তটাই নায়েব, সামান্যাংশে মাত্র সে ব্রাহ্মণ। কাজেই ব্রাহ্মণের প্রেস্টিজকে ওপরওয়ালা অফিসার যখন ধূল্যব-লুণ্ঠিত করে তখন সামান্যাংশের ব্রাহ্মণের ক্ষোভ অচিরেই নায়েবাংশের কাছে পরাভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে গ্রামীণ জীবনের করুণ বিড়ম্বনা ঐখানে। এ নয় শুধু নিমন্ত্রণ বাড়ির দলাদলি অথবা চণ্ডীমণ্ডপী ঘোঁট অথবা শুধুই অকারণ মূঢ়তা। একটা একদা শক্তিশালী অতিকায় সত্তাকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি কেমন করে মেরে ফেলেনি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তৃণমুষ্টি ভক্ষণ করিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে জীবন্তে অর্ধমৃত—তারই যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। সেজন্য শুধু পাড়াগেঁয়ে নীচতা ও সংকীর্ণতাকে তিনি চিত্রণের বিষয় করেননি। পল্লীসমাজের পরিবেশ বলতে কেবল পল্লীর ভূমি-নির্ভর পর-শ্রমজীবীদের কথাই তিনি ভাবেননি। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বিশ্লিষ্ট গ্রাম্য-

সমাজের শোচনীয় দীর্ণতাকে। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে আমরা সমস্যার অতি সীমিত রূপ প্রত্যক্ষ করি। সমস্যাটা যে শুধু লোকগুলির ভালো-মন্দ হবার সমস্যা নয়, এবং কেউ ভালো হয়ে গেলেই যে সমস্যার মীমাংসা হয় না—সে কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজ-জীবনে—শরৎচন্দ্র তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। কী সেই তৎকালীন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো যার অনিবার্য পরিণতিতে প্রাচীন গ্রাম্যসমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পরস্পর সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয়েছে, শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা তোলেননি। তিনি দেখেননি যে সমস্যার একটা সামগ্রিক স্বরূপ না উপলব্ধি করলে সমস্যার লঘুকরণের দিকে প্রবণতা সহজে আসে। ইংরাজ আগমনের পর ভূমিজীবী গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সঙ্গে যখন গ্রামের কৃষক, কামার, ছুতোর, মুচি, মেথরের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক-সূত্র শিথিল হয়ে গেল তখন শুধু বর্ণাশ্রম পরিচালিত সমাজের দুর্দশা শুরু হল না, সেটাই হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত পক্ষে জাতীয় দুর্গতি। কলকাতামুখী মধ্যবিত্তের চেহারা রমেশ দত্ত সামাজিক উপন্যাসে অচেতনভাবে যথার্থ অঙ্কন করেছেন—'গ্রামে থাকিলে উন্নতি নাই।' তাই মধ্যবিত্তের যে অংশ কলকাতায় লেখাপড়া শিখতে গেল তাদেরই আত্মীয়স্বজনেরা সমাজ রক্ষার্থে অভিভাবক হলেন। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের ভূমি-ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামীণ সাধারণের মধ্যে যে ফাটল সৃষ্ট হল সেই দুরতিক্রম্য ফাটলের একদিকে রইলেন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ভূস্বামী, পুরোহিত, মোল্লা আর অপর দিকে রইল গ্রামের প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনের প্যাটার্নের ভগ্নাবশেষকে বুকে নিয়ে কৃষক, কামার, ছুতোর, নাপিতেরা এবং প্রভৃতিরা। রবীন্দ্রনাথ সব সময় এই ফাটলকে দেখাতে চাইতেন, যন্ত্রণার মূল নির্ণয় করতে চাইতেন এখানে। গোরা উপন্যাসে চরঘোষপুরের উৎসন্ন গ্রাম্যসমাজের স্বরূপ তিনি সে কারণে বৃহৎ উপকরণ ব্যতীত প্রস্ফুট করতে পেরেছেন। বড়ো কথা এটা নয় যে গোরা বা গোরার সঙ্গী রমাপতি নাপিতের ঘরে জল খেতে সম্মত হয়নি। শুধু এই সূত্রটুকু অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ জাতিভেদের নিদারুণ কুফল সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে চাননি। তিনি দেখিয়েছেন নাপিতও গোরাকে পানীয় জল দিতে ইচ্ছুক ছিল না। এই ব্যাপারটা একটা বহু কালাগত জীবনাচরণ-বিধি। সমস্যাটা এখানে নয়। রবীন্দ্রনাথ সমস্যাটাকে দেখিয়েছেন তার একটু পরেই। যেখানে নায়েব মাধব চাটুজ্যের ঘরে বিশ্রম্ভালাপরত দারোগাকে তিনি উপস্থিত করেছেন। নীলের হাঙ্গামায় পুলিশ অবশ্যম্ভাবীরূপেই জমিদারের রক্ষক

হিসাবেই আবির্ভূত হবে। নায়েবের ঘরে দারোগা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দারোয়ানের মতো অপরিহার্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মাত্র এইটুকু বলে সমস্থাহত জীবনের রূপনির্ণয়কে পরিহার করেননি। ভালো নায়েব আছে, ভালো জমিদারও আছে, ভালো দারোগাও আছে। প্রশ্নটা কারুর ভালো হয়ে যাওয়া বা মন্দ হয়ে যাওয়ার নয়। এই পরিচ্ছেদের পরে রবীন্দ্রনাথ গোরার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলো সাহেবের সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। ব্রাউনলো সাহেব গোরা অপেক্ষা স্বভাবতই শাসনযন্ত্রের দারোগা নামক সেই ছোট বল্টুটিকে বেশি বিশ্বাস করেন। দারোগার কাছ থেকে তিনি গ্রামের যে চিত্র সংগ্রহ করেছেন তারই ফলে সাতচল্লিশজনকে পুলিসের কর্তব্য-কর্মে বাধা দেওয়ার জন্য, দাঙ্গা মারপিটের জন্য হাজতে যেতে হল। কিন্তু এটুকুও যে-কোনো সাধারণ ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে হতে পারত শুধুই বিদেশী রাজার পুলিসী দাপটের কাহিনী। কিন্তু ব্রাউনলো সাহেব, দারোগা ও নায়েবের অক্টোপাশে বন্দী গ্রামের মানুষের যে ছবি লেখক ইতিমধ্যে অপূর্বভাবে শিল্প-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন তা অবিস্মরণীয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের বীর্যবত্তার প্রতীক হিসেবে একদিকে যেমন ফরু সর্দার অপর দিকে তেমনি সেই নাপিত। সেই নাপিতের লৌকিক জীবনবোধের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ফরু সর্দার নীলকুঠির সাহেবকে আঘাত করার পর জেলে চলে গেলে সারা গ্রামে যখন পুলিসের অত্যাচার নেবে এল সেই সময় নিরাশ্রয় মাতৃহীন ফরুর সন্তান তমিজকে নাপিত এবং তার বৃদ্ধ পত্নী আশ্রয় দেয়। গোরা এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় নাপিত জবাব দিয়েছিল যে "হিন্দুর হরি ও মুসলমানের আল্লায় কোনো তফাত নেই"। যে প্রাণময়ী শক্তি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার লোকজীবনকে লালন করে আসছে ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও আমাদের লোকধর্ম ও লোকসাহিত্যে, এবং লোকজীবনের ধর্মসাধকদের সাধনায় সেই শক্তির উৎস সন্ধান করেছিলেন। যে অন্তরময় ঐক্যসূত্রে একদা গ্রাম্য জীবনকে ভিতরের দিক থেকে আশ্লিষ্ট করে রেখেছিল সেই লোক-জীবন-গত প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি এবং ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা এবং নায়েবের সমস্ত কুঠারাঘাত গিয়ে পড়েছে সেই জীর্ণ বনস্পতির শিথিল মূলে। তখন গোরার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা আমাদের কাছে আর নির্বস্তুক নয়, সে যন্ত্রণাকে আমরা যেন হাতে করে অনুভব করতে পারি। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐতিহ্যের সচেতন নবমূল্যায়ন মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। চরঘোষপুরের

উৎসন্ন গ্রাম্যসমাজকে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রসঙ্গসূত্রে নিবিড়ভাবে বিধৃত আঁচড়ে এমন এক মূল্যে মূল্যবান করে তুলেছেন যে সেই মূল্যে আমরা তখন স্বদেশের গ্রাম্যসমাজের একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নকেই লাভ করি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেতনা কতখানি ব্যাপক ও গভীর ছিল আত্মশক্তি গ্রন্থের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে তার প্রমাণ পাই :

> এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন-কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না ; আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে ; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে ; আমি যদি শক্তি অর্জন না করি অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে ; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য নিয়ম।

প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে কৃষিকে আশ্রয় করেই টিঁকেছিল এবং শেষ সম্বল কৃষির পুনঃসংস্কারের ভেতর দিয়েই যে বিদেশী গভর্ণমেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে গ্রাম্যসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে রবীন্দ্রনাথ এটা বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো জানতেন যে নবোদিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের বৃহৎ অংশের মূঢ়তা-জনিত ব্যবধানের অভিশাপ গ্রাম এবং শহর প্রভেদ করে চলে না। কলকাতায় গোরার বন্ধু অসীম স্বাস্থ্যবান পঞ্চু কেবল তখনকার ছুতোরের ঘরের অসীম মূঢ়তার জন্য মরে। একই উৎস-নিঃসৃত অভিশাপের বারি পানে সারা দেশটার পঙ্গু অবস্থাকে বুঝতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চুর মৃত্যু তারই নিদর্শন।

সে-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কদাচ সমস্যার সমগ্র রূপকে ধরতে চেয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম ত্রুটি এই যে পল্লীসমাজের সমস্যাটা যেন কতকগুলো রীতি-নীতি, আচার-আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কতকগুলো কুপ্রথার সমষ্টিতেই যেন সমস্যার রূপ নির্ণয় হয়ে গেল। ফলে উদ্ভূত হয়েছে তাঁর এ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় ত্রুটি—কতকগুলি ব্যক্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বলে দিয়েছেন যে এরাই হল সংকীর্ণতার আধার, সমস্যার উৎস। আমরা আগেই বলেছি যে

এ-অবস্থায় সমস্যার সরলীকরণ হয়, উপন্যাসের উপযুক্ত সামগ্রিকতা থেকে বঞ্চিত হয় উপন্যাস। বেণী অথবা তারিণী যদি সমস্যার পূর্ণ রূপ হয় তা হলে রমা এবং রমেশের নিজেদের দ্বন্দ্ব এবং যন্ত্রণার ঘনীভূত তীব্রতা হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। শরৎচন্দ্র তাই করেছেন। অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মোটেই প্রতিনিধি-স্থানীয় নয়, এমন অংশকে সমগ্রের প্রতিভূ বলে মনে করেছেন।) অন্য ক্ষেত্রে—যথা পণ্ডিতমশাই উপন্যাসে চরণের মৃত্যুর পূর্বে গ্রামের মহামারী উপলক্ষে অসামান্য গ্রাম্য মূঢ়তার সম্মুখবর্তী নায়কের অবস্থাকে, পূর্বোক্ত কারণেই, মনে হয় একটা সৎ লোকের দুর্গতি মাত্র। এবং এই ভাবেই, এই আংশিকতার জন্যই, এই সমস্যাগত অস্পষ্টতার কারণেই বোঝা গেল না বিশ্বেশ্বরীর বেদনার উৎস কোথায়; বোঝা গেল না চিরপ্রবাসী রমেশ কী করে গ্রামে এসেই সমস্যাজীর্ণ গ্রামবাসীকে ভালবেসে ফেলল। কিংবা সমস্যা বলতে সে কী বুঝল? তাই এও বোঝা গেল না যে হঠাৎ কারান্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ মন্ত্রবলে রমেশ দেখল পল্লীসমাজ এবার আদর্শ সমাজের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। সমস্যার সরলীকরণের জন্য সমাধানও অত্যন্ত সরল পথে এসেছে। তার ফলে চরিত্রগুলি কোনো দৃঢ় বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। তারাও থেকে গেছে লেখকের ভাবাবেগ সৃষ্টির উপায়ক্রম। রমা কেন রমেশের বিদ্যোৎসাহিতায় অথবা শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে সুখী হয় তা বোঝা মুশ্‌কিল। এ যদি শুধু প্রেমিকের কীর্তিতে প্রচ্ছন্ন আনন্দোপভোগ হয় তা হলে তারও একটা সঠিক প্রস্তুতিভূমি প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র সেই প্রস্তুতিভূমি রচনা ব্যতিরেকেই রমার দোদুল্যমানতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আংশিকতার প্রধান দোষ আকস্মিকতা। তাই রমা এবং রমেশের প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই রমা রমেশ সম্বন্ধে দুর্বোধ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। গ্রামের সমাজপতিদের সপক্ষে, পিতৃশত্রুর পুত্রের বিপক্ষে তার উচ্চকিত ঘোষণাও যেমন আকস্মিক, আবার রমেশকে দেখে বিচলিত হওয়াও তেমনি আকস্মিক। সুতরাং এই রমা এবং এই রমেশ, যাদের কাছে নিজেদের রূপ পরিষ্কার নয়, তারা পল্লীসমাজের স্বরূপ আবিষ্কারে কতখানি সক্ষম হতে পারে? তাই শরৎচন্দ্রের সামাজিক রীতি-নীতি সংক্রান্ত উপন্যাস কতকগুলি সংকীর্ণচেতা মানুষের সঙ্গে দুটি একটি আদর্শীভূত মানুষের সংঘর্ষের গল্প মাত্র। পল্লী অঞ্চলে অরক্ষণীয়া কন্যার সমস্যা তাঁর কাছে শুধুই একটা শুভবুদ্ধির, অথবা তার অভাবের সমস্যা। এ-সমস্যার সরলীকৃত রূপ সৃজনের জন্য কন্যার পিতৃমাতৃবিয়োগের মর্মান্তিকতা যেমন

লক্ষ্যহীন, তেমনি অর্থহীন কারো একজনের শুভবুদ্ধির শুভলগ্নে শ্মশানকেও আনন্দাশ্রুতে ভাসানোর আয়োজন।

আংশিকতা থেকে আকস্মিকতা, এবং আকস্মিকতা থেকে আতিশয্য—এই হল শরৎচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসের অপরিহার্য ছক। এই ভাবেই সামাজিক সমস্যার কাটা-কাটা অংশগুলিকে তিনি শুধু ওপর থেকে দেখে জুড়ে দিতে চান। এই ভাবেই বোঝেন না (যেমন একজন তরুণ তীক্ষ্ণধী সমালোচক বলেছেন) যে রমা এবং বেণীর আর্থিক-বৈষয়িক সম্বন্ধ সূত্রটির বাস্তবতা কতখানি; বোঝেন না যে রমার দ্বন্দ্বকে যদি অন্তত বেণীর কূটবুদ্ধিতে ধৃত শিকারের অন্তর্জালা করে গড়ে তুলতেন শরৎচন্দ্র তাহলেও একটা তাৎপর্য সৃজিত হত। অথচ বেণীর দীর্ঘ পরিচয়ে বেণীর বুদ্ধিকে রমা কোনো দিন প্রশ্ন করেনি। সম্ভবত মেয়েমানুষ—বিশেষ সুন্দরী তরুণী—বৈষয়িক বুদ্ধির ক্ষেত্রে অতখানি তীক্ষ্ণতা দেখালে তার সরল পবিত্রতা থেকে বিচ্যুত হয়, এই ছিল শরৎচন্দ্রের ধারণা। কিন্তু তাহলে আবার বেণী যে কেন এই সরলপ্রাণা তরুণীকে পথে বসানোর আয়োজন করেনি সেটা থেকে গেল দুর্বোধ্য। নাকি, বেণী ছিল রমা প্রসঙ্গে সৎ এবং খাঁটি, আর রমেশ প্রসঙ্গে পল্লীসমাজের চক্রান্তবাজ ব্যক্তি? তাহলে আবার বেণীরও তো একটা দ্বন্দ্ব থাকা দরকার ছিল, একটা অধিকার হারানোর ব্যাপার সংক্রান্ত বোধ তার কার্যগুলির নিয়ামক হওয়া উচিত ছিল। একমাত্র তখনই রমার সূত্র ধরেই তার সুমতি জাগ্রত হতে পারত। স্তর পরম্পরায় সেটাকে রূপায়িত করলে আকস্মিকতা কিছু পরিহৃত হতেও পারত।

বরঞ্চ সমাজকে বোঝার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের দুটি ছোট গল্প বিশেষ মূল্যবান। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্প দুটিতে গ্রাম্য-সমাজকে ছোট গল্পের ছোট পরিসরে হলেও অধিকতর গভীরভাবে শরৎচন্দ্র ধরবার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই ছোট গল্প দুটিতেই দেখা যায় যে প্রেমের ঘটনার ভাবালুতা-(যেখানে শরৎচন্দ্র সব থেকে দুর্বল এবং যেখানে তিনি সব থেকে জনপ্রিয়)-বর্জিত পরিবেশে শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে অনেক লক্ষ্যভেদী করে গড়ে তুলতে পেরেছেন। এই ছোট পরিসরেই দেখা গেল যে গ্রামের কঠিন সমস্যাকে তিনি চিনতেন না এমন নয়। মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ গল্পে গোটা গ্রাম-জীবনের প্যাটার্নকে, তার বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিক রূপ এবং জীর্ণ সামাজিক বন্ধনকে শরৎচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। আমাদের ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত জন্মবৃত্তান্তে যে নগর-জীবনের স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণ অপেক্ষা

পল্লীঅর্থনীতির নিদারুণ বিপর্যয় ক্রিয়াশীল রয়েছে মহেশ গল্পটি তার আশ্চর্য প্রমাণ। অভাগীর স্বর্গের স্বত্বহীন প্রজাটিকেও আমরা চিনতে পারি এই কারণে। "দুরধিগম্যতা" "জটিলতা" "দোলাচলতা" প্রভৃতির লোভ পরিহার করে শরৎচন্দ্র বরং এই দুটি ছোট গল্পেই তাঁর আন্তরিকতা প্রমাণ করেছেন বেশি।

পাঁচ

শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির অন্যতম। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমরা শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডটির বিস্তৃত আলোচনার পক্ষপাতী। শ্রীকান্ত প্রথম খণ্ড শ্রীকান্তের অন্যান্য খণ্ডগুলি অপেক্ষা শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে উন্নততর এবং শক্তিশালী চরিত্র অঙ্কনে সমৃদ্ধ। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডেই এক নতুন ধরনের বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত যার সাক্ষাৎ এই উপন্যাসের আদর্শে পরবর্তীকালে পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমরা কখনো পাইনি। এ-ধরনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রবল আত্মসচেতনতায় সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্মকাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন।

আত্মকাহিনীর ছলেই হোক বা কোনো নায়ককে স্থাপিত করেই হোক সাধারণত এ-জাতীয় উপন্যাসের ভিত্তিতে লেখকের জীবন ছায়াপাত করে বলে পাঠকদের কাছে এদের একটা পৃথক মূল্য থাকে। কিন্তু সেই মূল্যে লেখাটির বাজার-মূল্যের বৃদ্ধি ঘটলেও এ-জাতীয় রচনার তাৎপর্য অন্যত্র। বিশেষ কোনো প্লটের দায়ভার এখানে উপন্যাসকে বহন করতে হয় না, বহন করিতে হয় না চরিত্রকে পরিবেশের সম্মুখীন করে নিরীক্ষা করার দায়। এখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে শুধু অভিজ্ঞতাকে ধারানুক্রমে লিপিবদ্ধ করে গেলেই ঔপন্যাসিকের কর্তব্য পালন হল। বৃহৎ ঘটনার জন্য এ-জাতীয় উপন্যাসে কোনো প্রতীক্ষা নেই, নেই বৃহৎ ঘটনাকে এড়িয়ে যাবার সন্তর্পিত পদক্ষেপ। মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে এজাতীয় উপন্যাসে লেখক অনেক মুক্তবাধা, অনেক স্বাধীন। কিন্তু একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতা এ-ধরনের উপন্যাসেও গূঢ় নিয়মের বশীভূত হয়ে ক্রিয়াশীল। এ সত্যই নদীধারার মতো কতকগুলি ঘাট ছুঁয়ে চলে যাওয়া নয়, অথবা পন্থাধর্মী পথিকের মতো কতকগুলি বিচিত্র মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিবরণী নয়। এ-ধরনের উপন্যাসের সময়কাল সাধারণত নায়কের বা গ্রন্থের ''আমি''র আশৈশব প্রৌঢ়ত্ব। এই দীর্ঘ সময়খণ্ডকে লেখক ব্যবহার করেন নায়কের পূর্ণ

ব্যক্তিমানসের গড়ে ওঠার প্রস্তুতিকাল হিসেবে। (আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছি যে উপন্যাস বহুবিধ। এই বহুবিধতার মধ্যে যোগসূত্র একটি—পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ ও ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক আগ্রহ। এই জাতীয় আত্ম-জীবনীকল্প উপন্যাসে একদিকে যেমন মেলে নানা ব্যক্তির সাক্ষাৎ অপর দিকে সেই সমুদয় ব্যক্তির সমাহারে সমস্ত ঘটনার পুঞ্জ পুঞ্জ প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে আত্মজীবনীর যিনি নায়ক তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। গুছিয়ে লিখলে প্রতিটি মানুষের জীবনই একটি সার্থক উপন্যাসের বিষয় এ-কথা এদিক দিয়ে সত্য। এই ব্যক্তিস্বরূপের প্রথম উন্মেষ থেকে, শৈশব-কৈশোরের অস্ফুট এবং অর্ধস্ফুট প্রদোষান্ধকার থেকে খরদীপ্ত যৌবনের বিচিত্র মধ্যাহ্ন ও প্রৌঢ়ত্বের শান্ত উদার প্রশস্ততা এবং আসন্ন বার্ধক্যের সায়াহ্নে ক্ষমাশীল নিরাসক্তির বিশাল মোহানা পর্যন্ত নানা দিকে নানাভাবে ব্যক্তিটিকে গড়ে তোলা এ-উপন্যাসের কাজ। বাইরের লোকটার তত নয়—মনের গহন-সঞ্চারী মানুষটার জীবনী রচনা হয় এখানে। যেন সন্তর্পণে একটা ফুলের প্রতি মুহূর্তের ফুটে ওঠাকে; পাপড়ি মেলে দেওয়াকে, বাতাস, শিশির এবং মৌমাছির কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তের স্নিগ্ধতা সঞ্চয়ের ইতিহাসকে, সৌরভ ও রেণু বিতরণের কথাকে ধরে রাখা হয় এই উপন্যাসে।)

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস এ-জাতীয় উপন্যাসের বিশেষ ধর্মের আলোকে বিচার্য। শরৎচন্দ্র জীবনকে নানারূপে দেখেছিলেন। বহুরূপী জীবনপট-বিধৃত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তিনি জীবনে বহু মানুষ এবং ঘটনার সংস্পর্শে এসেছেন। এই সমস্ত কিছুর প্রসাদ তাঁর উপন্যাসে মেলে। শ্মশানে অন্ধকার রাত্রি, অথবা সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোন—শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতার আশ্চর্য ফসল। পর্যটক লেখকের অভিজ্ঞতা কী মনোজ্ঞ শিল্পসুন্দর শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় তার সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার মনোরম ভঙ্গি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে রূপময় করে তুলেছে।

তথাপি এখানেও সেই একই কথা মনে হয় যে আংশিকভাবে এক একটা চরিত্রের বা এক একটা অংশের সার্থকতা উপন্যাসের সমগ্র সার্থকতার সঙ্গে অন্বিত হতে পেরেছে কি না, এবং শরৎচন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন কি না, তা নইলে জীবনে যেমন হতে পারে শ্রীকান্ত উপন্যাসেও তিনি ঘটনাবিন্যাসকে সেইভাবে উপস্থাপিত করতে গেছেন কেন? শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডে নতুনদা অধ্যায়ের অমিশ্র ক্যারিকেচার শুধু যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় তা নয়, নতুনদা

অধ্যায় উপন্যাসে এসেছে অন্নদাদিদি অধ্যায়ের পর। অন্নদাদিদির অধ্যায় যেমন গভীর তেমনি অর্থবহ। এই বিষণ্ণ গম্ভীর কাহিনীর পরে নতুনদা অধ্যায়ের তাৎপর্য কী? স্বভাবতই পাঠক এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অন্নদাদিদি প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের যে অভিজ্ঞতা তা শ্রীকান্তের কিশোর চিত্তকে গভীরভাবে রেখাঙ্কিত করেছে এবং সেটা নিশ্চয়ই তার জগৎসংসারকে উপলব্ধি করবার একটা সোপান। স্বভাবতই এই কাহিনীর পরে আমরা যখন নতুনদার কাহিনীর ভূমিকায় গিয়ে উপনীত হই তখন আমাদের মন উঁচুতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছে। এই ভূমিকায় শরৎচন্দ্র লিখছেন:

> তারপরে অনেকদিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিন মাত্র আমরা উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তারপরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সে দিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

স্বভাবতই ওপরের অনুচ্ছেদের সুর রীতিমতো গম্ভীর। মনে হয় যেন শরৎচন্দ্র এখনও অন্নদাদিদি সংক্রান্ত অনুভূতির রেশ টানছেন। এর মধ্যে সব থেকে ভ্রান্তিগর্ভ হয়েছে "অখণ্ড স্বার্থপরতা" কথাটুকু। কেননা আমাদের মন তখন সম্পূর্ণভাবে অন্নদাদিদিতে ভাবিত। স্বার্থপরতা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি আমরা অন্নদা-দিদির পরিপ্রেক্ষিতে তখনও ভেবে চলেছি। অন্নদাদিদির নিঃস্বার্থপরতার সুর তখন আমাদের মনের মধ্যে এমনভাবে অনুরণিত হয়ে রয়েছে যে স্বভাবতই আমরা স্বার্থপরতার উদাহরণ হিসাবে অন্নদাদিদিরই বিপরীত কিছু দেখবো এইরকম প্রত্যাশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু যাকে শরৎচন্দ্র উপস্থাপিত করলেন সে বড়ো জোর একটি মূর্তিমান ক্যারিকেচার। এই অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তের মনে অন্নদাদিদিকে দৃঢ়মূলে স্থাপিত করে না, বরঞ্চ অন্নদাদিদির গভীর সুরের মর্যাদাহানি ঘটায়। হাস্যরস হিসাবেও এ ব্যর্থ হয়েছে। কেননা এ-জাতীয় উপন্যাস নাটক নয় যে নাটকীয় অবকাশ রচনার প্রয়োজন হবে, আর নাটকীয় অবকাশ রচনায়ও স্থান-কাল পাত্র প্রসঙ্গ আছে। উপন্যাসে—বিশেষ এ-জাতীয় উপন্যাসে—অবশ্যই শিথিল কাঠামোর যুক্তি উঠতে পারে। কিন্তু উপন্যাসে শিথিল কাঠামোরও একটা নিজস্ব ন্যায় আছে। সেখানে যথেচ্ছ

যোজনার কোনো অবকাশ নেই। শ্রীনাথ বহুরূপীর ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথকে আমরা যা দেখলাম তারপর নিশীথ-অভিযান ও অন্নদাদিদি প্রসঙ্গ পেরিয়ে যেতে নানা ছোট বড়ো ঘটনার ভিতর দিয়ে তাকেও আমরা আমাদের মনের মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছি। সুতরাং স্নেহপ্রবণতা, কর্তব্যপরায়ণতা—কোনো দিক থেকেই ইন্দ্রনাথকে নতুনদা অধ্যায়ে নতুন করে ধরা গেল না। এটা শিথিল কাঠামোর ব্যাপার শুধু নয়, কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাও বটে। এই ব্যাপার আরো ক্ষীণভাবে হলেও প্রকট হয়েছে ইন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। এবং সে ক্ষেত্রে অন্নদাদিদিকে উপস্থাপিত করতে গিয়েই এই ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করেছে। চরিত্রকে রূপময় করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বরাবর একই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। একজনকে না নামালে, না ছোট করে আনলে আরেকজনকে সত্য প্রতিপন্ন করতে পারতেন না। এর কারণ কিছুটা আমরা পূর্বে নির্দেশ করেছি। শরৎচন্দ্র চরিত্র অপেক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন বেশি। যেহেতু এই চিন্তায় আংশিকতার দৈন্যই সূচিত হয় সেইহেতু এই আংশিকতাকে সামলাতে গিয়ে আনতে হয় আকস্মিকতা ও আতিশয্য। ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অতি অল্পসংখ্যক স্থায়ী সৃষ্টিগুলির অন্যতম। এই ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিশোর শ্রীকান্তের অভিভূত মানসের অংশীদার আমরা সকলেই। সুতরাং নিশীথাভিযানের কালে যখন এই ঘটনা ঘটল :

> ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না।—সাপ জড়িয়ে আছে ; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।
>
> কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?
>
> ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখছিসনে?
>
> সে তো দেখছি ; কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল, সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। নিজের কাজ করিতে করিতে বলিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে। ......আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন তো হবেই ভাই।

তখন স্বভাবতই আমাদেরও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অংশের প্রতিটি কথায় ইন্দ্রনাথ-চরিত্র এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, এমন জীবন্তভাবে যে শ্রীকান্তের মতো আমরাও ভাবি :

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি ? মানুষ ? দেবতা ? পিশাচ ? কে ও ? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি ? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোনো বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে সে-কথা কি ও জানেও না ! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি ? সেটা কি আমাদের মতো সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না ? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেল, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ?… …আর আজ সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া, নিঃশব্দে অকুণ্ঠচিত্তে এই ভয়াবহ অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল।

এই ইন্দ্রকে যখন আবার আমরা শাহজীর বাড়িতে অন্নদাদিদির সম্মুখে উপস্থাপিত দেখি তখন অন্নদাদিদিকে সহজ শক্তিতে অসীম শক্তিময়ী করে গড়ে তোলার জন্য ইন্দ্রকে দিয়ে যে সমস্ত আচরণ শরৎচন্দ্র করিয়েছেন তা সঙ্গতিহীন। ঘটনাটি এই :

ইন্দ্র জানাইল যে সে গোখ্‌রো সাপই খেলাইবে ; এর পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো এক হাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল। এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্‌রে ! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে ? ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায় ? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব ? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে ?

এখানে সর্পভীত ইন্দ্র শরৎচন্দ্রের কাছে গৌণ ব্যাপার। আসলে তাঁর লক্ষ্য তখন কেন্দ্রীভূত ছিল অন্নদাদিদিকে অসীম শক্তির আধাররূপে প্রতিপন্ন করা, যাতে ইন্দ্র তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে এবং শ্রীকান্ত ভক্তিতে এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। কেননা পূর্বোক্ত সাপটি অন্নদাদিদি প্রায় অবলীলাক্রমে গল্প করতে করতে বন্দী করে ফেললেন। অথচ ইন্দ্রকে আমরা জানি যে গায়ের ওপর দিয়ে গোখ্‌রো

সাপ গেলেও বলতে পারে 'মরতে তো একদিন হবেই'। রাম নামে তার এতই সরল এবং অভ্রান্ত বিশ্বাস যে সেই নামের জোরে প্রেতভূমিকেও সে ভয় করে না। অথচ এখানে আমরা একটু পরেই দেখতে পাচ্ছি যে ইন্দ্রের হাতে শাহজীর মন্ত্রপুত শিকড় ছিল ; সেই শিকড় এবং শাহজীর বিষপাথর যে বিষজয়ী সেই দৃঢ় বিশ্বাসও ইন্দ্রের ছিল। কিন্তু ইন্দ্রের ভীত আচরণে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। শুধু অন্নদাদিদিকে দাঁড় করাতে গিয়ে ইন্দ্রের সাহস এবং ইন্দ্রের বিশ্বাসবোধ এই উভয়কেই লেখক খণ্ডিত করেছেন। চরিত্রে অবশ্যই অসঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু সে অসঙ্গতিরও একটা সূত্র থাকা উচিত। তা নইলে অসঙ্গতিটা হয়ে দাঁড়ায় লেখকের খেয়ালখুশির ফরমায়েশী ফল। সে অসঙ্গতি তখন লেখকের অসঙ্গতি।

ইন্দ্রনাথের বৃহত্তর শিল্পসাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষীণ অসঙ্গতিটুকু শরৎচন্দ্রের নিজের বলেই প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ দিয়ে যেতে পারি। চরিত্র এবং তার পটভূমিকাগত প্রকৃতির অমোঘ টানে ইন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়—আমরা শরৎচন্দ্রের শিল্পস্বভাবের মুদ্রাদোষের বিষয়টির দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শুধু। এইবার এই ক্ষীণ অসঙ্গতি বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনে কীভাবে বড়ো অসঙ্গতি রূপে প্রকট হয়েছে তাই দেখাব। পরে দেখাব যে এ-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র কতখানি লক্ষ্যহীন ছিলেন। এই লক্ষ্যহীনতা অবশ্যই উদ্দেশ্যগত লক্ষ্যহীনতা, এবং শিল্পলক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতনতাই এর মূলকথা। আমরা সকলেই জানি যে ইন্দ্রনাথ 'শ্রীকান্তের' একমাত্র প্রভাব-সম্পাতী পুরুষ চরিত্র। এরপরে যে সমস্ত চরিত্রের সাহায্যে তিনি উপন্যাসের পটকে নানা ভাবে নানা সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলেছেন বলে মনে করেছেন তারা সকলেই নারী। এবং এই বিচিত্ররূপিণী নারীকূলের মধ্যে রাজলক্ষ্মী প্রধান। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের মধ্যভাগে রাজলক্ষ্মীর উপস্থাপনা। উপস্থাপনাতে রাজলক্ষ্মী এত কৃত্রিম আবেগ এবং মেকি সুরের স্রষ্টা যে তারপর বহু গঙ্গা মাটিতেও আর তার স্বাভাবিক সুর ফিরে আসেনি। রাজলক্ষ্মীকে আমরা দেখি পিয়ারী বাঈজীরূপে। কুমার সাহেবের শিকার-পার্টির অপরিহার্য আনুষঙ্গিক সে। কিন্তু পিয়ারী বাঈজীর বাঈজী-জীবনটা যেন একটা কথার কথা মাত্র। সে যেন প্রথম থেকেই এ-কথা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, সে শরৎচন্দ্রের নায়িকা। শ্রীকান্ত যখন পিয়ারী বাঈজীর গান শুনে মুগ্ধ চিত্তে এ-কথা বলল যে 'আমার বড়ো সৌভাগ্য যে তোমার গান দু-সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ

শুনতে পাব।" তখন বাঈজী তাকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'টাকা নিয়েছি, আমাকে তো গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনেরো ষোলো দিন ধরে এর মোসাহেবী করবেন?' কথা শুনে শ্রীকান্ত "হতবুদ্ধি" এবং "কাঠ" হয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারি না যে এ-কথা শুনে "কাঠ" হবার কী আছে—যদিচ হঠাৎ বাংলাভাষা শুনে হতবুদ্ধি না হয়ে অবাক হলেই বেশি মানায়। তবু আমরা পিয়ারী বাঈজীর মধ্যে এমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশে না হয় মেনেই নিলুম যে পিয়ারী বাঈজী সাধারণ স্তরের নন। কিন্তু পিয়ারী বাঈজী যে শ্রীকান্তকে স্পষ্টত চিনতে পেরেছে সে কথাও বাঈজীর উক্তিতে পরিস্ফুট। শ্রীকান্ত কিন্তু বাঈজীকে চেনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। : তাহলেও পরের দিন যখন রতন শিকার ছেড়ে চলে আসা শ্রীকান্তকে জানাতে গেল যে "বাঈজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়", তখন শ্রীকান্তের মনোভাব—"ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশঙ্কাও করিতেছিলাম।" কিন্তু কেন? শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীকে তো তখনও জানে না এবং জানার জন্য ইচ্ছুকও নয়। এরপরে শ্রীকান্ত পিয়ারী বাঈজীর তাঁবুতে এল দেখা করতে। ততক্ষণে শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়েছে পিয়ারী বাঈজীকে বাঈজী বলে প্রতিভাত করতে হবে। আগের রাত্রের গানের আসরের দৃশ্যে শরৎচন্দ্র সে সুযোগ হারিয়েছেন। রাজলক্ষ্মীর জীবনের বর্তমান পর্যায়ের কদর্যতাকে যে পরিচিত করানো দরকার সে বোধ শরৎচন্দ্রের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল :

> পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাঈজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই, আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাঈজী যেই হোক বাঙালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাঈজী বসিয়া আছে। ভিজা এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন গুড়গুড়িটা নিয়ে যা।

'রতন আসিয়া গুড়গুড়িটা লইয়া গেল।' এবং আশ্চর্যের বিষয় যে গুড়গুড়ির সঙ্গে সঙ্গে পিয়ারী বাঈজীর বাঈজী-জীবনও যেন বিদায় নিল। গুড়গুড়িটা রাজলক্ষ্মী আগেও সরিয়ে রাখতে পারত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ধারণা যে

গুড়গুড়িতেই বাঈজী-জীবনের সমস্ত প্রতীক। সেই প্রতীকটি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যবান কার্পেটের ওপর গরদ পরিহিতা সিক্ত-কেশিনী নারী মুহূর্তেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হয়ে উঠল। যে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে একবিন্দুও স্মরণ করতে পারছে না (এটিই শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় কৌশল, তারকেশ্বরে রমেশও রমাকে এই রকমই চিনতে পারেনি। সম্ভবত পুরুষ নারী-উদাসীন হলে নারীকে আকর্ষণ করতে পারে বেশি এরকম ধরনের একটা ধারণা শরৎচন্দ্রের ছিল। এটি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়ে গেছেন বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রবোধ সান্যালকে) রাজলক্ষ্মী সেই শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশব ইতিবৃত্ত এরপর একে একে বলে চলল, জিজ্ঞাসা করতে লাগল তার সমস্ত অতীত সংবাদাদি। এবং শুধু জিজ্ঞাসা করেই ক্ষান্ত হল না আঁখিপাতা ভারী ও চোখ ছল চল করে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তার আগ্রহের গভীরতাও রাজলক্ষ্মী ব্যক্ত করল। অত দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর পরেও শ্রীকান্তের কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়ছে না। যে-শ্রীকান্তের সমস্ত শৈশবস্মৃতি নখদর্পণে, যে-শ্রীকান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে এমন কি নতুনদা প্রসঙ্গেরও, সেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বিন্দু বিসর্গও স্মরণ করতে না পারলে যে শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, মনে হয় রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ব্যাপারটাই বাড়াবাড়ি, এ-বোধ শরৎচন্দ্রের ছিল না। কাজেই রাজলক্ষ্মীর লম্বা জেরার পরে শ্রীকান্তের এই চিন্তা অনেকখানি বিসদৃশ ও অসঙ্গত।,

> কে এ ? আমার পাঁচ বছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি ; কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোনো অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিসের জন্য ? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি ? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত ? ভালবাসা-টাসা কিছু নাই ? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল।

এবং মনে যে শ্রীকান্তের ছিল না, সে কথাও তো সত্য। কেননা তাহলে অন্নদা-দিদি পর্যায়ে অন্তত বালিকা লক্ষ্মীর কথা শ্রীকান্তের একবার না একবার মনে

পড়ত। তারপর শ্মশান এবং শনিবারের অমাবস্যার ঘটনাকে অবলম্বন করে পিয়ারী যখন শ্রীকান্তের বিপদ আশঙ্কায় "অকস্মাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল" তখন অকস্মাৎ শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর সমস্ত শৈশব মনে পড়ে গেল। এবং সেই অতীত স্মৃতির প্রত্যাবর্তনেও রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের গভীর সম্পর্কের কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের প্রহারের ভয়ে বৈঁচির মালা এনে শ্রীকান্তকে দিত। এই উপদ্রবের স্মৃতি ছাড়া রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র আর কিছু তখন আমাদের জানালেন না। শ্রীকান্তের কাছে যে ব্যাপারটা কিছুই ছিল না এ তো বোঝাই গেল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ব্যাপার দেখে মনে হয় যে রাজলক্ষ্মীর কাছে এটি ছিল একটি গভীর সুরের ব্যাপার। তাহলে ধরে নিতে হয় যে রাজলক্ষ্মী সেই ক্ষুদ্র স্মৃতিকে তার আট বছর বয়স থেকে লালন করছে শ্রীকান্তের কাছে এক মুহূর্তে কেঁদে সমস্ত কিছু নিবেদন করার জন্য। কিন্তু আমরা জানি রাজলক্ষ্মীও নিরুদ্দেশ শ্রীকান্ত সম্বন্ধে কোনো খবর রাখতো না, এমন কি সে খবর সম্বন্ধে তার-যে কোনো আগ্রহ ছিল সে কথাও তার উক্তিতে ব্যক্ত হয়নি। তাহলে রাজলক্ষ্মীর এই অকস্মাৎ মমতাতিশয্যের কারণ কী? এই অধ্যায় যদি শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর পুরাতন প্রেমের মধ্যলীলা হয় তবে তা খণ্ডিত, কেননা আমরা আদি লীলা কী তা জানি না, আর যদি এ নতুন প্রেমের উপক্রমণিকা হয় তবে তা যেমন ব্যর্থ তেমন হাস্যকর।

এবং এই হাস্যকর আতিশয্যের জন্যই শ্মশানের নিশীথ অভিজ্ঞতার অপূর্ব কাব্যময় রূপায়ণও বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা সকলেই জানি যে শিল্পক্ষমতার আশ্চর্য ব্যবহারে প্রকৃতিকে এখানে প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য করে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রসাদ ছড়িয়ে রয়েছে এর সর্বত্র। একটা পৃথক অংশ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে এই বর্ণনা তুলনারহিত না হলেও এর স্থান কারো নিচে নয়। এবং ভাষায় রবীন্দ্র প্রভাবের ছায়া একটু অসংযতভাবে আত্মপ্রকাশ করলেও তা অনুভূতিকে স্পর্শ করে নিজের প্রাণবত্তায়। প্রকৃতির ভীতিকর মূর্তিকে রূপময় করার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্রের। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নিশীথাভিযানের বর্ণনায়, শ্মশান-রাত্রির বর্ণনায় এবং সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনায় সে ক্ষমতায় পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু আঁধারের রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য রয়েছে। আমরা জানি যে উপন্যাসে মানুষ অথবা প্রকৃতির বিশিষ্ট মূল্য কিছু নেই। গোটা উপন্যাসের পটেই সমস্ত কিছুর

বিচার। এই আঁধারের রূপ মাত্র আঁধারের রূপ নয়। যে ব্যক্তি সম্পর্কে উপন্যাস প্রসঙ্গে আমাদের আগ্রহ আমরা উপন্যাস-ধৃত প্রকৃতিকেও দেখে থাকি সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই জড়িত করে। যে উপন্যাসে প্রকৃতির ব্যবহার সেই বিশিষ্টতা-রহিত, অর্থাৎ প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে একান্তই ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে—সে উপন্যাসে প্রকৃতি মাত্র একটি অভিজ্ঞতার ব্যাপার। শ্রীকান্তের প্রথম খণ্ডের এই অংশে সেই দোষ ঘটেছে। আমরা নিঃসন্দেহে আঁধারের রূপালেখ্য দেখে মুগ্ধ হই। এবং শ্মশানের uncanny রহস্যঘন ভয়-ভয় পরিবেশ চিত্রণে শরৎচন্দ্রের ক্ষমতাকে তারিফ করি। কিন্তু যে ব্যক্তিটি এই সমস্ত অনুভূতির ধারক, শ্মশানের ঐ অভিজ্ঞতা তার চেতনায় বা মনোলোকে কোনো স্থায়ী সুর বেঁধে দিল কিনা, ব্যক্তিমানসের যে তিল-তিল বিকাশ এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান বিষয় সেই বিকাশের পথে এই শ্মশানের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য ছিল কিনা তা বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল যে রাজলক্ষ্মী অসীম মমতায় শ্রীকান্তকে বাধা দিয়েছে শ্মশানে যেতে আর শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের ছাত্রের উপযুক্ত দুঃসাহসিকতায় শ্মশানভূমিতে নিশীথাভিযান করেছিল। এই জাতীয় অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নৈশ অভিযানের সময়েও একবার শ্রীকান্তের ভাগ্যে জুটেছিল। সেখানে ক্ষুদ্র পরিবেশে সেটা যেমন ছিল ভয় অনুভব ও ভয়মুক্তির কাহিনী, বিস্তৃত পরিসরে সমৃদ্ধতর রচনার রীতিতে এখানেও তা ভয় এবং ভয়মুক্তির গল্পই থেকে গেল। কেননা এত বড়ো একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার পরেও শ্রীকান্ত তেমনি তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, এবং রাজলক্ষ্মীর চলে যাওয়ার বেদনাটাই তার বুকের মধ্যে কম্পমান। রাজলক্ষ্মী এরপর চলে গেল এবং শ্রীকান্তকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। আত্মসম্মানের ভয়ে শ্রীকান্ত রাজী হল না। বোঝা গেল না এ আত্মসম্মানের স্বরূপ কী—কেন এই না যেতে চাওয়া। যাই হোক জীবানন্দের কলিকের ব্যথার মতো যথারীতি, সুরেশের নিউমোনিয়ার সুযোগের ন্যায় সন্ন্যাসী শ্রীকান্তের দারুণ অসুখের সুযোগে রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীকান্তের ক্ষণ-বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলন হল। এখানেও আমরা অকস্মাৎ জানতে পারলাম যে রাজলক্ষ্মীর বঙ্কু বলে একটি ছেলে আছে এবং তারপরেই জানলাম পুত্রটি রাজলক্ষ্মীর ছেলে নয়। ছেলেটি নিজের মা থাকা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মীকে মা বলে। এবং রাজলক্ষ্মীর গানবাজনার ব্যাপার সংসারের সম্মতিলাভ যে করেছে এ-কথাও বঙ্কু গল্প প্রসঙ্গে শ্রীকান্তকে জানিয়ে দিল। এবং এও জানাতে ভুলল

না যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে দেখলে খুশি হয় এ-কথা সে বোঝে, কিন্তু তাতেও তার অসম্মতি নেই। এদিকে রাজলক্ষ্মীও ততক্ষণে পিয়ারী নাম ঝেড়ে ফেলেছে, সে আর তখন মাইরি বলে না। কিন্তু শ্রীকান্তের মধ্যে সংশয়—"হঠাৎ বন্ধুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল"। সুতরাং রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে শ্রীকান্ত পুনরায় বিদায় নিল। এবং তখনও শ্রীকান্তের জন্য পাঠকের সমবেদনাকে আরও ভারী করার আয়োজন হিসাবে আমাদের জানানো হল যে শ্রীকান্তের ফের জ্বর এসেছে। কিন্তু বন্ধুর মায়ের সম্মান রাখতেই হবে কাজেই শ্রীকান্ত আবার চলে গেল। তারপর শ্রীকান্ত উপন্যাসের বাকি তিন খণ্ড ধরে চলল আসা এবং যাওয়া।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে অকস্মাৎ আগত অভ্রভেদী হিমাচলের একটু চূড়াও এর আগে দেখা যায়নি। এবং "আমাদের মাঝখান" বলে যে কোনো বস্তু আছে সে-কথাও স্পষ্ট করে বা আভাসে জানানো হয়নি। রাজলক্ষ্মীর দিক থেকে তার অর্থহীন আট বছর বয়সের প্রেমের স্মৃতি যে আতিশয্যই সৃষ্টি করুক না কেন, শ্রীকান্তের দিক থেকে সমস্তটাই নতুন ব্যাপার। সুতরাং "আমাদের মাঝখান" গড়ে উঠতে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা এখানে নেই। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রের মতোই সব হঠাৎ মনে হয়। এই হঠাৎ-মনে-হওয়া শরৎচন্দ্রের সমস্ত আতিশয্যের জন্মদাতা। এবং সেই আতিশয্যকে অধিকতর বর্ধিত করার জন্যই বন্ধুর অবতারণা। অথচ বন্ধু সমস্যাকে কোনো দিক থেকেই স্পর্শ করেনি। এই আতিশয্যদুষ্ট নারী-চরিত্রটি যখন কমললতার সঙ্গে দৃষ্টিকটু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল তখনই প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটির ভরাডুবি হয়েছে। সে ভরাডুবির আয়োজন শরৎচন্দ্র চরিত্রটির অবতারণার মুহূর্তেই করে রেখেছিলেন।

অসংখ্য চরিত্র এসেছে এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে। তারা কেউ এর নায়ককে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেল না। ইন্দ্রনাথ-অন্নদাদিদির অধ্যায়ে আমরা যে বোধের দেখা পেলাম—যে সমস্ত চরিত্রগুলির কাছে মাধুকরী শেষ করে শ্রীকান্ত খুঁজে পাবে জীবনের একটা মানে—উপন্যাসের শেষে দেখা গেল সে মানে শ্রীকান্ত যেন খোঁজেইনি। কাজেই অন্নদাদিদির অগ্নিপরীক্ষা এবং ইন্দ্রনাথের নিস্পৃহ নির্বিকারত্বের পাঠশালায় যে নায়ক মানুষ হল সে এত মাঝারি অভিজ্ঞতাকে নিয়ে (একবার রাজলক্ষ্মীর সেবা-শুশ্রূষার জগতে ও তার

পরেই জাগ্রত বিবেক নিয়ে আবার বাইরে) জীবন কাটাল এটা সংসারের দিক থেকে বেদনার, এবং শিল্পের দিক থেকে গূঢ়ার্থহীন।

ছয়

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঞ্জীবনী শক্তির উৎসটা তা হলে কোথায়? ঔপন্যাসিক অসঙ্গতির বিপুল বোঝা বহন করেও তিনি কেমন করে পৌঁছে গেছেন পাঠক চিত্তের অমরতার রাজত্বে? চেস্টারটন সাহেব ডিকেন্স প্রসঙ্গের উপসংহারে ডিকেন্সের বিরুদ্ধবাদীদের দুটি প্রধান প্রশ্নের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। অভিযোগ দুটি এই: ডিকেন্স প্রচুর অনুন্নত সৃষ্টির জনক। এবং তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে রঙের আতিশয্য আছে। চেস্টারটন সাহেব ডিকেন্সের পক্ষ সমর্থনে শেকস্‌পীয়রের দোহাই দিয়ে বলেছেন যে অনুন্নত সৃষ্টির প্রাচুর্য তাঁরও অনুল্লেখ্য নয়। দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন যে তাঁর চরিত্র সৃজনে আতিশয্য ঘটেছে বটে কিন্তু আতিশয্যগুলি চরিত্র-ন্যায়েরই অন্তঃনিঃসৃত ব্যাপার। অর্থাৎ আতিশয্যগুলি পাত্র-পাত্রীর জীবনযাত্রার ফল—লেখকের আরোপিত নয়। এ প্রসঙ্গে মিকবরের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে। অশ্রুময়তায় ডিকেন্স এবং শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তি উত্থাপিত করা চলে নিশ্চয়। এবং গোটা উপন্যাসের বৃহৎ পটের কথা বাদ দিলে ডিকেন্স প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অভিযোগে চেস্টারটন সাহেবের উত্তরের সুবিধা শরৎচন্দ্রেরও প্রাপ্য।

ছোট মাপে, মিত পরিসরে শরৎচন্দ্র এই কারণেই সিদ্ধহস্ত জীবন-রসিক। তাঁর মেজদিদি, নারায়ণী, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, এরা সকলে যে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রগুলির পাশেই বিরাজ করে তার একমাত্র কারণ লেখকের জীবন-প্রেম। বৃহৎ উপন্যাসের বিস্তৃত পট শরৎচন্দ্রের অনুধাবনীয় ছিল না—এই দৌর্বল্য তাঁর সমগ্র উপন্যাস পরিকল্পনায় পরিস্ফুট। রমেশ, শ্রীকান্ত, জীবানন্দ—সকল উপন্যাসের নায়কই উপন্যাসের পটে বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত নায়ক। ফলে এদের ব্যবহারের সঙ্গতি-সূত্র রক্ষা করার প্রয়োজন লেখককে মানতে হয়নি। পক্ষান্তরে ছোট ছোট পটে এক-একটা ব্যক্তি চরিত্রের অসামান্যতা পরিস্ফুটনে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। শ্রীকান্তও (প্রথম খণ্ড) এই কারণে তাঁর অপেক্ষাকৃত সার্থক সৃষ্টি। এখানে বিস্তৃত নির্দিষ্ট পটে কাউকে ধরে রাখতে হয়নি। এক-একজনের রঙ ফোটানো

সারা হলেই তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছেন। যাদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে পৌনঃ-পুনিকতা তারাই শেষ পর্যন্ত হয়েছে রঙছুট। জীবন—প্রেম ও মানবিক অনুভূতি শরৎচন্দ্রের প্রধান শক্তি। ঔপন্যাসিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের সঙ্গে চিরদিন থাকবেন তা এই কারণে। তাঁর ছোট পটে ধৃত চরিত্র-পাত্রগুলির প্রধান উপাদান মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা। এর কাছে সকল অপ্রিয় সমালোচনাই—তা সে যতই সত্য-দর্পিত হোক না কেন—কিছুটা আত্মানুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে পারে না।

জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া

এক

শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া শরৎচন্দ্রের কালেই কতখানি নির্মমভাবে সক্রিয় ছিল জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী তার অব্যর্থ নিদর্শন। সমাজ প্রগতি বা রাষ্ট্রনীতিক দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়ার অর্থ ভিন্ন। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিক্রিয়া শব্দটি সেই পারিভাষিক অর্থসীমায় আবদ্ধ নয়। বরঞ্চ আক্ষরিক অর্থেই তার সঠিক ব্যাখ্যার ঠিকানা। শরৎচন্দ্রের দরদী স্থষ্টির বিপুল বিস্তৃতি যে পরিমাণে চিত্তবিনোদনী সেই পরিমাণে শিল্পার্থসাধক নয়—এই প্রতীতির মূলে রয়েছে সংহত জীবনবোধ ও সঙ্গত শিল্পজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া। শিল্প-সাধনা শিল্পের নিয়মে জীবন-সাধনা বলেই শিল্পের অসঙ্গতিতে প্রকৃতপক্ষে জীবনবোধের অসঙ্গতিই অভিব্যক্ত। শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়ের সমালোচনায় জগদীশ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের অসংহত জীবনবোধ এবং সঙ্গতিহীন শিল্পক্রিয়ার নির্মম বিশ্লেষণ করেছেন। শেষের পরিচয় শরৎচন্দ্রের প্রতিনিধিস্থানীয় স্থষ্টি নয় এবং জগদীশ গুপ্তের সমালোচনাও সাময়িক প্রতিকূলতায় দুষ্ট তথাপি এই উপন্যাসের আলোচনার ভিতরে জগদীশ গুপ্তের মনের প্রবণতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার গঠনটির প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়। এক অর্থে শেষের পরিচয়ের আলোচনায় শরৎসাহিত্যের সাধারণ অসঙ্গতির স্থত্রগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে—বিশেষ-রচনার প্রসঙ্গে সমগ্র বক্তব্যটি সীমিত বলে সমালোচনাকে মনে হয়েছে উগ্র প্রতিকূলতায় পূর্ণ—এই সীমিত পরিসরের শ্বাসরোধকারী অসহিষ্ণুতায় কিছু কিছু কটূক্তিও স্থজিত হয়েছে—যেমন একক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে জগদীশবাবু প্রায় ধাপ্পাবাজ বলেছেন।—

> রাখালরাজ ভক্তিভরে সবিতার সর্বাঙ্গে যত মর্যাদাই নিরীক্ষণ করুক, আর মা মা আহ্বান যতই ধ্বনিত করুক, আর সারদা যত উৎসাহ লইয়াই রাখালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাক শরৎচন্দ্র সবিতাকে মর্যাদা দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই—সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে আমাদের ধাপ্পা দিয়াছেন।

অবশ্যই অসহিষ্ণুতা এই সমালোচনার বিশ্লেষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কিন্তু তা

সত্ত্বেও যে পদ্ধতিতে সমগ্র গ্রন্থখানি বিশ্লেষিত হয়েছে, চরিত্রগুলির অসঙ্গতির স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা শরৎচন্দ্রের কালে তাঁর প্রবল প্রভাবের পটভূমিতে রীতিমতো নির্মোহ মানসিকতার পরিচায়ক। চরিত্র-সংক্রান্ত আলোচনায় নিন্দাবাণী অথবা প্রশংসাবাণীকে আবদ্ধ রাখা যেখানে গড়পড়তা সমালোচনা, সেখানে একটা উপন্যাসের নৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচনাও আমাদের কাছে নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে পারে না। শরৎচন্দ্রকে আমরা যে সমস্ত সদা-প্রস্তুত বিশেষণে বিশেষিত করে থাকি—দরদী কথা-শিল্পী, নরনারীর সম্পর্কের ওপর নতুন আলোক-সম্পাতী, নারীর দোলাচল-চিত্ততার রূপকার—এই সমস্ত বিশেষণকে এই সমালোচনায় আঘাত হানা হয়েছে। সমালোচনাটি যদি শরৎচন্দ্রের একটিমাত্র উপন্যাসের ভিত্তিতে না হত তাহলে যে অসহিষ্ণুতা সমালোচনাটিকে মাঝে মাঝে আবহাওয়াচ্যুত করেছে তার অবকাশ ঘটত না। স্মর্তব্য যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ভাবালুতাকে জগদীশ গুপ্ত যতটা সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন তার থেকে বেশি ঘটেছে শিল্পী হিসাবে তাঁর নিজের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। এবং এই রকমই ঘটে থাকে। যখন কোনো লেখক অপর লেখকের সাহিত্য-কীর্তির বিচার করেন তখন সমালোচনার ন্যায়-সূত্র অপেক্ষা তাঁর কাছে প্রধান বলে প্রতিভাত হয় নিজ শিল্প-অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ শিল্পীই অভিজ্ঞ সমালোচক। বিড়ম্বিত শিল্পীর সমালোচনাতেও বিড়ম্বনা। সমালোচক হিসাবে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ যে এখনও পর্যন্ত ধ্রুবমর্যাদার অধিকারী তার অন্যতম কারণ শিল্পকে তাঁরা যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিল্পরসিকের সৌখিনতা সেখানে অহং বিনোদনে তৎপর হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া শিল্পীর শিল্প-সমালোচনার ব্যাপারটি আরো একটি কারণে আমাদের কাছে গভীরতর অর্থদ্যোতক। এ-জাতীয় আলোচনায় আমরা একজন শিল্পীর শিল্প-কর্ম আর এক শিল্পীমানসে কোন্ শিল্পসমস্যার আকারে অনুভূত, তার ইঙ্গিত পাই। সাহিত্য জীবনের ব্যাখ্যা। জীবনের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা সেখানেই অধিকতর গৌরবময় হয় যেখানে ব্যাখ্যাতা নিজেই জীবন সমালোচক শিল্পী। এখানে একটা কথা স্পষ্ট বলা দরকার যে, বিষবৃক্ষের সমালোচনায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ—মধ্যবর্তিনী গল্পেও সেই রবীন্দ্রনাথই প্রত্যক্ষ এমন ধরনের একটা মন্তব্য কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের সহায়তা করবে না। আমরা শিল্প-সমালোচককে জীবন-সমালোচনায় অবতীর্ণ দেখতে যতটা বাসনা করি জীবন-সমালোচককে শিল্প-সমালোচনায় দেখার বাসনা আমাদের কাছে তার চেয়ে অধিকতর

তাৎপর্যপূর্ণ। সফল শিল্পী জীবনকে বোঝেন বলেই শিল্প-ব্যাখ্যায় সেই জীবনোপলব্ধিকে প্রয়োগ করতে পারেন। পাঠলব্ধ শিল্পোপলব্ধিকে যদি জীবন-ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত করেন কেউ, তবে তার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। মধ্যবর্তিনী গল্প গল্পের বেনামিতে কিছুটা বিষবৃক্ষের সংশোধনী সমালোচনা বলেই রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এ-ক্ষেত্রে গল্পে ভাববস্তুর প্রেরণা, সংশোধনের বাসনাসঞ্জাত পরোক্ষ প্রেরণা। যতটা বুদ্ধিজাত ততটা অনুভূতিশুদ্ধ নয়। জগদীশ গুপ্তের রচনার নেপথ্য-প্রেরণা-নির্মাণে শরৎচন্দ্রের ভ্রান্তির ও অসঙ্গতির প্রতিক্রিয়া কতটা এবং নিজস্ব মৌল অনুভূতি-সিদ্ধ জীবন-ব্যাখ্যা প্রয়াস কতটা সক্রিয় ছিল এই বিচারের ওপরই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় নির্ভরশীল।

দুই

জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালবর্তী এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত। স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে যে কল্লোলের মূল বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়? অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্যের প্রতি অমর্যাদা না করেও প্রতিক্রিয়াকেই কল্লোলের প্রাণধর্ম বলে আখ্যাত করা যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথ যদি এই প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য হন তাহলে সমগ্র আন্দোলনই একটা সাহিত্যিক ফ্যাশন প্রচলনের অপরিণত উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয়। কল্লোল বলতে যা বোঝায় তার লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রধান হেতু এই অপরিণত উদ্দেশ্য। জগদীশ গুপ্তের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলের সমগ্র প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক পন্থাবিলাসে পরিসমাপ্ত। বেদে, উপনায়ন, মিছিল প্রমুখ উপন্যাসের কাঠামো এবং বক্তব্য সমীক্ষণে এ-কথার সমর্থন মেলে। গোকুল নাগের পথিক ছাড়া কাব্যধর্মী উপন্যাসেরও একটা শিল্পসম্মত মান কল্লোলপরায়ণদের হাতে সৃজিত হয়নি। বলাবাহুল্য এঁদেরও অধিকাংশের শিল্প জীবনের মূলে যতখানি জীবন-সমালোচনার প্রেরণা কার্যকরী ছিল তার থেকে শিল্প-সমালোচনার প্রভাব কার্যকরী ছিল অধিকতর। বিদেশী সাহিত্যের হাতছানিতেই এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-পরিহারের দুস্তর পথের ধূলি-ঝঞ্ঝায় নেমে পড়েছিলেন। "অমুক অমুক বস্তু আমাদের সাহিত্যে নেই, থাকা উচিত"—কল্লোলের হাওয়ায় আন্তর্জাতিক আকাশের দান এইটুকু। কাজেই স্বভূমি এবং পরিবেশ সম্বন্ধে

কোনো গভীর জিজ্ঞাসার অবকাশ এখানে ছিল না। আমাদের বোহেমিয়ানী ভঙ্গি মানে এলোমেলো যথেচ্ছা কল্পনা। অ্যান্টি-রোমান্টিক নায়িকা মানে নায়িকার কেক ভক্ষণরত মুখশ্রী। ডিটেল সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অর্থ নায়ক মুখে ক্যুটিকুরাকে ফেস পাউডারের বদলে মেখে ফেলবে কিনা এই সংশয় প্রকাশ। প্রেরণার বিদেশী পুঁথির উৎস যখন হারিয়েছে তখন দেশ নিরুদ্দেশ। অথচ কল্লোলের কালে প্রতিক্রিয়ার মুহূর্তও পরিপক্ব। যে সমস্ত বস্তুগত কারণে এই প্রতিক্রিয়া মানসিক সাবালকত্ব অর্জনের পথে চলছিল তার বিস্তৃত আলোচনা জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে স্থগিত রেখে শুধু এইটুকু ইঙ্গিতই বোধ হয় যথেষ্ট যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরের বাঙালী মধ্যবিত্তের চেতনাপ্রবাহ যুদ্ধোত্তর সংকটের শঙ্কিল খাত বেয়ে অগ্রসর হয়েছিল। প্রাকযুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের ছকে প্রথম আলোড়নের আঘাত এসে পড়েছে তখন। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র এই পরিবর্তনমুখী চেতনাকে গল্পে-উপন্যাসে ধারণ করতে পারেননি। তখনও কথাসাহিত্যের মানুষেরা মাটির মানুষ থেকে পৃথক। মাটির মানুষের যে প্রাকৃত যন্ত্রণা তা তখনও শিল্পের অলৌকিক রঙে রঞ্জিত হবার জন্য উন্মুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপায়ন প্রমুখ উপন্যাসে সেই যন্ত্রণাকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব যে রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়াকে কথাসাহিত্যে বহন করতে চেয়েছিলেন সে প্রতিক্রিয়ার সীমাবদ্ধ চেহারা অনুধাবনযোগ্য। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের আমল। এই ত্রয়ীর মধ্যে বিস্তৃত পার্থক্য সত্ত্বেও পাঠকমানসে শেষোক্ত দুজন নিঃসন্দেহে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। কল্লোলের লেখকবৃন্দের সামনে কাজ ছিল জনশ্রুতিতে ধৃত, অথচ সাধারণ পাঠক সমাজে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাসের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তোলা। শরৎচন্দ্রের লঘুকরণের হাত থেকে উপন্যাসকে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ-সম্মত জীবনচর্যার দুরূহ পথের সন্ধানে ব্রতী করে তোলার দায় ছিল এঁদের। Up-to-date হবার ঐতিহাসিক তাগিদে সে শিল্প-কর্তব্য এঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন, উপন্যাসের দিকে তাকালে এ-কথা বলতেই হয়। প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সে প্রতিক্রিয়ার সরলীকৃত অর্থ রবীন্দ্র-অতিক্রমণ নয়। অবশ্যই আমরা জানি যে আমাদের সদ্য-ব্যবহৃত শিল্প-কর্তব্য কথাটির কর্তব্যাংশে আপত্তি উঠতে পারে। কিন্তু সমগ্র আন্দোলনটি যখন কর্তব্যমূলক তখন কর্তব্যের শুদ্ধ রূপ এবং সমগ্র চেহারাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

তিন

জগদীশ গুপ্তের শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উগ্র প্রতিক্রিয়া সেদিক থেকে একটি বিশিষ্ট মানসিকতা-সঞ্জাত। এই মানসিকতা তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ফল। এই ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধির জন্য জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য-কীর্তির আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল জগদীশ গুপ্তের অন্তর্দৃষ্টির একটি নিজস্ব অখণ্ড গঠন। রবীন্দ্র-অতিক্রমণ জাতীয় কোনো সৌখিন সাহিত্য অভিরুচি এই অন্তর্দৃষ্টির রচয়িতা নয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী-প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। সেই গভীর তাৎপর্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ছিল বুদ্ধিসম্ভব উপলব্ধি, জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে সেখানে উপলব্ধিটা জীবনবোধের ফল। জীবনের গূঢ় সমস্যা হিসাবেই তিনি বিষয়গুলিকে শিল্পী হিসাবে ধারণ করেছিলেন। যে সমস্ত পূর্বতন শিল্প-সৃষ্টি তাঁর স্রষ্টা-মানসে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলো তাঁর কাছে শিল্পরীতির বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন নয়। জীবনকে তাঁর নিজের দৃষ্টিতে বুঝতে চাওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন সেখান থেকে। এই সূত্রের সাহায্যেই জগদীশ গুপ্তের শক্তি এবং দৌর্বল্য উভয়কে ব্যাখ্যা করা যাবে।

ধরা যাক্ "অসাধু সিদ্ধার্থ" নামক উপন্যাসটির কথা। নটবর নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধার্থ নামে মৃত এক উজ্জ্বল-চরিত্র ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল অজয়া নামে একটি সুন্দরী তরুণীর হৃদয় হরণের জন্য। সিদ্ধার্থের সমস্ত পরিচয় নটবর সংগ্রহ করে রেখেছিল। এই ছদ্মবেশ ফেঁসে গেল অজয়া এবং ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থের প্রেম যখন বিবাহের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। এখন এই যে কাঠামো, এ আমাদের কাছে অল্পবিস্তর পরিচিত কাঠামো। রত্নদ্বীপ উপন্যাসেও এই কাঠামোর সাদৃশ্য মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। সেখানেও মৃত স্বামীর আবয়বিক সাদৃশ্যের সুযোগে বৌরানীর অন্তঃপুরে এবং অন্তরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল নায়ক রাখাল। গল্প-প্রিয় প্রভাতকুমার যে যত্নে প্লটকে গড়ে তুলেছিলেন সে যত্নে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পারেননি। এখানে কল্পনার সর্বোচ্চ ব্যবহারে রাখালের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার কথা। প্রভাতবাবু

তাঁর এই সর্বোত্তম সৃষ্টিতে যেন বড়ো তাড়াতাড়ি রাখালের পাপ-ক্ষমতার সীমায় গিয়ে পৌঁছেচেন। রাখালকে বঙ্কিমের moral teaching-এর অনুবর্তী প্রভাতকুমার ফুটিয়েছেন সর্ব-শক্তি নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে তিনি সার্থককাম। জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যতর। "নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ"—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের অনেক ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।

রত্নদীপের রাখালের পাপ-চেতনা বৌঠাকুরানীকে দেখে এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে জাগ্রত হয়েছে। তার পূর্ব পর্যন্ত সে স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক বিপদ-বিমুখ এবং অকস্মাৎ দুঃসাহসী ব্যক্তি। বৌরানীর সংস্পর্শে না এলে সে কখনও আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হত না। বৌরানী তার পাপ-চেতনার উদ্বোধক। পক্ষান্তরে নটবরের সিদ্ধার্থ হবার বাসনা জেগেছে অজয়াকে দেখার পর—অজয়ার নিকটবর্তী হবার বাসনায়। নটবরের জীবন রাখালের মতো এই ঘটনা ব্যতিরেকে স্বাভাবিক জীবনও নয়। বরঞ্চ বলা যায় চরম অস্বাভাবিক। নটবর ছিল বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের জারজপুত্র। মুদির দোকানের ছোকরা চাকর, সখের থিয়েটারে অভিনেতা ও পরিশেষে অর্থলোভে এক বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যা-সহচর—এই হল নটবরের নাতিদীর্ঘ জীবনের প্রধান বিগত পরিচ্ছেদ। এই ব্যক্তি নানা অপবিত্র কার্যাদির মাঝে বা পরিশেষে একটি পবিত্র স্বপ্নের কাছা-কাছি এসে দাঁড়িয়েছিল—সেটি হল অজয়াকে ভালবাসা। ভালবাসা তাকে যে ছদ্মবেশ পরিয়ে দিল ভালবাসার বিশুদ্ধ আবেগে সেই ছদ্মবেশ তার জীবনে খাঁটি হয়ে উঠতে চাইল। অতীত জীবনের প্রেতভূমির বাসিন্দারা অত অনায়াসে এই নবাগত অধ্যায়কে সংযোজিত হতে দেবে না। জগদীশবাবু যথার্থই নটবর-সিদ্ধার্থের সংঘাতকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অজয়ার প্রভাবে ধীরে ধীরে মহানুভবতার অভিনয়ে অভ্যস্ত নটবরের আত্ম-সমালোচনা ও আত্মচিন্তার মধ্যে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার যে কারুণ্য তা লক্ষণীয়।—

> শুনতে পাই, জীবন-যুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কীট-পতঙ্গে আছে উদ্ভিদে আছে—সেটা বিধিদত্ত প্রেরণা। তবে আমি মানুষ হয়ে কেন টিকে থাকতে চাইব না?··· মনে মনে তাল ঠুকিয়া বলিল—আলবৎ চাইব।···কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ রং বদলায়, আমি একটু নাম বদলেছি, কিন্তু মানুষ তো আমি

সেই আছি।....ধরণীর সব সুখ কৃপণের মতো লুকিয়ে রেখেছিল—এতদিন পরে তার এক অঞ্জলি তপস্যার ফলের মতো আমার সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে ; কেন আমি তা দু-মুঠো ভরে কুড়িয়ে নেব না ?

এই কাঙাল মনোভাবকে নটবর বহু শঠতায় ও কাপট্যে সিদ্ধার্থের রূপে সাজিয়েছে। অজয়ার স্বপ্নময় আকর্ষণ আত্মহত্যামুখী নটবরকে যে মুহূর্তে নবজীবন-রসে সঞ্জীবিত করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই মুহূর্তই নটবরের ধ্বংসাবশেষে সিদ্ধার্থের জন্মমুহূর্ত। অজয়ার ভালবাসায় নটবরের জগৎ সংসার পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—কিন্তু মিথ্যা খতের সাক্ষী হিসাবে আসে রাসবিহারী, তার পুরনো বন্ধু। রাসবিহারীকে দেখলেই নটবরের মনে হয় জগৎ অপরিবর্তনীয়। নটবরের অবচেতনে ধীরে ধীরে সমুদয় অভিনয়, সমুদয় ছলনার প্রতিক্রিয়া রূপ-পরিগ্রহ করে স্বপ্নে :

শ্মশানে চিতা জলিতেছে, চিতার আগুনে ধোঁয়া নাই, কিন্তু তার অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ নিবিড় আর নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া যেন একটা তরল স্রোতের মতো বহিয়া চলিয়াছে—

চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাইতেছে—

পুড়িতে পুড়িতে দেহটা কাষ্ঠশয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে মাটির উপর পা রাখিয়া নামিয়া দাঁড়াইল, আগুনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল—চক্ষু তার নির্নিমেষ—

আসিয়া সে সিদ্ধার্থেরই সম্মুখে দাঁড়াইল ; বলিল—চিনতে পারছ ?

—না, কে তুমি ?

—আমি সিদ্ধার্থ। আমার প্রত্যাবর্তন আশা করনি বুঝি ?

—তুমি তো মৃত।

—না, আমি জীবিত। আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে ?

স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরেও সিদ্ধার্থের মৃত চোখ দুটি যেন নির্নিমেষ নয়নে নটবরের দিকে তাকিয়েছিল। সমগ্র কাহিনীটির তাৎপর্যও এইখানে। "আমার পরিচয় চুরি করে যাকে তুমি মুগ্ধ করেছ সে তো আমার। তুমি তার কে ?" এই উক্তির মধ্যে অসাধু সিদ্ধার্থ উপাখ্যানের নাট্যরসের সংহত রূপ। সমগ্র উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু মুমূর্ষু মানুষের জিজীবিষা। নটবরের শেষ উক্তি ও-প্রসঙ্গে আলোক-সম্পাতী। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, বলে যাও

সিদ্ধার্থ কোথায়, তার জবাবে সে বলল—স্বর্গে কি নরকে তা সে জানে না, তবে এটুকু জানে সে বেঁচে নেই। সিদ্ধার্থ বেঁচে নেই—এই শেষ উক্তির সার্থকতা এইখানে যে সিদ্ধার্থ হতে চাওয়া সর্বক্ষেত্রেই মৃত হতে বাধ্য। মূল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য, ভুল সিদ্ধার্থের ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

দেখা যায় রূপকের আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সত্ত্বেও জগদীশবাবু নটবরের জীবনের মৌল সমস্যাকে বিশ্ব জীবনের মূল ধারার সঙ্গে অন্বিত করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রভাতবাবুর ক্ষেত্রে রাখালের পাপ-সাধ্যের সীমা হল রাখালের (মূলত অব্যবহৃত) দ্বন্দ্বের হেতু। এখানে দেখানো হল পাপ-সাধ্যের কোনো সীমা নেই। নটবরের পাপ-ক্ষমতার ভিতর দিয়েই প্রকাশমান পৃথিবীর শাশ্বত নিরাময়-সঞ্চারিণী শক্তি। সে জীবনান্তরের বাসনায় ছলনার পথের পথিক—সেই বাসনার এমনই অন্তর্নিহিত অমৃতধারা যে তারই এক অঞ্জলি পানে পাপও, ছলনাও অমর হতে চায়। বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নির্মাণের দিক থেকে জগদীশবাবুর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমারের থেকে একপদ অগ্রবর্তী।

চার

ঠিক এমনিভাবেই "গতিহারা জাহ্নবী"র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। অকিঞ্চন ও কিশোরীর দাম্পত্য জীবনের নিদারুণ অসঙ্গতিঘটিত নৈতিক প্রশ্ন এই উপন্যাসের ভাব-বীজ। অকিঞ্চন স্থূল-প্রবৃত্তিপরায়ণ গ্রাম্য যুবক। ভূস্বত্বভোগী, নিষ্কর্মা। তার নববিবাহিতা স্ত্রী কিশোরী নারীর স্বাভাবিক সততার অধিকারী এই দুয়ের সংঘাতে যে আপসহীন অনিবার্যতা তাকে লেখক ক্ষমাহীন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্থূল স্বামী এবং আদর্শ-রুচি পত্নীর ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত দ্বন্দ্বের আশ্চর্য শিল্পরূপ আমরা যোগাযোগ উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করি। যোগাযোগের ব্যক্তিসত্তাগুলি নিজ নিজ ইতিহাসের যোগফলে জগদীশবাবুর ব্যক্তিবৃন্দ অপেক্ষা বিরাটতর। উপন্যাসের উদ্দিষ্ট রসবস্তুকে শিল্পের ও জীবনের ন্যায়ে বন্দী করার প্রয়াসেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর অভিনিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। কুমুর ব্যক্তিত্বের উৎস, মধুসূদনের অধিকার-চেতনার মূলত শিল্পের ন্যায়েই আমাদের কাছে পরিস্ফুট। জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে সেই ঔপন্যাসিক মননশীলতার অভাব আছে। কিশোরী কেমন করে জগদীশবাবুর নায়িকা হল সে-কথা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। শুধু আমরা ধরে নিতে পারি যে লেখক একটি গ্রাম্য তরুণীর স্বাভাবিক শুচিতাবোধকে একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন।

তাই বাগ্‌দীদের মেয়ে ভুবন এবং গেরস্তর মেয়ে কিশোরীতে কোনো পার্থক্য না দেখলেও জগদীশবাবু আশ্চর্য হন না। কেননা দুইয়ের ক্ষেত্রেই শুচিতাবোধ স্বতঃসিদ্ধ।

তথাপি এই উপন্যাসে নাট্যরস সৃজনে লেখক এমন সব মুহূর্ত রচনা করেছেন যা জীবনের গভীর অন্তঃস্থলটিকেও আলোকিত করে। বাড়ির উঠানে ভুবন এসে যখন অকিঞ্চনের তার প্রতি কামার্ত আচরণের অভিযোগ উচ্চারণ করল সে-মুহূর্তের সূচীভেদ্য জমাট গাঢ়তা অতুলনীয়।—

> ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একেবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিশোরী সব শুনিল—
>
> কাত্যায়নী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধকরি কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না। কিশোরী তার পরেও বসিয়াই রহিল। কাত্যায়নী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন কড়াই পুড়িয়া ধোঁ ধোঁ করিতেছে। ভুবন বলিল—এখন আমি আসি, তুমি ক্যানে শুনলে—বলিয়া কিশোরীর রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া বসিয়া রহিল।
>
> কিশোরী বলিল—শুনলাম ভালোই হল, আচ্ছা এসো এখন। ভুবন চলিয়া গেল। এবং কাত্যায়নী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—বৌমা চান কর, বাগ্‌দী মাগীকে ছুঁয়েছ।
>
> কিশোরী বলিল—করি।
>
> তারপর মনে হইল তার বলে—জননী কতবার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

এই মুহূর্তে কিশোরীর আচরণের স্পষ্টতা আমাদের বিস্মিত করে। এবং এই আচরণগত স্পষ্টতার জন্য যে পরিস্থিতি পর্যায়ের পরম্পরা-সৃজন উপন্যাসে প্রয়োজন সে-ক্ষেত্রেও জগদীশ গুপ্তের কাহিনী-সংস্থান প্রয়াস মূল্যবান কিন্তু "তারপর মনে হইল তার বলে" এই অংশে যে রুচির প্রশ্ন জড়িত তার ইতিহাস কোথায় সে-কথা স্পষ্ট হয়নি। "বলির পর জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়"—কিশোরী সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হল। পিত্রালয়ে চলে গেল সে স্বামীগৃহ পরিহার করে।

স্বাভাবিক সততার আশ্চর্য আধার নয় কিশোরী। বরঞ্চ মানুষী আধারের দুর্বলতাও সেখানে ঈপ্সিত পূর্ণতারই জননী। স্বামী-বিরহে পিত্রালয়বাসিনী

"কিশোরীর দেহ অথবা মন স্বামীর জন্য কেমন-কেমন করেনি। এ যদি হত তবে বলতে হত নিম্নশ্রেণীর শিল্পকৌশলের আশ্রয়ী হয়েছেন জগদীশবাবু। স্বামীকে সে উপযাচক হয়ে পত্র প্রেরণ করেছিল বটে, সে ভিন্ন কারণে। ব্যক্তিমানসের সামাজিক অংশটুকু সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে ভয় পায়। সমাজ নানা সম্পর্কের জাল মেলে দিয়ে নানাদিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায় ব্যক্তির মন। কিশোরীর ক্ষণদৌর্বল্যের ইতিহাসও তাই। বৈশাখ মাস আসে, চারদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসবার, শ্বশুরবাড়িতে জামাই আসবার সোরগোল, কিশোরী বুঝল যে এ-উৎসবে তার স্থান নেই। তার বান্ধবীরা তাকে এড়িয়ে চলে। তার পত্র প্রেরণের মূলে এই সামাজিক মন। সেখানে তার শর্তে অকিঞ্চনের অসম্মতিতে অথবা উপেক্ষায় চিঠির ভূমিকা শেষ হল। তার এই পিত্রালয় জীবনের মাঝখানে একদিন সে আবিষ্কার করল অকিঞ্চনের সন্তান তার গর্ভে।

এমনিভাবে কুমুও একদিন সচকিত হয়ে উপলব্ধি করেছিল তার শারীরিক অবস্থা। অশ্লীল এবং স্থূল মধুসূদন সম্বন্ধে এমনি ঘৃণাই তখন ছিল কুমুর। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আধারে কল্পিত এই দুই চরিত্রের একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দুই রূপ লক্ষণীয়:

॥ কিশোরী ॥

কিন্তু সহজ সরল অর্থ ঘুচিয়া গিয়া কিশোরী যে অর্থ পাইল তাহা ভয়ানক। এমন নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, একদিকে হাস্যকর অন্যদিকে হৃদয়বিদারক হইয়া আর কাহারো জন্য কখনো ঘটে নাই বোধহয়। এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল—এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত—ইহা শুভ নহে, ইপ্সিত নহে। ইহা অবাঞ্ছিত এবং

॥ কুমু ॥

মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে।'…ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর-মনকে সঙ্কুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে, চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারিদিকে জমে উঠেছে। আপন

॥ কিশোরী ॥	॥ কুমু ॥
বর্জনীয় কলুষ। সর্পের যেমন বিষদাঁত থাকে ঐ পুরুষটির অন্তরে তেমন একটি জ্বালাময় প্রবৃত্তি আছে। এই সন্তান তাহার সেই প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির চিহ্ন মাত্র। বিবাহিত পত্নীর গর্ভের সন্তানের যে মূল্য লোকে দিয়া থাকে ইহার সে মূল্য নাই···তার মুখ দেখিয়া কি সে সকল যন্ত্রণা ভুলিতে পারিবে? যেমন সকল মা পারে? সে তা পারিবে না।	মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামী-পূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কত বড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝেনি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। এ-প্রসঙ্গে কুমুর শেষ উক্তি হল: “এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোওয়ানো যায় না।”

ব্যক্তি হিসাবে উভয়ের ক্ষোভ এবং নারী হিসাবে উভয়ের অসহায়তা উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটির সাদৃশ্য-সূত্র। কিশোরীর চিন্তায় যে স্পষ্টতা এবং কুমুর অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের যে ভঙ্গি তা গভীর আলোচনার বিষয়। এত বড়ো একটা ব্যাপারে যেন কুমুর প্রতিক্রিয়া তাদৃশ সাড়া দিতে পারেনি এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অশ্লীলতা এবং বীভৎসতার কথা কুমুর মনে এসেছে বটে কিন্তু শ্যামাপ্রসঙ্গ এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেখা দেয়নি। অবশ্যই কিশোরীও শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল, বলেছিল—যা খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে। এখানে কিশোরীর জীবন-বিতৃষ্ণাকে প্রতিকূলতার কাছে অসহায় করে তুলেছেন জগদীশবাবু। কিন্তু কুমুর ক্ষেত্রে তা না হওয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অপার নৈতিক সচেতনতা। কুমু না হতে পারলে আর সবকিছু হওয়াই ব্যর্থ। বধূ হওয়া এবং জননী হওয়াও। জননী হতে চলেছে বলে তার প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার কিছু বৃদ্ধি ঘটবে না। ঘটলে, নিঃশেষে আত্মসমর্পণের আত্যন্তিক পরাজয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। সংসার অন্ধের মতো বসে বসে যে অদৃষ্টের জাল বুনে চলেছে তা কখন এবং কবে থেকে আমাদের চারপাশে ঘন হয়ে নিকটবর্তী হয় আমরা তা জানি না। জালবদ্ধ হরিণের মতো জালবদ্ধ মানুষ জাল সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়ার আক্ষেপ কেঁপে ওঠে। কিশোরীর স্পষ্ট চিন্তার মধ্যে তারই

ইঙ্গিত। যে-স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বলল—যা খুশি করো আমাকে নিয়ে, সে আসলে মৃত। কুমুর অধ্যাত্ম-প্রেরণায় এই মৃত্যু থেকে সঞ্জীবিত হবার সম্পদ ছিল। কিশোরীর এবং নটবরের শেষ উক্তির মধ্যে যে আত্মিক বিনষ্টিবোধ, যে চূড়ান্ত শূন্যতা তার মধ্যে সঞ্জীবনীবোধ নেই।

এই অভাবের মূল অবশ্যই জীবন সম্বন্ধে জগদীশবাবুর attitude-এর মধ্যে। কুমুর ক্ষেত্রে কুমুর লাঞ্ছনা তার ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনা। কিশোরীর লাঞ্ছনা অদৃষ্টের লাঞ্ছনা। কুমুর যে ভাবনাংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি সেখানে দেখা যায় মধুসূদন নামক ব্যক্তির অন্তর-বাহিরের গোটা জীবনাচরণের যোগফলকেই কুমু স্বীকার করে নিতে পারেনি। অকিঞ্চনের দুশ্চরিত্রতাই সে-ক্ষেত্রে কিশোরীর বিরূপতার কারণ। কিন্তু এই কারণের মধ্যে এমন এক দৈন্য বিদ্যমান যেটা জগদীশবাবুর জীবন-সংক্রান্ত মনোভাবের বা তাঁর মনোভঙ্গির কিছুটা ক্ষতি করেছে। জীবন নিয়তির নিষ্ঠুরতার শিকার। জীবনকে নিষ্ঠুর করতে গিয়ে তিনি অকিঞ্চনকে নিষ্ঠুর করে ফেলেছেন। সেই কারণে কিশোরীর উদ্ধৃত উক্তি কুমুর চেয়ে স্পষ্ট শোনালেও কুমুব সমগ্রতা কিশোরীতে নেই, যদিও এ-প্রমাণের কোনো অভাব নেই যে কিশোরীর বেদনার তীব্রতাকে তিনি অনুভব করেছিলেন। এবং সে অনুভূতিকে গোঁজামিল দিয়ে হেয় করেননি।

জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাবু সর্বত্রই পরাভূত দেখেছেন। একটা শিল্পী-জীবনের আদি অন্তে জীবনবোধের অপরিবর্তনীয়তা শিল্প এবং জীবন দুয়ের ন্যায়েই অসত্য। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টির এই অপরিবর্ত-নীয়তা অবশ্যই আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু তিনি কখনও জীবনের প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখেননি। শুদ্ধিভবনের জন্য জীবনের অমেয় প্রয়াসকে তিনি যদি ছোট করে দেখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে শিল্পসৃষ্টিই সম্ভব হত না। সুখের বিষয় জীবনের অমেয় প্রয়াস জগদীশ গুপ্তের সার্থকতম শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সর্বদাই প্রতিফলিত। যদিও প্রাক্তনের সূত্রে অথবা কর্মফলের বন্ধনে মানুষের স্বাধীন ভূমিকা অবলুপ্ত, এমন একটা ধারণা জগদীশবাবুর ছিল, তথাপি স্বাধীন ভূমিকা-বিস্মৃত মানুষের কথা তিনি কখনও ভাবেননি। বরঞ্চ প্রাক্তন কর্মফলের বন্ধনে বন্দী মানুষ স্বীয় ভূমিকার স্বাধীন বিকাশের জন্য অশেষ যন্ত্রণাকে শিরোধার্য করেছে, হয়েছে সংগ্রামপরায়ণ—এই ছবিই মানুষের সত্য ছবি বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। এই কারণেই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মীয়সন্ধানে ব্যর্থ হবার আশঙ্কাই বেশি। একমাত্র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ছাড়া জগদীশবাবুর শিল্পস্বভাবের আত্মীয় আর কেউ নেই। উদাসীন অদৃষ্ট শক্তি, যাকে রচনা করেছে কর্মফল, এবং যন্ত্রণাহত শান্ত মানুষ—যতীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর প্রধান উপন্যাস লঘুগুরু এ-প্রসঙ্গে প্রোজ্জ্বল নিদর্শন।

যন্ত্রণাহত শান্ত মানুষ এই কথাটি লঘুগুরু উপন্যাসের টুকির সৎমা বলে পরিচিত বিশ্বম্ভরের রক্ষিতা উত্তমকে যত মানায় তত আর কাউকে নয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভর উত্তমকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে রাখবে বলে। যদিও উত্তম-বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে লেখক "নবযুগল' বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি আমরা জানি বিবাহাদির কোনো ব্যাপার এখানে নেই। "উত্তম বিশ্বম্ভরের বাড়িতে যাইবে ঠিক হইয়া গিয়াছে"—এই চুক্তিটুকুর কথা লেখক এক কথায় সমাপ্ত করেছেন। এর পরে আমরা উত্তমকে বিশ্বম্ভরের কন্যা টুকি-সমেত সংসারের কর্ণধার হিসাবে দেখি। সমগ্র লঘুগুরু উপন্যাসকে উত্তমের আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনলস যন্ত্রণাভোগ বলে বর্ণনা করা চলে। উত্তম সর্বৈবভাবে টুকির মা হতে চেয়েছিল। টুকির প্রতিষ্ঠায় এবং শুদ্ধ জীবনের বাসনায় প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই শুদ্ধতার বাসনা। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীদের সাধ্বী হিসাবে অঙ্কনে তখন পূর্বসূরী। রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখী প্রমুখ চরিত্রে শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ মানবিকতার সাহায্যে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমাজ-ভ্রষ্টাদের দিকে। শরৎচন্দ্রের কাছে পতিতার সমস্যা বলে কিছু ছিল না। পতিতারা সাধু রমণী মাত্র এই কথাটুকুই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। তাদের শ্রেণী বা ব্যক্তি কোনো রূপকেই শরৎচন্দ্র ধারণ করতে চাননি, করেননি। এইসব রমণীদের মধ্যে প্রেম আছে এবং প্রেমেই সব শুদ্ধ, সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব অনেক বড়ো কথা, এই ছিল মোটামুটি শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। উত্তমের সাহায্যে জগদীশবাবু দেহজীবিনী এক নারীর গোটা জীবনের বাসনার সমস্যাকে রূপদান করেছেন। শরৎচন্দ্রের মতো সহানুভূতির প্রশ্ন জগদীশ গুপ্তের মুখ্য প্রশ্ন ছিল না।

নাট্যকারের নির্লিপ্তি জগদীশবাবুর আদর্শ বলে তিনি উপন্যাসে যৎপরোনাস্তি স্বল্পভাষী। এ-স্বল্পভাষিতা কখনো কখনো তাঁকে ত্রুটির সীমায় উপনীত করেছে। করেনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে উত্তম তার অন্যতম। উত্তম চেয়েছিল টুকির জন্য তার সমস্ত ক্ষেত্রে অতীতকে মুছে ফেলতে। পাড়াপ্রতিবেশীর কুৎসা, বিশ্বম্ভরের দেওয়া অমর্যাদা এবং শতমুখী সামাজিক দংশনকে সে সহ্য করেছে শান্ত চিত্তে

এবং পক্ষীমাতার মতো টুকির নবজাগ্রত নানা প্রশ্নের হাত থেকে, পরিবেশের কবল থেকে, টুকিকে ডানার আড়াল দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে সে টুকির বিয়ে দিয়েছে। টুকির ভালো বরের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। উত্তম যা কিছু এ-সংসারে ভালো বলে জানে তা সবই টুকিকে শিখিয়েছে। ঘর গেরস্তালির মাঙ্গলিক কর্মাদি, ক্রোচেট বোনা প্রভৃতি টুকিকে শিখিয়ে উত্তম যেন টুকির ভিতর দিয়ে নিজের জীবনেরই সংশোধিত রূপ সৃজন করে চলছিল। টুকির বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতায় প্রতি পদে পদে আমাদের চোখের সামনে উত্তমের সেই প্রয়াস ভেঙে খান খান হয়ে গেল! টুকির অন্ধকারে অন্তর্ধানের ভিতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমের সাধনার অন্ধকার-বিলুপ্তি—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বম্ভর, পাড়া প্রতিবাসী, বিশ্বম্ভরের বন্ধুবান্ধব সকলের কাছ থেকে শুধু আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপরচনায় লঘুগুরু অনুপম। লঘুগুরু তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ করি জগদীশ গুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।

সাত

এতক্ষণে একটা কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে জগদীশবাবু তাঁর সমস্ত উপন্যাসে একই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ-প্রভাত-কুমার-শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর রচনায় পরিস্ফুট কিন্তু তাঁর এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকে। সে বক্তব্য হল এই : মানুষ তার কর্মফলকে মুছে ফেলে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবর, কিশোরী—এরা সকলেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেননি। জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।

তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি

আমাদের বাংলা উপন্যাস পরিক্রমার এই পরিমিত প্রয়াসে এতক্ষণে একটা কথা পরোক্ষে স্পষ্ট হয়েছে—Pure Novel বা বিশুদ্ধ উপন্যাস বলতে যা বোঝায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তা প্রধানত অনুপস্থিত। সুবিন্যস্ত পরিকল্পনায় শুদ্ধ মানবিক সম্পর্কগুলির অভিব্যক্তি সাধনকে শিল্প লক্ষ্য হিসাবে অবিচল রেখে কোনো জেন অস্টেন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হননি। তিরিশের যুগের বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই লক্ষণটির বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জেন্ অস্টেনের ন্যায় উপন্যাস-শিল্পীর কল্পনার স্থৈর্যে এবং সংশয়হীনতায় উত্তর-বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল। ইংলণ্ডীয় উপন্যাস সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই এই উত্তর-বিপ্লবী নিশ্চিত অবিচলতার পরিমণ্ডল ছিল সহজে ক্রিয়াশীল। জেন্ অস্টেন ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তি হলেও তাঁর উপন্যাসের মাটিতে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের বীজের ফসল। কল্পনার স্থৈর্য এবং নিশ্চিন্ত অবিচলতার প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব শতাব্দীর উত্তরাধিকারকে বহন করেছেন। এই দুটি গুণের অধিকারিণী তিনি ছিলেন বলেই তাঁর রচনা বিশুদ্ধ উপন্যাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

বিশুদ্ধ উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিশ্চিন্ত নিরাসক্তি অবশ্যই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দুর্লভ। এই দুর্লভতার হেতু আমাদের স্বদেশীয় জীবন-বিন্যাসের মধ্যে নিহিত। প্রথমত, আমাদের সমাজ-জীবনে আমরা ইংলণ্ডীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানের ন্যায় ব্যাপক পরিবর্তনগর্ভ কোনো সামাজিক আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের যা কিছু চেতনাগত আলোড়ন তা প্রধানত চাকুরিমুখী ও কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে জীবনের সার্বিক প্রসারের কোনো ভূমিকা এখানে প্রস্তুত হয়নি। সুতরাং জেন্ অস্টেনের ন্যায় ঔপন্যাসিক যে উত্তর-বিপ্লবী নিশ্চিন্ত অবিচলতার উত্তরাধিকারিণী হতে পেরেছিলেন এখানে তা কারো পক্ষে হওয়া দুঃসম্ভব ছিল। সে-কারণেই কীর্তিপ্রধান জাতির প্রথম ঔপন্যাসিক প্রয়াসে যে বাস্তব ব্যাখ্যার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, মানবিক সম্পর্কগুলির নিখাদ রূপায়ণ মুখ্য হয়ে ওঠে—সে জাতীয় কীর্তিগর্ভ বনিয়াদ

এখানে ছিল অনুপস্থিত। বঙ্কিমের উপন্যাসের সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্কগুলির বিষয়ে তাঁর পরাঙ্মুখতা লক্ষ্যণীয়। দ্বিতীয়ত, ঔপনিবেশিক জীবনের শতবন্ধন জাল জটিলতায় সমস্যা আমাদের নিত্য সহচর। যেখানে কিছুরই সমাধান হয়নি—অথচ সমাধানের আবেগও নয় তীব্র—সেখানে সমস্যা সদা-সর্বদাই তদপেক্ষা দীর্ঘতর ছায়া সৃজন করে। সমুদয় বাংলা উপন্যাসে—সমস্যাসঙ্কুলতাই প্রধান।

(সুতরাং (তিরিশের যুগের উপান্তে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন, এই দ্বিবিধ হেতুরই শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। বিশুদ্ধ উপন্যাসের অবকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ তিরোহিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাস্তব অবস্থায় তার একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার চরিত্রটিকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ইতিহাস ব্যাখ্যায় শুধু তার সূত্রটুকুই হাতে আসে। কেননা এমন বিমিশ্র অনুভূতিকে সমাজে এবং সাহিত্যে যুগপৎ উপস্থিত হতে অল্পই দেখা গেছে। একদিকে যুদ্ধ দিগন্তকে বিস্তৃত করেছে, আর একদিকে যুদ্ধ-পরবর্তী অধ্যায়েই চাকুরিপ্রাণ মধ্যবিত্তিক সত্যযুগের অবসান ঘটল। একদিকে বিপ্লব ও রূপান্তরের বিশ্ববোধ, অপর দিকে ঘন ঘন জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের নিষ্ফল আলোড়ন; একদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন-লোকের আবিষ্কার, অপর দিকে এঙ্গেলস্-মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নবীন জ্ঞান—তিরিশের উপান্তে এই জট-পাকানো বাস্তব জীবনে গ্রন্থিমোচনের জন্য দুষ্পাঠ্য বাস্তবকে ব্যাখ্যা করার দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের।)

দুই

কল্লোল এই সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যস্ত ছিল যে পরিমাণে, সে পরিমাণে প্রস্তুত ছিল না। এই ব্যস্ততায় সে যে আগ্রহে পাঠ করেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য, সেই অনুসারে পাঠ করেনি দেশের জীবনকে। বেদে উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রের সারমর্মে এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত এ-দেশের সকল সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আলোক-সম্পাতী। যে বোহেমিয়ান বিলাসীকে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পানপাত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আসব পান করে বিচরণ করতে দেখেছি আমরা বিদেশী সাহিত্যে, এখানে তার উপযুক্ত ভূমি ছিল না। উপন্যাসের পক্ষে যা পরম প্রয়োজনীয়: দেশ-কালের সঙ্গে উপন্যাসের ভাবমণ্ডলের যোগসাধন—কল্লোলগোষ্ঠীর ভিতরে তার পরম অভাব তাঁদের সার্থক উপন্যাস

লিখতে দেয়নি। গোকুল নাগের পথিকের আংশিক সাফল্যের কথা বাদ দিলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক, উপনায়ন, মিছিল কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য উপন্যাস। তিনটি উপন্যাসেই কল্লোলের যা সম্ভাবনা ছিল, এবং যে-সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্যকুমারের বেদে ও যুবনাশ্বের পটলডাঙার পাঁচালিতেই নিঃশেষিত হত—তার সুচারু বিকাশ ঘটেছে। তার কারণ একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রই হলেন কল্লোলের ক্রোড়ে লালিত সেই লেখক যাঁর অসঙ্গতি অল্প। যদিও ছোট গল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্রে আর কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রে দুস্তর পার্থক্য এবং ঔপন্যাসিকও আবার এই দুইকেই ছাড়িয়ে অন্যপথগামী তথাপি মানুষের দুঃখ-বেদনাকে মূল্য প্রদানের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমগ্র শিল্পপ্রয়াসে একটা সূত্র-বিধৃতি ঘটেছে। নইলে সাড়া থেকে তিথিডোরের যদি বা ব্যাখ্যা চলে, বেদে থেকে পরমপুরুষের রহস্য বোঝা যায় একমাত্র এইভাবে যে সাহসিকতায় বিস্ময় সৃজনের দুর্মর অভীপ্সাই সমগ্র কল্লোলী লেখকদের মূল প্রয়াস।

তথাপি এই যুগের না হলেও প্রথম যুদ্ধোত্তর কলকাতার একটি প্রতিফলন মিছিল এবং উপনায়নে পড়েছে। উন্মূলিত এবং উদ্দেশ্যহীন নিম্ন মধ্যবিত্ত কিশোর বিনুর জীবনে অথবা মেস-বাড়ির অসহযোগ-আন্দোলনোত্তর নিস্তরঙ্গ বেকার জীবনে চাকুরির সত্যযুগের যে অবসান ঘটেছে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে এই সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটা মানসিক দৃষ্টির অধিকারী হতে পেরেছিলেন যা তাঁকে কল্লোলের যুগের অশ্লীলতার ফ্যাশন থেকে মুক্ত রেখেছিল। অবশ্য কল্লোলের স্থূল বাস্তব বর্ণনায় একটা সামাজিক সত্যের ছায়া পড়েছিল। কল্লোলের যুগের ঐ দেহাশ্রয়ী বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের পরের সর্বাঙ্গীণ অস্থিরতার দ্বারা চিহ্নিত। এবং সে-অস্থিরতাও আবার উপনিবেশের জীবনের চূড়ান্ত বিফলতাবোধ-সঞ্জাত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রধান উপন্যাসগুলিতে এই বিফলতাবোধের ব্যবহার ঘটেছে জীবনের শাশ্বত নীতিতে বিশ্বাস-ব্যতিরিক্ত ভাবে নয়। এই স্থিরতায় তিনি পরিহার করেছেন অশ্লীলতা। কিন্তু তাতেই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যভেদ সম্ভব হয়নি। উপনায়ন উপন্যাসে বিনুর দৃষ্টিকে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে করতে অকস্মাৎ কেন্দ্রচ্যুতি ঔপন্যাসিক অসঙ্গতিরই প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের যিনি রাজা শুদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপন্যাসে তিনি অকিঞ্চিৎকর।

তিন

তিরিশের ঔপন্যাসিকবৃন্দ সে দিক থেকে যেমন কল্লোলের তেমন শরৎচন্দ্রেরও সীমাবদ্ধতাকে উপলব্ধি করেছিলেন গভীরভাবে। যদিও শরৎচন্দ্রের চৈতন্য-সঞ্চারী প্রয়াসের পাঠে তাঁরা ছিলেন দীক্ষিত, এবং কল্লোলের সাহসিকতাকে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন ন্যায়তই। তিরিশের প্রধান ঔপন্যাসিকদের বুদ্ধিপ্রধান (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার) এবং হৃদয়প্রধান (তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক) এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করলেও এই বিভাগের জন্য কঠিন সীমারেখা ব্যবহার করা চলে না। বরঞ্চ বলা চলে, সৎ-ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টায় অনিবার্যভাবে মননের যে আলোকসম্পাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে তিরিশের যুগের সমগ্র ঔপন্যাসিক প্রয়াস সেই মননশীলতার প্রয়োগে বিশিষ্ট। (তারাশঙ্করের দেশ-জিজ্ঞাসা, বিভূতিভূষণের বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা বা ধূর্জটিপ্রসাদের নায়কের সমগ্র মানসের টানাপোড়েন হৃদয়েরও ব্যাপার, বুদ্ধিরও ব্যাপার।) বস্তুত হৃদয় নায়ক বস্তুটি তো সত্যই হৃৎপিণ্ডের ধারে কাছে নেই—সে বরঞ্চ রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কের শক্তির মধ্যেই। তিরিশের বাংলা উপন্যাস এই বুদ্ধির স্বাভাবিক কিরণসম্পাতে উজ্জ্বল। He who thinks reasonably must think morally—বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক উত্তরাধিকার এই পথেরই নির্দেশক। প্রচুর পঠনশীলতায় অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলায় এই নির্দেশেরই স্বীকৃতি।

তিরিশের কালে বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলার জন্য যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে তার মূলে একদিকে যেমন বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসাবে উপলব্ধি, অপরদিকে তেমনি মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার ভূমিকা ক্রিয়াশীল। সে কারণে তিরিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক সংকটের স্বীকৃতি যেমন স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ়তাও তেমনি লক্ষণীয়। এই দৃঢ়তার মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশার চেহারা গড়ে উঠেছিল উপনিবেশের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে। যত অস্পষ্টই হোক এই আশার আলোকে চেতনাচঞ্চল মধ্যবিত্ত যুবকের প্রেরণা এবং বেদনার (শিবনাথ ও শশী) কথা ধ্বনিত হয়েছে আমাদের উপন্যাসে। সম্ভবত এই কারণেই শরৎচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্র প্রাধান্য এবং কল্লোল-পন্থীদের নেতিভিত্তিক উন্মূল

যুবকদের প্রসঙ্গ পরিহার করে তিরিশের উপন্যাস আবার বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারা বহন করে পুরুষ-চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে। অপু-শিবনাথ-শশী-বাদল-খগেনবাবু-অমিত এই যুগের উপযুক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। ভাব-প্রবণ নায়ক অপেক্ষা চিন্তাশীল নায়কের প্রতি পক্ষপাত তিরিশের চেতনা-বিস্তারের অনলস প্রয়াসের পটেই প্রাসঙ্গিক। এই চেতনার বিস্তৃতসাধনের জন্য তিরিশের ঔপন্যাসিকবৃন্দ তাঁদের উপন্যাসের বিষয়-নির্বাচনে ও শিল্পপ্রয়াসে অনেক বেশি সমগ্রসন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তারাশঙ্করের গ্রামীণ সমাজবীক্ষা এবং বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অভিমুখীনতা উপন্যাসের কাম্য সমগ্রতা-সন্ধানের নিদর্শন। সমগ্রতা সন্ধানের এই বিভিন্নমুখী প্রয়াসের জন্যই তিরিশের যুগেই ঘটল বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রসার। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কালে এ ছিল শুধু একক পুরুষের প্রবল কীর্তি। তিরিশের যুগেই প্রথম পাওয়া গেল বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একাধিক শক্তিমানের একত্র সমাবেশ। সাহিত্যে সর্বতোমুখী কর্মিষ্ঠতার কাল বলে তিরিশের কালকে আখ্যাত করা যায়। সে কর্মিষ্ঠতার মূলে ছিল এক পরম মানবিক বিশ্বাস—বিশ্বাস মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে, মানুষের জীবনের প্রতি মমতা সম্বন্ধে। একেই আমরা ব্যাপক জীবনবোধ বলে আখ্যাত করেছি। তিরিশের লেখকদের প্রসঙ্গে গণজীবনের সঙ্গে পরিচিতি, মাটির মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রভৃতি যে-সব বিশেষণোক্তি ব্যবহৃত হত তার মূলে জীবন সম্বন্ধে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর চেতনা। বিস্তৃতি ও গভীরতায় এ-চেতনা বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের ফল।

এই বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের মৌল প্রেরণায় আলোচ্য সময়ে উপন্যাসের আঙ্গিক-সাধনারও একটা ধারা ক্ষীণভাবে গড়ে উঠতে থাকে। বনফুলের আঙ্গিকসাধনা নানা পথচারী না হলে, এবং তিনি বক্তব্য নির্মাণে অতিমাত্রায় আলস্যবশত শেষ পর্যন্ত নেতিধর্মী লক্ষ্যহীনতায় ব্যর্থ না হলে, তাঁর 'সে ও আমি' উপন্যাসের আঙ্গিক-নিরীক্ষা মূল্যবান পরিণতির পথে অগ্রসর হতে পারত। 'হাটে বাজারে' যতখানি না উপন্যাস তার চেয়ে বেশী চিত্রধর্মী ঘটনাপুঞ্জের বা অভিজ্ঞতা সমূহের ধারাবিবরণ। ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে বা স্বগত আলাপনের মেজাজে বনফুল শতধা বিভক্ত মধ্যবিত্ত যুবমানসের অসঙ্গতিময় চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু লেখকের নির্মম নাটকীয় ব্যঙ্গদৃষ্টি যে পরিমাণে উত্তম ছোট গল্পের স্রষ্টা, শুধু সেই বক্তব্যটুকুই কখনও মহৎ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। জঙ্গমের বিশাল আয়োজন এ-কারণেই ব্যর্থ। 'রাত্রি' 'সপ্তর্ষি', 'ডানা', 'ত্রিবর্ণ' প্রভৃতি উপন্যাসে বনফুলের

অন্যান্য নিরপেক্ষ বিচিত্র আঙ্গিক সাধনার কথা নিশ্চয় স্মরণীয়। জীবনের একধরণের অধুনা-লুপ্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বনফুলের সচেতনতাও এ বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ন্যূনতার কারণেই তাঁর আঙ্গিক সাধনা কেবল কসরৎ থেকে গেল। সবমিলিয়ে এখনও যেন মনে হয় 'মৃগয়া ও 'কিছুক্ষণ'ই বনফুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আবার এই বক্তব্য সম্বন্ধে অতিসচেতনতাই আর একজন লেখককে তাঁর সাধনায় অগ্রসর হতে দিল না—তিনি গোপাল হালদার। 'একদা' বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক গল্পধারায় অকস্মাৎ আশ্চর্য শক্তিশালী ব্যতিক্রম। আজ বাংলা সাহিত্যে যখন সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে চেতনা-প্রবাহ প্রভৃতি বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হচ্ছে তখন একদার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে অন্তঃশীলা এবং 'একদা' থেকেই এই নতুন লেখকেরা প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন—এঁরা অভিনব কিছু নন। একদার একটি দিনের মুকুরে কলকাতা, সমকালান স্বদেশ—কাজেই বিশ্বজগৎ এবং ব্যক্তিমানসের সকল ভগ্নাংশে সঙ্কটাপন্ন সভ্যতার ছবি—সবই প্রতিফলিত। একদার ভাষা সম্বন্ধে লেখক সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। যে-কারণে পারেননি সেটা হল লেখকের বক্তব্য-সচেতনতা। যে-দৃষ্টির সাহায্যে লেখকের বিশ্ববীক্ষা তা জয়েস প্রস্তাবিত ভাষারীতিকে আত্মসাৎ করে নিতে পারেনি। এই সমস্যার কারণেই লেখকের এই পথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদচারণা সার্থক নয়। বলা প্রয়োজন আজকের নতুন প্রয়াসশীলদের মধ্যেও এই সমস্যা অগ্নিবৎ জ্বলন্ত।

তিরিশের যুগেই বাংলা উপন্যাস সাবালকের দ্বিধামুক্তি অর্জন করেছে। এখন আমরা এ-যুগের লেখকদের প্রধান ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় গ্রহণ করব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

নগর-জীবনের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশক মধ্যবিত্তের চাকুরিগত নিরাপত্তার অভাব, যা ত্রিশের আর্থিক সংকটে প্রথম উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল—এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ও পর্বতের মূষিকপ্রসব ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্ত-জীবন তখন আশাহীন ·হয়নি। বরঞ্চ এবম্বিধ অবস্থায় চিন্তার বিভিন্ন স্তরের সক্রিয়তায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন বিশ্বাস এবং আশার মূল জাতীয় জীবনের গভীরে মেলে দিতে চেয়েছে। শশী, অপু অথবা শিবনাথ কিংবা শঙ্কর, প্রত্যেকেই পরস্পরের থেকে দূরে হলেও, এদের সমস্যার একটা সাধারণ উৎস বিদ্যমান ছিল। জীবন সম্পর্কিত আশা বা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারা-না-পারার ব্যাপারটাই এদের জীবনের মুখ্য ব্যাপার। অপুর শিশুচিত্তে স্দূরের আহ্বান, অথবা শশীর নগর-স্বপ্নের সঙ্গে গাওদিয়ার সংঘর্ষ কিংবা শিবনাথের ধরিত্রীকে চেনার বাসনা জীবন সম্পর্কিত আশা-আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ। এটা অবশ্য সে-যুগেই সম্ভব, যে-যুগে জাতীয় মানস সুদৃঢ় আশাবাদিতার ন্যায়ে ও শৃঙ্খলে বাঁধা। (স্বপ্ন থাকলে তবেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনার কথাও ওঠে এই কারণে শশী এ-যুগেই প্রাসঙ্গিক।) এই আশাবাদিতার মূল জাগ্রত জাতীয় চেতনায়—যে জাতীয় চেতনা ১৯০৫ সালের দেশমাতৃকার বন্দনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। উপনিবেশের জোয়াল কাঁধে চেপে আছে বলেই স্বদেশকে, দেশজ মানুষকে, দেশের প্রকৃতিকে চেনা যাচ্ছে না, গ্রামকে যে রূপান্তর দিতে চাই তা দিতে পারছি না। কখনো স্পষ্টভাবে, অধিকাংশ সময়ে অস্পষ্টভাবে এটাই এ-যুগের সকল সাহিত্যকর্মের প্রধান কথা। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূল ছকের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের আশা-প্রত্যাশার সংঘাতের রূপায়ণে এ-যুগের উপন্যাসের শিল্পকর্ম নিয়োজিত হয়েছে। এখানে আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ-যুগের প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। দীর্ঘ সাহিত্যজীবন এবং তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিতে তিনি বিশিষ্ট। জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী আগ্রহবিশিষ্ট তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সাহিত্যকর্মের আলোচনা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব ও তৎপরবর্তী বাংলা উপন্যাসের শক্তিসামর্থ্যেরই একটা প্রধান পর্যায়ের আলোচনা।

দুই

যে ভৌগোলিক অঞ্চলকে তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলীর জন্য নির্বাচন করেছেন সেটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বক্ষেত্র। কিন্তু এটাই সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নানা দিক থেকে জীবন সম্বন্ধে বহুমুখী কৌতূহল এবং আগ্রহ সঞ্চার করার ক্ষমতা এ-অঞ্চলে বর্তমান। বীরভূম-বর্ধমান-বাঁকুড়ার ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরই জ্ঞান আছে তিনিই জানেন যে একদিকে বর্ধমানের শস্যপূর্ণ আদিগন্ত প্রান্তর, অপরদিকে বীরভূম ও বাঁকুড়ার তরঙ্গময় কাঁকুরে রুক্ষতা, জীবনের দ্বৈত রূপকে এখানে যুগপৎ ধরে রেখেছে। কাজেই পিপাসার্ত বীরভূমের দুর্ভিক্ষ (ধাত্রীদেবতা) এবং দু-কূলপ্লাবী ময়ুরাক্ষী (গণদেবতা) দুইই এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মতো কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষীকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে—যেটা এ-অঞ্চলেরই নিজস্ব ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকেও ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর গড়ে তুলতে গিয়ে যাযাবরত্ব ত্যাগের আহত বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় এখানে স্পষ্ট (কালিন্দী)। দুর্বল কৃষির ওপর নির্ভরশীল গ্রামীণ বেকারের অজস্র টাইপ স্বভাবতই বাঁকুড়া-বীরভূমের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববঙ্গের তুলনায় অধিকতর গ্রামমুখিতা এবং অধিকতর আলস্য এই বৈশিষ্ট্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে (অগ্রদানী এবং কবির বিপ্রপদ)। কৃষি দুর্বল বলেই জীবিকাহীন অনন্যোপায় বাউরী প্রভৃতি শ্রেণীর তথাকথিত "স্বভাব অপরাধিত্ব" এখানে অধিকমাত্রায় প্রকট। আবার অপরদিকে একই কারণে বাউল, বৈরাগী, বোষ্টম এবং কবির দল, ঝুমুরের দল প্রভৃতির আধিক্য তথাকথিত "স্বভাব অপরাধী" শ্রেণীর সঙ্গে একটা বৈপরীত্য সৃজন করে রয়েছে (রাইকমল ও কবি)।

দ্বন্দ্বই রাঢ় অঞ্চলের জীবনের প্রধান পরিচয়সূত্র এটা আরো বেশি বোঝা যায় যখন সমগ্রভাবে এ-অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপটা চোখে পড়ে। একদিকে রানীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লাখনির শিল্পাঞ্চল এবং অপরদিকে তারই সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবংশগুলি যে-কোনো চিন্তাশীল লেখকের কাছেই যথেষ্ট আগ্রহের বিষয়। বর্ধমান-বীরভূমের এই বিচিত্র রূপটি বাংলা দেশের অন্যত্র

দুর্লভ। চটকলের চেহারা অন্য। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্টের একচেটিয়া ব্যবসায়ে বাঙালী শিল্পপতির ভূমিকা লুপ্ত। শ্রমের প্রতিযোগিতায় স্বল্পশ্রমী বাঙালী মজুরদের ভূমিকাও গৌণ। একমাত্র রানীগঞ্জ-বরাকর অঞ্চলেই সেই শ্রেণীর বাঙালী শিল্পপতির দেখা পাওয়া যাবে যাঁরা জমিদারি সম্পত্তি বেচে কয়লার ব্যবসায়ে নেমেছেন। এই নতুন বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রেণীর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সংঘাত এখানকার মাটি থেকেই উদ্ভূত ব্যাপার। ফিউডাল অর্থনৈতিক কাঠামোর চারদিকের রূপান্তরমুখী ইতিহাস কী ভাঙন, আলোড়ন সৃষ্টি করল তা বলার উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্ধমান-বীরভূম (হাঁসুলিবাঁকের উপকথার চাকরানভোগী কাহারপাড়া বনাম রেলপথের বিস্তৃতির দ্বন্দ্ব স্মরণীয়)। ভারতীয় কয়লার পৃথিবীর বাজার নেই। আর বিদেশী পুঁজি ভারতবর্ষে সে-ক্ষেত্রে একচেটিয়া হয়নি, যে-ক্ষেত্রে পাট বা চায়ের মতো একচেটিয়া বাজারের সম্ভাবনা কম। সুতরাং উপনিবেশের প্রভুদের ছত্রছায়ায় থেকেও এক ধরনের অর্ধগঠিত বাঙালী শিল্পপতি ও বাঙালী ব্যবসায়ী চরিত্রের বিকাশ এ-অঞ্চলে ঘটেছে—যা বাংলার অন্যত্র বিরল। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এ-ধরনের ব্যবসায়ীর চরিত্রের ভূমিকা সর্বত্রই বিদ্যমান। কালিন্দীর বিমল মুখুজ্যে বা শিবনাথের শ্বশুর (ধাত্রীদেবতা) বা আরতির বাবা (উত্তরায়ণ) শুধু নয়, আরো প্রমাণ এ-প্রসঙ্গে দেওয়া চলে। অবশ্য এদের ভূমিকা সম্বন্ধে তারাশঙ্কর ওয়াকিবাল হলেও তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর উপন্যাসে হয়নি। তথাপি এটা তো খুবই সুস্পষ্ট যে এই উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংঘর্ষে ধ্বংসমুখী সামন্ত জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের চরিত্র তারাশঙ্কর উপন্যাসে অনেকবার ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের দিক দিয়ে এটা কতটা তাৎপর্যসূচক তা শিল্পবিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

তিন

এই বিষয়বস্তু ব্যবহারের সময় উপন্যাসের কাঠামোগত পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তাও এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাসরাজিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—একভাগে পড়ে ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা প্রভৃতি, আর একভাগে পড়ে হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাধা প্রভৃতি। এর মধ্যে শেষোক্ত উপন্যাসগুলির প্যাটার্নে রূপকথার প্রভাব সহজেই ধরা যায়। করালী, নাগুঠাকুর যেন

রূপকথার সেই নায়ক যে আঁধারপুরীতে প্রতিকূল দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতে, আঁধারপুরী ভেঙে দেয়।) কথকতার ভঙ্গিতে প্রথমাবধি ছন্দায়িত ভাষায় বিধৃত এই কাহিনীগুলি শুধু যে লোকজীবনের সঙ্গেই তারাশঙ্করের পরিচয়ের প্রমাণ তাই নয়, লৌকিক সাহিত্যধারার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ের প্রমাণও বটে। (কিন্তু নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসেই নয়, মনে হয় রূপকথার আদল তারাশঙ্করের অন্য বৃহৎ উপন্যাসগুলিতেও সমানভাবে বিদ্যমান। তারাশঙ্করের বড়ো উপন্যাসের গল্প সর্বদাই এই। একটি পুরাতন জীবনের ছকে এক নবীন নায়ক কী পরিবর্তনের পর্যায় নিয়ে এল তারই সংঘাত-সংঘর্ষকে ভিত্তি করে তারাশঙ্করের উপন্যাসের নাট্যরস জমে ওঠে। তাঁর নায়কেরা প্রাচীন বাংলা কাহিনী-কাব্যের নায়কের মতো সর্বদাই ধীরোদাত্ত, রূপবান, গুণবান, অক্রোধী, দৃঢ়চেতা এবং মেধাবী (শিবনাথ, অহীন, দেবু ঘোষ থেকে শুরু করে উত্তরায়ণের প্রবীর পর্যন্ত স্মরণীয়)।) তাঁর মধ্যবিত্ত নায়কেরা সবসময়েই অভিজাত বংশোদ্ভূত। নায়ক-চরিত্রের এই পরিকল্পনা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের নায়ক পরিকল্পনার কথা মনে করিয়ে দেয়—অধিকন্তু তারাশঙ্করের উপন্যাসের গ্রামীণ পরিবেশ-পটভূমিতে তা সহজেই রূপকথার গল্পের প্যাটার্ন গ্রহণ করতে পারে (অবশ্য এর একটা সংকটও আছে)।

বলা প্রয়োজন যে পূর্ব পরিচ্ছেদে কথিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে—তথা তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতার সঙ্গে—এই রূপকথার প্যাটার্নের সম্পর্ক নিবিড়। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটা হল এই যে আঞ্চলিক জীবনবিন্যাসের ওপর কোনো বহিরাগত শক্তির আঘাত যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার রূপায়ণ। (যথাদৃষ্ট স্থির ছবির ন্যায় মাত্র আঞ্চলিক জীবনই প্রচুর পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে কখনো সার্থক উপন্যাস গড়ে তুলতে পারে না। হার্ডির উপন্যাসে Ballad tale-এর প্যাটার্ন এবং তারাশঙ্করের উপন্যাসে রূপকথার প্যাটার্ন রচনার হেতু এই সূত্রের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। এই উভয় লেখকেরই উপন্যাসে ব্যবহৃত জমাট কাব্যরস এবং নাট্যরস এই বিশেষ জীবন-বিন্যাসের জন্যই এমন সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। ওয়েসেক্স অঞ্চলের Agricultural Decline-এর সঙ্গে অবশ্যই বর্ধমান-বীরভূমের আংশিকভাবে আহত ভূম্যধিকারীদের কোনো তুলনা হয় না। কেননা ব্যাপক শিল্প-রূপান্তর এবং ১৮৪৬ সালে শস্যে স্বাধীন বাণিজ্যের ফলে Agricultural Decline,

আর সম্রাজ্ঞীর ছত্রছায়ায় গজিয়ে-ওঠা কলোনির কয়লার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বা অন্য কোনো আঘাতে কম্পমান সামন্তদের কারো কারো ব্যক্তিগত দুঃখভোগ নিঃসন্দেহে এক ব্যাপার নয়। ফলে উপন্যাসের বিষয়ের দিক দিয়ে ইতিহাসের বলিষ্ঠ সাহায্য হার্ডি যতটা পেয়েছেন তারাশঙ্কর ততটা পাননি। তথাপি উপন্যাসে জীবনকে শিল্পরূপে বিন্যস্ত করতে গিয়ে হার্ডির Ballad tale-এর প্যাটার্নের মতো রূপকথার প্যাটার্নের আশ্রয় গ্রহণ তারাশঙ্করের পক্ষে খুবই সমীচীন হয়েছে। এইভাবে লোকসাহিত্যের বলিষ্ঠ ধারার সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনার পন্থানুসরণের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তি-প্রতিভার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের এক মিলন খুঁজে পেলেন। এটাই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব মহৎ দান।

চার

'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এটা তারাশঙ্করেরও প্রধান বক্তব্য। উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব অবলম্বনে তারাশঙ্কর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তার রূপটাও প্রণিধানযোগ্য। সাধারণত সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির পশ্চাতে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের একটা ছায়া কাজ করে। শ্রীহরি ঘোষ এবং দেবু, বা ইন্দ্র রায় এবং বিমলবাবু বা শিবনাথ এবং তার শ্বশুরবাড়ি বা করালী এবং কাহারপাড়া এদের সংঘাতের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক সূত্রগুলির সন্ধান যেমন মেলে তেমনি সাধারণভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ভালো-মন্দের যুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ প্রভৃতি মোটা দাগের নৈতিক প্রশ্নও জড়িত থাকে। রূপকথার প্যাটার্ন এই নৈতিক চেতনাকে এভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কথক যেমন তার সমস্ত কথকতার শেষে স্বস্তিবাণী উচ্চারণ করেন—তারাশঙ্করেরও সমস্ত উপন্যাসের ফলশ্রুতি সেই স্বস্তিবাণী। সম্ভবত সমস্ত অকল্যাণ বা পাপের মধ্যেও পুণ্যের জন্য একটা সংগ্রাম বিদ্যমান এমন ধরনের একটা বক্তব্যে তিনি বিশ্বাসী। রামায়ণ-মহাভারতাশ্রয়ী ভারতীয় চাষী যেমন 'সত্যের' জয় অবশ্যম্ভাবী'—এ-কথাকে বিশ্বাস করে, তারাশঙ্করের বিশ্বাসেও সেই unsophisticated সারল্য আশ্রয়ের চেষ্টা উপস্থিত। প্রত্যেক মহৎ ঔপন্যাসিকের সৃজিত চরিত্রাবলীই জীবনের ঘাটে ঘাটে নিজের অভ্রান্ত সত্তাকে খুঁজে ফেরে। নেখল্যুডফই হোক বা গোরাই হোক—নিহিলিস্ট বাজারভ ব্যতীত—মহৎ উপন্যাসে বোধকরি সকলেই সেই অস্তিত্বের পূর্ণাদর্শের সন্ধানী।

বাজারভের নেতিবাচনে এবং বিমুখ ঔদাসীন্যের পক্ষে এটা অপ্রয়োজনীয়। এই কারণে অপ্রয়োজনীয় যে, বুদ্ধিজীবী রুশ মধ্যবিত্তের তৎকালীন খণ্ডায়নই সেখানে দেখবার বিষয় ছিল। বাজারভ তার চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবতার মাঝখানে বিশ্বাস খুঁজে পেলে এই দেখানোর কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। তারাশঙ্করের প্রশ্ন অন্যতর। মানুষ বিশ্বাস খুঁজে পায় তার অন্তরে—বাস্তব ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বিশ্বাসেরই শুদ্ধতা ঘটে। তাই টলস্টয়ের এই পথে তারাশঙ্কর পদার্পণ করতে চেয়েছেন। কোনো মহৎ উপলব্ধির স্তরে জীবন যদি উপনীত না হয় তবে জীবনের ঘাটে ঘাটে ফেরা নিরর্থক। জীবনের অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি সেই মহৎ বিশ্বাসে মানুষকে নিয়ে যায়। নিতাই (কবি), কৃষ্ণেন্দু (সপ্তপদী), শিবনাথ (ধাত্রীদেবতা), প্রবীর (উত্তরায়ণ), এরা সকলেই নিজ নিজ ঘটনাময় জীবনের শেষে এই বৃহত্তর উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই উপলব্ধিটা কতখানি জীবন থেকে উদ্ভূত আর কতখানি লেখকের আরোপিত, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।

এতক্ষণ আমরা দেখলাম যেটুকু তা সংক্ষেপে এই : (তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা যেমন তাঁর উপন্যাসের প্যাটার্নকে গঠন করতে সাহায্য করেছে তেমনি তারাশঙ্করের নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্নাবলীও সেই প্যাটার্নের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পেয়েছে। জীবন, জীবনের বিন্যস্ত রূপ এবং নৈতিক সমস্যা একাধারে বিধৃত হবে—এটা মহৎ ঔপন্যাসিকেরই লক্ষণ।

পাঁচ

হার্ডির কারুদক্ষতা তারাশঙ্করে অবিদ্যমান এই ভেবে যাঁরা শোক করেন তাঁরা উক্ত দুই লেখকের আঞ্চলিকতার সাদৃশ্যটুকু দেখেই বিচারে অগ্রসর হন বলে এই বিপত্তি ঘটে। তাঁরা অবশ্যই হার্ডির কারুদক্ষতার প্রচুর প্রশংসা ন্যায়ত করতে পারেন। চরিত্রের বিধুরতার ব্যঞ্জনায় বা প্রকৃতির আশ্চর্য চিত্র অঙ্কনে হার্ডির সিদ্ধতা স্মরণীয়।

> The stillness was disturbed only by some small bird that was being killed by an owl in a neighbouring wood, whose cry passed into the silence without mingling into it.

এ-জাতীয় বর্ণনার সিদ্ধতা বা 'রিটার্ন অফ দি নেটিভ'-এর এক অংশে একটা উপযুক্ত চিত্রকল্পের জন্য তীব্র অনুসন্ধানের পর্যায়ে

প্রথমে : A dwindled voice strove hard at a husky tune.

পরে : The note bore a great resemblance to the ruins of human song which remains to the throat of fourscore and ten.

এবং পরিশেষে অব্যর্থভাবে : It was worn whispers, dry and papery and it brushed so distinctly accross the ear……

এই পরিণত চিত্রকল্পের জন্য কবিসুলভ জাগ্রত প্রয়াস তারাশঙ্করের প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু এ-কথা বলার সময় একটি প্রধান কথা ভুলে যাওয়া হয় যে, হার্ডির উপন্যাসে কাব্যরস প্রধান, সে-ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রধান গুণ নাট্যরস। হার্ডির উপন্যাসের প্রধান সহচরই হল কবিত্ব। হার্ডির সমালোচকেরা বহু স্থলেই বলেছেন যে কথাসাহিত্যের পরিভাষায় নয়, ব্যালাড কবিতার আঙ্গিকে এবং কাব্যবিচারের মাপকাঠিতেই হার্ডি স্পষ্টতরভাবে বোধগম্য।

এ-পার্থক্যের মূল দুজনের বিষয়বস্তুতে। আমরা আগেই বলেছি যে ওয়েসেক্স অঞ্চলের Agricultural Decline এবং বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চলের সামন্ততন্ত্রের ভাঙন এক কথা নয়, যেহেতু এক কথা নয় একটা স্বাধীন বাণিজ্যজীবী জাতির শিল্পবিপ্লব এবং কলোনির সাম্রাজ্যের প্রভুদের প্রসাদপুষ্ট কয়লা অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের খর্বিত আত্মপ্রসার। তাই শিল্পবিপ্লবের ফলে ওয়েসেক্সের কৃষি অঞ্চলে যে-প্রতিক্রিয়া সহজেই চোখে পড়ে বীরভূম-বর্ধমানের কৃষি-জীবনে সে রূপান্তরের সন্ধান নেই। সেখানে অতি অসম্পূর্ণ দেশী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র প্রবল প্রতিরোধী শক্তি। সে শুধু কালের নিয়মে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙনদশাগ্রস্ত। ফলে বাথসেবা বা টেসের মতো সামাজিক বিপর্যয়ের বলি হিসাবে সাধারণ মানুষের কথা তারাশঙ্করের নেই, কিন্তু ইন্দ্র রায় বা বিশ্বম্ভর রায় তারাশঙ্করে আছে। অদৃষ্ট নয়—ইতিহাস অর্থে যে কাল বোঝায় সেই কাল বিমুখ বলেই বিশ্বম্ভরের মতো শক্তিমানকে ভেঙে যেতে হচ্ছে—এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব এই বিষয় থেকেই জন্মেছে। এখানে তারাশঙ্কর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়। এইভাবে 'কালবিমুখ'-তার বোধকে যদি তারাশঙ্কর ব্যবহার না করতেন তাহলে বিমল মুখুজ্যের মতো দেশী শিল্পপতির পঙ্গু নিদর্শনের হাতে রামেশ্বর ও ইন্দ্র রায়ের পতনের কোনো মানে হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে টেস কিংবা বাথসেবা নেই, কিন্তু বনোয়ারী আছে। বনোয়ারী যদিও প্রাকৃত মানুষ—কিন্তু সে জনতার একজন নয়। সে কাহারপাড়ার মোড়ল। করালী এবং ইতিহাসের ধাক্কায় কাহারপাড়ার রূপান্তরে সে একটা প্রতিরোধী শক্তি। এবং এ-প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের শিল্পকর্ম বিচারে হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা ও বনোয়ারীর বিষয় নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বম্ভর রায়, রামেশ্বর, ইন্দ্র রায়ের চেয়ে বনোয়ারী অনেক পূর্ণতর চরিত্র। বিশ্বম্ভর, রামেশ্বর, ইন্দ্র রায়ের পতন অনেকটাই সামন্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব-প্রসূত। দশ আনা ছয় আনার বিবাদ যেন সামন্ত দাম্ভিকতার ফল। বিমল মুখুজ্যেদের ভূমিকা এখানে গৌণ নয়। কিন্তু সে পরিমাণ স্পষ্টতার সঙ্গে গোটা সামাজিক কাঠামোয় বিমল মুখুজ্যেদের ভূমিকা তারাশঙ্কর আঁকতে পারেননি। কাজেই উল্লিখিত ব্যক্তিদের পতনের চিত্রঅঙ্কনে বা 'কালের রূপান্তর ঘটেছে' এই বোধের ব্যবহারে তারাশঙ্কর যথেষ্ট শিল্পচেষ্টা নিয়োগ করলেও রূপান্তরমুখী সারা সমাজপটের অতি ক্ষীণ সমর্থনই উক্ত শিল্পপ্রয়াস পেয়েছে। অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে বিষয়টা যেন শেষ পর্যন্ত শুধুই ব্যক্তিগত। কিন্তু বনোয়ারীর ক্ষেত্রে এই ত্রুটি নেই। সে কাহারপাড়ার মোড়ল। কাহারপাড়ার ভবিষ্যৎ করালী তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়, বলেই তার সঙ্গে করালীর দ্বন্দ্ব। গোটা কাহারপাড়ার রূপান্তরটা তার চোখের সামনেই ঘটেছে তিল তিল করে। এবং প্রতি মুহূর্তেই সে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাই বনোয়ারী অনেক পূর্ণ এবং স্পষ্ট। সমাজ-বাস্তবতার সার্থক ব্যবহারে তারাশঙ্কর বনোয়ারীর নাটকীয়তাকে উপন্যাসে সুপ্রযুক্ত করেছেন। কাহারপাড়ার বটগাছে যখন কুড়ুলের ঘা পড়ে তখন বনোয়ারী ইতিহাসের অনিবার্যতার কাছেই বিধ্বস্ত হয়।

অথচ ইতিহাসের এই অনিবার্যতা হার্ডির অদৃষ্টবাদ নয়, যদিও অদৃষ্ট যেমন অপ্রতিরোধ্য, হাঁসুলিবাঁকের উপকথার কাহার-পল্লীতে ইতিহাসের প্রবেশও তেমনি অপ্রতিরোধ্য, অন্তত বনোয়ারীর কাছে। তথাপি এটা ইতিহাস বলেই —শুধু অদৃষ্টের বিধিকল্প-অন্ধতা নয় বলেই—এ যেমন কাহারপাড়ার পুরনো জীবনের প্যাটার্নকে ভাঙে তেমনি করালীদের নতুন জীবনকে রচনাও করে। তারাশঙ্করের সম্বন্ধে এ-আপত্তি না উঠে পারে না যে জীবনের দ্বন্দ্বসম্ভূত পুরাতনের যে ক্ষয় তার জন্য বিধুরতাকে তিনি যতটা প্রশ্রয় দেন, ততটা তার স্বরূপকে চিনতে চান না। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে যে সামাজিক অগ্রগতির জন্ম হয়, এটাকে তারাশঙ্কর শুধু কথার কথা মনে করেন। না করলে হাঁসুলি-

বাঁকের উপকথা বনোয়ারীর গল্প না হয়ে করালীর গল্পই হত। এবং এখানেই হার্ডিরও যে ত্রুটি তারাশঙ্করেরও সেই ত্রুটি। হার্ডি চরিত্রকে গল্পের কাঠামোর কাছে সমর্পণ করেন, তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্রেরা বলি হয়ে যায় তাঁর নাটকীয়তার কাছে। বনোয়ারীর প্রতি পক্ষপাতে যে নাটকীয়তার জন্ম তার মধ্যে নাট্যকারের নিরাসক্তি খণ্ডিত—এ-সন্দেহ শেষ পর্যন্ত নির্মূল হয় না। এবং এইখানেই তারাশঙ্করের শিল্পের প্রধান অসঙ্গতি। যে যুক্তি পরম্পরায় ইতিহাসের নতুন রূপকে চেনা যায় এবং উপন্যাসে তাকে ব্যবহার করা চলে, সে ন্যায়শৃঙ্খলা তারাশঙ্করের চেতনায় খণ্ডিত। এটা তাঁর যে-কোনো নায়ক-চরিত্রের ভিত্তিগত মূল অসঙ্গতির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। জীবনের পুরাতন বিন্যাসের ছকে রূপান্তরের আঘাত হানবার জন্যই তারাশঙ্করের নায়ক-চরিত্র ব্যবহৃত হয়। রূপান্তরের ফলে পুরাতন ছকে আঘাতের প্রতিক্রিয়া বলার জন্য তারাশঙ্কর ন্যায়তই ব্যস্ত! কিন্তু সে রূপান্তর সৃজনের মাধ্যমে যে মানুষগুলো যেমন করালী, অহীন—তারা যেন অনেকটাই ইতিহাসের যন্ত্র। করালী, অহীন বা শিবনাথের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এদের মানসলোকেও যে একটা দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন চলতে পারে এবং তারও একটা নাটকীয় সার্থকতা থাকা সম্ভব—তারাশঙ্কর সে সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই জন্যই হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ও কালিন্দী করালী এবং অহীনের চেতনার নবজন্মের কাহিনী না হয়ে বনোয়ারী এবং ইন্দ্র রায়ের গল্প হয়ে ওঠে। লেখকের নাট্যাসক্তি শিল্পীর নিরাসক্তিকে ব্যাহত করে, শিল্পবিন্যাসে অসঙ্গতি নিয়ে আসে। অহীন কী করে নিজ জন্মের পরিবেশ ছাড়িয়ে মার্কসবাদী হয়, করালী তুটো বিয়ে করতে চাইলে তার পাপবোধে আঘাত লাগে না কেন, আরতি গান্ধীবাদ গ্রহণ করে কিসের ভিত্তিতে, এ-সমস্ত কথার কোন উত্তর নেই। একমাত্র কবি উপন্যাসের নায়ক ছাড়া তারাশঙ্করের প্রধান নায়কদের কারো অন্তর্দ্বন্দ্বই যথার্থ প্রত্যয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। (ইদানীংকালে কতকটা সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু এ-মর্যাদার দাবি করতে পারে।) ডোমজীবনের অন্ধকার পটে নিতাইয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনীই কবি উপন্যাসের প্রধান কথা। নিজ সমাজের কাছে তার ব্যক্তিজীবনের সামাজিক দান একটি পরম স্বকীয়তায় মূল্যবান হয়ে উঠুক, এই সুপরিচ্ছন্ন নৈতিক জিজ্ঞাসায় কবির নায়ক নিতাই বিশিষ্ট। নিতাই তারাশঙ্করের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান পর্যায়ের সৃষ্টি। যে সমস্ত অবিনশ্বর চরিত্র সৃষ্টির জন্য তারাশঙ্কর উত্তরকালের কাছে নমস্য হয়ে থাকবেন

বনোয়ারী এবং নিতাই তাদের অন্যতম। অন্যথা তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত যুবক নায়কেরা রূপকথার নায়কের মতো প্রায়ই অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। অথবা অমূলক অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। এই দ্বন্দ্বহীনতার জন্যই তারাশঙ্করের উপন্যাসের তরুণ নায়কেরা প্রায়ই সরলীকৃত হয়ে পড়ে। অথচ এবম্বিধ সরলীকরণ উপন্যাসের নৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষেই হানিকর হয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসের নৈতিক তাৎপর্য তার শিল্পরূপের সঙ্গেই সংযুক্ত—সেটা নীতিবাগীশতা বা ঋষিবচন বিতরণ নয়। যদি তা হয় তবে তা art-এর বিচারে দাঁড়ায় না। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তারাশঙ্কর এ-সতর্কতা সংগ্রহ করতে পারতেন। এই সরলীকরণের হাত থেকে শিল্পকে বাঁচাতে গিয়ে তারাশঙ্কর মাঝে মাঝে নকল বুঁদির গড় সৃষ্টি করেন। যেখানে শিবনাথের জমিদারির অন্তঃসারশূন্যতায় তার পত্নীও বিদ্রূপ-মুখর হয়ে তাকে চাকরি গ্রহণ করতে বলে সেখানে আর শিবনাথের ঘোড়া বেচে দিয়ে দেশের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করছি ভাবার কোনো মানে হয় না—ও তো এমনিই বিক্রি হয়ে যেত। দেবু ঘোষের বাধাটা শুধু এই যে ছিরে ঘোষ অসৎ, তা নইলে তার কোনো সমস্যা নেই। তেমনি আরোগ্য নিকেতনের প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের বাস্তবভিত্তি কোথাও নেই। উত্তরায়ণের প্রবীরের সিদ্ধান্তের মর্ম স্বীকার্য এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যটা হচ্ছে এই যে শ্রেণীসংগ্রামও তো এই প্রকারই হিংসালীলা, অতএব পরিহার্য। এ-সিদ্ধান্ত লেখক নিজ দায়িত্বে আরোপ করেছেন বলেই এটা শিল্প হয়নি। যদিও তারাশঙ্কর নিশ্চয় জানেন যে রেজারেকসনের নায়কের বাইবেলীয় সদাচরণের উপলব্ধিতে পৌঁছানো এ-ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে সিদ্ধান্তে নেখল্যুডফ পৌছল সেটা আমাদের মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পেরেছে। কারণ, যে দীর্ঘ সোপান পথের শেষে সে উক্ত উপলব্ধিতে উপনীত হল সেই সোপানগুলির ক্রম এবং চরিত্রের ন্যায় আমাদের মনে যুক্ত হয়ে দেখা দেয়। অহীনের মার্কসবাদ গ্রহণ এবং আরতির গান্ধীবাদ গ্রহণে সেই ন্যায় রক্ষিত হয়নি। তাছাড়া নেখল্যুডফের সাহায্যে টলস্টয় যে সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ চিত্রিত করলেন ও তার ব্যাখ্যা দিলেন সেটাও অনুধাবনযোগ্য। নেখল্যুডফের গল্প শুধু শিবনাথের গল্পের মতো একটা সৎলোকের গল্প নয়। নেখল্যুডফ ব্যক্তিগত-ভাবে সৎ কাজ করতে চায়, কিন্তু টলস্টয় দেখাচ্ছেন যে, সে যে ভালো কাজের জন্য চেষ্টাও করতে পারে তার কারণ সে নিজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তান।

সাধারণের প্রবেশাধিকার এবং ক্ষমতা যেখানে সীমিত নেখল্যুডফ সেখানে নিজ বংশ-মর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা নেখল্যুডফের চরিত্রের সাধুতা যতটা স্পষ্ট হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি স্পষ্ট হচ্ছে তৎকালীন রুশ জনতার দুর্দশা। এবং সে দুর্দশার পাহাড়প্রমাণ বাধা নেখল্যুডফের শত ভাল মানুষিতেও দূর হচ্ছে না, এটাই নেখল্যুডফের দুঃখ, টলস্টয়ের বক্তব্য। শিবনাথ বা দেবু ঘোষের বেলায় বাধাটা মাত্র শিবনাথের স্ত্রীর বা ছিরে ঘোষের হয়ে ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্তরে থেকে গেছে। কাজেই নেখল্যুডফের বাইবেলীয় সদাচরণের পথে সাধারণ মানুষের জীবন স্বীকরণ—তথা জীবনের বিশুদ্ধির জন্য অনলস প্রয়াস—তারাশঙ্করের নায়কদের অধ্যাত্ম-সিদ্ধি বা গান্ধীবাদ গ্রহণের থেকে অনেক তাৎপর্যময়।

বরঞ্চ সে-ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত নায়কেরা যথার্থই কালোচিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত নায়ক। শশী এবং গাওদিয়ার দ্বন্দ্বে আমাদের ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনের সেই চূড়ান্ত দ্বন্দ্বই প্রকাশিত। শশীর গাওদিয়ার জীবন কলকাতাই নাগরিক জীবনের সব স্মৃতিস্বপ্নকে গলা টিপে ধরতে চায়। উপনিবেশের অসঙ্গতি আর কোন্ নায়ক-চরিত্রে এর বেশি ব্যবহৃত হয়েছে জানি না। তিরিশের বাংলা দেশের গ্রাম-শহরের সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে শশী সর্বদা স্মরণীয় চরিত্র।

তা বলে আমার বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এ নয় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর হেরে গেছেন (যেমন এর উল্টো কথাটাও আমাদের বক্তব্য নয়)। বরঞ্চ আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ও তার ব্যবহারে তারাশঙ্কর বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। বহুকালাগত প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসকে এ-কালের পটে নবমূল্য প্রদানে (সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী), জীবনের সুস্থ স্বভাবকে খোঁজার অক্লান্ত প্রয়াসে, বিচিত্র বিশাল নবজীবনকে একটা নৈতিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টায়, তারাশঙ্কর স্মরণীয়। মহৎ শিল্পের উপাদান জীবন ও জীবনভিত্তিক দর্শন। এ-কথা তারাশঙ্কর যেখানে যে-পরিমাণে মনে রেখেছেন সেখানে সে-পরিমাণে স্বীয় প্রতিভায় তিনি কালোত্তীর্ণ, যেমন কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা (আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ)। এখানে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের বর্ণ-বিহ্বল, অভিজ্ঞতার কারবারীদের শিক্ষাস্থল। কখনো কখনো তিনি নিজ অহংবুদ্ধির কাছে শিল্পবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি নিজে যেটাকে অসংলগ্নভাবে বোঝেন, বা বোঝেন বলে মনে

করেন সেটাকে প্রচারের ভিতর দিয়ে শিল্প করে তুলতে চান যেমন আরোগ্য নিকেতন, উত্তরায়ণ প্রভৃতি। এখানেই আমাদের শিল্পগত আপত্তি। আমরা তারাশঙ্করের সেই শিল্প-সংকটের কথা এবার আলোচনা করব।

ছয়

তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে সুপরিচিত পাঠক সমাজ জানেন যে তাঁর গোটা শিল্পজীবনকে এখনো পর্যন্ত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটা ভাগ হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা পর্যন্ত। আর একটা ভাগ মন্বন্তর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মন্বন্তর হাঁসুলিবাঁকের উপকথার আগে লিখিত হলেও মন্বন্তরে তাঁর সাহিত্যজীবনের রূপান্তরের সূচনা। সুতরাং, তারাশঙ্করের প্রথম যুগের রচনাধারার সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের রচনাধারার প্রতিতুলনা এ-ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সরল নায়ক, সহজ পরিবেশ এবং বলিষ্ঠ জীবনবোধ তারাশঙ্করের প্রথমদিকের রচনার বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্করের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে কথকতার সুর তা এই ফ্রেমের উপযুক্ত আঙ্গিকরীতি। তারাশঙ্কর গল্পকে স্থাপন করতেন গ্রামের পটভূমিতে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষীয়মান সামন্ত-সূর্যের অস্তরাগ তাঁর গল্প-উপন্যাসের জগতে এক আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ সম্ভব করেছে যার কথা অবিস্মরণীয়। কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট শিল্পী তখনও তারাশঙ্কর ছিলেন না বলেই এ-কথা উপলব্ধি না করে পারেননি যে তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতে তিনি একটিও পূর্ণাঙ্গ নায়ক চরিত্র সৃজন করতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়িকা চরিত্র সৃজন করতে পারেননি। প্রচলিত অর্থে নায়ক নায়িকা যুগলের সৃজনে তারাশঙ্কর এই পর্যায়ে একেবারেই ব্যর্থ। বরঞ্চ বলা যায় মধ্যবিত্ত পরিসরের বাইরে যেখানে দাঁড়াতে চেয়েছেন সেখানে তাঁর সাফল্য অনেক বেশি মাত্রায় করতলগত হয়েছে। কবি এবং হাঁসুলিবাঁকের উপকথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সব মিলিয়ে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কবি'। পরবর্তীকালে তিনি 'রাধা'-র মতো ইতিহাস পটাশ্রয়ী উপন্যাস ও 'সপ্তপদী'র মতো যন্ত্রণা-জটিল উপন্যাস লিখেছেন বটে, কিন্তু 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর নিতাই, ঠাকুরঝি ও বসনের ত্রিভুজে জীবনের যে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বেগ ও শ্রীকে বেঁধেছেন তা তাঁর অন্য উপন্যাসে দুর্লভ। রাধা যে পরিণামে বর্ণাঢ্য সে পরিমাণে জীবনগভীর নয়, সপ্তপদী যে পরিমাণে চঞ্চল সে পরিমাণে গভীর নয়। কবি-তে অতলস্পর্শ গভীরতা—ঠাকুরঝির পিপাসায়

বসনের জীবনাকৃতিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিতাইয়ের মতো নায়ক তারাশঙ্করের আর নেই। তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত নায়ক চরিত্রে সরলীকৃত যন্ত্রণার সরলীকৃত নাটক বরাবর সহজলভ্য। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির যন্ত্রণাকে তার মনোময় সত্তার গভীরে তিনি নিয়ে যেতে পারেননি। শিবনাথের সমস্যা না সামন্ত সংকটের, না দাম্পত্য জীবনের, না ব্যক্তির উপলব্ধির। অথচ সব কিছুরই সম্ভাবনা এ-ক্ষেত্রে ছিল। অহীনের কাছে কালিন্দীর চর সমাজতত্ত্বের পাতা। নাটকটা বরঞ্চ ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেবু ঘোষকে তারাশঙ্কর বলেছেন যে সে বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন, খানিকটা স্বার্থপর। "বিদ্যা অবশ্য বেশি নহে, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে। এ-গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান ব্যক্তি কাহাকেও তো সে দেখিতে পায় না।" "তাহার ধারণা গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে। ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহার প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশুশাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপর মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা আলোক ভোগের জন্যই উর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না ; নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে আলোক রাজ্যের অভিযানে চলুক—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা" কিন্তু সে নিজের গ্রাম-খানিকে ভালবাসে। স্বভাবতই লেখকের চিন্তায় এই যে মানুষের কাঠামোটি ধৃত হয়েছিল তা একটা পুরোদস্তুর উচ্চাভিলাষী গ্রামীণ মানুষের কাঠামো। কিন্তু লেখকের কল্পনায় যে এই মানুষটি একেবারেই ধরা দেয়নি পূর্ণাঙ্গ দেবু ঘোষ চরিত্রটি তার নিদর্শন। প্রতিযোগিতাপরায়ণ ব্যক্তির সে পট নয় গণ-দেবতা বা পঞ্চগ্রাম, সে জটিল মনের আধারও নয় দেবু ঘোষের সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন সরল বিনীত চরিত্রটি। বরঞ্চ প্রথম অধ্যায়ে ছিরু ঘোষ লেখকের নায়কের প্রতিশ্রুতি থেকে কিছুটা ঋণ গ্রহণ করে নিজ ন্যায়ে বিশিষ্ট হয়েছে। অথচ এই উদ্ধত অংশটুকু পরিহার করে দেবু ঘোষকে উপস্থাপিত করলে দেবুর গ্রাম্য পণ্ডিতের সহজ মর্যাদা-সচেতন চরিত্রের কোনো ক্ষতিই হত না। সম্ভবত লেখক মনে করেছেন যে দেবুর জীবনে ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত একটা সংঘাত এবং দ্বন্দ্বের সাহায্য নিলে দেবুকে রূপায়িত করা যাবে নতুন কালের তাৎপর্যে। কিন্তু এই হিসাবী চিন্তা উপন্যাসস্থ হতে পারেনি।

অথচ তারাশঙ্করের নাট্যরস প্রবণতায় এই বিষয়টা অন্তত স্বচ্ছ যে, সত্তার

গভীরে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্রণা ব্যতিরেকে নায়কের ব্যক্তিস্বরূপকে স্পষ্টরেখ করে তোলা যাবে না। এ-ধরনের একটা বোধ তাঁর মধ্যে স্বতঃই উপস্থিত। উপন্যাসের নিজ নিয়মে দেবু পণ্ডিত বেঁচে গেলেও আরোগ্য নিকেতনের জীবন মশাইকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। জীবন মশাইয়ের অস্তিত্বের আলোড়িত রূপ সৃজনে লেখকের ব্যর্থতা উপন্যাসে দু-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এক, দ্বন্দ্বটা কাল-কালান্তরের রূপক নির্মাণ করতে পারেনি, যা পেরেছে তা হল অ্যালোপাথি বনাম আয়ুর্বেদের ঝগড়া। ফলে মৃত্যুকে নিয়ে মিথ্ সৃজন জীবন মশাইয়ের ব্যক্তিজীবনের অনিবার্য সূত্রে গ্রথিত হয়নি। দুই, এই অসঙ্গতি তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই তিনি জীবন মশাইয়ের ব্যক্তি জীবনের প্রথম-প্রেমের ব্যাপারটির শেষ অধ্যায়ে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে জীবন-বৃত্তের বিষয় সম্বন্ধে, মায়ামুক্তি বা মোহচ্ছেদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। আরোগ্য নিকেতনে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে এটা উপন্যাসটির আংশিক ত্রুটি। এর মূলীভূত কারণটি অনুসন্ধেয়। চরিত্রের বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক দুইই হতে পারে। প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন এইখানে যে, যে-জীবন মশাই জীবনরহস্য ও মৃত্যুরহস্য দুইকে জানেন, এবং দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে জানেন—তিনি শুধু লেখকের উপলব্ধির দায় বহন করেই ক্ষান্ত হলেন, না, উপন্যাসের আকাশ বাতাস মৃত্তিকা এবং আবহাওয়া থেকে কিছু রক্তমাংস সংগ্রহ করে জীবিতকল্প হলেন? শেষোক্ত প্রশ্নে আমাদের উত্তর—'না'। জীবন মশাইয়ের জীবন সম্বন্ধে অসামান্য স্নিগ্ধবোধ, নিরুদ্বিগ্নতা এবং শান্ত-ভাবের সঞ্জীবনের জন্য উপন্যাসের বিষয়ভূমি থেকে কোনো সহায়তা না থাকায় জীবন মশাই কতকগুলি নিরাময়ের হেতু হয়ে রইলেন শেষ পর্যন্ত। জীবনের ভ্রমে এবং স্খলনে, উত্থানে ও পতনে যে নিরাময়ের সম্ভাবনা নিহিত সেই awareness of the possibilities of life উপন্যাসে শিল্পোজ্জ্বল হয়ে উঠল না। অথচ কবি উপন্যাসে নিতাইয়ের শেষ উত্তরণকে জীবন ও পৃথিবীর কূলে এমন ভাবে স্থাপিত করা হয়েছিল যে সেখানে সৃজিত ব্যক্তিস্বরূপের নিজস্ব ন্যায়েই তাকে মনে হয়েছে জীবন এবং শিল্পের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নিতাই-য়ের যন্ত্রণা প্রেম, অভীপ্সা সমস্তই উপন্যাসের শিল্পময় আধারকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। পক্ষান্তরে সে নিজেও প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে উপন্যাসের পটধৃত পরিমণ্ডল থেকে। কিন্তু তারাশঙ্করের অপর মূল্যবান সৃষ্টি হাঁসুলিবাঁকের উপকথায় নায়ক চরিত্রের পরিকল্পনায় পুনরায় অসঙ্গতির দেখা মেলে। করালী

যদি মাত্র নবকালের প্রতীক হয় তা হলে করালীর একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করানো চলে। কিন্তু উপন্যাস তো প্রতীকী বাচনরীতির বা আঙ্গিকরীতির উপযুক্ত লীলাভূমি নয়। তাই এখানে চরিত্রের পরিভাষায় লেখক তাঁর জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে ব্যক্ত করলেও সাংকেতিক নাট্যরীতি নিশ্চয় এখানে চলে না। করালীর প্রথম উপস্থাপনায় নিঃসন্দেহে সে নায়ক। সর্প-নিধনের তাৎপর্যে এ-কথার বড়ো সাক্ষ্য মিলবে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল যে করালী একটা অন্ধ আবেগ ছাড়া কিছু নয়। সে নবকালকে ধারণ করে নেই। নবকালই তাকে ধারণ করে আছে। তার প্রয়াসের কোনো শুদ্ধতা নেই। যে রূপকথার নায়কের মতো কাহারপাড়ার আঁধার দৈত্যকে হনন করেছিল সে ধীরে ধীরে শুধু কাহারপাড়াকে আঘাত করার একটা যন্ত্রে পরিণত হল। অতঃপর বনোয়ারীর প্রাধান্য আর আতিশয্য ছাড়া উপন্যাসকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না। উপন্যাসটি হয়ে উঠল বনোয়ারীর গল্প। বনোয়ারীর বেদনা তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির অন্যতম হলেও বনোয়ারীকে তিনি নায়ক করতে পারেননি তাঁর সামাজিক বুদ্ধির তাগিদেই। অথচ তারাশঙ্করের দীর্ঘ সাহিত্যকীর্তিতে নিতাই ছাড়া তখনও পর্যন্ত কোনো নায়ক নেই।

এই অবস্থায় তিনি মুখ ফেরালেন কলিকাতা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের দিকে। যে জটিলতা, যে দ্বন্দ্ব, যে ব্যর্থতাবোধ তাঁর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নায়কদের ক্ষেত্রে তিনি কল্পনায় আনতে পারেন না, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন দীর্ণতার পর, তারাশঙ্কর ভাবলেন, সেটা কলকাতায় হবে সহজলভ্য। মন্বন্তরে তাঁর সেই চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। অথচ মন্বন্তর উপন্যাসের নায়ক কানাইয়ের যন্ত্রণায় মধ্যবিত্ত মানুষের সর্বাঙ্গীণ জটিলতার কোনো সাক্ষ্য নেই। যেটা কানাইয়ের যন্ত্রণার প্রধান সূত্র সেটা হল বংশগত রক্তধারা, যা তার মধ্যে প্রবহমান, তার শুদ্ধি-অশুদ্ধির ব্যাপার। নগর-জীবনকে গভীর মনোনিবেশে তারাশঙ্কর ধরেননি কোথাও। নগর পটভূমি হিসাবেও অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল দ্বন্দ্বময় নায়ক। সুতরাং তারই সন্ধানে তিনি ব্যস্ত। এই দ্বন্দ্বের উৎসরূপে তিনি জীবনের গভীরে যাবার চেষ্টা করেননি। চেষ্টা করেছেন জীবনের সংবাদে যাবার। জারজ কিনা, বংশের রক্তধারায় শুদ্ধতা কোথায়, এই সমস্ত ব্যাপার তারাশঙ্করের কাছে নায়কের সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এর জন্য নগরপটের কোনো অপরিহার্যতা নেই। কৃষ্ণেন্দুকে কলকাতাতেই বরং বেমানান মনে হয়েছে। বাঁকুড়ার রুক্ষ পরিবেশে এই স্নিগ্ধ

মানুষটি চমৎকার বৈপরীত্য সৃজন করেছে। কিন্তু ওদিকে অকারণে রিণা-ব্রাউনের জন্মরহস্য কতকগুলি বড়ো বড়ো গ্রন্থি সৃজন করে বড়ো গল্পকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছে। 'বলো আমার পিতা কে' অথবা নায়ক জারজ কিনা এ-প্রশ্নের নিজস্ব জোর এত বেশি যে একটি ব্যক্তিস্বরূপের বহুলাংশই এই জিজ্ঞাসাচিহ্নের ধাক্কায় হারিয়ে যায়। এর পরে যা জেগে থাকে তা হল লণ্ঠনের পলতেকে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দিলে যে ধূমেল শিখা জ্বলে ওঠে, যার মধ্যে অন্ধকার বেশি, তারই মতো অরসিক কৌতূহল। এ কিছুতেই রসসৃজন নয়। ১৩৬৭ সালের শারদীয় উল্টোরথে প্রকাশিত তারাশঙ্করের উপন্যাস বিপাশা-র কথা উল্লেখ করা যায়। বিপাশার নায়কের সমস্যাও এই ব্যক্তিগতরূপে নির্বিশেষের তাৎপর্য রহিত। গোটা ভারতবর্ষকে পটভূমি করে তুলতে গিয়ে পাঞ্জাব থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতা এবং সেখান থেকে আবার এলাহাবাদে এই উপন্যাসের ঘটনাক্রম বিস্তৃত। শিখ, খ্রীষ্টান, আদিবাসী সবই এবং সবাই এখানে উপস্থিত শুধু একটি উদ্দেশ্যহীন পরিসমাপ্তিকে গড়ে তোলার জন্য। কৃত্রিম নাটক, মেকি আবেগ এবং প্রচুর আবেগময় বাক্যরাশির সমাবেশে তারাশঙ্কর মধ্যবিত্ত নায়কের দ্বন্দ্বময় রূপ সৃজনের নাম করে যা করেছেন তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে এ-যুগের সাহিত্যের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অনুভূত অবক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত। সেগুলি এই ঃ

(ক) যা তাঁর ছিল—সেই বৃহৎ অর্থে জীবন এবং সভ্যতা সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁর নেই।

(খ) তিনিও এতদিন বাদে ঘটনা-সারালো, ঘটনা-ধারালো ও ঘটনা-ভারালো উপন্যাস লিখতে চাইছেন।

(গ) জীবনের সমস্যা বলতে তাঁর কোনো প্রয়াস নেই। তার চেয়ে ব্যস্ত তিনি জীবনের রহস্য বলতে। আর রহস্য বলতে তিনি বুঝেছেন 'নফর সংকীর্তনের' মতো গল্প।

নগর জীবনে নায়ক খুঁজতে এসে তারাশঙ্কর যেন শিল্প বিসর্জন দিতে বসেছেন। অথচ এখনো তারাশঙ্করের ফেলে আসা ক্ষেত্রই স্বক্ষেত্র। 'অরণ্যবহ্নি' তাঁর সেই স্বক্ষেত্রচারণের উজ্জ্বল নিদর্শন। সাঁওতাল বিদ্রোহের বিষয়াশ্রয়ী এই উপন্যাসে লেখকের আবেগ এবং আন্তরিকতার অগ্ন্যুদ্দীপ্ত ছবিটি চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে থাকল। যে কাজ বাঙালী লেখকদের অনেক কাল বাকি পড়ে ছিল, যে কাজ তারাশঙ্করবাবুরই শেষ করার কথা—তা তিনি পরম নিষ্ঠায় শেষ করলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

তিরিশের কালে প্রকৃতি চেতনার জন্য চিহ্নিত দুজন শিল্পীর খ্যাতি এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এঁদের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরজন জীবনানন্দ দাশ। বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের মধ্যে প্রকৃতি সাধারণ উপকরণ এ-কথা কিন্তু একান্ত প্রাথমিক সত্য। উভয়ের ব্যক্তিস্বরূপের বিশেষ বিন্যাসে, প্রকরণের স্বতন্ত্র মহিমায় দুই তাৎপর্যের সূচক দুজনে, এ-কথাই শেষ সত্য। জীবনানন্দের মন সচেতনভাবে আধুনিক বলেই মর্মশায়ী পীড়া সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাঁর প্রেরণায় ক্রিয়াশীল। জীবনানন্দের বিখ্যাত প্রতীকে, রূপকে, হেমন্তের অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিকতায় জীবনের সেই পীড়াক্রান্ত অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট। যদিও শেষ দিকে মানুষের প্রেমে এই পীড়ামুক্তির সান্ত্বনা কবি প্রত্যয়কে আকর্ষণ করেছে, তথাপি 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ'—এই বোধই কবি জীবনানন্দের ভাবভূমির মূল আবহাওয়া। নিঃসন্দেহেই বিভূতিবাবু জীবনানন্দের নিজস্ব সংজ্ঞানুসারে সভ্যতা-সচেতন নন। সংকটাপন্ন সভ্যতার আর্তি তাঁর মানসের সৃজনীবৃত্তির চেতন অংশটুকুকে অধিকৃত করেনি। সেই জন্যেই বিভূতিভূষণ এমন এক স্বাস্থ্য-মনস্কতা রচনা করেছিলেন যার ফলে তিনি না হলেন পল্লীপ্রীত কুমুদরঞ্জন, না হলেন সংকট-বিধুর জীবনানন্দ। সান্ত্বনা আর উজ্জীবনের মধ্যে প্রেরণাগত উৎস একই—ব্যাধিই উভয়ের উৎস, কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে দুই মানস-দৃষ্টির কথা ওঠে বলেই উভয়ে পৃথক পথগামী। নইলে, এ-জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে কোথায় যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গ্রাম প্রকৃতির পর বিভূতিবাবুর প্রকৃতি-দৃষ্টির বিশিষ্টতা কোন্ খানে? তিরিশের যন্ত্রণাও যত তিরিশের প্রেরণাও তত। এই দ্বৈতে সেই বিশিষ্টতা অনুসন্ধেয়। তিরিশের যন্ত্রণা অর্থ নৈতিক সংকটে, আমাদের বেকার সমস্যায়, জাতীয় আন্দোলনের মন্থরতায় এবং মধ্যবিত্ত জীবনের মূললগ্ন মৃত্তিকার বিশুষ্ক বিদীর্ণতায়। তিরিশে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার প্রেরণা এ-দেশে অনুভূত হয়েছে জিজ্ঞাসার তীব্রতায়। মার্কস এবং ফ্রয়েড জট পাকিয়ে গেলেও সে প্রেরণা অনুভূত

হয়েছে জীবনের দ্বন্দ্বময় অথচ ব্যাপ্ত গভীর রূপ-কে উপলব্ধির প্রয়াসে। জীবন সম্বন্ধে নির্মোহ আগ্রহ উপন্যাস শিল্পের মূলে। ইতোপূর্বে ব্যক্তি সম্বন্ধে আগ্রহী বাংলা উপন্যাসে ব্যাপক জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এত সমগ্রতা নিয়ে একটা যুগ সৃষ্টি করেনি। হয়তো স্বদেশ-জিজ্ঞাসা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা তিরিশের দশকের শুভলগ্নে মিলিত হতে পেরেছিল বলেই জীবনের সংলগ্নতা এ-যুগের প্রধান উপন্যাস-লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণের উপন্যাস বিচারকালে এ-কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দুই

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনায় নিঃসন্দেহে কবির মর্ত-প্রীতির প্রকাশ। প্রথমাবধি কবিজীবনের সকল পর্যায়ে কবির প্রকৃতি-চেতনা মর্ত-প্রীতিরই নামান্তর। প্রকৃতি সোনার তরী-চিত্রা-পর্যায়ে কবির সৌন্দর্য সাধনার সহায়ক, পরবর্তী পর্যায়ে অরূপ সাধনার অঙ্গ, সহজ জীবন-প্রীতিতেই প্রকৃতি আকর্ষিত হয়েছে—জীবনের অমেয় সম্ভাবনার বাহক হিসাবে। সেই ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে বিভূতিবাবুর কোনো সঠিক সংজ্ঞানিবদ্ধ প্রকৃতি-দৃষ্টি নেই। প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের অংশ রূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী এই ব্যাখ্যাতেই তাঁর প্রকৃতি-চেতনাও ব্যাখ্যাত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে কবির আবেগে প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, যে ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, সে-ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের দৃষ্টি কৌতূহলীর দৃষ্টি। যে দীপ্ত আগ্রহে জীন্‌স্ সাহেবের বিশ্বরহস্যের সম্মুখে বিস্ময়াতিভূতি, বিভূতিভূষণের কৌতূহলের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বরঞ্চ লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানীর জানবার পিপাসার সঙ্গে কবির আবেগ সেখানে যুক্ত। পথের পাঁচালিতে যে ছেলেটি বারে বারে তার পিতাকে এটা কী ওটা কী বলে ব্যস্ত করেছিল, অথবা আরণ্যকে যে ভদ্রলোক এত কিছু আছে জানতাম না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এরা দুজনেই জীবনের সম্বন্ধে প্রবল কৌতূহলের লক্ষণে চিহ্নিত। এই বিশ্ববোধের ব্যাপার উপন্যাসে বিভূতিভূষণের দান। কেউ কেউ আছেন যিনি তুচ্ছকে মহৎ করে তোলেন, বিভূতিভূষণ সে শ্রেণীর লেখক নন। তাঁর কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়—তিনি যা কিছু দেখেছেন তা সবই পূর্ণ। পূর্ণেরই অংশ বলে সকল কিছুই স্বরূপতঃ পূর্ণ, এই হল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা। প্রথম দৃষ্টিতে

বিভূতিভূষণকে কবি বলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত করলে তাঁকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। অসীম গ্রহ-নক্ষত্রের জগৎ, গাছ লতা পাতা, নদী নালা-বিধৃত যে জীবন আমরা যাপন করি অথচ বিস্মৃত থাকি, বিভূতিভূষণ সেই বিস্মৃতিকে পূরণ করে পূর্ণ বৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি এই সূত্রেই বিভূতিবাবুর কল্পনার সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ। বিভূতিভূষণের এই জীবনদৃষ্টি কতখানি শিল্প-প্রযুক্ত, কতখানি নয়, তাঁর আরণ্যক গ্রন্থখানির সাহায্যে সে-কথা আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বোঝার চেষ্টা করব। আরণ্যক গ্রন্থখানির এ-প্রসঙ্গে নির্বাচনের কারণ বিদ্যমান। পথের পাঁচালিই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অপু এ উপন্যাসের প্রাণ—কিন্তু দুর্গাই উপন্যাসের লাবণ্য। নিশ্চিন্দপুর গ্রামের জলমাটি দিয়ে তৈরি এই দুর্গাপ্রতিমাই পথের পাঁচালির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ প্রতিমাকে এই পরিবেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যেতনা। তাই দুর্গার মৃত্যুর পরেই নিশ্চিন্দপুরের ইতিবৃত্ত প্রকৃত প্রস্তাবে শেষ হয়েছে। তবু লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনাই যে সর্বদা তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে যোগ্য গ্রন্থ এমন নাও হতে পারে। যে রচনায় লেখককে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা-সমেত ধরা যায় লেখকের সমগ্রতা বিচারে সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। পথের পাঁচালি সর্বোত্তম হলেও আরণ্যক এ-হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। বিভূতিবাবুর শক্তির প্রকাশ এবং ব্যত্যয় দুইই এখানে বিদ্যমান।

আমরা জানি যে বিভূতিবাবুর প্রধান ক্ষমতা এই যে তিনি তাঁর জগৎ রচনা করেন এমনভাবে যেখানে বিশ্বাস্যতা বা অবিশ্বাস্যতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সেখানে প্রেমের ঘটনার জন্য আসর সাজাতে হয় না; 'বিপিনের সংসার' এবং 'দুই বাড়ি'তে প্রেমের কথাটুকু গাছের পাতা বা ফুলের মতোই স্বাভাবিকভাবে ফুটেছে—সে পটভূমিকায় জ্যোৎস্নারাতে পাখির ডাক যতটুকু বিস্ময়কর, প্রেম তার থেকে বিস্ময়কর নয়। এমন কি বিশ্বাস্য হবার জন্যও তাঁর বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। তিনি প্রমাণ প্রয়োগ করেন না, কেবল যা দেখেছেন তাই আমাদের বলতে চান। এর বিপরীতাচরণ তাঁর স্বধর্ম নয়। সেই কারণে দৃষ্টি প্রদীপের সাংসারিক রূঢ়তা বিভূতিবাবুর হাতে রূঢ়তার তালিকা প্রণয়ন হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির আলোকে সে রূঢ়তা-জনিত রসাভাসকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়নি। বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে পথের পাঁচালিতে ইন্দির ঠাকরুণের প্রতি সর্বজয়ার নিষ্ঠুরতা প্রায় জীবনসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, নিশ্চিন্দপুরের স্বপ্নধাত্রী পরিবেশে তাকে বেমানান ঠেকেনি। শুকনো পাতা

গাছ থেকে ঝরে যায় যে স্বাভাবিকতায় ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুও তাদৃশ। সর্বজয়ার সংকীর্ণতা এ-ক্ষেত্রে যে বিরাট প্রাণময় প্রকৃতি-বেগ এ উপন্যাসের প্রধান স্রোত তারই অংশ। 'দৃষ্টি প্রদীপে' এমনটা ঘটেনি। যে সরল বলিষ্ঠতায় লেখক পথের পাঁচালির বিশাল প্রকৃতি পটকে এঁকেছেন, ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়ার ক্ষেত্রে সে-কল্পনাকে অকস্মাৎ রূঢ় পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে সংযত হতে হয়নি। এই পদ্ধতিতেই লেখকের জীবন-প্রত্যয় শিল্পমাধ্যমে সহৃদয়ের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।)

আরণ্যকেও দেখা যায় বিভূতিবাবুর মূল বক্তব্যের বীজ-রূপে পথের পাঁচালি দৃষ্টি প্রদীপের সাদৃশ্য বর্তমান। এই তিন ক্ষেত্রেই মূল বিষয় হল—স্বপ্নের জগৎটা হারিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। জগৎটাকে বিভূতিবাবু এত বেশি বিশ্বাস করতেন যে তার কথা বলতেই তিনি তদ্গত থাকতেন। জগৎটা ভেঙে যাওয়া, তাঁর কাছে প্রিয় বিয়োগের মতো নিবিড়ানুভূতির ঘটনা যে বিচ্ছেদের বেদনাটাই শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে। বিয়োগের অহেতুক বিশ্লেষণ তিনি করেন না। তবু পথের পাঁচালির সঙ্গে আরণ্যকের মূল পার্থক্যটিও অনুধাবনীয়। পথের পাঁচালিতে ব্যক্তি পটকে ছেড়ে গেল। আরণ্যকে পট ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে, তাকে ফেলেরেখে পরিবর্তিত হয়ে গেল। দুটোতেই করুণ সুর বেজেছে বটে, কিন্তু টিউনের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। নায়ক-নায়িকার চেতনার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বহীনতার যে অভিযোগ বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় তার মূল এইখানেই নির্দেশ করা যায়। সেদিক থেকে প্রথম দৃষ্টিতে আরণ্যকের ত্রুটি অনেক। ধাওতাল সাহুর মহাজনী, রাসবিহারী সিং-এর জমিদারি, গাঙোতা এবং রাজপুতদের দাঙ্গা অরণ্যের আদিম পটভূমিকা বিনাশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিনিবদ্ধ হলে আরণ্যক অন্য ধরনের সৃষ্টি হত। অবশ্যই যে তাৎপর্যে আরণ্যক এখন অনন্ত, সে অনন্ততা তখন তার থাকত না।

দেখা যাক বিভূতিবাবু কী কী পরিহার করেছেন। প্রথম, জমিবিলির ফলে আরণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সূত্র-সম্বন্ধ-সমাজ-জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব ঘটল তার কোনো পরিচয় লেখক দেননি। দ্বিতীয়, তিনি জীবন ও জীবিকার মৃত্তিকাবদ্ধ কোনো স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াসী হননি। তৃতীয়, অরণ্য মণ্ডলের রূপ নির্মাণে বর্ষা বা ঝড়কে আদপেই ব্যবহার করেননি। ওপরে কথিত এই তিনটি সূত্র থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বিভূতিবাবু জীবনের সংঘাত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিতে চান না। যেখানেই জীবনের নিষ্ঠুর নখরদন্তকে

তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই ডেকে এনেছেন অনন্ত জীবনরহস্যকে, বিস্মৃতি সৃজনের জন্য ততটা নয়, যতটা জীবনের ছোট বড়ো ভালো-মন্দ প্রভৃতির অতীত একটা রূপক সৃজনের জন্য। আরণ্যক উপন্যাসে ঘন ঘন ব্যবহৃত জ্যোৎস্না রাত্রির প্রসঙ্গ এই তাৎপর্যেই বুঝতে হবে। যা আছে, বা যা বিভূতিবাবু ব্যবহার করেছেন তাও এ-প্রসঙ্গে গননীয়। এই পরিহার ও ব্যবহারের মধ্যেই তাঁর জীবনদৃষ্টির কথঞ্চিৎ পরিচয় মিলবে। বিষয়বস্তুর ব্যবহারের প্রসঙ্গে আরণ্যকের এই তিনটি বিশিষ্টতা স্মরণীয়। প্রথম যার অভিভূত করার ক্ষমতা বেশি প্রকৃতির ভিতর থেকে তাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে ঘন ঘন। ছায়াহীন জ্যোৎস্না রাত্রি এবং ছায়াহীন নির্জন দুপুরের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দাবানলে যতটা আকস্মিকতা, বর্ণনাক্ষেত্রে ততটা দ্রুততা দাবানলের ঈপ্সিত ফলশ্রুতি আনয়ন করেনি। দ্বিতীয়, অতি-প্রাকৃতের ব্যবহার। (অতি-প্রাকৃতের দিকে ঝোঁক পথের পাঁচালিতে অস্পষ্ট,) দৃষ্টি প্রদীপে সুস্পষ্ট। আরণ্যকের আরণ্য-আদিম পরিবেশে এর সুসার্থক প্রয়োগ লক্ষণীয়। বোমাই বুরুর জঙ্গল কাহিনী এবং মহিষের দেবতা টাঁরবারোর গল্প উপন্যাসের সমগ্রতার সঙ্গে অভেদ সম্পর্কে গ্রথিত। তৃতীয়, এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অধিকাংশই জীবিকা-সংলগ্ন মানুষ নয়। কুন্তা এবং নাকছেদীর পরিবার ব্যতীত প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এ-কথা প্রযোজ্য। রাজু পাঁড়ে ভক্ত কবি এবং দার্শনিক, যুগলপ্রসাদ জঙ্গলে গাছ লাগায়, বেঙ্কটেশ্বর কবি, ধাতুরিয়া নাচে, মটুক নাথ টোলের পণ্ডিত। রাজু পাঁড়ে এবং যুগলপ্রসাদ লেখককে যে আকৃষ্ট করেছে অধিক পরিমাণে তারও প্রমাণাভাব নেই। একান্ত সহজ কীর্তিহীন মানুষগুলিই লেখকের উপাদান।

তিন

স্বভাবতই লেখকের এই মনোভঙ্গির মধ্যে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কিছু রয়েছে যাদের উপন্যাসস্থ হবার তথাকথিত যোগ্যতা অল্প। জীবনের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে, ব্যক্তির পট-ধৃত জীবনের যন্ত্রণাকে পরিহার করে বিভূতিভূষণ কীভাবে আরণ্যককে শিল্পভাতি দান করলেন সেটাই শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন। সেই শক্তিরহস্য অনুসন্ধান করতে হবে শিল্পীর মানসিক স্বাস্থ্যে, যা রচনাতে সঞ্চারিত হয়েছে, সমস্ত দুর্বলতাকে গ্রাস করেছে এবং উপন্যাসে এনেছে অটুট পূর্ণতা। বিভূতিভূষণের স্বদেশ ভূমি সম্বন্ধে আগ্রহ নিঃসন্দেহে তিরিশের জীবন-সন্ধানী

ব্যাপকতার দান। কিন্তু যেহেতু বিভূতিবাবুর মন কিছুতে আবিষ্ট নয় এবং তাঁর বিশ্বপরিচয়-পিপাসা একান্ত ভাবেই জীবনের ক্ষুধা, সেইহেতু সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা প্যাটার্নের মধ্যে নিয়ে আসা লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। দু-ভাবে আরণ্যকের উপন্যাস প্রকৃতির বিকৃতি ঘটতে পারত। এক হতে পারত প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঐতিহ্যবোধ অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে লেখকের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মুহুর্মুহু তাগিদে উপন্যাসটির ছন্দোভঙ্গ। আর হতে পারত ইয়োরোপীয় ভ্রমণবীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনের দুরন্তরূপ সন্ধানী রচনা। আরণ্যক এ-দুয়ের কোনোটাই নয়। বিস্তৃত উপন্যাসে কোথাও ঋষিকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে অরণ্যভূমিকে পূত করার চেষ্টা লক্ষিত হয়নি। আধুনিক বাংলা হিমালয় ভ্রমণের বর্ণনায় যেমন পদে পদে মৃত্যু কল্পনার আতিশয্য—এ-ক্ষেত্রে তার সাহায্যে পাঠককে শিহরিত করার চেষ্টাও কোথাও নেই।

এইভাবে সর্ববিধ সংস্কার-বিমুক্তির ফলেই আরণ্যকের মানুষগুলিও উপন্যাসের মৃত্তিকার সঙ্গে অরণ্যানীর মতোই দৃঢ়-লগ্ন। ধাওতাল সাহুর কথা প্রথমে ধরা যায়। ধাওতাল সাহু কুসীদজীবী—অর্থনীতির পরিভাষায় Indigenous Banker-এর পর্যায়ে সে পড়ে। ধাওতাল সাহু লক্ষপতি, কিন্তু অনাড়ম্বর এবং বিশ্বাসবান ব্যক্তি। এ-ধরনের গ্রামীণ মহাজন আমরা দেখিনি—বাংলা উপন্যাসে তো নয়ই। কিন্তু বিভূতিবাবু তাকে প্রত্যয়সিদ্ধ করলেন কী প্রকারে? তার উত্তর এই যে উপন্যাসের ন্যায় শৃঙ্খলে তাকে লেখক আশ্চর্যভাবে বেঁধেছেন বলে। এই উপন্যাসের আবহাওয়ার নিয়মেই সে হয়েছে সত্য। এখানে যদি কুটিল এবং কুচক্রী এক মহাজনের আধুনিক লোভার্ত মূর্তি লেখক গড়ে তুলতে চাইতেন তাহলে আরণ্যকের সহজ বলিষ্ঠ পটভূমি স্থাপনা মিথ্যা হয়ে যেত। যেমন অক্লেশে ধাওতাল সাহু তামাদি হ্যাণ্ডনোটগুলি ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি অক্লেশে কলেরায় মানুষগুলো মরে, তেমনি অবলীলায় গাছে গাছে বসন্তে ফুল ধরে, গরমে শুকিয়ে যায়। টাকা বসিয়ে রাখা যায় না তাই তাকে খাটাতে হয়। এ-ছাড়া তার কোনো অভিলাষ নেই। নিরভিলাষ অরণ্যের মতো, নিরভিমান ধাওতাল সাহু সত্য। ঠিক এই নিয়মেই রাসবিহারী সিংও সত্য। সে বন্য প্রাচুর্য এবং বন্য উদ্দামতা নিয়ে অরণ্যের হিংস্রতার স্মারক হয়ে রইল। তার বাড়িতে লেখককে প্রদত্ত আহার্যথালীতে 'হাতির কানের মতো বড়ো বড়ো পুরী'র কথা আমরা পড়েছি। রাসবিহারী সিং-এর স্মৃতিতে মদমত্ত হাতির

প্রসঙ্গ সর্বদা উপযুক্ত। এবং এইভাবে বলতে বলতে বিভূতিবাবু আরণ্যকের মানব-জীবনের একটা রূপ শেষ পর্যন্ত বিন্যাসের মধ্যে আনতে পেরেছেন। একাধিকবার লেখক বলেছেন এ-দেশের মানুষ বড়ো নিষ্ঠুর, তাদের দয়ামায়া নেই। কিন্তু ধাওতাল সাহু এই দয়ামায়াহীন জীবনের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু এর মধ্যে বাস্তবিক কোনো বিরোধ নেই। কলেরায় মানুষ মরে—এ-ঘটনায় এখানকার মানুষের মনে দয়াধর্ম উদ্রেক করার কোনো অবকাশ নেই। অরণ্য এখানে জটিল নাগপাশের মতো মানুষের জীবনকে শত-জট-বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। দীর্ঘ অভ্যাসে তারা সেই বন্ধনে অভ্যস্ত, সমর্পিত-চিত্ত। তারা জানে অরণ্যের অমোঘ নিয়মের মতো সবই অলঙ্ঘ্য। কাজেই দয়ার প্রশ্ন নিরর্থক। ধাওতাল সাহুও যে তামাদি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফেলে, তার পশ্চাতে দয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। টাকা খাটাতে গেলে এই রকমই ঘটে থাকে। আরণ্যক উপন্যাসে মাত্র একটি ঘটনা দয়ার স্নিগ্ধতায় আর্দ্র। লেখক যেখানে কুন্তাকে জমি দিচ্ছেন সেখানে কুন্তার জমি চাষ করে দেবে কে এ-প্রশ্নের জবাবে সেই গাঙ্গোতা যুবক যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল যে সকল জমিতেই গাঙ্গোতাই একখানি করে লাঙ্গল দেবে—সেখানেই প্রথম দয়ার সাক্ষাৎ। অরণ্যের আদিম পট ছিঁড়ে অর্থ নৈতিক সূত্রবদ্ধ জীবনের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তার সহজাত সামাজিক কর্তব্যবোধের উদয় হল। এই ভাবেই বলা যায় যে বিভূতিভূষণ সমগ্র শিল্পকর্মের দিকে প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন বলেই নন্দলাল ওঝার মতো কুটিল ব্যক্তিকে যথাসম্ভব উপন্যাসের পটের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছেন। জমিদারি সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ এবং আমলাবৃন্দও একই কারণে যথাসম্ভব দূরে পরিহৃত হয়েছে।

চার

সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বাচন-ভঙ্গিমাও দ্রষ্টব্য। ভাবোন্নীত সুগম্ভীর ভাষাকে কোথাও কারো মুখের কথাকে বাস্তব করে তোলার অনুরোধেও লেখক লক্ষ্যচ্যুত করেননি। প্রাকৃত এবং অতি-প্রাকৃত জীবনের ভেদরেখা যে অরণ্যভূমিতে মিলে-মিশে রয়েছে সেখানকার বর্ণনাভঙ্গিতে গদ্যের ঋজুতার সঙ্গে কাব্যের নমনীয়তা প্রয়োজন। বিভূতিভূষণের সমুদয় প্রধান উপন্যাসের ভাষাতেই এই গুণ বর্তমান। আরণ্যকে তা আরো যথার্থ আধার পেয়েছে।—

(ক) দিক চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মতো পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে।…এর জ্যোৎস্না, এর বন

বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কখনো কোথাও পাই নাই। তার উপরে বেশি করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কী রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্না রাত্রে কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে।

(খ) তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী পরীরা নামে; জ্যোৎস্না রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐসব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মতো জেগে আছে। আমি দেখিনি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন।

উদ্ধৃত অংশ দুটিতে ভাষার বিন্যাসে কোনো ভেদসীমা নেই বললেই চলে। অথচ প্রথমটি লেখকের উক্তি, দ্বিতীয়টি আমিন রঘুবর প্রসাদের। আমিন রঘুবর প্রসাদের উক্তিকে বিশ্বাস্য বা বাস্তব করে তোলার জন্য লেখকের কোনো গরজ নেই। কেননা আমিন রঘুবর প্রসাদকে রূপায়িত করা লেখকের লক্ষ্য নয়। সে যে গল্প বলছে তার অবিশ্বাস্যতাকে বিশ্বাস করার জন্য আমরা প্রস্তুত বলে ছোট খাট বিশ্বাস্যতার বেলায় আমরা আর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নই। কাজেই যে কবিত্ব লেখকের নিজের ভাষায়, সে কবিত্ব রঘুবর প্রসাদের ভাষাতে এলেও বিস্ময়ের কিছু নেই এবং লক্ষণীয় যে লেখক সর্বত্র অতি-প্রাকৃত গল্পগুলিকে সফল করেছেন একটা বিশেষ কৌশলে। প্রকৃতির অঢেল এবং উদ্দাম সৌন্দর্যলীলার কথা বলতে বলতেই তিনি অতি-প্রাকৃত কাহিনীগুলির অবতারণা করেছেন। কোলরিজের কৌশল এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পাঠকের কাছে দুইই সমান বিস্ময়ের বিষয়। নাগরিকতা-ক্লান্ত মানসে বিশাল সীমাহীন প্রকৃতির কথা বিশ্বাস করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন তারই পটভূমিকায় স্থাপিত অতি-প্রাকৃতকে বিশ্বাস করতে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। মনে হয় প্রথমটা যদি সত্য হয় তা হলে দ্বিতীয়টাই বা নয় কেন? ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ-প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বর্ণিত অঞ্চলগুলির নামের মধ্যে মহাপ্রাণবর্ণের আধিক্য রহস্যময়তার সূচক হিসাবে কাজ করেছে।

মহালিখা, মোহনপুরা, ফুলবইহার, ঝনঝরি প্রভৃতি নামের মধ্যেই যেন বন ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসের ইঙ্গিত মেলে।

পাঁচ

এই সমস্ত উপাদানের পশ্চাতে সতত ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে লেখকের একটি বেদনা। এই বেদনার দুই মুখ। একমুখে অপরিচয়ের জন্য ক্ষোভ। এ অপরিচয়জনিত ক্ষোভের মূল সুদৃঢ় ভিত্তিতে। দেশকে জানার পিপাসা তিরিশের কালের একটা প্রধান লক্ষণ এ-কথা পূর্বে বলেছি। স্বদেশ-জিজ্ঞাসায় জীবন-জিজ্ঞাসারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিভূতিভূষণের রচনায় স্বদেশ-জিজ্ঞাসার বহিরঙ্গ আবরণটা কখনই বড়ো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আরণ্যকে বারে বারে দেখা যায় যে স্বদেশ পরিচয়ের অসম্পূর্ণতার জন্য লেখকের ক্ষোভ কথা বলেছে। ভারতবর্ষ নামক ব্যাপারটা যে এত বিশাল এত বিচিত্র এ-কথা তিনি এ-উপন্যাসে বারে বারে বলেছেন। এই বেদনার দ্বিতীয় মুখ জাতীয় সম্পদের অপচয়ে। উপনিবেশের ভূস্বত্বভোগীদের হাতে শাসক-শক্তির ঔদাসীন্যে, যে বিরাট অঞ্চল ন্যাশনাল পার্ক হতে পারত, তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে বসল দু-মুঠো গমের জন্য। এই জাতীয় সম্পদের চেতনা এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্টির ক্ষোভ থেকে জন্ম লাভ করেছে যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদ আশ্চর্য প্রেমিক মানুষ। এ-প্রেম জীবন-প্রেম। যে জীবন ঐ বিস্তৃত অরণ্য পটভূমিতে ব্যাপ্ত, তাকে সাজিয়ে বেড়ায় রাষ্ট্রশক্তির সহায়তাহীন একক যুগলপ্রসাদ। সরস্বতীর ধারে ধারে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ালে তার মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকত। লেখক উপন্যাসের প্রবক্তা হিসাবে তার কথা বলে গেলেই সে মহিমার সম্যক শিল্পরূপায়ণও সম্ভব হত। কিন্তু লেখক নিজে যুগলপ্রসাদের সঙ্গে অরণ্যভূমিকে অলংকৃত করার কাজে যুক্ত হওয়ার যুগলপ্রসাদের বিশ্বাস্যতা কমে গিয়েছে। প্রাচীন অরণ্যভূমির কাছে যে কারণে লেখক বারে বারে ক্ষমা চেয়েছেন, সেই অপরাধবোধকে স্খলিত করার জন্যই মনে হয় যেন যুগলপ্রসাদের সঙ্গে এই যুক্তপ্রয়াস—এমন ধরনের যান্ত্রিকতার অভিযোগ এখানে না উঠে যায় না। অথচ যুগলপ্রসাদ এই উপন্যাসের পক্ষে একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। জমি বিলির ফলে লবটুলিয়ার নবোদ্ভুত মানব বসতি যদি কাউকে আঘাত করে থাকে তো সে হল যুগলপ্রসাদ। যুগলপ্রসাদকে দিয়ে সে ক্ষেত্রে লেখক অনেক কথা বলাতে পারতেন, যা বলা হয়নি।

জাতীয় সম্পদ বিনষ্টি-জনিত যে-ক্ষোভের ফলে যুগলপ্রসাদকে লেখক কল্পনা করেছেন, সেই ক্ষোভের প্রেরণায় রচিত হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না। দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, আরণ্যক উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক। লেখক সৌন্দর্যের মর্যাদা এবং মর্যাদার সৌন্দর্য উভয়কেই নিঃসংকোচে রূপায়িত করেছেন। পরাভূত দোবরু পান্না বিপর্যস্ত হলেও, সে রাজা এবং অতীত সংগ্রামের নায়ক, এ-কথাটা লেখক কদাচ বিস্মৃত হননি। যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছেন দোবরু পান্না, তাঁর পূর্বপুরুষেরা লড়েছেন মুঘল সাম্রাজ্যবাহিনীর সঙ্গে। সূর্য বংশের সন্তান তিনি, একদা তাঁর বংশের অধীনে ছিল ঐ পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী। দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান দিয়েছেন লেখক। রাজার পূর্বপুরুষদের প্রাচীন সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখকের অনুভূতি স্মরণীয়।—

> ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল, সে নাটকের কুশীলবগণ একদিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—একদিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধ সিং।

দোবরু পান্নাকে রাজসম্মান, রাজাদেশ পালন, রাজার সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ভিতরে লেখকের বেদনার্ত ক্ষুব্ধ আত্মাই ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভারত-ভূমির অপরাজেয় প্রতিরোধের একটা প্রতীক খুঁজেছেন লেখক এই বিরাট অরণ্য-সম্পদের বিনষ্টির অসহায়তায়। ভারত সকল কিছুকে সমন্বিত করার ব্রহ্ম মন্ত্র জানে এ-কথায় তখন আর লেখকের ক্ষোভের নিরসন হয় না। দোবরু পান্নার প্রতিরোধী আত্মার স্মৃতিতে পুষ্পাঞ্জলিদানের অংশে যে গম্ভীর ভাবাবেগ সঞ্চারিত হয় তার মূল এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতী অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্যকে এবং সারল্যকে নিজের মধ্যে অবলীলাক্রমে সংহত করেছে। এই ক্ষেত্রে লেখকের সংযম যেন ভানুমতীরই সৌন্দর্যের মর্যাদার দান। তথাপি আমার মনে হয় যে দোবরু পান্নার মৃত্যুর পরে সমাধিভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সঙ্গেই এই অধ্যায়ে যবনিকা ফেলে দিলে ভানুমতীর শেষ অধ্যায়ে যে রসাভাস ঘটেছে তার হাত থেকে সে বেঁচে যেত। ভানুমতীর সঙ্গে বিদায় দৃশ্যে ভানুমতী উপন্যাসের নায়িকার মতো

আচরণ করেছে। এমন কি তার কালো জোড়া-ভুরু ছুটির কথায় আমাদের হঠাৎ যেন ভুলে যেতে ইচ্ছে করে যে সে সাঁওতাল মেয়ে। 'ভানুমতীই হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'আজ যেতে দেব না বাবুজী',— এই অংশেও তার ব্যবহারে প্রচলিত নায়িকা ভঙ্গিমার ছাপ অসঙ্গত হয়েছে। অরণ্যভূমি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এ ঘটনা যেন একান্তই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হল।

ছয়

আরণ্যকের মূল শক্তি তার ভাষা ভঙ্গিমায় এবং বর্ণনা-রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে —কিন্তু এ-শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে লেখকের সমগ্র চেতনার বিন্যাসে। নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-ভূমিতে যে বিস্ময় তা একদিকে যেমন আ-নীহারিকা-তৃণকণা-বিস্তৃত জীবনের বিস্ময়, তেমনি লেখকের স্বদেশ জীবনের অন্তর্গত মানুষের জীবনধারণের বিস্ময়ও বটে। এই ছুটি ব্যাপারকে, তথা জীবনের দ্বৈত রূপকে লেখক শিল্পস্থ করেছেন। ফলে অনেক টুকরো টুকরো কাহিনী (যেমন কুন্তার কাহিনী, মঞ্চীর কাহিনী) এক অনিবার্য ছন্দোবেগে রূপময় হতে পেরেছে। সে ছন্দ স্বভাবতই জীবনের ছন্দ। এই জীবনের ছন্দকে যে ঔপন্যাসিক বোঝেন তিনিই পট ও পাত্রের পরস্পর সম্পর্ককে কখনো ভুল করেন না। আরণ্যকের কতক স্থলে সেই ছন্দের ব্যত্যয় লক্ষ্য করেও বলা যায় জীবনের সমগ্রতার ধ্যানে আরণ্যক সফলকাম শিল্পকর্ম—তিরিশের যুগের কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলির মধ্যেই তার স্থান।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্ম আলোচনা কালে প্রথমে লেখকের attitude towards life বা জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গির কথা অবশ্যই অপরিহার্য। কোনো লেখকের মনোভঙ্গির কথা আমরা যখন বলি তখন আমরা নিঃসন্দেহে কোনো অস্পষ্ট আপ্তবাক্য উচ্চারণ করি না। লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের নিজস্ব বৃত্তি যার সাহায্যে লেখক নিজ শিল্পকর্মে স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি হতে পারেন। এই স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য উপন্যাসের বা গল্পের কাঠামো নির্মাণে, চরিত্র সৃজনে, ভাষাবয়নে এবং জীবন-ব্যাখ্যার সর্বত্রই অনুভূত হয়। বস্তুত লেখকের জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ধ্যান-ধারণা বা লেখকের মনোভঙ্গির ওপরেই সার্থক উপন্যাসের রস পরিণাম নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, লেখকের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা বা মনোভঙ্গি এবং লেখকের ব্যবহৃত দৃষ্টিকোণ সর্বাংশে এক বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভঙ্গি লেখকের পক্ষে এক গভীরতর প্রশ্ন। লেখকের দৃষ্টিকোণের প্রশ্নটা অপেক্ষাকৃত বাইরের প্রশ্ন। সে কারণে দুজন মার্কসবাদী লেখকের দৃষ্টিকোণের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দুজনের মনোভঙ্গির মধ্য বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। হাওয়ার্ড ফাস্ট * এবং এরেনবুর্গ উভয়েই একই রাজনৈতিক দৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং উভয়েরই উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনামিশ্রিত হলেও উভয়ের রচনার প্রসাদ যে ভিন্ন তার মূলে দুই লেখকের মনোভঙ্গির পার্থক্য। একজন যে-ব্যক্তিকে ইতিহাসের পটে স্থাপন করে তাকে পরীক্ষা করার পক্ষপাতী এবং একজন যে-ইতিহাসকে ব্যক্তির জীবন-বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত করায় সচেষ্ট, এখানেও দুই লেখকের নিজস্ব মনোভঙ্গিই সক্রিয়। লেখক যে জীবনকে দেখেছেন সেটা অবশ্যই তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিভাত হয়ে থাকে এবং সেই জীবনরস-সমৃদ্ধ শিল্পকর্ম লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির কথাই ঘোষণা করে। সে কারণেই হেনরি জেম্‌সের সুবিখ্যাত বক্তব্যটি আমরা স্মরণে রাখি যে No good novel will ever proceed from a superficial mind। তাই উপন্যাসের শিল্পকর্মের বিচারে লেখকের মানস-বিচারই হয়ে থাকে।

* সাম্প্রতিককালে অবশ্য হাওয়ার্ড ফাস্টের রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটেছে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গ অলোচনাকালে আমাদের মানিকবাবুর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি বা attitude-এর কথা সর্বাগ্রে আলোচ্য। তিনি ফ্রয়েড এবং অতঃপর মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন এর কোনোটার জন্যই তাঁকে নিন্দিত বা নন্দিত না করে আমাদের দেখা দরকার যে মানিকবাবু জীবন থেকে কী "নির্বাচন" করেছেন, কোন্ বক্তব্যে পৌছতে চেয়েছেন— স্থুল কথায় তাঁর জীবনকে দেখার মনোভঙ্গি কী। একজন লেখকের শিল্পগত এই মনোভঙ্গি বিচারের কালে আমাদের করণীয় কী এ-সম্বন্ধে রসজ্ঞপণ্ডিতদের সূত্রও এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। কোনো শিল্পকর্ম বিচারে বিশেষ উপন্যাস বিচারে আমাদের বিবেচ্য এবং আলোচ্য তিনটি বিষয়—প্রথম, লেখক কী পদ্ধতিতে জীবনকে দেখেছেন, দ্বিতীয়, কী তিনি জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন, কী তিনি বর্জন করেছেন, তৃতীয়, তাঁর সমস্ত বক্তব্য কোন্ নৈতিক বোধে বিশিষ্ট। যে-কোনোও লেখকের সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করতে গেলে উক্ত সূত্র তিনটির আলোকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানা রকম ভাবে জীবনকে দেখা যায় বলেই সার্ত্রে কমিউনিস্ট হলেও গোর্কি হবেন না। তারাশঙ্কর মন্বন্তর লিখলেও তারাশঙ্করই থাকেন। সে কারণেই মানিকবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা অনর্থক। সে কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে যদি দেখা যায় যে, মানুষের মনের বিচিত্র গহনতাকে উপন্যাসের বিষয় করে তিনি বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন—এ-কথার উল্লেখও হল না তখন সে আলোচনাও অপূর্ণ।

দুই

মানিকবাবুর উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটে মোটা দাগে ভাগ করতে পারি। একভাগে পড়ে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝি আর একভাগে পড়ে চতুষ্কোণ, সরীসৃপ, অহিংসা প্রভৃতি এবং তৃতীয় ভাগে পড়ে শহরতলী, চিহ্ন, আরোগ্য প্রভৃতি। যদিও এই তিন ভাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করেছেন তথাপি তাঁর মনোভঙ্গি—জীবনকে গ্রহণের পদ্ধতি—প্রথমাবধি প্রায় অপরিবর্তিত থেকেছে। মানিকবাবুর শক্তি এবং তাঁর দৌর্বল্যের উৎস এই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। অবশ্যই কোনো লেখক তাঁর attitude towards life-কে পরিহার করতে পারেন না। স্বেচ্ছায় নিজ দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের জীবন ধ্যান-ধারণাকে

যদি কেউ পরিবর্তিত করে নিতে চান তাহলে তাঁর অবস্থা হয় সুবোধ ঘোষের মতো। সুবোধবাবুর শিল্পজীবনের মধ্য পর্যায়ে গান্ধীবাদে পৌছনোয় আমাদের কোনো ক্ষোভ ছিল না যদি সুবোধবাবুর নবলব্ধ বিশ্বাস তাঁর শিল্পী-জীবনে ফাঁকির সৃষ্টি না করত। গান্ধীবাদকে গ্রহণ করার পর সুবোধবাবুর যথার্থ শিল্পীহৃদয় যেটা আবিষ্কার করল সেটা হল 'অযান্ত্রিক' 'গোত্রান্তর' এবং 'ফসিল' রচনার কালে জীবন সম্বন্ধে লেখকের যে মনোভঙ্গি ছিল গান্ধীবাদকে শিরোদেশে অঙ্কিত করে সে ভঙ্গিতে জীবনদর্শন আর সম্ভবপর নয়। শ্রেণীসমন্বয়, হৃদয়েয় পরিবর্তনের মতাদর্শের সঙ্গে গোত্রান্তরের মতাদর্শকে মেলানো শিবের অসাধ্য। অতএব সুবোধবাবুকে এমন দায়হীন (সশ্রদ্ধভাবেই বলছি দায়িত্বহীন নয়) প্রেমের গল্প লিখতে হয়। এই চকচকে গল্পগুলোর তাৎপর্যহীনতার পিছনে শিল্পী-জীবনের ঐ ফাঁকিই সক্রিয়।

দুঃখের বিষয় মানিকবাবুর ক্ষেত্রেও শিল্পের সংকটের যে অনুযোগ উত্থাপিত হয় সে সংকট মানিকবাবুর পক্ষে মতবাদের সংকট। এই সংকটের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে মানিকবাবুর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা দরকার এবং এ-আলোচনার সূত্রপাতেই একটা মোটা কথা পাঠকের মনে না হয়ে পারে না। সেটা হল চতুষ্কোণ এবং সরীসৃপ পর্যায়ের রচনাগুলি ব্যতীত পদ্মা নদীর মাঝিতে, পুতুলনাচের ইতিকথায় অথবা শহরতলীতে কিংবা চিহ্নে যৌনতাকে মুখ্য বিষয় কোথাও করা হয়নি। শহরতলী, চিহ্ন, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথায় মুখ্য বিষয় মানুষ। যদিও তাঁর প্রথম পর্যায়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিস্তর পার্থক্য তথাপি এই দুই পর্যায়ে মানুষেরই অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন মানিকবাবু হয়েছিলেন এবং সে-ক্ষেত্রে একমাত্র চতুষ্কোণ পর্যায়েই যৌন-বিষয়ক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাত্র চতুষ্কোণকে অবলম্বন করে মানিকবাবুর রচনায় জীবন কম, যৌনতা বেশি এ-অভিযোগ করা অসমীচীন।

বরঞ্চ আমাদের মনে হয় চতুষ্কোণকে গৌণ আসন দিয়ে চতুষ্কোণ পর্যায়ের আগে এবং পরে মানিকবাবুর আরম্ভ এবং পরিণতির কথাটাই বিশেষ বিবেচ্য। সে-ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বিবেচ্য হবে পদ্মা নদীর মাঝি এবং পুতুলনাচের ইতিকথা। বস্তুত, পদ্মা নদীর মাঝি এবং পুতুলনাচের ইতিকথায় মানিকবাবুর বক্তব্য প্রায় এক। শুধু জীবনের দুটো ভিন্ন বিন্যাসে সে বক্তব্যকে ধরা হয়েছে— এই যা পার্থক্য। বই দুটি মানিকবাবুর বিশিষ্ট শক্তির প্রায় সমস্ত চিহ্নই বহন

করেছে। মানিকবাবুর সেই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির লক্ষণ এই: মানিকবাবু জীবনের বর্ণবহুল মুহূর্তগুলিকে পরিহার করতে চান। মানুষের হাসি-কান্নার প্রেম-বিরহের উপরিতলশায়ী সমস্ত বিকারের অপেক্ষা চৈতন্যের গভীরতর প্রশ্নকে তিনি ধরার পক্ষপাতী। সুতরাং ঋজু এবং প্রত্যক্ষভাবে ইমোশনকে জাগ্রত করবে এ-জাতীয় সমস্ত প্রলোভন স্বভাবতই তিনি পরিহার করে থাকেন। বলা বাহুল্য মানিকবাবুর বিষয় যেহেতু মানুষের মন সেই হেতু ঘটনার প্রোজ্জ্বল রঙ-চড়ানোর বর্ণনা অপেক্ষা মানুষের মনের ওপর ঘটনার প্রতিক্রিয়া সন্ধানের জন্য তিনি বেশি উৎসুক। তাই পুতুলনাচের ইতিকথায় 'ভোরের দিকে সেনদিদি মরিয়া গেল'—এই মৃত্যুর বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর চেয়ে অধিক সময় দিতে নারাজ। কারণ সন্তান প্রসবের পর সেনদিদির মৃত্যুতে শশী এবং গোপালের মানস প্রতিক্রিয়াই মানিকবাবুর মূল লক্ষ্য।

পুতুলনাচের ইতিকথায় শশীর সমস্যা নিশ্চয় যৌন সমস্যা নয়। সম্পূর্ণই শশীর মনের সমস্যা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ-উপন্যাসের বিষয়—গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনা জট পাকিয়ে যাওয়ার সমস্যা। যেহেতু মানিকবাবুর নায়ক একান্তভাবে মানিকবাবুরই নায়ক সে-কারণে শশীর কাছ থেকে ধাত্রী দেবতার শিবনাথের ব্যবহার এবং চরিত্র আশা করা অন্যায় হবে। অনেক সমালোচক শশীর সমস্যাটাকে যে সহানুভূতি দিয়ে অনুধাবন করেন না সেটা বুঝি তখন, যখন দেখি যে শশীর সমস্যাটাকে চেপে রেখেই উপন্যাসের আলোচনা শেষ হল। তাই যখন দেখি যে কুসুমের সেই বিখ্যাত উক্তি 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন, ছোটবাবু'—উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয় শশীর তৎপরবর্তী স্বগতোক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই তখন দুঃখ হয়। আসলে ঐ বিচিত্র স্বগতোক্তি উপন্যাসের নিজস্ব ন্যায়ের ক্রমেই ঘটেছে। 'শরীর শরীর, তোমার কি মন নাই কুসুম'—এইটেই তো শশীর প্রশ্ন। আমাদের এই কিম্ভূতকিমাকার গঠনের ঔপনিবেশিক জীবনে কলকাতা এবং গাওদিয়ার মাঝে যে দুমতিক্রম্য ব্যবধান শশী-কুসুমের সম্পর্ক তারই প্রতীক। শশীর ফুলের চারা মাড়িয়ে কুসুমের দাঁড়ানোর মানেও এইখানে। শশী কলকাতার তথা উপনিবেশের প্রয়োজনানুগ শিক্ষাযন্ত্রের তৈরি শশীবাবু (উপন্যাসে ছোটবাবু) মাত্র। এই বাবুত্বের আরোপিত যন্ত্রণায় মানুষ শশীটা ছটফট করেও শেষ অবধি শশী ডাক্তার হয়েই কেমন করে শেষ

হয়ে যায় সেইটাই উপন্যাসের বিষয়। মানুষের মনটাই ছিল শশীর অন্বিষ্ট। অথচ এইটা শশী জানত না যে কুসুমের মন গাওদিয়ার মন, শশীর অনুরূপ নয়। অপরের মনের সঙ্গে নিজের মনের মিল না পাওয়া গেলে শশী নিজের মনের মানেও খুঁজে পাবে না। এবং এই মিল তাকে সেখানে খুঁজতে হচ্ছে যেখানে 'কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকাইলে' আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতে শশীর লজ্জা করে। গাওদিয়াকে কলকাতার ছাঁদে গড়ে নিতে গিয়ে শশী পারে না এটা বোঝানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

শশী তিরিশের উপনিবেশের মধ্যবিত্ত জীবনের নিহত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ। শশীর জীবনে এবং মনে গাওদিয়ার জটিল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই তাই গাওদিয়া রূপময় হয়ে ওঠে। গাওদিয়ার মানুষগুলোর "রোজকার জীবনযাত্রার" প্রসঙ্গ না টেনে আনলে একে রূপময় করে তোলা যাবে না, বা সে মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্রকে নিখুঁত করে না দেখালে সে-জীবন বিশ্বাস্য হবে না, আমরা এ-রকম প্রথাসিদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী হলে মানিকবাবুর চরিত্র-পাত্রকে চেনা যাবে না।

কেননা আমরা জানি যে It is a matter rather of the firm and vivid concreteness with which the representative attitudes and motives are realized। যে-গুণে একজন শিল্পী তার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন তার প্রধান কথা হল He must be exceptionally aware of them। এই exceptional awareness-এর পরিচয় রোজকার জীবনযাত্রার সংবাদ-প্রদানের মধ্যে থাকে না। এর পরিচয় খুঁজতে হয় অন্যভাবে। কারবারী লোক গোপাল দাসের প্রতিদিনকার কারবার-কেনাবেচার মধ্যেই তাকে সন্ধান করতে হয় না। শশী তার পুত্র। শশী সম্বন্ধে তার মনোভাবের মধ্যে যে অধিকারের চেতনা জাগ্রত ছিল সেটাই তার সম্পত্তিবান গ্রাম্য মালিক মনোভাবের যথেষ্ট প্রমাণ। তার জন্য তাকে গণদেবতার শ্রীহরি পাল হতে হবে নিশ্চয় এ-প্রত্যাশা আমরা করব না। জীবিকার উপরিতলশায়ী পরিচয়ের চেয়ে এ-পরিচয় যে অনেক গভীর।

এবং এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা আরো বেশি হয়ে দেখা দেয় পদ্মা নদীর মাঝি হোসেন মিয়ার চরিত্রের মূল্য নিরূপণে। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া-প্রীতির উল্লেখেই তার চরিত্রের ব্যাখ্যা-কার্য শেষ করতে চাই বলে হোসেন মিয়ার সম্যক তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। তাই হোসেন মিয়ার চরিত্র

আলোচনাকালে তার গান বাঁধার প্রসঙ্গ অনালোচিত থাকে . আমাদের আলোচ্য সমালোচনায়। গানটি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোন্ধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও
মিয়া, কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার পিকু
উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগ্যা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
দিল জাগানি আলেন যিনি, মিয়া
চিরা-মেঘের বাদাম তুল্যা বন্ধু কনে যাও ?
জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি, কত ঘুমাইবা।

যদিও বাউল মুর্শিদের গানের আদলে এ-গান রচিত তথাপি "কত ঘুমাইবা" এই ধুয়ার মধ্যেই গানটির অন্য তাৎপর্য হোসেন মিয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু একে বুঝতে হলে একটু আগে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মা নদীর মাঝির যে সমান ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সে-বিষয়ে দু-কথা বলা প্রয়োজন। অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মানুষের কথাই এই দুটি উপন্যাসের উপজীব্য। গাঁওদিয়ার গ্রাম-সমাজ এবং পদ্মা নদী এই দুই উপন্যাসে অদৃষ্টের অন্ধ নিয়তির প্রতীকরূপে উপস্থাপিত। কিন্তু পদ্মা নদীর মাঝিতে উপন্যাসের রূপ-কল্পনা কথঞ্চিৎ পৃথক। হোসেন মিয়া এবং পদ্মা, কুবের ও তার সমগোত্রীয়দের কাছে অবশ্যই একই দুরতিক্রম্য বিধিলিপির প্রতীক। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং পদ্মা পরস্পরের সহযোগী কদাচ নয়। বরঞ্চ হোসেন মিয়া যেন পদ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী। পদ্মার প্রতিকূলতাই তার ভূমিকা। পদ্মার তীরবাসী জেলেদের অদৃষ্টের তথা পদ্মার কাছে সমর্পিত-ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পটভূমিকায় হোসেন মিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। সে নিজ ভবিষ্যৎ রচনায় বিশ্বাসী। তাই অকূল জলরাশির

মাঝখানে দ্বীপ রচনায় একাগ্রচিত্ত এক কর্মিষ্ঠ ব্যক্তি হোসেন মিয়া। পদ্মার ক্রুর প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে হোসেন মিয়াই কঠিন হাতে পাঞ্জা ধরেছে। কাজেই তার ব্যবহারও অক্রূর নয়। তাই 'কত ঘুমাইবা' উপরে উদ্ধৃত গানের এই ধুয়ার অর্থ বাউল-মুর্শিদ-ঈপ্সিত আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইঙ্গিত নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধতা হোসেন মিয়ার সমগ্র জীবনের সারার্থ। গানটির রূপকে তাই বলা হয়েছে। এবং এই গানের পর বিস্মিত কুবের যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে—আপনি গান বাইন্ধবার পারেন? তখন হোসেন মিয়ার জবাবটিও লক্ষ্য করার মতো—খুশ হলে না পারি কি? অবশ্য কুবেরের কাছে হোসেন মিয়া প্রায় ঐশী শক্তির সমতুল্য। দ্বীপে বসতি রচনা এবং গান রচনা খুশি হলে সে সব পারে—দুইই তার লীলা। সে-কারণেই ময়না-দ্বীপ যাত্রার বর্ণনায় কম্পাসের সামনে স্থিরনেত্র হোসেন মিয়ার পুরুষকার-প্রদীপ্ত মূর্তিটি মানিকবাবুর রচনার দরকার হয়—কুবেরের কাছে হোসেন মিয়াকে মানুষ করে তোলার জন্যই আফিমের প্যাকেটের ঘটনার প্রয়োজন হয়। এর কোনো কথাই, আশা করি, নতুন কথা নয়। তবু একটা কথা বোধ করি কাউকে অসম্মান না করেই বলা চলে যে হোসেন মিয়ার মতো কল্পনা-সিদ্ধ চরিত্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্র-মালায় আর একটিও নেই। পুতুলনাচের ইতিকথার যাদব আর হোসেন মিয়া একই মনোলৌল্যে গঠিত-এ কথা তাই রসবোধসম্মত কথা নয়।

এ-সমস্ত কারণেই চতুষ্কোণ অবলম্বন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তুষ্ট থাকা হয় যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যৌনতা আছে বেশি জীবন আছে কম। চতুষ্কোণের ক্ষণিক পর্যায় মানিকবাবুর আদি এবং অন্তে কোথাও স্থায়ী চিন্তা হিসাবে ছিল এ প্রমাণ নেই। চতুষ্কোণের পরবর্তীকালে শহরতলী, চিহ্ন এবং আরোগ্যে মানিকবাবু নতুন করেই মানুষকে দেখতে চেয়েছেন। মানুষের গোটা চেহারায় তারই সমাজ প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল—চতুষ্কোণে এ-বক্তব্যের ব্যর্থ শিল্প-রূপায়ণের পর স্বাভাবিকভাবেই মানিকবাবু অগ্রসর হয়েছেন নতুন জিজ্ঞাসায়। এবং এরই ফলে মানিকবাবু মার্কসবাদকে স্বীকার করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই স্বীকরণ নির্ভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণাম। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে নিজ শিল্পীজীবনে জারিত করে নিতে গেলে নিজেরই শিল্পী ইতিহাসকে যে ভাবে অনুধাবন করা দরকার সে-ক্ষেত্রে মানিকবাবুর ব্যত্যয় ছিল। তাঁর

শেষ দিকের উপন্যাসগুলি নিয়ে কোনো যোগ্য বিনীত সমালোচনা হলে এ-কথা নিশ্চয় উত্থাপিত হবে। শুধু যখন অম্বিষ্ট হয় নিজের মন অথবা মনের মানে, তখন,—অথবা অন্ধ অদৃষ্টতুল্য প্রকৃতির গ্রাসে উপায়ান্তরহীন জীবন যখন উপজীব্য, তখন যে-মনোভঙ্গি কার্যকরী, মানুষ নিজ ইতিহাসকে নিজেই রচনা করে এ-কথা বলবার সময় আর সে-মনোভঙ্গি কার্যকরী হয় না। মানুষ পরিবেশের অধীন—শহরতলী পর্যন্ত এ-কথা যত শিল্পসম্মত ভাবে মানিকবাবু বলেছেন—মানুষ আপন অদৃষ্ট রচনায় অংশ গ্রহণ করে এ-কথা তত শিল্পসম্মত ভাবে তিনি বলতে পারেননি। অথচ মানিকবাবু হোসেন মিয়ার মতো চরিত্র সৃজন করেছেন। যশোদার নিঃসঙ্গতার ছবি এঁকেছেন। সেই কারণেই পাকার আত্মানুসন্ধানের ছকে (জীয়ন্ত উপন্যাসে) অথবা চিহ্ন উপন্যাসে অক্ষয়ের মদের গ্রাসে তাজা ছেলের রক্ত দেখায় মানিকবাবু মানুষের নিঃসঙ্গতাকেই রকমফের করে এঁকে বসেছেন তাঁর মার্কসবাদী অধ্যায়ে। অবশ্যই মানিকবাবুর অগ্রসর হবার প্রয়াস সদাই অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রয়াসেই তিনি জগদীশ গুপ্তের নৈঃসঙ্গ্যের বক্তব্য থেকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যের সার্থক রূপান্তরের পথে বাধা ছিল তাঁর নিজস্ব শিল্পী-ব্যক্তিত্ব যা তাঁর শিল্প-ধর্ম, শিল্প-দৃষ্টি, শিল্প-বক্তব্য—সবই। শশী-হোসেন-কুবের-যশোদার পর্যায়ে তিনি যে মানুষকে খুঁজেছেন সে শুধু আত্মা নয়, শুধু দেহ নয়, নয় শুধু বুদ্ধি, অথবা স্নায়ু কিংবা কোষের জটিলতা, কিংবা সমাহার। তিনি খুঁজেছেন সেই অখণ্ড ব্যক্তিস্বরূপকে যে তার সমুদয় উক্ত খণ্ডগুলির থেকে বড়ো। সেই মানুষের যন্ত্রণা ছিল মানিকবাবুর বিষয়। মার্কসবাদী পর্যায়ে তিনি বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষকে আঁকতে গিয়ে হারিয়ে ফেললেন তাঁর শিল্পের অভিজ্ঞান।

এইভাবেই মানিকবাবুর গদ্যরীতিকেও উপলব্ধি করা সম্ভব। তিরিশের লেখক-বৃন্দের মধ্যে যাঁর গদ্যরীতি চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের শক্তিমান লেখকদের সমধিক প্রভাবিত করেছে—তিনি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা স্মরণ করার মতো। কথাটি এই যে প্রভাবিত লেখকেরা প্রায় ক্ষেত্রেই মার্কসবাদী নন। এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি আমাদের এতক্ষণের আলোচিত সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত করছে—মানিকবাবুর শিল্পজীবনের প্রকৃষ্ট অধ্যায়ে মার্কসবাদের সাঙ্গীকরণ হয়নি। তাঁর বিশিষ্টতার উত্তরাধিকারীদের দিকে তাকালে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে মানিকবাবুর শিল্প-সাধনার সার্থকতর স্তরে, ভবিষ্যৎ প্রভাবী স্তরে মার্কসবাদের বীজ ছিল না।

যে অর্থে মানিকবাবুর সঙ্গে জগদীশবাবুর আত্মীয়তা এবং মানিকবাবু সঙ্গে ইদানীন্তের লেখকদের—সে অর্থের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিচ্ছিন্ন মানুষ, প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নিঃশব্দে সমর্পিত-প্রাণ মানুষ—এবং ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে পরাধীন মানুষকে গড়ে তোলার উপযুক্ত ভাষা জগদীশ গুপ্তের ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের; এবং এই ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন বর্তমান কালের অনেকে।

এই ভাষা-রীতিকে প্রসঙ্গসমেত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে এ-ভাষা বেগবতী নয়। সম্প্রতিকালে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কারো কারো মন্তব্যেও মানিকবাবুর ভাষা যে বেগবতী নয়, সেখানে যে তীব্রতা প্রায় নেই এ-অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের কোনো কারণ থাকে না, যদি আমরা এ-কথা অনুভব করি যে বেগবতী না হওয়াটাই মানিকবাবুর ভাষার প্রধান গুণ। মানিকবাবু যদি প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা বলতে চাইতেন, তাহলে তাঁর উপন্যাসের উপকরণ-প্রকরণ সমেত ভাষাও পরিবর্তিত হত। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তির কথা বলেছেন তারা কেউই তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের নায়কের মতো জীবনের পাঠ প্রথম গ্রহণ করছে না। চারদিকের জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্বময়, অথবা সখ্যময়, এই দুই ছবির কোনোটার প্রতিই তাঁর কোনো লোভ নেই। সুতরাং তাঁর গদ্যে বেগ বা আবেগ দুয়ের কোনোটাই স্পন্দিত হয়ে ওঠেনি। তিনি বেছেছেন সেইসব মানুষকে যারা জীবনের একটা প্যাটার্নের নিদর্শন। (যশোদা), সেই প্যাটার্নকে যারা অদৃষ্টের মতো মেনে নিয়েছে, সুখ দুঃখকে সেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে (কুবের), যাদের জীবনের সেই বিধাতা-কল্প অপরিবর্তনীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাসনা নেই, ক্ষীণ প্রয়াস প্রায় দুর্লক্ষ্য (শশী)। আবার তিনি কখনো কখনো অন্ধ অদৃষ্টের বিপরীত মেরুতে যে প্রতিযোগী শক্তি কল্পনা করেছেন সেও পদ্মার মতোই নিরাসক্ত এবং প্রায় অমানবিক (হোসেন মিয়া)। পাকার মতো দামাল কিশোরের কল্পনায় মানিকবাবুর এই ধরনের ব্যক্তি কল্পনা একবার ব্যতিক্রমের পথ ধরেছিল বটে, কিন্তু অচিরেই মনের দিক থেকে পাকা বয়সকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় গদ্যরীতির নিজস্ব ছন্দের বদল আবশ্যিক হল না। স্বভাবতই যে সমস্ত মানুষের কথা তিনি বলেন তাদের প্রসঙ্গে ভাষার মন্থর নিরাবেগ ভঙ্গিই কার্যকরী।

মানিকবাবুর গদ্যরীতির দ্বিতীয় লক্ষণ হল এই যে এ-ভাষা একেবারেই ঘটনা-ভারবাহী বা সংবাদ-বাহন নয়। কেননা মানিকবাবু বাস্তব বলতে বাস্তবতার বিকারকে বোঝেন না। তিনি সব সময়েই বাস্তবের অন্তঃসারগত মূর্তিটিকেই আবিষ্কার করতে চান। ফলে খুঁটিনাটি বর্ণনায় তাঁর সহজাত দক্ষতা তর্কাতীত হলেও (পদ্মানদীর মাঝির জেলেদের জীবন বর্ণনা) এ-বর্ণনার কোনো তাৎপর্য তাঁর কাছে নেই। তিনি জানেন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার কোনো শেষ নেই— বাস্তবের শুদ্ধ সার, যা সৎ অসৎ, ভালো-মন্দ কিছুই নয়, তা এই বর্ণনার জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারে। মানিকবাবুর এই শক্তিই তাঁর গদ্যভঙ্গিতে একটা সংক্ষিপ্ত হবার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল যা শেষের দিকে তাঁর শত্রুতা করেছে। এবং এখানেও তিনি তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের বিপরীত পথচারী। কেননা তারাশঙ্করের মতো তথ্যসন্ধ হবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না, বিভূতি-ভূষণের বিমুগ্ধতারও তিনি কেউ নন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়তা থাকলেও জগদীশ গুপ্ত নিজস্ব মেজাজকে গদ্যে প্রায়ই নষ্ট করতে চাইতেন, অনাত্মীয় কাব্যস্রোতের সাহায্যে। সে শুষ্কতা তাঁর সম্পদ তা এর ফলে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে। শুষ্কতার পরিবর্তে সরসতা এ-ক্ষেত্রে কর্দম সৃষ্টি করেছে। দিবারাত্রির কাব্যে মানিকবাবুর ভাষার শুদ্ধতায় যে কবিত্বের প্রসাদ তা পল্লবগ্রাহী কবিত্ব নয়। সেও বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে উন্মোচিত করার মাধ্যম। যে সরল ঋজুতার জন্য তিনি খ্যাতিমান তা তাঁর মধ্যবর্তী জীবনের সৃষ্টি। এখানে তিনি জগদীশ গুপ্তকে অবশ্যই অতিক্রম করেছেন। বক্তব্যে কৃত্রিমতা থাকলে এ-ভাষাও কৃত্রিম হতে বাধ্য। তখন এর শক্তিচ্যুতি ঘটে। মানিকবাবুর হাতে তা কখনো ঘটেনি। মানিকবাবুর গদ্যের উত্তর-সাধকদের এ-কথা মনে রাখা দরকার।

অন্নদাশঙ্কর রায়

এক

সত্যাসত্যের ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন যে ইচ্ছা ছিল সত্যাসত্য এপিক হবে, তথা রূপক। সুধী এবং বাদল হবে সত্য এবং অসত্যের প্রতীক—এই ছিল লেখকের বাসনা। বাসনা ছিল—উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ় মানবাত্মা। লেখক বলেছেন—'আইডিয়াটাকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা ধাবিত হল তৃতীয় দিকে—এই তিন নদ-নদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল বহু উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটা শক্তি নয়, ব্যক্তি। রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল।' যে সচেতন উদ্দেশ্য সত্যাসত্যের অব্যবহিত পূর্বপ্রেরণা, অচিরেই দেখা গেল সে সার্থক শিল্পের শাশ্বত ন্যায় অনুসরণ করে সেই সচেতন উদ্দেশ্যের সংকীর্ণ চতুঃসীমাকে লেখক অতিক্রম করে গেছেন। 'আমার হুকুম মানে না'—এ-কথাটা কতকটা সৌখিন উক্তি। কেননা ঔপন্যাসিকই হোন অথবা নাট্যকারই হোন, সৃজনী ক্ষমতা জীবন এবং শিল্পের দ্বৈত লীলায় সেতুবন্ধন প্রয়াসী; তাই সেতুরচনা নামত রচনা হলেও যেহেতু তা বন্ধন, বন্ধনের কঠিন নিয়ম শিল্পীকে পালন করতেই হয়। তথাপি রূপকের ছায়া সত্যাসত্যে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত এবং তাতে তার মর্যাদার হানি হয়নি, শুধু রূপকের বেশ বদল করার জন্য সিদ্ধির তারতম্য এসেছে। সে কথাটাই এখানে আলোচ্য।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ এবং প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের মুক্তদৃষ্টির প্রসাদলব্ধ হয়েও শুধু প্রসাদের মূল্যেই প্রসন্ন ছিলেন না। উপন্যাসে এক-ধরনের বিশ্ববীক্ষা বা সভ্যতা-সচেতনতাকে তিনি ব্যবহার করলেন, যার বিমুক্ত সংস্কৃতি-মনস্কতার ভিত্তিতে হয়তো প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও সহজ মানবিকতার মূলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার আধুনিক আগ্রহের

জন্য যা হয়ে উঠল বিশিষ্ট। "উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ় মানবাত্মা"—শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনী নিজে তা হয়নি কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের মানবতার সংকটকে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসস্থ করেছিলেন। এই সভ্যতার সংকট সম্বন্ধে চেতনা এবং আগ্রহের গূঢ় অর্থে অন্নদাশঙ্করের আধুনিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য উভয়ই গৌরবময়। স্মর্তব্য যে, বাংলা সাহিত্যে তখন শরৎচন্দ্রের জনতা-বিজয়ের কাল, তখনই কল্লোলের কলরবে সমুদ্রের গভীরতা না বাজলেও নানা জলতরঙ্গের বিদেশী সুর,—শ্রীকান্ত-অমিত এবং অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রের পথিক-চিত্তসম্পন্ন নায়কেরা তখনকার অস্থিত-মূল মধ্যবিত্ত-মানসের প্রতিভূ—এই সাহিত্যিক পরিবেশে তখন অন্নদাশঙ্করের নায়ক-নায়িকাবৃন্দ একে একে আবির্ভূত হল। শরৎচন্দ্র তাঁর ধারেকাছে নেই, কল্লোলের পথিক-স্বভাব বেদনা-বিলাসের তিনি কেউ নন। তিনি বললেন—'এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাব-নিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানব সংসার নয়, নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় পারম্পর্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়ক-নায়িকার তিনজনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্‌টুইশনের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেক্‌টের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিনজনের আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়।' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এ-উপন্যাসে মানুষের আত্মচেতনার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকার কথা। এবং সেই দ্বন্দ্বসংঘাতযুক্ত চেতনা-লোকের ভাষাও লেখককে গড়ে নিতে হবে। সত্যাসত্যের এপিক ধর্ম সম্বন্ধেও লেখক নিজেই একটি নিরিখ আমাদের দিয়েছেন—যথাকালে এই উপন্যাসের ভাষার বিচারও হবে সেই নিরিখের ব্যবহারে। নিরিখটি হল—'এপিকের লক্ষণ নায়ক-নায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব।'

দুই

লক্ষ্যের উচ্চতা সম্বন্ধে পূর্বে সুনিশ্চিত হয়ে প্রয়াসের মহত্ত্বের কথা বিবেচনা করা যাবে। বাদল এই উপন্যাসের নায়ক, অন্যতম নায়ক সুধী। বাদলের বক্তব্য হল: Free will এবং determinism-এর দ্বন্দ্বে Free will-এর জয় কল্পনাতীত নয়। বাদল ভারতীয়। কাজেই বাদলের পক্ষে Free will-এর প্রবক্তা হওয়া বলিষ্ঠ সত্যসন্ধিৎসারই পরিচায়ক। সুধী বাদলকে বলেছিল—জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট কোরো না। সম্ভবত এইটাই সুধীর জীবনের তাৎপর্য। উজ্জয়িনী জীবনের রসপিপাসায় পরিপূর্ণ। 'কার জন্য বাঁচব?' 'কার কাছে

আমার আদর?' আত্ম-নিবেদনের জন্য সে আকুল। এখন এ তিনটি চরিত্রের লক্ষ্যের তাৎপর্য কি? সম্ভবত অস্তিত্বের মূলীভূত রহস্যে অবহিত হওয়াই কুশীলবদের লক্ষ্য। জীবন শুধু বিরহ-মিলন কাহিনী নয়, নয় শুধু মনের অগমরহস্যের সিংহদ্বার উন্মোচন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ-কালের বেঁচে থাকায় উপলব্ধির শর্তটি প্রধান। সমাজ, সভ্যতা এবং ইতিহাসের জটিল রূপ সম্বন্ধে সচেতনতায় জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণের প্রেরণা। ত্রিশের ইওরোপে সেই সচেতনতা জন্মলাভ করেছে যুদ্ধোত্তর ইওরোপের রক্তহারা ক্লান্তির পথে। এ দেশে জীবনের গার্হস্থ্য চেহারায় এই ক্লান্তির অস্ফুট প্রতিফলন। ভারতবর্ষে জীবনের চেহারায় ত্রিশের যুগেও মাত্র চাকুরিগত সংকটের ছায়া। কল্লোলের শ্রেষ্ঠ রচনা গোকুল নাগের পথিক। পথিকে আভিজাত্যের প্রতি বিদ্রূপ, অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কথা থাকলেও পথিক শেষ পর্যন্ত বিরহ-মিলন কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনায়নে দুঃখের বাঞ্ছিত রূপ সৃজনে সহানুভূতি নির্মাণের প্রয়াস—যদিও তা নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের (মেজদিদি গল্পে) কেষ্ট যেমনভাবে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে এবং শিল্প হিসাবে নিকৃষ্ট হয়েছে, সে পথে পদার্পণ করেনি। জীবন সম্বন্ধে নতুন আশা-বোধ ত্রিশের যুগের কাল-লক্ষণ। কিন্তু সে-আশার স্পষ্ট কোনো অবয়ব আমাদের মনে গড়ে ওঠেনি। কাজেই আশাভঙ্গের বেদনাও আর্তির পর্যায় ছাড়িয়ে পৌরুষের যন্ত্রণায় গিয়ে উপনীত হল না। সীমিত জীবনবোধকে নিয়ে বড়ো উপন্যাস সম্ভব নয়। গোরা এবং চতুরঙ্গের পর, তাই আমাদের কল্লোল-কালীন উপন্যাস-সাহিত্য প্রধানত ক্লান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের সর্ববিধ জড়, অলস, কর্মবিমুখতাকে রঙিন এবং ভাবময় করে তুলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অমিত এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত তার প্রমাণ। এই কারণে অন্নদাশঙ্কর তাঁর নায়কদের ইওরোপের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন। ভেবেছেন, বাদল-সুধী-র লক্ষ্যের উচ্চতাকে এই স্বাদেশিক অষ্টাবক্র জীবনের আধারে ধারণ করা অকল্পনীয়। স্বভাবতই ইওরোপে সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব-জাত টানাপোড়েনে এই লক্ষ্যগত উচ্চতার বাস্তব পরীক্ষা। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ব্যতীত সমতলে যেমন শৈলবীরদের পরীক্ষা অভাবনীয়, সেইভাবে বলা যায় ইওরোপের জটিল গ্রন্থিল জীবন-সূত্রের মাঝখানে না দাঁড়ালে গ্রন্থিমোচনের কাজ সমাপ্ত হবে না। সুধী-বাদল সকলেরই উদ্দেশ্য জীবনকে বাইরের শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট ছকের হাত থেকে মুক্ত করা—এক কথায় গ্রন্থিমোচন। বাদলের Free will এবং সুধী-র নিরাসক্ত জীবন-প্রীতি

দুইয়েরই লক্ষ্যমুখ এই দিকে। উজ্জয়িনীর ব্যক্তি-জীবনের গ্রন্থিমোচন-কল্পনাও এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। আধুনিক অর্থে যে তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সত্যাসত্য উপন্যাসের প্রধান পাত্র-তিনজনের উদ্ভাসন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে আলোক-রশ্মির কথা স্পষ্টতই জনশ্রুতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ টানে উদ্ভুত নয়। কেতাবে পাওয়া ব্যাপার মাত্র। নানা মতবাদের মতো এও হয়তো আমাদের কাছে একটা 'বাদ'। উজ্জয়িনীর পিতার মতোই অসম্পুর্ণ এবং অসহায় এখানকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর চেহারা। এখানে জীবন নিয়ে ওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবাধ স্বাধীনতা কল্পনা করা দুরূহ। বাদলের মতো আত্মগোপনের ব্যাপারও এখানে সন্ন্যাসের ছকে বাঁধা। জীবনের মধ্যবর্তী হয়ে আশ্রমধর্মের অবহেলা কলকাতাতেও ত্রিশ সালে সম্ভব ছিল না। কাজেই ইওরোপ ছাড়া সত্যাসত্যের ঔপন্যাসিক কল্পনার স্বভূমি লেখকের পক্ষে ছিল দুরধিগম্য। লক্ষ্যের উচ্চতার সঙ্গে এই পটভূমি জড়িত হয়েছে এইভাবে।

প্রয়াসের মহত্ত্ব এপিকের নায়কের অন্যতম চরিত্র-লক্ষণ। লক্ষ্যের উচ্চতা সত্যের সন্ধানে—প্রয়াসের মহত্ত্ব সন্ধানের তীব্রতায়। কিন্তু মুশ্‌কিল হল এই যে, রামচন্দ্র এবং সীতার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল অবিচল এবং দৃঢ়বদ্ধ। প্রশ্নটা আমাদের মহাকাব্যের নায়কের কাছে এই ছিল না যে সত্যটা কী? সত্য ছিল তখন জীবনাচরণের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁদের সংগ্রাম ছিল প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমাকে রক্ষার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের তীব্রতায় তাঁদের মহত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সত্য কী সে সম্বন্ধে আমরা সন্দিগ্ধ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দানে র‍্যাশনালিজম ধর্মকেও একদা প্রভাবিত করতে চেয়েছে বটে কিন্তু উনিশ শতকের ইংলণ্ডের হ্যাঁ এবং না-এর দ্রুত কাটাকুটির ভিতরে Imperfect Synthesis-এর মধ্যে সত্যের পূর্ণ চেহারা মেলেনি। যুদ্ধোত্তর ইওরোপেও সংকটের দীর্ঘকায় ছায়ারণ্যে সত্যের সন্ধানেই মানুষ ফিরেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমা রক্ষার জন্য সংগ্রামে যে ইতিবাচকতা তার ফলস্বরূপে প্রাচীন মহাকাব্যে সরল বলিষ্ঠতা ছিল স্বাভাবিক। 'সত্য কী'—এই অন্বিষ্ট নিয়ে যে আধুনিক সন্ধানী যাত্রা সেখানে নায়কের জীবনরেখা জটিল বঙ্কিম হতে বাধ্য। টমাস ম্যানের ম্যাজিক মাউণ্টেন তার প্রমাণ।

ম্যাজিক মাউণ্টেনের জন্য নির্ধারিত ঘটনাস্থল ইওরোপের সংস্কৃতির সংকটের রূপক রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। নায়ক হান্স কাস্টর্প-এর বিশুদ্ধ জীবন-

জিজ্ঞাসাকে এই রুগ্নাবাসের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন লেখক। Research অথবা The Snow, প্রাকৃতিকতা অথবা জীবের প্রাণরহস্য, Settembrini-র বিতর্ক, Walpurgis Night-এর বিচিত্র ছদ্মবেশের অন্তরালবর্তী প্রাণোল্লাস —সমস্ত কিছুই হান্স কাস্টর্প-এর কাছে জীবনের পটকে বিস্তৃততর করে তুলেছে। এগুলি যেন নায়কের কাছে বিশাল জীবনের নানা অনুন্মোচিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। যখন নায়কের জীবনান্বেষার সঙ্গে—যক্ষ্মাবাসের সার্বজনীন প্রচ্ছন্ন মৃত্যুচিন্তা এবং অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিকশিত ইওরোপের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, তার মানবতাকে সম্পৃক্ত হতে দেখি, তখনই 'সত্য কী' এই বোধের অপেক্ষা জীবনসন্ধানী অপরাজেয়তা অধিকতর সত্য বলে প্রতিভাত হয়। সত্যাসত্য উপন্যাসের নায়ক বাদল জীবন অথবা জীবনসত্যকে খুঁজেছে এই জাতীয় পদ্ধতিতে এ-কথা উভয় উপন্যাসের যে-কোনো তুলনাই অবান্তর জেনেও, বলা চলে। ম্যাজিক মাউণ্টেনের লেখক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধপূর্ব ইওরোপও রোগজীর্ণ। যুদ্ধ এল আর ঘনিয়ে এল সংকট তা নয়। নানা খাত ধরে সংকটের স্রোত এসেছে বলেই যুদ্ধ। জোয়াকিম যেমন নিজের সমস্ত রুগ্ন শারীরিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে সাহসী সৈনিকের মতো, হান্স কাস্টর্প-এর শেষতম পরিণতিতেও হয়তো তারই ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। আমাদের নায়ক বাদল দেখেছিল যুদ্ধদীর্ণ ইওরোপকে। বাদলের জগৎ যুদ্ধোত্তর বিশ্বজনীন শূন্যতার রূপক, ইংলণ্ডের দ্বীপভূমি তার উপযুক্ত অনুকূল ক্ষেত্র। সেও এখানে সন্ধান করেছে জীবনসত্যের।

বাদলের অভিজ্ঞতার মাধুকরীতে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। এই গ্রন্থখানি যে পথে-প্রবাসের বিদেশবিবরণের সঙ্গে কাহিনী ও চরিত্র-সংযোগ মাত্র হয়ে ওঠেনি তা অন্নদাশঙ্করের প্রখর বক্তব্য-সচেতনতার জন্য। এবং তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে। মিঃ ওয়েলি দাবারু—মাঝে মাঝে বাদলকে তিনি আহ্বান করেন খেলার জন্য। হাসি তাঁর মুখে বাদল দেখেনি, মুখের মাংসপেশীতে তাঁর নেই কোনো ভাবতরঙ্গ। এই বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্টকে দেখে পাঠক নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর ঔদাসীন্যের ব্যাখ্যায় আমরা ইওরোপের গত দুশো বছরের ছায়ার বদলে যেন দেখতে পাই শূন্য ভবিষ্যতের ছায়া। 'ওয়েলি কোনো জিনিসকে ভালো বলেন না মন্দ বলেন না। কারো ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছে যে নেই।

আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই?' আশ্চর্য এই যে ইতিহাসের শঙ্কিল গিরিপথে এই সমস্ত উক্তি যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে তা শুধু দার্শনিকতার জনক নয়, রিক্ত বর্তমান ও হতাশ্বাস ভবিষ্যতের যে বোধ তৎকালীন ইওরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার ইঙ্গিতবহও বটে। বাদলের কাছে ওয়েলির বক্তৃতাটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'ইচ্ছা কাকে বলব সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? Cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরো কিছুকাল জীবনধারণ? দু-দিন কমবেশিতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও তবে এমন কি আসে যায়? Cell-গুলো বাঁচতে পারে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortality-র কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।'

মানবজাতি থাক বা না থাক তাতে ওয়েলির ভ্রূক্ষেপ নেই। Nothing matters in the last analysis। অন্নদাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসের সমকালীন বুদ্ধির সংকটকে অনুভব করেছেন এবং ওয়েলি-চরিত্রের সাহায্যে তার রূপ নির্মাণও করেছেন। কিন্তু বাদলের কাছে ওয়েলি শুধুই ইংলণ্ডীয় বৈচিত্র্য-মালার নানা ফুলের একটি ফুল, নাকি বাদলের কাছে এর কোনো মূল্য ছিল? পরবর্তী অধ্যায়ের বাদলকে দেখে মনে হয় ওয়েলি তার মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি ছাড়া কোনো বৃহৎ প্রশ্নের সঞ্চার করতে পারেনি। হান্স কাস্টর্প-এর What is Life আর বাদলের মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষায় যে মূলগত তফাত তারই ফলস্বরূপে এই প্রশ্নের অবিদ্যমানতা! বাদলের মুক্ত জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটা কিছু প্রমাণ করতে চাওয়া। প্রমাণের প্রয়োজনে তার যা কিছু। উজ্জয়িনীকে পরিহার এবং পান্থজীবনের গতিবেগ সবই প্রমাণের প্রয়োজনে। জীবনের কোনো সংকট থেকে, জীবনবোধের অমোঘ আকর্ষণে এগুলো ঘটেনি। তাই কারো আসা-যাওয়াই তাকে কোথাও পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না। ম্যাজিক মাউণ্টেনে Research অধ্যায়ে প্রাণতত্ত্বের গবেষণার শেষে হান্স যেমন জীবনকে ভালবাসার রূপকে ভেবেছিল, বাদলের জন্য সে জাতীয় তৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিস্থিতি সৃজিত হল না। বাদল যেন ইংলণ্ড আবিষ্কারে বেরিয়েছে। অথচ বাদলকে দিয়ে লেখকের করণীয় ছিল অনেক। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকা মানেই প্রতি নিমেষের 'হওয়া'। সেই হওয়ার যে পদ্ধতি তা কি শুধু দু-একজনের সঙ্গে দু-একবারের ইষ্টগোষ্ঠীতেই রূপায়িত করা সম্ভব? ধরা যাক মিঃ মারউডের

কথা। দু-বগলে ক্রাচ, খবরের কাগজ নির্ভর এই ব্যক্তিটি আরেকবার লেখকের অন্তর্দৃষ্টির দূরস্পর্শী শক্তির সাক্ষ্য দেয়। সমুদ্রতীর থেকে দূরে একটি ছোটো মার্কেট টাউনে এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল বাদল। এর আগে বাদল পেরিয়ে এসেছে মেরিয়ন এবং অশ্বারোহণ-পর্ব। তখন অদম্য উৎসাহে ঘোড়ায় চড়তে যাওয়ার মধ্যে বাদলের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়াসকে আমরা দেখেছি। মারউড ওয়েলির মতোই ইতিহাসের স্বষ্টি। প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি। মারউডের বিখ্যাত উক্তি, 'আমার ভবিষ্যৎ নেই, আছে অতীত' অথবা 'বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ি ঘাগী হয়ে গেছে—একে ভেঙে গড়বার কল্পনা বৃথা'—তখন আমাদের তৎকালীন ইওরোপকে চিনতে দেরি হয় না। হৃত-বিশ্বাস মারউড এবং প্রায় শূন্য-বিশ্বাস ওয়েলি নিশ্চয় লেখকের পশ্চিম ইওরোপের বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা উপলব্ধির প্রমাণ। এদের দুজনের কথায় এবং আচরণে যেন তৎকালীন অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বনিত এলিয়ট এবং অডেনের স্বর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অকৃত্রিম স্বরের পরেই যখন বাদল বলে (মারউডের প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের লিবারেলদের সঙ্গে এদেশের লিবারেল পত্রিকার কী সম্পর্ক)—'আঃ মিস্টার মারউড সারা ইংলণ্ডকে আমি বারবার এ-কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরাজ। জন্মের উপর হাত নেই, Free will খাটে না। তা বলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে?' তখন আমাদের বাদলকে চিনতে কষ্ট হয়। জন্মের পর determinism-কে যে চ্যালেঞ্জ করবে ভারতবর্ষই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। ইওরোপ নানাভাবে নানা দ্বন্দ্বময় জীবন-ধারণার মধ্যে দিয়ে তার ইতিহাসকে গড়ে তুলেছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়েও ইওরোপের জীবন-ভাবনায় ত্রিমুখী চাপ। যুদ্ধের ফলে তৃতীয় চাপটা প্রবল। সেটা সোশ্যালিজম বা তাকে এড়াতে চেয়ে ফ্যাশিজম। একদিকে ছিল প্রেম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের খ্রীষ্টীয় ধর্মবাহী ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য-আরোপী Enlightenment ও Liberalism-এর দর্শন, এর সঙ্গে শক্তিমান হয়ে উঠল যুদ্ধোত্তর সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা। এখানে যখন chief desiderata of the age ছিল good life, সামাজিক সাম্য-সুবিচার প্রভৃতি, অথচ এ-সম্বন্ধে, মানুষের জীবনাচরণের যথার্থ বিন্যস্ত রূপ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ছিল দূরপরাহত; যখন মূল্যায়নের সংকট শুরু হয়েছে

এবং সংকটের মূল্যায়নও, তখন বাদলের ভারতীয় determinism-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যদিবা কোনো তাৎপর্য মেলে, ইংলণ্ডীয় হবার জন্য Free will-এর সাধনা হয় হাস্যকর। তার শেষ অধ্যায়ও এ-থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। বাদলের 'আমাদের' কথাটির মধ্যে যে বিশ্বগ্রাহী সারল্য, একমাত্র তাকে আমরা যুবক-বলিষ্ঠতার পরিচয়-চিহ্ন বলেই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট।

মিস্টার পিউ ভারত-ফেরত ইংরাজ। বাদলের সঙ্গে মারউডের সাক্ষাৎকার যখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে তখনই মিস্টার পিউর সঙ্গে বাদলের সংঘাত। ইনি ভারত-বিদ্বেষী। বাদলকে, কুলির দেশের মানুষ বলেই বোধ হয়, তিনি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। মিস্ এফিংহ্যামের বাড়ির পার্টিতেও মিস্টার পিউ এবং বাদলের সংঘাত হল। অপমানিত বাদলের পক্ষে মিস এফিংহ্যাম আতিথেয়তার ব্রিটিশ-পরাকাষ্ঠায় অবশ্যই রইলেন। কিন্তু বাদল আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখল যে তার সমর্থকেরা অন্তর্হিত। এ-ব্যাপারে বাদলের ক্ষোভ ভারতীয় হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই। কিন্তু ত্রিশের ভারতীয় যুবক একেবারে বর্ণাধিকার চেতনাবিহীন এই কথা কল্পনা করা দুষ্কর বলেই এর প্রস্তুতি আমাদের সম্মুখে ঘটা সমীচীন ছিল। সে-কারণেই আমাদের কাছে বাদলের পুরো চেহারাটা কখনই স্পষ্ট হল না। জীবনবোধ ব্যাপারটা জীবন বৃক্ষের ফল। 'স্বপ্ন বাস্তব স্মৃতি' অধ্যায়ে সুধী-র অতীত স্মৃতি বিবরণে আমরা বাদলের অতীত পরিচয় পেয়েছি। মাঝে মাঝে আরো নানা প্রসঙ্গে বাদলকে অতীত বিন্যস্ত দেখেছি, কিন্তু তার চাওয়ার মূলীভূত শক্তির উৎসটা কোথায় বোঝা গেল না। অথচ যখনই সাধারণ ইংলণ্ডীয় চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সাক্ষাৎ হয়েছে সে অভিভূত হয়েছে তাদের প্রাণবত্তায়। কলিন্স এমনই এক সাধারণ চরিত্র। মেরিয়নের আগে কলিন্সের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কলিন্স বইয়ের দোকানদার। এবং একজন খাঁটি কর্মিষ্ঠ ইংরাজ তনয়ের মতো সে বইয়ের দোকানী হয়েই খুশি নয়, হতে চায় প্রকাশক, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা আপিস। কলিন্স মেরিয়নকে দিয়ে বাদল জীবনের সহজ রূপসাধনাকেও বুঝল না, দেখল শুধু।

তাই বাদল যেখানে গিয়ে পৌঁছল সর্ববিধ অহমিকামুক্ত সেই উপসংহার, সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ মিলল না। দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে একটা করুণ ব্যঞ্জনা-গৌরব আছে হয়তো, কিন্তু সত্যের গৌরব কোথায়? শ্রেণী পরিচয়ে মানুষের পরিচয় না থাকতে পারে, কিন্তু বিমুক্ত মানুষের Free-will-এর যে পরিচয়

বাদল খুঁজছিল দেশলাই-বিক্রেতার জীবনে কি তার ইঙ্গিত লভ্য? আসলে বাদলের চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাকে উপন্যাসে উপস্থাপনায় অন্নদাশঙ্করের একটি মূলগত ত্রুটি ঘটেছে! বাদলের বীর্যবান সারল্য প্রশ্ন-চিহ্নের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এটা প্রথম ত্রুটি। দ্বিতীয় ত্রুটি যতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক ঘটেছে তারা সকলেই উপসংহারে উপনীত চরিত্র। ওয়েলি মারউড তার উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্যদিক থেকে পিউ ব্যতিক্রম নয়। ফলে এদের উপসংহার থেকে বাদল কোনো উপক্রমণিকার সন্ধান পেল না। ওয়েলির কাছ থেকে সমুদ্রতীরে গমন এবং উদ্দাম জীবনের প্রয়াস যতটা ওয়েলির কাছ থেকে পলায়ন ততটা ওয়েলির প্রতিক্রিয়া নয়। শুধু একটা বিপরীত ছক সৃজন। আবার ওখান থেকে মারউডের অভিজ্ঞতায় যাওয়াও কোনো জিজ্ঞাসার বিস্তৃতিসাধন নয়। ফলে কমিউনিস্ট বাদল, মিষ্টিক বাদল, নানা বাদলের দেখা পেলাম বটে কিন্তু তার অন্তিম পরিণতিকে কোনো সত্য জিজ্ঞাসার অপরিহার্য ফল বলে মেনে নেওয়া গেল না। বড়ো বড়ো রাশি বসানো হল। যোগফলে এত বড়ো শূন্য সেই রাশিগুলিকে মিথ্যা করে দিল বলে বাদলের যাত্রা দুর্বল হয়ে গেল।

তিন

সেদিক থেকে উজ্জয়িনী এবং সুধী এ-উপন্যাসের বলিষ্ঠ নির্ভর। উজ্জয়িনী আমাদের কাছে আদি অন্ত সমেত পূর্ণ এক নারী হিসাবেই প্রতিভাত। উজ্জয়িনীর পিতা, উজ্জয়িনীর শ্বশুর, যোগানন্দ এবং মহিমচন্দ্র, উজ্জয়িনীর সখিবৃন্দ, স্বদেশে-বিদেশে তার অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে সে শুধু সংকটারূঢ় মানবাত্মা নয়, সম্ভবত আধুনিক ভারতবর্ষও। উজ্জয়িনীর পিতা এবং উজ্জয়িনীর শ্বশুর আধুনিক ভারতবর্ষের দুই রূপ। এখান থেকে উজ্জয়িনীর শুরু। কাজেই এই উভয়ের সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। উজ্জয়িনীর পিতা নব্য ভারতবর্ষের একদিক। সেদিকে তার সংস্কারমুক্ত মানসিকতায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাকাশের উজ্জ্বল আলোকরশ্মির প্রতিফলন। উজ্জয়িনীর শ্বশুর ভারতবর্ষের বিকৃতির চিহ্নধর। শ্বশুরবাড়িতে উজ্জয়িনীর কোনো পরীক্ষার আয়োজন লেখক করেননি। ব্রিটিশ উপনিবেশের চাকুরিঅন্ত আভিজাত্যের রায়বাহাদুরীর প্রতীক উজ্জয়িনীর শ্বশুর। মিসেস স্যামুয়েলসের অবতারণা করিয়ে লেখক এই ভদ্রলোকের হ্যাংলামিকে চূড়ান্ত কশাঘাত করেছেন। বিদ্রূপ যে অন্নদাশঙ্করের

স্বক্ষেত্র নয় উজ্জয়িনীর শ্বশুরের কাঙালপনাকে কুকুরের হ্যাংলামির সঙ্গে তুলনা করে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এ-আঘাতে আমাদের লৌকিক ক্ষোভের নিরসন ঘটে বটে, কিন্তু বিদ্রূপের আতিশয্য বোধহয় এই গভীর যন্ত্রণা-মথিত উপন্যাসে সুসঙ্গতি লাভের উপযুক্ত বিষয় নয়। সে যাই হোক এখানে উজ্জয়িনীকে আকর্ষণ করত—সম্ভবত এই বাড়িরই পিঙ্গল প্রাণহীনতার প্রতিক্রিয়ায়—পাশের বাড়ির ছোট সাধারণ শ্রমক্লান্ত পরিবারের দাম্পত্য জীবন। যে আত্ম-নিবেদনের থালা পূর্ণ করার সাধনা উজ্জয়িনীর—এই ছোট পরিবারের রূপকে হয়তো তারই কিছু আভাস সে পেয়েছিল। ওদিকে ছিল তার পিতার প্রভাব। যে পিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একদা সূচীমুখ জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে সে ভেবেছিল : 'অন্তর উদ্বেল হল। তার সেই স্নেহের বাবাটি নেই। বেচারা বাবা। কেউ তার মর্যাদা বোঝেনি, না ঘরের লোক, না বাইরের লোক কেউ তাকে চিনত না, তিনি ছিলেন মনের গহনে একাকী। সেই উপেক্ষিত বাবা, পরাজিত বাবা, নিরহংকার ও নিঃসঙ্গ বাবা আজ নেই।' নিঃসঙ্গ একাকিত্বের সাধক উজ্জয়িনীর পিতাকে আমরা মাত্র উজ্জয়িনীর চোখ দিয়েই দেখেছি। চরিত্র হিসাবে সেই বিড়ম্বিত স্বতন্ত্রতার সাধক মানুষটি আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। বাবা এবং শ্বশুর দুজনেই শুধু উজ্জয়িনীর ভূমিকা। যে নব ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীকে রূপ দিতে চেয়েছে তার দুই দিক এঁদের দুজনের মধ্যে।

উজ্জয়িনীর প্রশ্ন কাকে দেব আমার জীবনের নৈবেদ্য? 'আমি যদি পাখি হতুম, উজ্জয়িনী ভাবে, আমার কোনো প্রশ্ন থাকত না। আমি অসংশয়ে বাঁচতুম ও তেমনি সহজে মরতুম। আমার আসা-যাওয়ার চিহ্ন রইত না। আমি যদি গাছ হতুম তবে তো আমি ভাবতুমই না কোনো কথা। আমি অকারণে বাঁচতুম ও কখন এক সময় চুপ করে মরে যেতুম। কেউ মনে রাখত না যে এখানে একটা গাছ ছিল। আমি যদি পতঙ্গ হতুম তবে হয়তো জানতুমই না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আফসোসের বিষয় আমি মানুষ। তাই প্রশ্ন ওঠে বেঁচে কি হবে? কার জন্যে বাঁচব? কার কাছে আমার আদর?'

উজ্জয়িনীকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। মিলিয়ে নেওয়া যায় ভারতীয় রসসাধনার ধারার সঙ্গে। মিলিয়ে নেওয়া যায় প্রেমধর্মের নায়িকা রূপে, সত্যাসত্যের পর অন্নদাশঙ্করের প্রেমের উপন্যাসের নায়িকাদের মুখপাত হিসাবে। দেখা যায় তাকে সংকটারূঢ় মানবাত্মার রূপকে, চেনা যায় তাকে

চিরকালের রাধাভাবের আখরে চিহ্নিত বলে। এগুলিই উজ্জয়িনীর শক্তির নিদর্শন! আসলে উজ্জয়িনী জীবনের ভাস্বর নিদর্শন, অন্নদাশঙ্করের জীবনার্থ। উজ্জয়িনী কেন দে-সরকারকে গ্রহণ করেছিল মাত্র এই অভিযোগে উজ্জয়িনী চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিংবা রূপক সাহিত্যের সনাতন রীতি অনুমোদন করলে এমন উপসংহার কল্পিত হত না—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যেও উজ্জয়িনীর স্বরূপ নির্ণয় হবে না। শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই—এমন ধরনের একটা লাবণ্য-সুলভ জীবনার্থ-বোধ উজ্জয়িনীর ছিল এমনও নয়। উজ্জয়িনীর সমস্ত জীবন এবং মনন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে যা খুঁজেছিল তা হল কিসে তার সার্থকতা। উজ্জয়িনী গোটা জীবনের রূপক বলেই রূপকের ক্লাসিক বন্ধনগুলি তার প্রসঙ্গে শিথিল। সে বারবার বলেছে আমার মূল্য কোথায়। উজ্জয়িনী বীণাকে দেখে যা বুঝেছে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান উপলব্ধি। সেইটাই বস্তুত তার স্থায়িভাব। তার পরের যা কিছু সমস্তই অকৃতার্থতার অস্থিরতা থেকে। বাদলের জন্য রয়েছে তার আকুলতা অথচ বাদলের জন্য যদি তার 'মানব জমিন রইল পতিত' হয় তাহলে সেই চরম অচরিতার্থতায় সান্ত্বনা কী? তার রাধাকৃষ্ণ, তার মক্ষিরানীবৃত্তি, তার সকল কিছুর মধ্যেই এই অস্থিরতা। এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে এক যুগের 'সংকটারূঢ় মানবাত্মারই লক্ষণ। যে যুগে মানুষ সার্থকতার পথ সন্ধান করে ফিরেছে—পথ কোথায় হয়তো কেউ কেউ তাদের মতো করে সে-কথা জেনেও ছিল কিন্তু অন্য সকলের জটিল পথের অরণ্যে তাদের পথের মুখ গিয়েছিল হারিয়ে। চূড়ান্ত হতাশার মাঝখানে উজ্জয়িনী যখন বলছে 'কেন বাঁচব' তখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ললিতার। স্বামীপুত্রের সম্পদে একদা-ধন্যা কিন্তু বর্তমানে সর্বরিক্ত এই নারীর প্রথম প্রবেশ শোকের শান্ত পদক্ষেপে, অচিরেই কথা বলতে বলতে ললিতা জীবন্ত হয়ে উঠে উপস্থাপিত করলে তার মোক্ষম প্রশ্ন 'কেন বাঁচব না?' 'তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ, যদিও সাধ মেটেনি তোমার। তোমার পক্ষে বলা সাজে, জীবন নিয়ে কী করব? কিন্তু জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশ করবার সময় যার চোখের ওপর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, প্রাণের পেয়ালাখানি তুলে ধরে পান করবার সময় যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছি আমি, কেন বাঁচবো না?' এই প্রসঙ্গে উজ্জয়িনীর আবেগদীপ্ত সিদ্ধান্ত-বাচন—ঠিক। কেন বাঁচব না। কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার, বুঝে নেব না কেন? অবশ্যই কথার আবেগে কথা। কিন্তু তার পরবর্তী জীবন কিছুটা এই

বিশ্বাসের বোধে চালিত। সুধী-র কাছে প্রত্যাহত হয়ে দে-সরকারে আত্ম-সমর্পণও এই বোধের ফল। দে-সরকারের পরিবর্তনের মধ্যে উজ্জয়িনীর সার্থকতার সন্ধান মেলে। সেই দে-সরকার, যে সব সময়েই একটা না একটা অ্যাফেয়ারের নায়ক সে ধীরে ধীরে সৌখীন প্রেমিকের বেশ পরিহার করে প্রেমের শুদ্ধ উপকূলে পৌছে গেল। এই উপনায়নের মূলে উজ্জয়িনীর প্রতি তার প্রেমের অনুভূতি। দে-সরকার সকল দিক থেকে জীবন্ত চরিত্র। সুধী-র সঙ্গে উজ্জয়িনী সংক্রান্ত কথোপকথনের কালে সুধীকে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে, পরাজয়কে নিশ্চিন্ত জ্ঞান করে সে যখন কথা বলছিল তখনই দে-সরকারের সমস্ত প্রবঞ্চিত জীবনের রূপ আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। দে-সরকার-রূপী ধূলিমুঠিকে উজ্জয়িনী যখন নিজের অজ্ঞানে সোনামুঠিতে রূপান্তরিত করে ফেলল তখন উজ্জয়িনীর সর্বরিক্ততাও কাঙাল হয়ে অপেক্ষমানা। এই অবস্থায় দে-সরকারকে উর্জ্জয়িনী গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের ভিতরে অভিজ্ঞতা-দীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে, জীবনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দুলে উঠেছে। এই দুই আলোকে উজ্জয়িনী পেয়েছে জীবনের স্পন্দন। এই উপন্যাসের একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারা যায় না। অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে একের পরিণতি বা পরিস্থিতি দিয়ে অপরকে লেখক স্ফুটতর করছেন। উজ্জয়িনীর উপসংহার এবং বাদলের উপসংহার যখনএইভাবে আমরা একত্র যুক্ত করে দেখি তখনই জীবনের অপচয় এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে করুণোজ্জ্বল সমগ্রতা লাভ করে।

জীবনকে উজ্জয়িনী কোনো পূর্ব-নির্ধারিত দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দেখেনি। সুধীও দেখেনি। তথাপি এই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দুর্লভ। সুধী-র মার্সেলকে ভালবাসা আর উজ্জয়িনীর সোনিয়াকে আদর করার মধ্যে তফাত অনেক। একটা জীবন সম্বন্ধে স্নিগ্ধ প্রসন্ন মনোভাব থেকে উৎসারিত, আরেকটা অতৃপ্তি সঞ্জাত। সুধী মানুষের দিকে তাকায়, প্রকৃতির দিকে তাকায়, আত্মার পূর্ণতার আনন্দের মনোভাব নিয়ে। সে স্থিতধী এবং স্থিত-প্রজ্ঞ। সে প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষের কথা না বলেও ভারত-আত্মার যথার্থ প্রতিভূ। সেদিক থেকে সকলের প্রিয় কিন্তু আপন অন্তরে একাকী, অথচ অপূর্ণতার কোনো গ্লানি যাকে স্পর্শ করেনি সেই সুধী যেন সত্যের প্রতীক। অন্নদাশঙ্করের রূপকাভিপ্রায় সুধীতে শিল্পসম্মত হয়েছে। এ-কথা বলার হেতু এই যে বাদলকে অসত্যের প্রতীক বলা দুষ্কর। তার সত্য-জিজ্ঞাসা কোন ক্ষেত্রেই অসত্য নয়। উজ্জয়িনীর

বাদলের জন্য যে আকুলতা তাকেও সংকটের প্রতীক বলা যাবে না। লেখক সে কারণেই বলেছেন যে শিল্প নিজ নিয়মে সেই রূপকাভিপ্রায় খণ্ডিত করেছে। জীবন এবং শিল্পের নিয়ম মেনেও যেখানে এই রূপকাভিপ্রায়কে খণ্ডিত করা প্রয়োজন হয়নি সে হল সুধী। লেখকের জীবনবোধসঞ্জাত যে বক্তব্য সেটা চরিত্র-পাত্রের বাইরে কোথাও নেই। বক্তব্য ও চরিত্রের পরস্পর ক্রিয়ার রূপার্থ সমন্বিত আধার-আধেয়ের রূপকে এ-ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পোদ্দেশ্য সাধিত হয়। লেখকের গদ্য শৈলী নির্মাণে, ঘটনা সংস্থানে, চরিত্র উপস্থাপনার সর্বত্রই সেই পরস্পর সম্পর্কের অমোঘ প্রভাব। অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যের শিল্পকর্মেও সেই প্রভাবের প্রসাদ মেলে।

তথাপি যদি ধরা যায় যে উজ্জয়িনী এবং সুধী-র মধ্যে তুলনায় সুধী রূপককে অধিকতর আভাসিত করেছে, তাহলেই শিল্পগত যথার্থ্যের দিক থেকে সুধী-র একক জয়লাভ সূচিত হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে অন্নদাশঙ্করের মহাকাব্যকল্প উপন্যাস-চিন্তায় প্রধান ত্রুটি ঘটেছে নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রে। নায়কের জীবনের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা বুদ্ধির স্তরে সীমিত থাকায় আমাদের আপত্তি নেই। যদি সেটা চিন্তার সংকটের আকারে নায়কের জীবনকে নানাদিক থেকে ছায়াচ্ছন্ন করত তাহলে নায়কের মাধ্যমে বা নায়কের চরিত্রের পরিভাষায় বলা লেখকের জীবনবোধ রূপান্বিত হতে পারত। তখন যে-কোনো দিকেই সে হতে পারত বিচারের ঘাতসহ। নায়ক কল্পনায় এই ত্রুটি লেখকের বক্তব্য-বিষয়ক অসঙ্গতির ফল বলে উপন্যাসের ভাষায় তার কিছু প্রকাশ ঘটেছে। মহাকাব্য-কল্প উপন্যাসে উপন্যাসের উপযুক্ত সংহতি নির্মাণে প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি এ-ভাষা সর্বত্র রক্ষা করতে পারেনি। মহিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে শানিত ব্যঙ্গময়তা ভারসাম্যকে লঙ্ঘন করেছে। যে-কোনো স্বগত চিন্তায় কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বড়ো দ্রুত। অন্নদাশঙ্করের গদ্য নায়কের মতো কিঞ্চিৎ অস্থিতমতি বলে মননের ভাষায় মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উজ্জয়িনীর নিজের কথার পক্ষে তা মেয়েলি আটপৌরে প্রসাদগুণে শক্তিময়ী। সেখানে আর একবার বোঝা যায় সত্যাসত্যের প্রধান শক্তি কোথায়। সংকটারূঢ় মানবাত্মার মুক্তি সভ্যতার নিজস্ব নিয়মের চেয়ে ব্যক্তির নিজের যন্ত্রণার পথে লভ্য এবং সাধারণ মানুষ হওয়াই মুক্তির পথ, এই টলস্টয়ী বিশ্বাসের পক্ষে অন্নদাশঙ্করের সায় উপন্যাসটির নানা জটিলতার মধ্যে কখনও অস্পষ্ট নয়। সেদিক থেকে তিরিশের

"অন্তত‌পক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন ; এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিও দ্বিমুখী—একদিকে বিকলনে ব্যস্ত, অন্য দিকে সংকলনে নিরত। ধূর্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষধর্মাবলম্বী।" কিন্তু নানা মতামত, নানা তত্ত্ব আবর্তের ভিতরে এত প্রবল যে সেখানে লেখকের মনীষা পাত্র খুঁজে না পেয়ে অনেক স্থলে স্বহস্তে পরিবেষিত হওয়ার ফলে লেখকের উক্ত প্রধান ধর্ম মাঝে মাঝে খণ্ডিত হয়েছে। এই ত্রুটি খুবই প্রভাবী হতে পারত। হয়নি কেবল খগেনবাবুর জন্যই। "ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অপকট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী যে" বইখানি "আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে।" অবশ্যই খগেনবাবু এর মূলে। তিনি যেন চৈতন্যময় আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি। মস্তক ও হৃদয়, বিশেষ ও সামান্য, প্রেম ও প্রভুত্বের উভয় সংকটের সম্মুখীন যে যন্ত্রণা খগেনবাবুতে তারই প্রতিবিম্ব।

কিন্তু যন্ত্রণার জন্য যে তীব্র রঙের কথা আমরা কল্পনা করে থাকি তা আবার খগেনবাবু এবং তাঁর জগৎ সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। যে নিরাসক্তি নিয়ে খগেনবাবুর ভারত পর্যটন, অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণ সে নিরাসক্তি শিল্পীকে মানালেও মুক্তি-সন্ধানী নায়কের পক্ষে একটু দুর্বহ হয়ে ওঠে। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী করে, জীবনের ভগ্নাংশ কণিকা-গুলিকে ফেলে সমগ্রের অভিমুখী করে অন্তঃশীলায় তা উপস্থিত। এবং আবর্তে জ্ঞানের নীরস বোঝার ভারে ন্যুব্জতা। এটা মোহানায় ফের সুসমতা ফিরে পেয়েছে কিনা তা বলা মুশ্‌কিল। শেষপর্বে খগেনবাবুর কর্মযোগ এবং রমলাদেবীর প্রজাপতি-বিহার এক দুর্লঙ্ঘ্য বৈপরীত্য—অথচ এই রমলাদেবীকেই প্রথম পর্বে খগেনবাবুর আদর্শ নিকষে মনে হয়েছিল খাঁটি সোনা, সাবিত্রী (খগেনবাবুর আত্মহত স্ত্রী) যেন রাংতা। কিন্তু খগেনবাবুর এই প্রতি মুহূর্তের হয়ে ওঠার ভিতরে যে অজস্র মৃত্যুর যন্ত্রণা—যার অভাবে নব জন্মকে আমরা প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না—সেটা অন্তঃশীলায় যত তীব্র, আবর্তে ও মোহানায় তত তীব্রতার প্রাণস্পর্শ পায়নি। অথচ অন্তঃশীলায় এই যন্ত্রণাকে ধারণ করার সর্বতোমুখী আয়োজন ছিল প্রস্তুত। মানুষ তার আত্মস্বরূপকে আবিষ্কার করে দীর্ঘ এবং ক্লান্তিহীন যাত্রার পথে। রমলাদেবীকে একদিন খগেনবাবু ভেবেছিলেন সমধর্মী। দীর্ঘযাত্রার শেষে যেখানে তিনি পৌঁছলেন সেখানে রমলাদেবীর থেকে জীবন বড়ো কথা। যাত্রার পূর্বেই খগেনবাবু ক্লান্ত

এবং নীরক্ত—তাই যাত্রার যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত রঙ ফোটাতে পারেনি। এই নীরক্ত এবং ক্লান্ত মানুষটির চৈতন্য প্রবাহেও তাই পরম নিরাসক্তি। প্রথম পরিচ্ছেদে স্ত্রীর শবদাহ দেখতে দেখতে তার যে চিন্তাধারা তা নিঃসন্দেহে চেতনা-নদীর আত্মপ্রকাশ—জয়েস প্রুস্তের ছায়াচ্ছন্ন সে নদী।—

> কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন—যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়—এখান থেকে চলে যাও। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে···প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতে লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে।

গন্ধের অনুষঙ্গে খগেনবাবুর অতীত জীবন মনে পড়া এবং 'চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে' এই বাক্যাংশের ওপর ভর দিয়ে বর্তমানে ফিরে আসায় চেতনার প্রবাহধর্মিতা অনুসৃত হয়েছে। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদার প্রবাহধর্মী চেতনার ব্যাপার প্রথমে উপলব্ধি করেন—আজ এ-কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু এই মনে-পড়াকে অবলম্বন করে যদি আমরা ধূর্জটিপ্রসাদকে জয়েসীর পদ্ধতির নিরীক্ষক বলি তা হলে ভুল হবে। বরঞ্চ "পুরুষার্থের তাৎপর্যকে" অনুসরণ করতে করতে তিনি একটা নিটোল কাহিনী গড়েছেন—বলাই বাহুল্য সে কাহিনীর সাদৃশ্য আমরা শরৎচন্দ্রে খুঁজে পাব না—পাব রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ নষ্ট নীড় জাতীয় সৃষ্টিতে, যেখানে কাহিনী শীর্ণ-শরীর তপস্বিনীর মতো বক্তব্যের আত্মাকে দীপ্ত করে তোলে। সে কারণেই এই উপন্যাসের যেখানে যেখানে ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায় নায়কের যন্ত্রণার ধ্বনি বেজেছে সেখানে কাহিনী-ধৃত মানুষটাকে বোঝা যায় সহজে—বোঝা যায় খগেনবাবুর পীড়িত অস্তিত্বের দাহ।—

> শ্রাদ্ধ তিনি করবেন না। শ্রদ্ধা নেই তার আর শ্রাদ্ধ কী? এ-দেশে এ-সমাজে এ-যুগে শ্রাদ্ধ অচল, চল হওয়া উচিত প্রায়শ্চিত্তের, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, অপঘাত মৃত্যু কী দোষ করেছে, ধরা পড়েছে বিষ।

এই যন্ত্রণাময় মানুষটাই যখন অনুভব করে দুঃখের কাব্যময় গোপন পদসঞ্চারকে

তখন ভাষায় ধূর্জটিপ্রসাদের বিপরীত কণ্ঠ শুনে আমরা বিস্মিত হলেও পুলকিত না হয়ে পারি না।—

> দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে গোপন সঞ্চারে আমার প্রিয়ার মতো তার নম্রগতি। দুঃখ নামে করুণার মতন আমার প্রিয়ার মতো বিষাদ-মাখা স্মিত হাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন। যমুনার কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে, আজ আমার মন সেই আনন্দে ভরে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল।

বুদ্ধির উগ্র প্রহরায় ক্লান্ত মন মুক্তি খুঁজছে—এই হল ধূর্জটিপ্রসাদের বিষয়। সদ্যোদ্ধৃত অংশটিকে আমরা মনে করতে পারি খগেনবাবুর ক্ষণিক মুক্তির দীর্ঘশ্বাস। তাঁর গদ্যের যুক্তিপন্থী কাটা-কাটা গতি এখানে পরিহৃত। কিন্তু এ-মনোভাব ক্ষণিকের বলেই তার প্রতিফলন-স্বরূপে গদ্যেও কবিত্বের আতিশয্য ঘটেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ সাধারণ লেখকের মতো এ-সমস্ত অংশে পূর্বাভাস সূচিত করেন না। আধুনিক মানুষের প্রতি মুহূর্তটাই সত্য—তাই তার অতীত নিয়ে অশ্রুপাত ও বর্তমান নিয়ে ব্যঙ্গ দুইই অচল। শুধু হয়ে-ওঠাকেই রূপময় করতে হবে, উপকরণের এবং লক্ষ্যের দ্বন্দ্বটা মিটিয়ে মিটিয়ে। এই উপন্যাসত্রয়ের প্রথম খণ্ডে তার সার্থক আশ্চর্য পরিচয় আমরা পেয়েছি এবং তা বাংলা সাহিত্যে এখনও একক। "কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়" এই সাধারণ সামাজিক সূত্রকে, জীবননিষ্ঠ উপন্যাস শিল্পে প্রয়োগ করা অবশ্যই দুরূহ। শেষ দুই খণ্ডে সুজন-বিজন-রমলা খগেনবাবুর মতো তাৎপর্য পেলে এ-বইখানি কী হত সে আলোচনা না করেও এ-মন্তব্য আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি যে—তিরিশের দ্বিধামুক্তির মনোভাব যদি জীবন এবং শিল্পকে কোথাও কোথাও সাযুজ্যে নিয়ে গিয়ে থাকে অন্তঃশীলা তাদের অগ্রগণ্যদের মধ্যে।

অন্নদাশঙ্কর এবং ধূর্জটিপ্রসাদ উভয়েই যথার্থ নাগরিক মানসের অধিকারী। এদের উপন্যাসেও স্বভাবতই সেই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। এঁদের বাদল এবং খগেনবাবু উভয়েই প্রকৃতপক্ষে জীবনের মুক্ত স্বরূপের সন্ধানী নায়ক। উভয়েই বিশ্ব-পথিক, দেশের এবং বিদেশের ধ্রুবলোক ও বহতা নদীর প্রসাদ দুজনেরই সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বাদল অপেক্ষা খগেনবাবুর পুরুষার্থের তাৎপর্য অবশ্যই গভীর। বাদলের উজ্জয়িনীকে ফেলে রেখে ইওরোপের জটিল আকাশের নিচে গিয়ে জীবনকে খোঁজা কতখানি সার্থক সে বিষয়ে আমরা

ইতোপূর্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, সে হিসাবে স্ত্রীর আত্মহত্যার পরে খগেনবাবুর অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে উত্তরণে অনেক বাস্তব যন্ত্রণার ব্যাপার। বাদলের এবং খগেনবাবুর উপসংহারে যে পার্থক্য তার মূলেও এই জীবন-বোধের ভূমিকা। বাদল আমাদের প্রতীতি উৎপাদন করে না। অথচ মনে হয় খগেনবাবুর পটে অপূর্ণতা থাকলেও এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। আমাদের এই বোধ, উভয় ক্ষেত্রেই লেখকদ্বয়ের স্বদেশ-সভ্যতার ব্যাখ্যার তারতম্যের প্রভাব-জাত। বিরাট ইওরোপীয় সভ্যতার পটে সুধী যদিবা মানবিকতায় সার্থক, বাদল বহিরাগত বলেই ব্যর্থ—অথচ সে ব্যর্থতা নায়কের ব্যর্থতা নয়, পরীক্ষার ব্যর্থতা; পাত্র-পাত্রীর জীবনোদ্ভূত জটিলতাই মনোলোকে যন্ত্রণার নানা আকার সৃষ্টি করে —ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলার খগেনবাবু তার নিদর্শন। যন্ত্রণা থেকে তর্ক এবং মননের টানাপোড়েনটা এসেছে এবং শেষোক্তের টানে আবার এসেছে নতুন যন্ত্রণা। এই দ্বন্দ্ব ছাড়া বুদ্ধিবাদী উপন্যাসে সার্থকতা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ-ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধি-মার্গ রচনা বাংলা উপন্যাস জগৎকে যে আকর্ষণ করেনি চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকের লিখিত উপন্যাসরাজির দিকে তাকালে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সামন্ত-যুগাবশেষের ক্ষীণপ্রভ স্নিগ্ধ মায়ালোকের পিছুটান বাঙালী সমাজে কাটেনি, তাই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এই পিছুটানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিষয়কে উপন্যাসস্থ করা কঠিন। উপকরণের দেশ-নির্ভরতাকে মেনে নিয়ে ঔপন্যাসিককে অগ্রসর হতে হয়, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে, আপসে, জয়ে, পরাজয়ে, এক-এক দেশের উপন্যাসের এক-এক ধারা গড়ে ওঠে। আমাদের ব্যর্থ নাগরিকতা নিশ্চয় সার্থক উপন্যাসের প্রতিবন্ধক, যদি না তার মধ্যেই আমরা ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবনোপকরণকে ব্যবহার করার দিকে ঝুঁকি। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে সেই সুস্থ বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসার অনুসরণ ব্যাহত হয়েছে নানা ভাবে। সে-কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলব। শুধু একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমাদের এলোমেলো জীবনে বুদ্ধির দায়-দায়িত্বকে পালন করায় নিশ্চয় দুঃসাধ্য কর্তব্যপালনের গৌরব। বর্তমান কালের বাংলা উপন্যাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল হলেও অলভ্য নয়। ধূর্জটিপ্রসাদের অনুবর্তী লেখক না হলেও আধুনিক জীবনের বহু স্রোতের কাটাকুটি খেলাকে পুরুষার্থের তাৎপর্যে অন্বিত করে দু-একটি উপন্যাস রচিত রয়েছে। অসীম রায়ের এ-কালের কথা, গোপালদেব ও শব্দের খাঁচায় তার মধ্যে অন্যতম। অসীম রায়ের

যেটা দুর্বলতা সেটা হল এই যে, তিনি আধেয়ের গৌরবকে আধারের কার্পণ্যে লঘু করে ফেলেন।

তিরিশের সাহিত্যের সর্বতোমুখী বিস্তার উপন্যাসের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা অর্জনের কঠিন সাধনায় ব্রতী থাকলেও সে সাধনায় পূর্ণসিদ্ধির পথে বাধা ছিল প্রচুর। আমাদের জীবনের উপকরণগত দৈন্য থেকেই যে প্রকরণগত ঔদাসীন্যের জন্ম তার পরিচয় বিভিন্ন সূত্রে তিরিশের উপন্যাসরাজির মধ্যে মেলে। বৃহৎ পাঠক সমাজের ঝোঁক ছিল যেমন 'স্বয়ংসিদ্ধার' মতো ইচ্ছাপূরণের কাহিনীর প্রতি অধিক, লেখক সমাজেও তেমন উপকরণগত দৈন্যকে বর্ণাঢ্যতায় ঢেকে ফেলার প্রয়াস। প্রমথনাথ বিশীর জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার অথবা কোপবতী কিংবা বনফুলের দ্বৈরথ অথবা মৃগয়া-য় ঔপন্যাসিকের মানসদৃষ্টি খণ্ডিত হয়েছে। জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার এবং দ্বৈরথের মতো উপন্যাস-বিভ্রমের পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে) ইতিহাস-রূপকথার অশুভ-পরিণয়, যে সমস্ত রচনায় নিটোলতা হারিয়ে ফেলা হয়েছে উচ্ছলতায়। প্রমথনাথ বিশী ও বনফুলের অসঙ্গতি এইখানে যে তাঁরা কন্‌টেন্টের ব্যবহার্যতার ভিতরেই যে-প্রেরণা এবং নিষেধের দ্বন্দ্ব বিরাজমান তাকে জানেন না। এবং জানেন না বলেই যা এঁদের লক্ষ্য, সেই ফর্মের সাধনায় তদ্‌গত হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের উপন্যাসের প্রধান গুণ অভিনিবেশসম্পন্ন কন্‌টেন্ট-জ্ঞান। এই গুণেই তাঁরা বনফুল প্রমুখের চেয়ে অগ্রণী উপন্যাস-শিল্পী। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশের ছন্দকে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ সঠিক অনুধাবন করেন না বলেই আবার ফর্মের প্রসঙ্গে এঁদের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত দুর্বল। তাই তাঁরা তুলনায় শক্তিমান হলেও উপন্যাসের সমগ্র রস-রূপ রচনায় অল্পক্ষেত্রেই সফল।

তাই যে-ত্রুটি জগদীশ গুপ্তের শিল্পী-জীবনে বিবর্তনকে সম্ভব হতে দিল না, সেই ত্রুটিই অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করে বাধা দিয়েছে তিরিশের কনিষ্ঠতম কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। উপনিবেশের চর ইসমাইলের কাহিনীতে যে বিষয়ী সম্ভাবনা তা মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত। নারায়ণবাবু যে তা উপলব্ধি করেননি, তাও নয়। তিনি পট-লগ্ন চরিত্রগুলিকে পটে বন্দী করে ফেলেন বলেই তাদের গতি এবং বিবর্তনকে হারিয়ে ফেলেন। এই অসঙ্গতিকে আবৃত করার জন্যই তিনি রোমান্টিক কল্পনাসিদ্ধ ভাষার আশ্রয়ী। অথচ ছোট গল্পের সিদ্ধহস্ত শিল্পী নারায়ণবাবু সেই ভাষাতেই ছোট গল্পের মুডে আশ্চর্য-

রূপে লক্ষ্যভেদী। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের সার্থক উত্তরাধিকারকে উপন্যাসে বহন করার কর্তব্য-বোধ চতুর্থ-পঞ্চম দশকে একমাত্র নারায়ণবাবুরই ছিল। সে উত্তরাধিকারের মূল কথা হল জীবন-প্রেম। এই জীবনপ্রেম-ভিত্তিক মূল্য-বোধকে নারায়ণবাবু গৃহদেবতার শ্রদ্ধায় দেখেন। আমাদের উন্মূল জীবনযাত্রা ছন্নছাড়া মূল্যহীনতায় যখন আক্রান্ত, যখন পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে তখন বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক ধরণের ইতিবাচক নারী বা নায়িকা চরিত্র কল্পনা করেছেন। বাস্তবতার বিষণ্ণ বিরূপতার মাঝখানে এই নারীচরিত্রগুলি ধৃতিরূপিণী বাঙালী নারীত্বের ঐতিহ্য বোধ থেকে উদ্ভূত। নারায়ণবাবুর এই দৃষ্টি রোমান্টিক বলে সহজে ব্যাখ্যাত হতে পারে—তবে এ চরিত্রগুলির আসল ব্যাখ্যা অন্যত্র। সমাজ দৃষ্টিতে নারায়ণবাবুর এক দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার অধিকার থেকেই এই চরিত্র পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত আর একটা কথা—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে লেখা নারায়ণবাবুর উপন্যাসটি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ জীবনী-উপন্যাস।
তিরিশের অসামান্য ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টার এক বাহুতে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিকের প্রয়াস, অপর বাহুতে অন্নদাশঙ্কর-ধূর্জটিপ্রসাদের। কিন্তু এই দুই কোটির মধ্যে বাস্তবিক কোনো দ্বি-মেরু-ব্যবধান নেই। কল্পনার সঙ্গে মননের ন্যায়কে যুক্ত করে তাকে জীবনরসে সমৃদ্ধ করে তোলাতেই তিরিশের সাধারণ সার্থকতা। একে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ঔপন্যাসিকেরা কতটা ব্যবহার করলেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস

এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধ যখন বাংলা দেশের দোর-গোড়ায় এসে উপস্থিত হল, তখন থেকেই বাংলা উপন্যাসও অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন।) যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণবিক্ষোভ ও দেশবিভাগজাত স্বাধীনতা পঞ্চম দশকেরই চারটে মাইলস্টোন—এগুলিকে পেরিয়ে পঞ্চম দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে, ষষ্ঠ দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের ক্লান্ত, স্খলিত গতি ক্বচিৎ কখনো স্থির হয়ে ভারসাম্যের প্রমাণ দিয়েছে বটে, নতুবা এলোমেলো পদক্ষেপেই তার লক্ষ্যহীনতার পরিচয় ক্রমশ প্রকট হয়েছে। এই লক্ষ্যহীনতার সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ এই সময়কার ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টাকে বোঝার জন্যই বিশেষভাবে অনুসন্ধেয়। নানা পরস্পর-বিরোধী কাটাকুটি খেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর জনমানসও ছিল যেমন খণ্ডিত, শিল্পীমানসের বৃহৎ অংশেও ছিল তারই অনুরূপ এক পন্থা-বিহ্বলতা। চতুর্থ দশকের সমস্ত জিজ্ঞাসার স্রোত যেন যুদ্ধোত্তর বালুকাময় খাতের ওপরে বিশুষ্কতায় মুখ গুঁজে-গুঁজে, কখনও নিজেকে হারিয়ে ফেলে, কখনও কোনো ঘোলা জলের ঋণ থেকে ঈষৎ গতি সঞ্চয় করে এগিয়ে চলছিল। এই প্রায় বিশ বছরের উপন্যাস প্রয়াসের প্রথম পরিচয় কতকটা এই:

(ক) যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষের সময় লেখা উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ আরো অনেকের লেখা উপন্যাস এর মধ্যে পড়ে। আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা অনেকগুলি উপন্যাসও এই সময়ের কীর্তি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি অবিস্মরণীয় মর্মস্পর্শী ছোট গল্প ও দু-একটি উপন্যাসও এই পর্যায়ের

উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। গোপাল হালদারের উনপঞ্চাশী, পঞ্চাশের পথের কথাও আমাদের মনে পড়ে।

(খ) অব্যবহিত-পূর্ব যুদ্ধ ও পরবর্তী কালের গণবিক্ষোভের পটে লিখিত উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, তারাশঙ্করের ঝড় ও ঝরা পাতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন এবং এই ধরণের আরো কিছু প্রয়াস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়প্রচেষ্টা। আয়তন এবং পরিমাণ উভয়ের দিক থেকেই এটি অতি সংক্ষিপ্ত পর্যায়।

(গ) প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়েছে রম্যরচনার অজস্র ধারাবর্ষণ। দৃষ্টিপাতের ও দেশে-বিদেশের জয়যাত্রা লেখকদের আকর্ষণ করেছে এবং সংখ্যাগণনার বাইরে চলে গেছেন রম্যরচনার লেখকেরা।

(ঘ) বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসগত পশ্চাদপসরণ ও ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃতিও এবারে শুরু হল। বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, প্রাণতোষ ঘটক, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রমুখ নবীন লেখকেরা যোগ দিলেন মনোজ বসু, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণের সঙ্গে। পাঠকমহলে এই অংশই পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

(ঙ) সমকালীন কলকাতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

(চ) জীবনের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার ওপর স্থাপিত এবং বৃহৎ এপিক-লক্ষ্য উপন্যাস। অসীম রায়, গুণময় মান্না, (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি উপন্যাস) অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রমুখেরা এই ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যময় অংশের প্রধান কয়েকজন।

এখন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোনো কারণগত যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যাক। ক-পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে দুর্ভিক্ষের মূল হিসাবে চোরা-গহ্বর ও তার সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। মানুষ যে তখনও প্রতিকূলতার কাছে সমর্পিত-প্রাণ নয়—জীবন যত দুর্বিষহ হোক না কেন, মৃত্যু যে তার বিকল্প হতে পারে না এ-বোধ তখনও বাংলা দেশের জনমানসে দৃঢ়। তখনও সামনে রয়েছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ প্রভুরা, গণ-আন্দোলনের প্রত্যাশা ও বাসনা। তিরিশের জের টেনে জীবন

তখনও, যত অস্পষ্ট ভাবেই হোক, আশাবাদী। যুদ্ধের ঠিক শেষ মুখে যে গণ-বিক্ষোভের তরঙ্গ তাতে জীবনের সেই বাসনারই অভিব্যক্তি। 'মন্বন্তরে', 'ঝড় ও ঝরা পাতা'য়, 'শিলালিপিতে', 'চিহ্নে' এই সময়ের হস্তাক্ষর স্পষ্ট। তখনও পর্যন্ত জীবনের প্রতি যে বাস্তব আগ্রহ উপন্যাসের আত্মা, তারই প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছি আমরা গণ-আন্দোলনের প্রতি লেখকদের আগ্রহে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তর এবং নবেন্দু ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রয়াস তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের সময়ে বাস্তব তীব্রতা এবং মানুষের আত্যন্তিক বিপর্যয় লেখক মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত। দেশবিভাগজাত স্বাধীনতায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইতোপূর্বে কুঠারাহত আশাতরুকে সঞ্জীবিত করে তোলার কোনো মন্ত্রের সন্ধান মিলল না। দেশবিভাগে ছিন্নমূল-জনতার জীবনেও এবার নেমে এল মূল্যবোধ বিনষ্টির দুর্দিন। তখনকার গণ-আন্দোলন হয় অতি-বামপন্থায় উন্মত্ত, নয় পরম নিশ্চিন্তে অন্ধ। এদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ওদিকে অগ্নিগর্ভ বাংলার গ্রাম-জীবন। এই বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝখানে হারিয়ে গেল জীবনের পরম সহিষ্ণু অথচ জিজ্ঞাসু সম্মুখ-দৃষ্টি। স্বভাবতই শিল্প-জীবনও গভীর আঘাত পেল। জীবনের সৎ সন্ধিৎসু চেষ্টার নিদর্শন হিসাবে গুণময় মান্নার লখিন্দর দিগার এবং অসীম রায়ের একালের কথার মতো শিল্প প্রয়াসের সাক্ষ্যের কথা অবশ্যই উঠবে—কিন্তু তাতে গোটা জীবন এবং শিল্পের যে চেহারা তার উপলব্ধির কোনো রকমফের হয় না। এ-সময়ে পাঠকদের আগ্রহও এই সমস্ত রচনায় বিশেষ ছিল না। জীবন সম্বন্ধে আগ্রহশূন্যতাই ধীরে ধীরে তার অধিকার বিস্তার করছিল। যে মূল্যবোধগত নৈরাজ্যের ফলে রাষ্ট্র এবং সমাজের পরস্পর ঔদাসীন্যে পাঠক সমাজের এই শূন্যমনস্কতা গড়ে উঠল তার চেহারা এই :

(ক) জীবনের প্রধান দাবি অর্থাৎ জীবিকার দাবি দারুণভাবে আহত হল। জীবনযাত্রার সুস্থ মানোন্নয়নের জন্য যে শ্রমজীবী-সমাজের দাবি তা মধ্যবিত্তের আবেগময় সমর্থন থেকে বঞ্চিত হল দু-কারণে। এক, দেশভাগের ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তের বহুলাংশের পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ায়, তারা হারিয়ে ফেলল অর্থনৈতিক স্থিরতা। দুই, অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম ঝাপটায় বাঙালী ব্যাঙ্কগুলিই প্রথম শিকার হওয়ার দরুন মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিল দারুণ প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন

বাংলা দেশের কৃষক-আন্দোলন ও বড়ো বড়ো শ্রমিক-আন্দোলনগুলি এই কারণের জন্য পাঠক সমাজের বৃহৎ কল্পনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার প্রমাণ দীপক চৌধুরীর শঙ্খবিষ, সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোনের মতো আরো নানা রচনায় স্পষ্ট।

(খ) এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রধান দুই ধারায় কোনো বিরোধ ছিল না। আমাদের প্রধান চাওয়ার বিষয় ছিল ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি। যা কিছু আমাদের জট তার মূল নির্দেশ করেছি আমরা ঐখানেই। আমাদের ঐতিহ্যগত যা কিছু, সাংস্কৃতিক যা কিছু, সব কিছুকেই আমরা ঐ একই মুক্তিসাধনার কাজে লাগিয়েছি। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটা সমগ্র একমুখিতা গড়ে উঠেছিল জাতীয় সংগ্রামের উন্মেষের যুগে। আমাদের কালী অথবা দুর্গা দেশের জন্য খড়্গ ধারণ করেছেন, আমাদের কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও জাতীয় সংগ্রামে সৈনিক-দেরই প্রেরণা জুগিয়েছে। রামকৃষ্ণের ভক্তিসাধনার থেকেও নৈতিক মর্যাদায় সন্ত্রাসবাদীদের কাছে অধিক দীপ্যমান ছিল বিবেকানন্দের ভাষ্য 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। সুতরাং আমাদের ধর্মপ্রাণতায় ও মুক্তিপ্রাণতায় কোনো দুস্তর বিরোধ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তীকালে, স্বাধীনতার পর সে সমগ্র একমুখিতা হারিয়ে গেল। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' কিংবা 'হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা' প্রভৃতি মনোভাবের উপযুক্ত মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক আধার গেল ভেঙ্গে। নানা ঠাকুর, নানা স্বামী ও নানা অলৌকিক শক্তিময় লামা অথবা বাবাদের জন্য অনেক ছোট-বড়ো আসন তখন দিকে-দিকে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক মালিক এবং চাকুরিহারা ও ব্যাঙ্কফেলে সর্বস্বহারা ছা-পোষা মানুষের আশ্চর্য তীর্থ-সঙ্গম গড়ে উঠেছে এই সমস্ত আসনের পাদপীঠে। জীবনে যখন এবম্প্রকার ক্লীবের ভক্তি সামাজিক কারণেই প্রবল হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। আতুর ও পীড়িত মধ্যবিত্তের সান্ত্বনার জন্য সে-ব্যবস্থা সাহিত্যে করলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে। বেদের লেখকের এবম্বিধ ভক্তিরসাপ্লুতি প্রায় জগাই-মাধাই উদ্ধারের আদর্শ স্থাপন করল। কিন্তু ব্যবধানটা এবার হল দুরতিক্রম্য। বারো ঘর এক উঠোনে প্রতিফলিত সামাজিক পরিস্থিতি ও পরমপুরুষের জন্য তদ্‌গতচিত্ততাকে

মেলানো কবি অমিয় চক্রবর্তীর সেই মহামিলনের দেবতার পক্ষেও অসম্ভব। উভয় দিকেই যখন নেতির বোধ প্রবল, তখনকার সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যেরই সন্তান ; সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল।

(গ) পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জটগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হতে লাগল এ-যুগে। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত স্নিগ্ধ পবিত্র সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড়ো মূল্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, রাস্তায়, বাস্তহারা লাঞ্ছিত মানবতার অসহায়তায়। চেতনায় এ-কথাটা পরিষ্কার হয়েছে যে অপরাধী ব্যক্তিটিকে সাজা দেবার মৌল প্রেরণা হওয়া উচিত সংশোধনী প্রেরণা, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি নিজে বৃহৎ অপরাধীগুলি সম্বন্ধে শিথিল। এই শৈথিল্য থেকেই দেহপণ্যা নারীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে অনিবার্য ঘটনা-সঞ্জাত নিরুপায় সহিষ্ণুতার বোধ জন্মাল। আমরা নিরুপায় হয়ে যেমন চোরাকারবারীদের সহ্য করলাম তেমনি নারীর দেহগত শুচিতা বোধের বিনষ্টিকেও সইতে পারলাম। এই ঔদাসীন্য এবং আগ্রহের অভাবের সামনে আমরা আত্মহত্যা-কারীর নীরবতা পালন করেছি। কখন যে সমাজ-প্রদত্ত আচরণগত সীমা মুছে যেতে সুরু করেছে তা হয়তো মীরার দুপুরে (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী) স্বামীটির আত্মহত্যার মতো ঘটনার পর স্পষ্ট হবার কথা, তা যে হয়নি তাও তো প্রমাণ হল বারো ঘর এক উঠোনের শেষে শিবনাথের স্ত্রীর শৈথিল্যকে (হঠাৎ বুদ্ধিমানের মতো) মেনে নেবার মতো ঘটনায়।

স্বভাবতই এমতাবস্থায় শিল্প-সাহিত্যের প্রাণদায়িনী স্নিগ্ধ স্রোত দুই কূলের মৃত্যুবিকীর্ণ তটরেখার অগ্নিদাহের তাপে শুকিয়ে যাবার কথা। গেলও তাই। পাঠকদের, এবং সাধারণ বিভ্রান্ত লেখকদের কাছে, জীবন-বিষয়ক আগ্রহের কোনো স্থির আদর্শ রইল না। বঙ্কিমী যুগে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ ছিল অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত পুরুষকারের যন্ত্রণা-মথিত হাহাকারের দিকে অথবা কর্মিষ্ঠ প্রয়াসের দিকে। রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইতেন মানুষের ব্যক্তিত্বের সমগ্রতা-সঞ্জাত সমস্যাকে, শরৎচন্দ্র ভালবাসতে চাইতেন দুঃখী মানুষকে, তিরিশের লেখকেরা জীবনের বিস্তৃত, জটিল এবং রহস্যঘন অখণ্ডতাকে ধারণ করতে চেয়েছেন—জীবনতৃষ্ণার তাগিদে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন ধরনের ইতিবাচক কোনো মানসদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া ছিল দুষ্কর। যে ঐক্যানুভূতির অলক্ষ্য সূত্রে এতদিনের সমস্ত প্রয়াস ধৃত ছিল তা তখন শতধাবিদীর্ণ। বিমুখ বর্তমান ও বিশূন্য ভবিষ্যতের

দিকে তাকিয়ে অধিকাংশ লেখকদেরই মনে এল এক পঙ্গু অসহায়তাবোধ। এ-রকম অবস্থায় জনজীবনের শুষ্ক খাতে আশার ধারা সঞ্চারিত করতে হলে অবশ্যই গোটা সমাজের দ্বান্দ্বিক চেহারার অনুধাবন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইতিহাসের কার্যকারণ পরম্পরায় সে দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে তখন সমাজ-জ্ঞানের মুখস্থ করা সূত্র দিয়ে উপলব্ধি করা যায়নি। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠক তখন নিজের জীবনকে ঘৃণা করে বলেই সাহিত্য-দর্পণেও নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে আগ্রহী ছিল না। এই মানসিক শূন্যতা পূরণের জন্য লেখকদের বৃহৎ অংশে তখন প্রয়াসও ছিল অন্তহীন। তারই পরিণতিতে দেখা দিল বিষয়বস্তু পরিবর্তনের তাগিদ। উত্তরঙ্গ, সাহেব বিবি গোলাম, আকাশ-পাতাল যেমন নবীন লেখকদের বিষয় পরিবর্তনের প্রয়াসসমূহের কয়েকটি, ইছামতী ও রাধা তেমনি তিরিশের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের উক্ত প্রয়াসে যোগদানের দুটি উদাহরণ। অতীত জীবনাশ্রয় এর মূল কথা।

এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন-সাধনের আর এক মুখ অজ্ঞাতপূর্ব আঞ্চলিক জীবনের সন্ধানে সচেষ্ট হওয়ার ভিতরে। নিঃসন্দেহেই তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশ্বাস ক্লান্তি থেকেই এই প্রয়াসের জন্ম। এখানেও শ্রমিক জীবন (বি.টি. রোডের ধারে), ধীবর জীবন (তিতাস একটি নদীর নাম অথবা গঙ্গা), অন্ত্যজ-জীবন (ঢোঁড়াই চরিত মানস), নাগা পাহাড়ের কাহিনী (পূর্বপার্বতী) প্রভৃতি নানা প্রয়াসের উল্লেখ করা চলে। লেখকেরা যা চেয়েছিলেন তার মধ্যে যে একেবারেই অকৃত্রিমতা অনুপস্থিত এ-কথা ঠিক নয়। বিমুক্ত, বলিষ্ঠ জীবনস্রোত, উন্মুক্ত প্রকৃতি এবং জীবন-মৃত্যুর সুস্থ স্বাভাবিকতায় অথচ নিষ্ঠুরতায় একটা আলাদা স্বাদ আছে। যদিও হাঁসুলিবাঁকের উপকথার তারাশঙ্করকে অতিক্রম করা এঁদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, তথাপি বিভিন্ন ভাবে এঁদের কীর্তির আংশিক সাফল্য উপভোগ্য। যে ক্লান্ত দ্বীপ-জীবনের মন্থর জীবনস্রোতের প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করার জন্য মম সাহেবের লেখায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় পটভূমি উঁকি দিয়েছে, এখানে প্রেরণা তার চেয়ে খাঁটি ছিল। বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করার সময় লেখকদের অনেকেরই দুর্বলতা প্রকট হয়েছে বটে, কিন্তু এদেশে, স্বাধীনতার পরে, আঞ্চলিকতার তাগিদের পশ্চাতে দেশকে জানতে চাওয়ার একটা অবচেতন তৃষ্ণা কাজ করেছে এ অনুমান অমূলক নয়।

অথচ সেই অবক্ষয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশের মধ্যবর্তী জীবনের নানা স্তরের

ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করার সাহসও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বারো ঘর এক উঠোন, চেনা মহল অথবা মোমের পুতুলের মতো উপন্যাসে সেই নানামুখী ভাঙনকে ব্যবহার করা হয়েছে। যে নৈরাশ্য এবং শূন্যমনস্কতা মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত সত্তাকে ফোঁপরা করে দিচ্ছিল তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন এই সমস্ত উপন্যাসে মেলে। সচেতন পাঠকদের সীমিত পরিসরের কথা বাদ দিলে, অ্যাভারেজ পাঠক এইসমস্ত রচনার বাস্তব-যন্ত্রণা-বিস্মরণী কোনো উপাদান খুঁজে পায়নি। তাদের প্রাথমিক আকর্ষণ ছিল বরঞ্চ ইতিহাস-ভূগোলাশ্রয়ী উপন্যাস-গুলির প্রতি। কিন্তু সচেতন পাঠক একটা কথা সেদিন অনুভব করেছিলেন। সেটা এই: উপন্যাসের শিল্পগত আত্মাকেই আমরা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ব্যবহারে খুঁজে থাকি। সেটা এ-জাতীয় উপন্যাসে সুলভ ছিল না, তথাপি সমকালীন দেশের মানুষকে নিয়ে লিখিত এই সমস্ত উপন্যাসের পরোক্ষ ধাক্কায় গড়ে উঠল বর্তমান বাংলা উপন্যাসের দুই রূপ। এক রূপে জীবনের বিশাল ভাঙা-গড়াকে, তার দ্বান্দ্বিক সমগ্রতাকে ধারণ করার প্রয়াস। অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মান্না, অসীম রায় এঁদেরই কয়েকজন। আর এক দিকে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অস্তিত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি মূলীভূত প্রশ্ন কোনো কোনো উপন্যাসে প্রবল হয়ে উঠেছে। বিশেষ ভাবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই বিপন্ন ও সংক্ষুব্ধ বর্তমানের অন্তর্গত ঘাতে-সংঘাতে মানুষের শুদ্ধ স্বরূপকে খোঁজেন পরম বেদনায়—তিনি নেতিবাদী নন—কোথাও একটা আশ্রয় আছে বলে তিনি ভাবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন জীবন- এবং জীবন বিমুখতার লুকোচুরি খেলায় জটিলতার বুড়িকে একবার ছুঁয়েই লোভন ছায়ায় বিশ্রাম চান, সমরেশ বসু যেমন পাতক ও প্রজাপতি উপন্যাসে উদ্দেশ্যহীন ক্রোধে লক্ষ্যভেদের আগ্রহে লক্ষ্যহারা—শীর্ষেন্দু সে ক্ষেত্রে অনেক আত্মস্থ, অথচ অনাসক্ত, প্রেমিক অথচ বিবাগী।

দুই

এখন আমরা এই সমগ্র অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাব যে সৎ-সাহিত্যের জন্য দায়িত্বশীল নিষ্ঠাকে কত পিছুটান এড়িয়ে এবং কাটিয়ে চলতে হয়েছে। দেখাব একবার এদিকে একবার ওদিকে পাড় ভেঙে ভেঙে শিল্পহীন বাণিজ্যবুদ্ধি কেমন করে সব কিছু গ্রাস করতে চাওয়া সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একটি দুটি

শিল্পকর্মে আমরা ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়েছি। প্রথমেই স্মরণীয়, ঔপন্যাসিকদের সৎ সন্ধিৎসু প্রয়াস বারে বারে খণ্ডিত হয়েছে নানাভাবে। পাঠক সমাজের উৎসাহহীন, পঙ্গু কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে হয়েছে শিল্পীদের, যার জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা-ঘন দিনগুলিতে। এই কৌতূহলের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ হল যুদ্ধকালীন সংবাদ-স্পৃহা। সংবাদ-স্পৃহা যে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহেরই নামান্তর সে কথা এ-গ্রন্থের প্রারম্ভে আমরা বলেছি। কিন্তু যুদ্ধের কালে সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধির কালে সংবাদ-স্পৃহা মাত্র কৌতূহল-বৃত্তি। এক ধরণের অলস কৌতূহল ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল বিরাট পাঠকসমাজের উদ্দেশ্যহীন মস্তিষ্ক। এ-যুগের উপন্যাস-রচয়িতাদের বহুলাংশ এই চরিত্রহীন কৌতূহল-বৃত্তিকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

'দৃষ্টিপাত' উপন্যাস নয় এবং আমাদের আলোচনার তালিকায় এ-জাতীয় গ্রন্থ স্বাভাবিক নিয়মেই অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি দৃষ্টিপাতের সাফল্যের ভিতরে তার সাহিত্যিক গুণাগুণের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে যা যুক্ত হয়েছিল তা এই সর্বব্যাপী অলস কৌতূহল।

পাঠক-সাধারণের সংবাদ-স্পৃহার যে আতিশয্যকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের একটা প্রবণতা বলে আমরা মনে করছি, দৃষ্টিপাত থেকে তাকে পরিচর্যা করা শুরু হল। এ-ব্যাপারে রম্যরচনার প্রকরণের সঙ্গে তৎকালীন উপন্যাস-সাহিত্যের উপকরণের একটা অলক্ষ্য যোগসূত্র বিদ্যমান। এই পরিচর্যা-প্রবণতার ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের বৃহৎ অংশে কতকগুলি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেগুলি এই :

(ক) পুরনো আমলের সামন্ততান্ত্রিক পরিবার-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস-গুলিতে উক্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা দুর্নীতি এবং বিলাসের বর্ণনার আতিশয্য ; বরঞ্চ বিষয়বস্তুর নিজস্ব তাগিদেই যেখানে এই ঝোঁকের হাত থেকে মুক্তি ঘটেছে সেখানে আবারও বোঝা গেছে বক্তব্যের সম্পদেই উপন্যাসের শক্তির উৎস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইছামতী তার পরিচয়।

(খ) আঞ্চলিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতেও এই খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা সরবরাহের প্রয়াসে পাঠকের কৌতূহলাতিশয্যকে তুষ্ট করার অহমিকাই সক্রিয়। পাঠক কত কম জানেন, তার ওপরেই যেন লেখকদের অভিজ্ঞতার প্রাসাদ নির্ভরশীল।

আঞ্চলিক জীবন এবং অতীত জীবন-আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির এই প্রবণতা যে কেবল বাস্তব সম্বন্ধে জ্ঞানের আংশিকতার পরিচায়ক তাই নয় উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানের নিদর্শনও বটে। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্য এ-যুগের উপন্যাস সাহিত্যের কেবল উল্লিখিত অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। নায়ক-পরিকল্পনার দৈন্য এ-যুগের উপন্যাসগুলির সাধারণ ব্যাধি। আমরা তারাশঙ্কর-সংক্রান্ত আলোচনায় দেখেছি যে এই দৈন্যের বোধ কেমনভাবে যুদ্ধের সময়েই তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে, কেমন করে তা থেকে তিনি তাঁর শিল্পী-জীবনের চোরাবালির মধ্যে পড়তে চলেছেন। ব্যক্তির ভূমিকাহারা সামাজিক পরিবেশে, সেতুবন্ধন, নগর স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির আমলা-তান্ত্রিক যান্ত্রিকতা, স্বাধীনতার পরেও এখানে অভিজ্ঞতা হিসাবে বিবর্ণ হয়েই থাকল। এ-অবস্থায় লেখকদের পক্ষ থেকে নায়ক-সবল কাহিনী গড়ে তোলার প্রেরণা অনুভব করা ছিল দুরূহ। ইতিহাসের এবং ভূগোলের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েও তাঁরা অতীতে এবং সুদূরেও বর্তমানের স্বদেশেরই প্রতিফলন খুজে ফিরেছেন। একমাত্র সমরেশ বসুর গঙ্গায় এই সামগ্রিক অবস্থার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। বিলাস তাঁর নায়ক-সবল কাহিনীর বলিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রমাণ। কিন্তু তিনি উপন্যাসের পট এবং পটলগ্ন জীবনের পরস্পরের টানাপোড়েনকে সবটা চিনতে ভয় পান বলেই সে পরিকল্পনা শেষ তাৎপর্যে বঞ্চিত।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের তাগিদ থেকে যে দুই শাখা উদ্গত হয়েছে তাদের সাধারণ লক্ষণ যেমন বিবৃত হল, তেমনি মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বাঙ্গীণ ভাঙনের বিষয় নিয়ে লিখিত উপন্যাসগুলিতেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন ঃ

(ক) গুণময় মান্নার প্রয়াস স্মরণে রেখেও বলা যায় কিছু সময়ের জন্য উপন্যাসে গ্রাম হারিয়ে যেতে বসল। পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এক আধটি প্রচেষ্টা মনে রেখেও বলা যায় কলকাতাকেন্দ্রিকতা হল এই উপন্যাস-গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাঙনের তীব্রতা অনুভূত হয়েছে কলকাতায় —মূল্যবোধের বিপর্যয়গুলিকেও, রুচির বিকার-চিহ্নগুলিকেও সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকট হতে দেখা গেল এখানে। কলকাতা এই সমস্ত উপন্যাসের ঘটনাভূমি হওয়ার ফলে জীবনের জটিলতাকে অবশ্যই ব্যবহার করা গেল, কিন্তু কলকাতাকেই গোটা দেশ ভেবে বসায় বিচ্ছিন্ন দৃষ্টির যা কুফল তাও

ভোগ করতে হয়েছে। উপন্যাসগুলির অধিকাংশেরই অন্তরের কথা হল মধ্যবিত্ত হতাশা। সে হতাশার পাশাপাশি লখিন্দর দিগার উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাও বাংলার গ্রামে-গ্রামে ঘটছিল, কিন্তু কলকাতার হতভবিষ্যৎ মধ্যবিত্তের কাছে তা শুধু সংবাদ, অথবা সংবাদও নয়। কলকাতা-কেন্দ্রিকতা বিষয়গত সীমাবদ্ধতার বীজ ছিল। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের মতো উপন্যাসে কলকাতার জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে ব্যবহারের সৎ প্রয়াস সে-প্রসঙ্গে খুবই নিঃসঙ্গ প্রয়াস।

(খ) তিরিশের উপন্যাসে নারী-চরিত্র-প্রাধান্য কিঞ্চিৎ স্তিমিত ছিল। সার্থক নারী চরিত্র সৃজনের পাশাশাশি পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য বরঞ্চ তিরিশের উপন্যাসের প্রাথমিক লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসে দেখা গেল নায়কের ঐতিহ্য রীতিমতো আঘাত পেতে চলেছে। অনায়ক লক্ষণাক্রান্ত নায়কদের পাশে বরং নারী চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতা শরৎচন্দ্রের পরে আবার লেখকদের অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে। প্যাসন-বিহীন পিঙ্গল এই নারীচরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মর্বিড। ছয়ের দশকে, আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের নায়িকাচরিত্র এ প্রসঙ্গে পৃথক ভাবে উল্লেখযোগ্য ; তাঁর সমুদয় সৃষ্টি কর্ম এক হিসাবে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষে এই নায়িকা চরিত্রেরই প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতি সার্থক ও রসোজ্জ্বল হয়েছে। মধ্যবিত্ত নায়কদের অবশ্যই আর ধাত্রী দেবতার শিবনাথ প্রমুখের আদলে চিন্তা করার অবকাশ সামাজিক কারণেই সম্ভব ছিল না। করতে গেলে তাদের কি রকম বেখাপ্পা লাগে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসের নায়ক রাজেন তার প্রমাণ।

(গ) বুদ্ধদেবের তিথিডোর ছাড়া বিশুদ্ধ প্রেমের আখ্যানও আর নেই। তিরিশের কাল থেকেই অবশ্য প্রেমকে উপজীব্য করে লেখা উপন্যাসের সংখ্যায় ঘাটতি ফুটে উঠেছে। এবং বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ঐতিহ্যের দিকে তাকালে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে প্রেমের বিশুদ্ধ আখ্যানে আমাদের উৎসাহ বরাবর কম। পাঁচ বা ছয়ের দশকের বিপর্যস্ত মানসিক অশান্তির কালে প্রেমের বা প্রকৃতির বিশুদ্ধ আখ্যানের অবকাশ আর রইল না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রস নামক বড়ো গল্পে প্রেমকে সামাজিক কর্মসূত্রের তাৎপর্যে গেঁথে গোটা জীবনের পটে ধারণ করা হয়েছে। এমন ধরণের

তাৎপর্যপূর্ণ প্রেমের কাহিনীর দ্বিতীয় নামোল্লেখ এই দশকে সহজসাধ্য নয়। অন্তর্গূঢ় অথচ অজটিল একখানি ক্ষুদ্র অথচ তীব্র উপন্যাসের নাম এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণীয়—সুধাংশুকুমার ঘোষের 'ফানুসের উপমা'। ছয়ের দশকে একধরণের প্রেমের গল্প বেসট সেলার্স তালিকায় স্থান পাবার যোগ্য। বিমল করের বালিকা বধূ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রেমের গল্পে যথাসম্ভব সময়ের জটিলতার অনুপ্রবেশ স্বীকার করার ভান করেন। তাই তাঁর কাহিনীতে বালিকা বধূর সঙ্গে যেটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করে তা ফুটরুল দিয়েই মাপা চলে, গজ কাঠিরও দরকার হয় না।

(ঘ) হাস্যরসের সম্পূর্ণ অবিদ্যমানতায় এ-যুগের উপন্যাস-কীর্তির আর এক চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশিত। যে উদার সহানুভূতি এবং মুক্ত নিরাসক্ত দৃষ্টির সন্তান হাস্যরস, পঞ্চম আর ষষ্ঠ দশকে তাকে লালনের অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অসঙ্গতির মাত্রাধিক্যে হাস্যরসিকের প্রশ্রয়ের পরিবর্তে সামাজিকের বিক্ষোভের কারণই বেশি ছিল। ব্যঙ্গের জন্য যে অনুকূল ভূমি তিরিশে বিদ্যমান ছিল, সমসাময়িক জীবনের বন্ধ্যাত্বে সে জীবন সম্পর্কে উদাসীনতায়, ব্যঙ্গরসের প্রস্রবণও শুকিয়ে গেল। পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শিবরাম চক্রবর্তী প্রথম মহাযুদ্ধের পরের ও তিরিশের সুফল। চল্লিশে-পঞ্চাশে পরিমল গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যতীত প্রায় কোনো হাস্যরস নেই, কাজেই তার বিকল্পে ভাঁড়ামি বৃদ্ধি পেয়েছে—যা আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে না।

সমস্ত অবস্থাটাই ছিল যেন মেঘাবৃত গুমোট—যেখানে ক্লেদাক্ততাই বেশি। সে বন্ধ্যা মেঘে যেমন ঝড়ের ইঙ্গিতও ছিল না, তেমনি হাস্যের বিদ্যুৎস্ফুরণও নেই। মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ক্ষণকালের জন্য এলোমেলো হাওয়া বয়েছে—তাতে তার চারিত্র ঘোচেনি।

তিন

এই ভাবেই বাংলা উপন্যাস-প্রবাহ বয়ে চলেছে। জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের ফলে বিশুষ্ক ও বিশূন্য মানসে নানা বিভ্রান্তি, নানা বিকার যেমন পাঠকদের অ্যাভারেজ চরিত্র, লেখকেরাও তেমনি বহু প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কখনও পরাভূত, কখনও 'জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা'র আহ্বানে

রঙিন গলিতে পদার্পণের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণে প্রয়াসশীল। সেইজন্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রতীক্ষায় ক্লান্ত মানসে পাঠকের পক্ষে ধৈর্যের আসন পাতাও দুঃসম্ভব, আবার লেখকও সেখানে কী আসন নেবেন সে সম্বন্ধে সাধারণত অস্থিরমতি। তবু জীবনের সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বকে লেখকেরাই খুঁজে ফেরেন, বরং রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজনীতির ছাত্রদের চেয়ে এ-দায় তাঁদেরই বেশি। তাঁরা জানেন—

> "বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্ন-প্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষত-বিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায়-গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতার বীজ কম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসংবাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়··।"
> (বিষ্ণু দে)

এখন আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কয়েকটি বাংলা উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করব। এ-আলোচনা কোনোক্রমেই প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের আলোচনা নয়। তার প্রয়োজনও বর্তমান লেখক অনুভব করেন না। যে-কোনো দিক থেকেই হোক, দোষে অথবা সম্ভাবনায় তাৎপর্যপূর্ণ—এমন কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা করা হবে।

চার

যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত মূল্যবোধের সম্মুখে অবক্ষয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ইতিহাস-ভূগোল আশ্রয়-বাসনা যেমন প্রবল হয়ে উঠল, বাংলা উপন্যাসের টেকনিকের বিকাশও তেমনি ব্যাহত হল নানা-ভাবে। জীবনকে খুঁজতে গিয়েই টেকনিকের উপলব্ধি এবং ভাঙাগড়া। ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদার যে চিন্তাধারা ও চেতনাস্রোতকে ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিরিশের কালে—অথবা তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক যে ঔপন্যাসিক কনটেণ্টজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে ইতিহাস-

ভূগোলকে আশ্রয় করায় কনটেন্ট এবং টেকনিকের সে দায় তাঁদের মানতে হল না।

তাই বাংলা সাহিত্যের পরিধি বা দিগন্তের বিস্তৃতিও 'দৃষ্টিপাতের' মতোই আর এক ধরণের সংবাদ-পিপাসার—পঙ্গু কৌতূহলের পরিনিবৃত্তি। কলকাতায় বড়ো অস্বাস্থ্য, অতএব চলো যাই বায়ু পরিবর্তনে, প্রায় এই সূত্রকে অনুসরণ করেই যেন ভাবা হয়েছে নগরজীবন বন্ধ্যা, চলো যাই পাহাড়ে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে। যেন জীবন নামক ব্যাপারটা কখনো সংসারে থাকে, কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে, অথবা জঙ্গলে! পাঁচের দশকে 'অবধূতের' আজগুবি বাজার মাত এই সময়েরই ঘটনা। অপরিচিত পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা লেখককে পাঠকের কাছে সর্বজ্ঞ করে তোলে।

আবার ইতিহাসকে আশ্রয় করে যেখানে সমকালকে পরিহার করেছেন লেখকেরা, সেখানেও তাঁরা মনে করেছেন ইতিহাসের পুঞ্জীভূত তথ্যরাশির সঙ্গে কাহিনীর চুনবালি কোনোক্রমে মেশাতে পারলেই বুঝি উপন্যাসের প্রাসাদ খাড়া করে যাবে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের জীবনযাত্রার বিবরণকে প্রত্যক্ষ করে তোলাতেই যে উপন্যাসের সার্থকতা নয়—জীবনের প্রাণস্পন্দন তথা ব্যক্তির সংঘাতময় বিকাশকে মুখ্য করে দেখানোতেই যে তার প্রধান পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসগুলিতে সে সত্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সাহেব বিবি গোলামের ঐতিহাসিক ত্রুটি নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ত্রুটিগুলিই ঔপন্যাসিক ব্যর্থতার একমাত্র হেতু নয়। যে সামন্ত পরিবারের পতনের কাহিনীকে উপন্যাসের মূল উপজীব্য করা হয়েছে তার মধ্যে কল্পনার অসঙ্গতিই সেই পতনকে বিশ্বাস্য করে তুলেও তাৎপর্যে অন্বিত করতে পারেনি। ছোট বৌয়ের ব্যক্তিগত পরিসমাপ্তি ব্যক্তিত্বের গন্থচ্ছন্দে না ঘটে গল্পের বৃত্ত পূর্ণতার তাগিদে ঘটেছে। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বিমল মিত্রের দ্বিতীয় বেস্টসেলার্স। অতিসরলীকরণের অত্যুত্তম নিদর্শন এই গ্রন্থের নায়কপরিকল্পনা।

গল্প কথনের অসামান্য নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই ত্রুটি অধিকতর তাৎপর্যহীন হয়েছে তারাশঙ্করের রাধা উপন্যাসে। মোগল আমলের শেষ পাদে বর্গির হাঙ্গামা-অধ্যুষিত বাংলার ধর্মীয় সাধনার পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসে যে পরিমাণে চড়া রঙের ব্যবহার সে পরিমাণে কান্তি নেই। এ-অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণে

কোন্ বিশিষ্ট বক্তব্য দ্যোতনা লাভ করল তা স্পষ্ট হয়নি। সাহেব বিবি গোলাম, রাধা প্রমুখ বেশ কিছু সংখ্যক ইতিহাসগত উপন্যাসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত শিল্প-সফল, সেটিও এই উপন্যাসগত দৈন্য থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এটি বিভূতিভূষণের ইছামতী। অবশ্য, অক্লেশে এবং অবলীলায় উপাদানের ব্যবহারে, বিধৃত কালখণ্ডের চিত্রণে, তৎকালীন সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসটি এই ধরনের সমুদয় উপন্যাসের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা'য় ঐতিহাসিক রস-সৃষ্টির দিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। পট-পরিবেশে এবং উপন্যাসের 'মিলিউ' রচনায় লেখকের প্রযত্নও উল্লেখযোগ্য। তথাপি সব মিলিয়ে ব্যক্তি-পাত্রের সেই উচ্চাবচ ছন্দিত মন্দ্রের প্রতিধ্বনি 'লালকেল্লা'য় বাজতে পারেনি। কেরী সাহেবের মুন্সিতে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে প্রমথনাথ বিশী সময়-সমাজ চিত্রণে যে সাফল্য লাভ করেছেন, অল্প আয়াসে সামান্য উপাদানে বিভূতিভূষণ সে-ক্ষেত্রে কালকে ফুটিয়েছেন সুন্দর ভাবে। নীলকর সাহেবদের কথা, নীলের নায়েব, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, সে কালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনাড়ম্বর শিল্পিতায় চিত্রিত হয়েছে। যে নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতা বিভূতিভূষণের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান তা যদিও এ-উপন্যাসে পরিণতিকে স্পষ্ট হতে দেয়নি—যদিও নায়কের জীবন যেন শান্তি থেকে অধিকতর প্রশান্তিতে যাত্রারূপে কল্পিত হওয়ায় উপন্যাসের ছন্দের ব্যাঘাত ঘটেছে, তথাপি পাঠক মনের ওপরে সেই অতীত দিনের আলোকরশ্মি সম্পাতে তিনিই সফলকাম, এ-কথা পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের একাধিক অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস পাঠান্তে আমাদের স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই।

এই ধরনের উপন্যাসের সমগ্র কল্পনার অসঙ্গতির আর একটি লক্ষণ এই যে গৌণের প্রলোভনে মুখ্য প্রায়শই হারিয়ে যায়। যেমন ছোটখাট খুঁটিনাটির অরণ্যে হারিয়ে যায় ইতিহাসের সত্য, তেমনি চরিত্র বিশেষের ওপর নির্ভর-আতিশয্যে নষ্ট হয় উপন্যাসের ভারসাম্য। কেরী সাহেবের মুন্সির কাহিনী এই ভাবেই হয়ে ওঠে রেশমির কাহিনী। রেশমির সাফল্যকেই লেখক এবং বহু ক্ষেত্রে সমালোচকেরা উপন্যাসের সাফল্য বলে ভেবেছেন। অথচ এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে উপন্যাসে বিশ্লিষ্ট কিছুর একক সাফল্যের কোনো মূল্য নেই। রেশমির প্রাধান্য কেরী সাহেবের মুন্সিকে গ্রাস করে ফেললে যুগচিহ্নিত তাৎপর্যে রাম বসুকে, তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাসনা-কামনাকে আর ফুটিয়ে তোলা যায় না। প্রমথবাবুর এই সর্বাপেক্ষা সুলিখিত উপন্যাসেও যায়নি। নতুন কালের

মানুষ হিসাবে রামরাম বসুকে স্থাপিত করতে হলে রামরাম বসুর কীর্তি-বাসনা সত্যিই কীর্তি-বাসনা না সুবিধাবাদ এ-সম্বন্ধে লেখকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা দরকার। রামরাম বসুর মনের সংশয় লেখকেরও সংশয় হলে খণ্ডিত ইতিহাস চেতনা নতুন কালের চরিত্রাঙ্কনে ফলপ্রসূ হয় না। রামরাম বসু স্রোতের মুখে শৈবালের মতো ভাসতে থেকেছে—লেখকের কৌতুকপ্রিয় মন তা দেখে কিছু রস নিষ্কাশন করেছে বটে কিন্তু যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যের রসরূপ প্রদানে এ-জাতীয় উপন্যাসের সিদ্ধিলাভ ঘটে তার অভাব প্রতিপদেই অনুভূত হয়। একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার। বর্তমান সমালোচক এ-কথা মনে করেন না যে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দশকে ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত অতীতাশ্রয়ী উপন্যাসগুলির অসাফল্যের হেতু তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিক কাঠামোয় উপন্যাসের কাহিনী গাঁথার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ফতোয়া নেই। বরঞ্চ জেম্‌স্ সাহেবের পরামর্শ স্মরণে রেখে বলা যায় যে লেখকদের বিষয়বস্তুগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার্য। আমাদের অনুসন্ধেয় শুধু এই যে বিষয়বস্তুর শিল্পময় প্রয়োগের পথ ধরে তিনি উপন্যাসে কোনো সার্থকতায় পৌছেচেন কিনা। এই শেষ, কিন্তু প্রধান জিজ্ঞাসার সামনে বিভূতিভূষণ ছাড়া সকল ঔপন্যাসিকই নীরব। রমাপদবাবুর লালবাঈ-এর বেগবান কাহিনীস্রোত কিংবা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কলকাতার কাছেই উপন্যাসের মধ্যবিত্ত ইচ্ছা-পূরণের ইতিহাস-লীলা এই উত্তরহীনতার জন্যই তাৎপর্যহীন। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে পট ও ব্যক্তির সংঘাতে ও মিলনে যে তাৎপর্য স্পষ্ট হল, তাও প্রত্যাশার তুলনায় বড়ই ক্ষীণায়ু। সে-ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যে উপস্থিত হয়েছেন। কাল-কালান্তর, নবকালের জন্ম প্রমুখ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। তিনি যুগাতিক্রান্ত মানব-জীবনধারাকে, ইছামতীর প্রতীকে যার পূর্ণ ব্যাখ্যা, ছোট সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবন্ত করেছেন। উপন্যাসের শেষাংশের করুণ সুরে যে জীবন মুগ্ধতার পরিচয়—তা নিরবচ্ছিন্ন অপরিমেয় জীবন লীলা সম্বন্ধে পাঠককে যুগপৎ স্নিগ্ধ করে এবং ব্যথিত করে। ভূতকে পিণ্ড দিলে সে মানুষ হয়ে যায়। নীলকর সাহেবদের উদ্দেশে প্রদত্ত দেশীয় প্রেমিকার পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে নীলকর সাহেবও এখানে মানুষ হয়ে গেছে। যে দুর্বলতায় অধিকাংশ অতীতাশ্রয়ী উপন্যাস চিহ্নিত এবং ভারাক্রান্ত, ইছামতী তা থেকে মুক্ত এই জীবনীশক্তির জোরেই। অন্যদের ক্ষেত্রে এ-দুর্বলতার প্রধান প্রমাণ কাহিনীকে বর্ণাঢ্য এবং প্রচণ্ড

কৌতূহলময় করে সাজানোর ভিতর বিদ্যমান। তারা মনে করেন যখন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে তখন বিদ্রোহের তাৎপর্যকে কল্পনায় ও মননে ধারণ না করে নানা সাহেব বা অনুরূপ কারো সম্বন্ধে অনাবশ্যক কৌতূহলকে ব্যবহার করাই ইতিহাসগত জীবন-ব্যাখ্যার পরাকাষ্ঠা। সে-ক্ষেত্রে বিভূতি-ভূষণের অসামান্য সংযমসিদ্ধ নির্লোভ কাহিনী মানুষের শাশ্বত মূর্তিকেই একটা সময়খণ্ডের পটে ধারণ করতে পেরেছে।

পাঁচ

উপন্যাসের অভিনব বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য অপরিজ্ঞাত-পূর্ব আঞ্চলিক জীবন-যাত্রার সন্ধানে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি-সাধন ঘটল পঞ্চম আর ষষ্ঠ দশকে। আমরা আবারও বলছি যে এ বিস্তৃতি-সাধনের প্রয়াসে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। বরঞ্চ অভিজ্ঞতাকে সর্বতোচারী করে তোলার এই প্রচেষ্টা কথাসাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদেই প্রয়োজনীয় ছিল। এখানেও বিষয়বস্তুর সার্বিক স্বাধীনতাকে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এখানেও একই সতর্কবাণী উচ্চার্য—বিষয়বস্তু নিজে একাকী শিল্পসিদ্ধির নিয়ামক নয়। এ জাতীয় অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা গেছে অভিনব হবার প্রাণপণ প্রয়াসে অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী সৃজনই যেন লেখকদের উদ্দেশ্য। আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধারে ধৃত জীবন-জাহ্নবীর জল লেখক আহরণ করবেন—এমনটাই বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় আধারটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সযত্নে অলংকৃত করতে গিয়ে হারিয়ে বসেছেন সব আধেয়টুকু—তবে তাকে বিড়ম্বিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন অথবা অপরিচিত শ্রমজীবী জীবনকে অবলম্বন করে নবীন লেখকদের হাতে যে কটি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি—সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিতমানস, অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম এবং সমরেশ বসুর গঙ্গা। তিনটি উপন্যাসেই লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যক্তিগত সাহস অভিজ্ঞতার প্রসারিত রূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনজনেই ধৃত বিষয়কে এমনভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন যে পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ফলশ্রুতির উদয় হয়—এর বেশি কিছু এ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আর জানতে পারতাম না। কিন্তু এই তিনটি উপন্যাসেই দেখা যায় যে উপন্যাসের পটকে এঁরা যত চেনেন,

পটলগ্ন ব্যক্তির ছন্দকে শেষ পর্যন্ত তেমন নিষ্ঠায় রূপময় করতে পারেননি। তাই ঢোঁড়াই চরিতমানসের প্রথম খণ্ডের আশ্চর্য বিকাশশীলতা দ্বিতীয় খণ্ডে বাধাগ্রস্ত এবং অবসিত। তাৎমাটুলির প্রাকৃত পরিবেশে বুনো লতার মতো বৃদ্ধি এবং শেষে উন্মূলতা, আমাদের যে ঢোঁড়াইয়ের সমব্যথী করে, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে অসীম শূন্যতার মুখোমুখি সেই লোকটা শুধু করুণার উদ্রেক করে গেল। প্রথম খণ্ডের পরে আর তার ব্যক্তিজীবন আমাদের কাছে নবীন বিকাশের কোনো তাৎপর্য সৃষ্টি করেনি। আগস্ট আন্দোলনের পটে তার নতুন অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ-কথা সত্য। কিন্তু প্রথম খণ্ড ঢোঁড়াই চরিতমানস বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। বৌকাবাওয়া, গন্‌হি বাবা, বটহিয়ার গান, রেবণগুণী,—চেতনার প্রাথমিক স্তরে পড়ে রয়েছে এমন একদল মানুষের অতি মন্থর বিবর্তনকে ঢোঁড়াইয়ের আশৈশবের সঙ্গে যুক্ত করা অতীব দুরূহ—সতীনাথবাবুর শক্তিশালী লেখনী সে কাজে পারঙ্গম ছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বৌকাবাওয়া সতীনাথবাবুর শক্তির স্মারক-চিহ্ন হয়ে থাকবে।

ব্যক্তির বিকাশের এই শর্তকে তিতাস একটি নদীর নামে অনুসরণ করার প্রয়োজন লেখক অনুভবই করেননি আদপে। তিতাসের মন্থর স্রোতের পাশেপাশে উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈতবাবু। তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গীত—যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখকে ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অথচ ব্যক্তির বিকাশের সূত্রকে লঙ্ঘন করেও তিতাস নদীর মালোদের কাহিনী ডকুমেন্টারি আলেখ্যে রূপান্তরিত হয়নি। বরঞ্চ যা বলা হয়েছে—বইখানি যেন নদীর পাঁচালি হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোনো ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না। নদীর যেমন বিশেষের প্রতি কোনো পক্ষপাত নেই, কাহিনীও তেমনি এখানে বিশেষ কিছুর ঘাটে বাঁধা নয়। এখানে স্নিগ্ধ বিষণ্ণ জীবনের করুণ শ্রীটুকু পলকে-পলকে মূর্তিধারণ করেছে—এবং কোনো ভাবপ্রবণ অশ্রুর মূল্যে সে-কারুণ্যকে অমর্যাদা করতে হয় না। উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি তিতাস একটি নদীর নাম পাঠ করে অবশ্যই মেলে না। সেই পূর্ণবৃত্ত অভিজ্ঞতার সমগ্র রসরূপ এখানে নির্মিত হয়নি, এও ঠিক। কিন্তু জীবনমুগ্ধতার অক্ষয় সম্পদের একটা সমালোচনা-নিরপেক্ষ শ্রী আছে, সেই সম্পদে বইখানি সম্পন্ন।

গঙ্গা সেই সমগ্রতার সন্ধানে আর-একপদ অগ্রসর রচনা, যদিও তিতাসের শান্ত নিয়তি বা অদৃষ্টবোধজনিত উদাসীন শ্রী থেকে তা বঞ্চিত। কিন্তু এও স্মরণীয় যে সমরেশ বসুর লক্ষ্য তা ছিল না। নদীসূত্রে গ্রথিত অদৃষ্ট তিতাসের কাহিনীতে মূল বোধ হিসাবে কাজ করেছে। নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ গঙ্গার মূল চেতনা। সমরেশবাবু কাহিনীর শেষার্ধে এই মৃত্যুবোধকে স্তিমিত করে এনেছেন হিমির খাতিরে। যতক্ষণ তা করেননি ততক্ষণ গঙ্গার খরস্রোতের সঙ্গে সেই মৃত্যু-চেতনাকে মিলিয়ে উপন্যাসের ঈপ্সিত গতিতে শিল্প-সাফল্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমরেশবাবুর সাহিত্য-জীবনের তো বটেই, পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টিগুলির মধ্যেও অন্যতম। অভিনব বিষয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরার যে-ব্যক্তিগত সাহসিকতায় সমরেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার পরিণত ফসল গঙ্গায়। বিলাসের উপসংহার বিষয়ে আমাদের শিল্পগত আপত্তি সত্ত্বেও এ-কথা ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বীকার্য। হিমি বইখানির সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম অংশ। তার ভালবাসায় মধ্যবিত্ত নায়িকার ধাঁচ এসে পড়ায় বিলাসের সমুদ্র-যাত্রার ফলশ্রুতি সৃজিত হয়নি। অবশ্য বিলাস সমুদ্রে যেতে না-পারলে, অথচ সমুদ্রের আহ্বান অহরহ তার বুকে বাজতে থাকলে বইখানি জীবনের গভীর তাৎপর্যে আলোকিত হত—শুধু জেলেদের কাহিনীই হত না। ডিটেল সম্বন্ধে অতি-সতর্কতায় এ-গ্রন্থেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের পাঠকের সংবাদগত কৌতূহল-বৃত্তিকে তুষ্ট করার প্রবণতা প্রকাশিত। সমরেশবাবু বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বৈপরীত্যের এক আশ্চর্য সমাবেশ। হিমিকে দেখলে স্বতঃই মনে হবে সমরেশ বসুর নারীচরিত্র-গুলি একেবারেই কল্পনাসিদ্ধ নয়, একই নারীর বিভিন্ন ঘোরফেরকে তিনি বিভিন্ন নামে হাজির করেন, কিন্তু পাঁচুর কথা মনে পড়লেই, বিশেষ তার মৃত্যুর সিচুয়েশন—স্তম্ভিত হতে হবে লেখকের বাস্তব জ্ঞানে ও তার রূপায়ণের ক্ষমতায়।

গঙ্গা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আপত্তিগুলিকে ধামা চাপা না-দিয়েও, যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অভিজ্ঞতার অভিনব উপন্যাসগুলির বিপুল ব্যর্থতার দিকে তাকিয়ে এ-কথা বলতে হয় যে, গঙ্গার ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা এ-জাতীয় অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সিদ্ধির অনেক নিকটতর। ব্যক্তিরূপে বিলাস গঙ্গার ক্ষুরধার পটভূমিকায় আশ্চর্য বীর্যবানরূপে চিত্রিত হওয়ায়, মধ্যবিত্ত পঙ্গুতার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভালবাসাকে ন্যায়তই আকর্ষণ করে। জীবনের চলিষ্ণু

মূর্তি এবং শ্রমে-স্বেদে-শ্রান্তিতে অপরূপ, কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় দুর্মর মানুষ—সমরেশ বসু এই ব্যাপারটুকুকেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সম্বল করেছিলেন। এ-সম্বলের মহত্ত্ব কোথায় বিলাসকে দেখলে তা বোঝা যায়।

বি. টি. রোডের ধারে সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম পর্বের সূচনা। 'গঙ্গা' উপন্যাসে তা শেষ হল। ত্রিধারা কোনো অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে না। 'বিবর' থেকে সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। বিবর-এর সাফল্য-ব্যর্থতার প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়েও একটা কথা বলা চলে যে এই উপন্যাসে তিনি একটা প্রশ্নকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের প্রথাদাস জীবনে আর কিছু আশা করার নেই। কিন্তু জীবন সম্বন্ধীয় যে দ্বান্দ্বিক বোধ থাকলে এই মধ্যবিত্ত শূন্যতার ছবি আঁকা চলে, সমরেশ বসুর তা নেই। সেই অভাবকে তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন ভুয়ো নাটকীয়তা দিয়ে।

॥ ছয় ॥

আমরা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে এ-কথা বলেছিলাম যে সমকালের দ্বন্দ্বময় মূর্তিকে স্বীকার করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগে জর্জরিত বাংলা দেশের অবক্ষয়িত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকৃত হয়ে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদপসরণ করে বাংলা দেশের উপন্যাসের দুই মূর্তি গড়ে উঠেছিল। তার এক মূর্তিতে ছিল অতীতাশ্রয় বাসনা এবং অপরিজ্ঞাত-অঞ্চলমুখিনতা। কিন্তু এরই সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের সমকাল-মুখিনতার প্রবহমান স্রোতটুকুও কম মূল্যহীন নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সমকাল এবং কলকাতাকে অবলম্বন করে বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের নতুন জটিলতা এবং জিজ্ঞাসাকে যাঁরা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে তিরিশের ধারাবাহী এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত-বহ। যে-অবক্ষয়, স্থায়ী মূল্যবোধগুলির ভাঙন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বাসহীনতা বাঙালী মধ্যবিত্তকে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে জর্জরিত করে ফেলল, এমন কি তার আঘাতে বেদনাবোধ এবং মৃত্যুতে দুঃখবোধ, এ-সবও যখন হারিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি, তখন বাঙালী ঔপন্যাসিকদের এক সংখ্যালঘিষ্ঠ জীবননিষ্ঠ অংশের রচনায় এই অবক্ষয়িত চেহারার প্রতিফলন দেখা গেল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকের সমকালীন কলকাতাকে নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর এবং মানিকবাবুর কথা ছেড়ে দিলে পৃথক ভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচিত তিথিডোর উপন্যাসখানি যদিও আমাদের পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তথাপি কলকাতার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা সমস্তের আশ্চর্য পরিবার-কেন্দ্রিক চিত্র তিথিডোর। উপন্যাসটির প্রধান পাত্র-পাত্রীদের বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমগ্র রচনাটি যে ব্যক্তির পরম স্নেহের আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তিনি রাজেনবাবু, নায়িকার পিতা। নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার প্রতি বিভূতিভূষণের ন্যায় বুদ্ধদেববাবুরও পক্ষপাত ছিল। তার শিল্প-সার্থক মূর্তি গঠিত হয়েছে রাজেনবাবুর পরিবারকে ঘিরে। স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ছন্দোপতনের মতো হারীত এবং বিজন বুদ্ধদেববাবুর উপন্যাস-বিষয়ক চিন্তার দৌর্বল্যের নিদর্শন এ-কথা মেনে নিয়েও, এই উপন্যাসকে, যে স্নিগ্ধ দিনগুলি আর একটু পরেই বাংলা দেশ হারিয়ে ফেলল তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসাবে আমরা মনে রাখব। বিজন এবং বিজনের ব্যবসায়ের গুরুদেব মজুমদার তৎকালীন বাংলা দেশের আসন্ন পতনের পূর্বাভাস। বুদ্ধদেববাবু তাদের চিনতেন না, আমাদের চেনাতেও চাননি, সেটা এ-উপন্যাসের সামগ্রিকতার পক্ষে সুসঙ্গতই হয়েছে। আর একটি কারণে তিথিডোর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্য-প্রভাবী। উপন্যাসটির উপসংহারে স্রোতোময় চেতনার বাহন হিসাবে যে জয়েসীয় গদ্যরীতির সফল নিরীক্ষা, তা ষষ্ঠ দশকের বাংলা সাহিত্যের নবীন পরীক্ষাশীলদের কাছে পূর্বসূরী হিসাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু কাল যে প্রবল এবং কালবৈগুণ্য যে প্রবলতর তা বোঝা গেল বুদ্ধদেববাবুর 'নির্জন স্বাক্ষর' পাঠ করে। যে আত্যন্তিক বিনষ্টির চেতনা জীবনানন্দকে ক্রমশই করে তুলেছিল ধূসর, সেই হতাশ্বাস অবস্থাকে বুদ্ধদেববাবুর মতো নির্দ্বন্দ্ব স্নিগ্ধতার উপাসকও যে এড়াতে পারছিলেন না নির্জন স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট। নির্জন স্বাক্ষরের মতো ঘোরালো প্লট বুদ্ধদেব বসুর আর একখানি উপন্যাসেরও নেই। বোঝা যায় যে নবাগত জটিলতা তাঁকে স্পর্শ করেছে কিন্তু এও বোঝা যায় যে এ-জটিলতার আহ্বানকে গ্রহণ করার উপযুক্ত পাত্র তিনি নন। সে কথা নতুন করে প্রমাণিত হল সাম্প্রতিক তাঁর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' উপন্যাসে। তাঁর দুঃসাহসী হবার লোভ আছে—কিন্তু সাহিত্যেও দুঃসাহসী হতে গেলে প্রাণবন্ত হতে হয়।

সে প্রাণবত্তাকে প্রাণিত করে কোনো দার্শনিক বক্তব্য। তার অভাবে এজাতীয় লেখাকে অশ্লীল বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র পর্যন্ত। বিমল মিত্রের ছাই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন বিপর্যয়কে ধারণ করার প্রথম প্রয়াস এবং সবিশেষ আন্তরিক প্রয়াস সর্বদা স্মরণীয়। তাঁর বাস্তবকে জানার ব্যগ্রতা যে কত গভীর ছিল এ-বইখানি তার প্রমাণ। আবার জীবনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুর ব্যভিচার আমাদের কোন্ পঙ্গু অসহায়তায় মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন উপন্যাসখানি তার একটি স্মারক-স্তম্ভ। এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন বাংলা দেশের রূপক নির্মাণ করেছিলেন নির্মম দুঃসাহসিকতায়, এবং যে-নিরাসক্তি প্রায় নিষ্ঠুরতার সামিল তাকে তিনি প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এই উপন্যাসে, যে-অগ্নিকুণ্ডে আমাদের এতদিনের শুনে-রাখা সমস্ত সুন্দর সুকুমার কথাগুলো এবং স্মৃতিগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে। কোন্ কলকাতাকে দেখে, কোন্ জীবনের ছিন্নমস্তা মূর্তিকে দেখে, সহ্য করতে না পেরে স্থানগত এবং কালগত পশ্চাদ-পসরণ শুরু করেছিলেন তৎকালীন বাঙালী সাহিত্যিকেরা, তাকে জানতে গেলে পড়তে হয় বারো ঘর এক উঠোন। কত আমরা হারিয়েছি বিনা ক্রন্দনে তা যদি কোথাও বলা হয়ে থাকে তবে তা বলা হয়েছে এই একটি উপন্যাসে ও প্রবোধকুমার সান্যালের অঙ্গার নামক ছোট গল্পে। প্রবোধকুমার সান্যাল অঙ্গারে সংযম রাখতে পারেননি। ছোট গল্পের মিত পরিসরেও তিনি অসংযত হয়ে পড়েছিলেন গল্পের উপসংহারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সে-ক্ষেত্রে নিষ্করুণ ও নিষ্পলক দৃষ্টিতে অগ্নিদাহটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবং পরিশেষে ভস্মশেষটুকু নেড়ে-চেড়ে দেখিয়েছিলেন আর কোথাও এক কণা প্রাণাবশেষও বাকী রইল কিনা।

কিন্তু এই বিষয়-চেতনার মধ্যে একটা সংকট আছে। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের উক্ত অবক্ষয়ের চেহারাকে, তার স্বরূপকে ব্যাখ্যা করায় তদ্‌গত লেখক, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজ শিল্পজীবনের একটা চোরাবালি সৃষ্টি করে বসেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। মধ্যবিত্ত জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতাকে দেখতে দেখতে তাঁরা ভুলে যান, ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র-পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখামাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময়

স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণ করাও সাধ্যাতীত। তাই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বারো ঘর এক উঠোনের নিঃসংশয়িত লক্ষ্যভেদের পরে অকস্মাৎ দেখেন বিষয়বস্তু যেন নিঃশেষিত। নীল রাত্রি, মীরার দুপুর এবং বারো ঘর এক উঠোনের নামোল্লেখে কালানুক্রমিকতা রক্ষার এই জন্য কোনো প্রয়োজন নেই যে এরা বিষয়-নির্বাচন, কাহিনী নির্মাণ ও বক্তব্য—কোনো বিবর্তনের সাক্ষ্যই বহন করে না। সমগ্রে পৌছলে সুখও নেই, দুঃখও নেই। তেমনি কালো অথবা সাদা তার কোনো রঙও নেই। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু যেন সমকালীন জীবনকে নিষ্ঠুরের কালো রঙে ছুপিয়ে দেখাতে চান। তাঁর দৃষ্টি এর ফলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মানিকবাবুর মন্ত্র-শিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। মানিকবাবুর বিবর্তন তাঁর স্বধর্ম অনুযায়ী হয়নি। কিন্তু বিবর্তনকে রোধ করেও মানিকবাবু উদ্ধার পেতেন না। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শিল্পধর্ম নিশ্চয় জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকেই উৎসারিত হবে। সে-কারণে জীবনের দিকেই তাঁকে তাকাতে হবে বারেবারে। দুঃখের বিষয় এই তাকানোর ব্যাপারটাতে তাঁর ব্যত্যয় আছে। আছে বলেই তাঁর বিবর্তন বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুতে পারল না। এই ব্যাপার নিজেই যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে বারো ঘর এক উঠোনের পর আর তাঁর বক্তব্যগত কোনো গতি নেই তখনই এক বিবিক্ততার সাধনা তাঁকে পেয়ে বসেছে। এ-বিবিক্ততা জীবনোপলব্ধির কোনো অনিবার্য আকর্ষণে উদ্ভূত নয়। বক্তব্যের শূন্যতাকে আচ্ছন্ন করার জন্যই এর জন্ম। বিবিক্ততার সঙ্গে অন্বিত দর্শন এক হিসাবে সঙ্কটের দর্শন। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কীর্তি চূড়ায় পৌছে যেদিন ব্যক্তি বুঝেছে যে তার প্রভুত্ব দাসত্বেরই নামান্তর, বুঝেছে যে শব্দ সমষ্টি, যন্ত্রাংশ অথবা বৃহৎ যন্ত্র সকলেই মানুষের প্রভুত্ব নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে চায়, সেদিন থেকেই বিবিক্ততার সমস্যা মানুষের কাছে প্রধান বলে অনুভূত হয়েছে। এই সমস্যাকেই অঙ্গীকার করে একদা ফয়েরবাখ ও মার্কসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই শতকের নানামুখী প্রতিক্রিয়ায় দেখা গেল সার্ত্রে বিবিক্ততার মূল নির্ণয় করে ভিন্নভাবে ব্যক্তির দায়িত্বকে নতুন সংজ্ঞায় বেঁধেছেন। ব্যক্তির সে দায়িত্বকে এঁরা কেউ স্বীকার করলেন না। এই ত্রুটি নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষের শক্তিশালী দুটি উপন্যাস-কীর্তিরও কোনো পরবর্তী বিবর্তন ঘটতে দেয়নি। চেনামহল ও মোমের পুতুল-এ মরণদশাগ্রস্ত কলকাতাই মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্দৃষ্টি-দীপ্ত আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই জীবনের সকল বিড়ম্বনা এবং মূল্যবোধের

বিনষ্টিকে লেখকেরা দৃঢ় হাতে ধারণ করেছেন এবং নিরাসক্ত মন নিয়ে ধৃত বিষয়কে বিন্যস্ত করেছেন উপন্যাসে। সন্তোষকুমার যদিও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ন্যায় মনোজ্ঞ নন, তথাপি উঁচুতলার জীবনের ফাঁকিবাজি, জালিয়াতি এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মোমের পুতুলের রসরূপ নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। চেনামহলে যদিও মানুষের ঐকান্তিক সংপ্রচেষ্টা যে কিছুতেই পরাভূত নয় তার ইঙ্গিত এখানে-ওখানে ছড়ানো রয়েছে, এবং যদিও সন্তোষকুমারের মোমের পুতুলে সেই ইঙ্গিত একেবারেই অনুপস্থিত তথাপি সন্তোষকুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র অপেক্ষা অবক্ষয়ের চরিত্র-চিত্রণে অনেক বেশি গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিনু গোয়ালার গলিতে সন্তোষকুমারের পদচিহ্ন ছিল শিথিল। মোমের পুতুল কিনু গোয়ালার গলি অপেক্ষা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ নয়, শুধু এখানে তিনি শক্ত করে মাটিতে পা বসাতে পেরেছেন এইমাত্র। কিন্তু এই অবক্ষয়ের কর্দমেই পদক্ষেপকারী লেখকও ডুবে গেলেন অতি সত্বর। নরেন্দ্রনাথ বর্তমানে আন্তরিকভাবে ঔপন্যাসিক প্রয়াস পরিহার করেছেনই বলা চলে। সন্তোষকুমার সে-ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক-রীতির দ্বারস্থ হয়েছেন বক্তব্যহীন অনাথের মতো। 'মুখের রেখায়' তাঁর ব্যর্থতা বক্তব্যের ব্যর্থতার জন্যই পরিহার করা যায়নি।

সম্ভবত প্রাচীন নায়ক পরিকল্পনা মহাযুদ্ধোত্তর নানা সংঘাতে ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত জীবনে কার্যকর ছিল না। সেই কারণে যাঁরা ক্ষয়ের বিপুল সর্বনাশা তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের মুক্তিও এঁকেছেন তাঁরাও পুরাতন ঔপন্যাসিক সংস্থান-রীতিকে পরিহার করে নতুন রীতির অভিমুখী হতে চলেছেন। ননী ভৌমিকের ধূলামাটি এবং বিমল করের দেওয়াল দুইখণ্ড এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ননী ভৌমিকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু একটি সংগ্রামী মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর চেতনার ক্রমবিকাশ। এখানে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার কথা ওঠেই না— তিনিও সে প্রয়াস করেননি। বিমল করের দেওয়ালের নায়িকা সুধা কার্যকারণ পরম্পরাতেই এমন স্তিমিত এবং নায়ক সুচারু এমন ভূমিকাবিহীন, বিপরীত উদাহরণ হিসাবে সমরেশ বসুর ত্রিধারা উপন্যাসে "কর্মবীর" নায়ক রাজেনের আতিশয্য এমন হাস্যকর যে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয় যে, সচেতন লেখকদের কাছে এই সময়ে প্রাচীন নায়ক-পরিকল্পনার ঐতিহ্য একটা দারুণ আঘাত পেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে সভ্যতার অসুস্থতা ও অসহায়তা উপন্যাসে ব্যক্তিপাত্রের চেতনামুকুরে নানা প্রতিবিম্ব ফেলেছে। ব্যক্তির শারীরিক মানসিক নৈতিক আর্ততা য়ুরোপীয় উপন্যাসে ধীরে ধীরে তীব্রতাও পেয়েছে। এতদিনে বাংলা উপন্যাসেও তা মূর্ত হল। এই বিবিক্ততা বোধ বা অনন্বয়ের মৌল প্রেরণা এখানেও চঞ্চল হয়ে উঠল। আর একবার মানুষ, রাষ্ট্র বা যন্ত্রযুগ প্রদত্ত সমুদয় সমষ্টি-অভিজ্ঞান পরিহার করে নিজ একক ব্যক্তি অভিজ্ঞানকে ফিরে পেতে চাইছে। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে চার্চ বা গোষ্ঠীর আধিপত্যকে ভাঙতে গিয়ে মানুষ যেমন নিজের বীর্যবান ব্যক্তিসত্তাকে উপলব্ধি করেছে—আজকের মানুষের নিজেকে আবিষ্কার সে তুলনায় অনেক ম্লান। অনেক প্রাপ্ত, জিত এবং লব্ধ-বস্তুর শূন্যতা আবিষ্কার করে করে মানুষ আজ ক্লান্ত। এ শতকে বর্তমান শতাব্দীর পাঁচের ও ছয়ের দশকে অনন্বয় তথা বিবিক্ততা বোধের কারণে অনায়ক নায়ক কল্পনা আরো বেশী প্রাধান্য পেল। নায়কের বাস্তব-জিজ্ঞাসা বর্তমানে তার আত্ম-জিজ্ঞাসারই নামান্তর। একালের নায়ক নিজের বিপন্ন ব্যক্তিসত্তার বিষণ্ণ ধূসরতার দর্পণেই বিশ্বাবলোকন করে। তার নানা কিম্ভূতকিমাকার আচরণের মানেও সে এই পথেই খোঁজে। সমরেশ বসুর 'বিবর' অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' সমগ্র মানব সমাজ নয়—ব্যক্তির নিমজ্জমান বিপন্ন অসহায়তার প্রতিচিত্র। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'পারাপার'। 'পারাপার' এবং ঐ লেখকেরই ছোট গল্প 'নীলুর দুঃখ' আমাদের জর্জরিত প্রহারিত বর্তমানের যথাসম্ভব বিশ্বস্ত দর্পণ। বিবর উপন্যাসে অদ্ভুত, অভবিষ্য যুবকের রূপকে মানহারা পৃথিবীর ছবি সমরেশ বসু ধরতে গিয়েছেন। যৌনতা সংক্রান্ত যে প্রশ্ন বইটি সম্বন্ধে তোলা হচ্ছে আমার মতে তা অবান্তর

॥ সাত ॥

অবশ্য এমন কথা কখনই সত্য নয় যে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবন অবলম্বন করে আদি-অন্ত সমন্বিত উপন্যাস অথবা বাংলা দেশের বিভিন্ন দিকে ছড়ানো বাঙালী জীবন-ভিত্তিক উপন্যাসের সমৃদ্ধ প্রয়াস একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। অসীম রায়ের একালের কথা ও গোপালদেবের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ

করা হয়েছে। বুদ্ধিপ্রধান বাংলা উপন্যাসের ক্ষীণ কিন্তু তীব্র ধারায় তিনি যে শক্তিশালী সংযোজন সে-কথাও বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলে অথবা গ্রামে, কলকাতার বাইরে, জীবন যেখানে শত তরঙ্গভঙ্গে, নানা টানে এবং ধাক্কায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, স্বদেশের সেই সমগ্র পরিচয় স্বভাবতই ঔপন্যাসিকদের কাউকে কাউকে আকর্ষণ করেছে। জাতীয় বেদনা এবং আশা-বাসনার সংঘাতময় মূর্তিকে তাঁরা জীবনের মৃত্তিকায় ও অশ্রু-স্বেদের রঙে রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অসীম রায়, গুণময় মান্না ও অমিয়ভূষণ মজুমদার সেই সব বিরল ঔপন্যাসিকদের তুজন। ঔপন্যাসিকের স্বভাব তাঁদের সহজাত। লখিন্দর দিগারে এবং জুনাপুর স্টীলে গুণময়বাবু বাংলা দেশের তুই ধারা সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তাতে এ-কথা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হবে না যে, এ-দেশের বৃহৎ অসংগঠিত জনগোষ্ঠী নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস রচনার যোগ্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গুণময়বাবুর আছে। তিনি যতটা ব্যাপকতা ও বিশালতাকে বোঝেন ততটা যদি বিশেষের বিশেষ স্বরকে সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে বুঝতে শেখেন তাহলে তাঁর সিদ্ধির গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে দৃষ্টিসাম্যে আমাদের এ-ঔপন্যাসিকেরা এখনও অভ্যস্ত হননি বলেই তজ্জনিত অসঙ্গতি থেকে তাঁরা এখনও আত্মরক্ষা করতে পারেন না। বিরাটের দিকে দৃষ্টি যেমন গুণময়বাবুকে বিশেষের বিষয়ে মাঝে মাঝে অনবহিত করে তোলে, তেমনি গৌরকিশোর ঘোষের প্রথম দিকের উপন্যাস, জল পড়ে পাতা নড়ে-তে বিশেষের দিকে অতি-মনোযোগ তাঁকে বিশাল উপন্যাসের পটাকাশের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। গৌরকিশোরবাবুর বর্তমানের লেখায় সমালোচকের আগ্রহ নেই। সংবাদ গরম গরম হলে সংবাদপত্র চলে। সাহিত্য চলে না। ভুল সংবাদ হলে সংবাদপত্রে ভ্রম সংশোধন হলেই দায় মেটে—সাহিত্যে ?

অন্যদিকে সরল কিন্তু অনাড়ম্বর শক্তিতে উপন্যাসের আকাশ মৃত্তিকায়, প্রান্তরে-প্রাঙ্গণে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করতে পেরেছিলনে অমিয়ভূষণ। তিনিই বর্তমান কালের একমাত্র তরুণ ঔপন্যাসিক যিনি গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে তার তাৎপর্য সমেত বোঝেন। তার নানা স্তরের ভাঙা-গড়ার সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েনকে যুক্ত করতে পারেন। অথচ গোঁজামিলের সাহায্যে যে কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায় না এ-সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান স্পষ্ট। তাঁর গড় শ্রীখণ্ড এবং তুখিয়ার কুঠি, এই তুইখানি উপন্যাসের প্রয়াসগত তারতম্যের

মধ্যেও এই সত্যের কোনো হেরফের নেই। গড় শ্রীখণ্ড বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যের বহু বিতর্ক-জটিল ও কুতর্ক-কুটিল আকাশে একমাত্র নিঃসংশয় শিল্পসৃষ্টি যা কালোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা রাখে। গড় শ্রীখণ্ডে একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি চূড়ান্ত বেদনাময় মুহূর্তে একটা গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। জীবনের সেই বেদনাকে এই উপন্যাসের সর্বত্র প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালাগত সম্পর্ক—লেখক যেন অপূর্ব নিরভিমান মন নিয়ে সেগুলিকে দেখেছেন, তাঁর নিরাসক্তির রাজসিংহাসন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি, বেদনায় যখন হৃৎপিণ্ড উন্মূল হয়ে যাবার কথা, তখনও। উত্তর বঙ্গের জীবন, কোনো প্রকার আঞ্চলিকতার প্রয়াস ব্যতিরেকেই ধৃত হয়েছে পরম নিশ্চিতিতে ও বিশ্বাসে। সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ উঁচুতলার—সান্যাল মশাইদের মতো মানুষগুলি সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের জানা-শোনা-দেখা যদি সম্পূর্ণতা পায়, তিনি যদি প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে না পড়েন এবং সংহতির দিকে আর একটু অভিনিবিষ্ট হন, তাহলে বাংলা উপন্যাসের একদিকের দৈন্য তিনি ঘোচাবেন—গড় শ্রীখণ্ডে সে ইঙ্গিত ক্ষীণ নয়। বাজার-চালু বহু-সংস্করণধন্য অনেক ঔপন্যাসিকই অমিয়ভূষণের কাছে ঔপন্যাসিকের শ্রম, নিষ্ঠা, বিস্তৃতি ও অভিজ্ঞা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

গড় শ্রীখণ্ডের পর দুখিয়ার কুঠির পরিমিত পরিসরে অমিয়ভূষণ ভিন্ন ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ক্রম-অগ্রসরমান একটি রাজপথের ধাক্কায় একটি গ্রাম ও একটি মেয়ের প্রতিক্রিয়াকে প্রায় প্রতীকে-রূপকে সাজিয়ে ফেলেছেন লেখক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও ব্যবহারে শেষ ত্রুটি এসেছে জন্ম-বৃত্তান্তের পুরাতন কৌশলের অবতারণায়। তথাপি উপন্যাসটির প্রথমাংশের ছন্দোগুণ সার্থক শিল্পীর স্বাক্ষরধন্য।

বিমলকরের নিরীক্ষা অনেকদিন হল অকালে শেষ হয়েছে। এখন তিনি একটি রমণীয় পথের পথিক। সে পথে শ্রম অল্প—পুরস্কার প্রচুর। অমিয়ভূষণ লিখেছেন 'মধু সাধু খাঁ'। গুণময় মান্নার শেষতম উপন্যাস 'অসামাজিক'। তার ধারণার বহির্গত বিষয়।

অসীম রায়ের শেষ দুই উপন্যাস 'দেশদ্রোহী' ও 'শব্দের খাঁচায়' দুইখানি

অসামান্য রচনা। বিশেষ করে 'দেশদ্রোহীর' নায়ক ভবানীপ্রসাদের চেতনার মুকুরে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালীর জীবনের গভীরগত যন্ত্রণার এবং অষ্টাঙ্গিক জটিলতা। 'শঙ্খের খাঁচায়' মধ্যবিত্ত বাঙালীর আত্ম-বঞ্চনার ছলনার ভ্রান্তির এবং অন্বেষার সার্বিক ছবিটি পটের স্বল্পতার জন্য ফুটেও ফোটেনি। 'দেশ-দ্রোহীর' নায়ক আমৃত্যু যেভাবে তাঁর Unauthentic existence থেকে সত্তার authentic existence-এর সন্ধানী হয়েছে তা এক শৈল্পিক ও মানবিক ইতিবোধে সম্পন্ন। বিস্তৃততর পট এবং পুরুষার্থ প্রেরণায় মথিত নায়ক অবলম্বনে সার্থকতর উপন্যাস অসীম রায় লিখবেন এ প্রত্যাশা অমূলক নয়। তরুণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, মতি নন্দী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক রয়েছেন। (আশা করবো তরুণ ঔপন্যাসিকেরা অতীতের ঔপন্যাসিকদের মতোই সমাজ ও ব্যক্তির জটিল গ্রন্থির পাঠোদ্ধার করবেন। বর্তমানে আমাদের চারপাশে বহু শব, নানা ভগ্ন মূর্তির ছড়াছড়ি। এই জটিলতর বর্তমানে ঔপন্যাসিকেরা নিশ্চয় মনে রেখেছেন যে তাঁদের দায়িত্বও গভীরতর।)

নির্ঘণ্ট

'অঙ্গার' ৩৬০
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৮, ৩২০, ৩৪৩
'অডিসি' ১৭, ৩৩২
অডেন ৩২৫
'অতিথি' ১৬৫
অদ্বৈত মল্লবর্মণ ৩৪১, ৩৫৫, ৩৫৬
'অন্তঃশীলা' ২৮১, ৩৩১—৩৩৭
অন্নদাশঙ্কর রায় ১৫৮, ২৭৯, ৩১৯-৩৩২, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯
অবধূত ৩৫২
'অভয়ের বিয়ে' ২২৫
'অভাগীর স্বর্গ' ২৪৮, ২৪৯
অমিয় চক্রবর্তী ৩৪৪
অমিয়ভূষণ ৬৭, ৩৪৬, ৩৬৪, ৩৬৫
'অযান্ত্রিক' ৩১১
'অরক্ষণীয়া' ২৪২
'অরণ্যবহ্নি' ২৯৭
'অসাধু সিদ্ধার্থ' ২৬৬, ২৬৮
'অসামাজিক' ৩৬৫
অসীম রায় ৬৭, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬৩, ৩৬৬
'অহিংসা' ৩১০

'আকাশ পাতাল' ৩৪৫
'আত্মপ্রকাশ' ৩৬৩
'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৯২
'আনন্দমঠ' ৯৯, ১৪৯
'আনা কারেনিনা' ৩০, ৩২-৩৬, ১৪২, ২৩০
আয়েন ওয়াট্ ৯৩
'আরণ্যক' ২৯৯-৩০৮, ৩৩১
'আরোগ্য' ৩১০, ৩১৫
'আরোগ্য নিকেতন' ২৯৩, ২৯৫
আর্নলড ৯৬
আর্নলড কেট্‌ল ৯, ১৭
'আলালের ঘরের দুলাল' ৫৯, ৭২, ৮১-৯৫, ১০৭, ২২৪
'আবর্ত' ৩৩২, ৩৩৪
আশাপূর্ণা দেবী ৩৪৯, ৩৫৪

অ্যাডাম ৭৯
'অ্যাজ ইন্‌ভেনটিভ্ এজ' ৭৩
অ্যাবট ১৪৬

'ইছামতী' ৩০৫, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৪
'ইন্দিরা' ৫৮, ১০৮, ১০৯, ১১৪, ১২৮
ইয়ুং ১৪
'ইলিয়াড্' ১৭
ইসাবেল ১৩

ঈশ্বর গুপ্ত ১১০

'উইলিয়ম কস্‌মো মঙ্ক হাউস' ৭৪
'উত্তরঙ্গ' ৩৪৫
'উত্তরায়ণ' ২৮৪, ২৮৭, ২৯১, ২৯৩
'উনপঞ্চাশী' ৩৪১
'উপনায়ন' ২৬৪, ২৬৫, ২৭৮, ৩২১
'উপনিবেশ' ৩৩৮
'উপন্যাসে মৃত্যু' ১৪০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২২৫
উপেন্দ্রনাথ দাস ১৮৫, ১৮৬
'উল্টোরথ' ২৯৭

'একদা' ২৮১
'একালের কথা' ৬৭, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৯ ৩৬৩
'এখনকার' ৩৩৭
এঙ্গেল্‌স্‌ ২৭৭
'এমা' ৪৩
এরেণবুর্গ ৩০৯
এলিয়ট ১৩, ১০৬, ৩২৫

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ১৪৪

'ওড্‌ টু এ নাইটিঙ্গেল' ৩০
'ওয়ার অ্যাণ্ড্‌ পীস্‌' ৩, ২৫, ৩০, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১৪৪, ১৪৫, ২০০ ৩৩২
ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ ১১, ৭৩, ৭৪, ১০৯, ১১০, ১২৯

'কথোপকথন' ৮৩
'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ৩৫২
কন্‌রাড্‌ ১২, ১৪, ৪১, ১৯৫
'কপালকুণ্ডলা' ১০৮, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২১-১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৫১, ১৬৫, ২২৪
'কবি' ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫
কমলকুমার মজুমদার ৬৭
কর্ণওয়ালিশ ২৪৪
'কলকাতার কাছেই' ৩৫৪
কার্লাইল ১৯৪
'কালিন্দী' ২৮৩, ২৮৪, ২৯০
'কিছুক্ষণ' ২৮১
'কিনু গোয়ালার গলি' ৩৪৩, ৩৬২
কীটস্‌ ৮৮, ১১০, ২২৩
কুমুদরঞ্জন ২৯৮
'কৃষ্ণকান্তের উইল' ৩০, ৩৮, ৩৯, ৪১, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৩৫-১৪৩, ১৬৭, ১৭৯, ২৩০
কেরী ৮৩
'কেরী সাহেবের মুন্সী' ৩৫৩
'কোপবতী' ৩৩৮
কোম্‌তে ১১৮
কোলরিজ ৩০৫
'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' ১৭, ৩২, ৩৭, ৩৮
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ২৪৫
'ক্ষুধিত পাষাণ' ১৬৫

'গঙ্গা' ৩৪৫, ৩৫৮, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮

গজেন্দ্র মিত্র ৩৫৪
'গড় শ্রীখণ্ড' ৬৭, ৩৬৪, ৩৬৫
'গণদেবতা' ২৮৩, ২৪৮ ২৯৪, ৩১৩
'গতিহারা জাহ্নবী' ২৬৯
'গল্পগুচ্ছ' ১৮৩, ২৪২, ২৯৮
গল্‌সওয়ার্দি ২২১
গিয়োভান্নি বোকাচিও ১
'গৃহদাহ' ২২৯, ২৩৭-২৪১
'গেন্‌জির কাহিনী' ১
গোকুল নাগ ২৬৪, ২৭৮, ৩২১
গোতিয়ের ১৫৩
'গোত্রান্তর' ৩১১
'গোপাল দেব' ৩৩৭ ৩৪৯, ৩৬৩
গোপাল হালদার ২৭৯, ২৮১, ৩৩৫, ৩৪১, ৩৫১
'গোরা' ৩১, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৯১, ৯২, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৬-২০২, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১৮,-২২৫, ২৪২, ২৪৪, ৩২১, ৩৩২
গৌরকিশোর ঘোষ ৩৬৪
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৩৪১

'ঘরে বাইরে' ১৫৭, ১৬৩, ২১০, ২২৯

'চতুরঙ্গ' ৬৫, ১১২, ১৫৫, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৮০, ২২১-২২৮, ৩২১, ৩৩৫
'চতুষ্কোণ' ৩১০, ৩১১, ৩১৫
'চন্দ্রশেখর' ১৪৬, ১৪৯, ২৩০
'চার অধ্যায়' ১৯০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫, ২২৬
চার্লস মেটকাফ্‌ ২৪৩
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫
'চিত্রা' ২৯৯
'চিহ্ন' ৩১০, ৩১১, ৩১৬, ৩৪১, ৩৪২
চেখভ ১৯০
'চেনা মহল' ৩৪৬, ৩৬১, ৩৬২
চেষ্টারটন ২৬০
চৈতন্য মহাপ্রভু ৬৮
'চোখের বালি' ১৪২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৮০, ২২৩, ২৩০, ২৩৩

'ছাই' ৩৬০
'ছিন্নপত্র' ১৮২

জয়েস্‌ ১৪, ১৫, ৩২, ১৫৩, ২৮১, ৩৩৫, ৩৫৪, ৩৫৯
জর্জ ইলিয়ট ১১, ১২, ১৪
'জল পড়ে পাতা নড়ে' ৩৬৪
'জঁা ক্রিস্তফ' ৩০
'জাগরী' ৩৪১
জীন্‌স্‌ ২৯৯
'জীবন স্মৃতি' ১৮৯, ১৯৫
জীবনানন্দ ৬৭, ২৯৮, ৩৫৯
'জুনাপুর স্টীল' ৩৬৪

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ২২৫, ২২৬, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭৫
প্রমথ চৌধুরী ৩১৯
প্রমথনাথ বিশী ৩৩৮, ৩৪১, ৩৫৩
প্রাণতোষ ঘটক ৩৪১
'প্রায়শ্চিত্ত' ১৬৬
প্রুস্ত ২১৮, ২৮১, ৩৩২, ৩৩৫
'প্রেম প্রবাহিণী' ৭১
প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৬৫, ২৭৮, ৩২০, ৩২১
ফয়ের বাখ ৩৬১
'ফরসাইট সাগা' ২২১
ফর্সটার ১২, ১৭, ৩০
'ফসিল' ৩১১
'ফানুসের উপমা' ৩৫০
ফিল্ডিং ৭, ৯, ১৬, ২৩, ৫৫
'ফুলমণি ও করুণা' ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬
ফ্রয়েড্ ১৪, ২৭৭, ২৯৮, ৩১০
ফ্রান্সিস পালগ্রেভ্ ১৪৪
ফ্লবেয়ার ১৩, ১৪, ১৭, ৩৩, ৩৬, ৫০, ৫৪
বঙ্কিমচন্দ্র ৩৯, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬২, ৭০, ৭৭, ৮৯, ৯৪—১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬৭, ১৬৮, ১৮৭, ১৯৭, ২০৬, ২৩০, ২৩২, ২৬৩, ২৬৭, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১, ৩৪৪
'বঙ্গ দেশের কৃষক' ৯৪, ৯৭, ৯৮
বনফুল ২৮০, ২৮১, ৩৩৮
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬৬
বসওয়েল ৭, ১০
'বহু বিবাহ নিরোধ বিষয়ক প্রস্তাব' ৯৯
'বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ' ১০১
বাজারভ ৪০
বাডেন ব্রুক্স্ ২২১
বাণভট্ট ১
বায়রণ ১১০, ১৮৮
বার্ক ১৮৮
'বারো ঘর এক উঠোন' ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৬০, ৩৬১
বালিকা বধূ ৩৫০
'বি. টি. রোডের ধারে' ৩৪৫, ৩৫৮
বিদ্যাসাগর ৭০, ৭৯, ৮১, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০৪, ১৩৩, ১৯৪, ১৯৫, ২০৭
'বিপাশা' ২৯৭
'বিপিনের সংসার' ৩০০
'বিবর' ৩১৮, ৩৬৩
বিবেকানন্দ ৩৪৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৯, ২৮০, ২৯৮—৩০৮, ৩১৭, ৩১৮, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৯
বিমল কর ৩৪১, ৩৫০, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৫
বিমল মিত্র ৬৩, ৩৪১, ৩৬০
'বিশ্বভারতী' ১৯৪
'বিষবৃক্ষ' ৩০, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১২৬-১৩৭, ২৬৩, ২৬৪
বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ১৮৫
বিষ্ণু দে ১৫৮, ৩৩২, ৩৫১

বিহারীলাল ৭১, ৭২, ৭৪
বুদ্ধদেব ৬৮
বুদ্ধদেব বসু ৫৪, ৬৩, ১৫২, ১৬১, ১৬২ ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ২৬৫, ৩৪৯, ৩৫৯
'বেদে' ২৬৪, ২৭৭, ২৭৮, ৩৪৩
বেন্থাম ৮৮, ১০০ ১০১, ১০৪, ১০৮, ১০৯
'বৌঠাকুরাণীর হাট' ১৫৩, ১৬৭
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৫৩, ১৬৭
ব্রাউনিং ১৬৫
'ব্রাহ্মণ' ১৮৮
'ভগবতী' ২০৭
ভারতচন্দ্র ৩৩৯
'ভারতবর্ষ' ১০৮
'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' ৯৭, ৯৯
'ভারতী' ৭৯, ২২৬, ২২৭, ২২৮
ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ৮
'মণিহারা' ১৬৬
মণীন্দ্রলাল বসু ২২৫, ২২৬
মতি নন্দী ৩৬৬
মধু সাধু খাঁ ৬৭, ৩৬৫
মধুসূদন ৭০
মধ্যবর্তিনী ২৬৩, ২৬৪
মনোজ বসু ৩৪১
'মন্বন্তর' ২৯৩, ২৯৬, ৩১০, ৩৪২
মম ৩৪৬
মল ফ্লাণ্ডার্স ৯৩
'মহাভারত' ১৭, ৭২, ২৬০, ২৮৬
'মহেশ' ২৪৮
'মাদাম বোভারি' ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ২৩০, ২৩১
মাদমোয়েজ্জল দ্য মোপাঁ্যা ১৫৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭, ৬৬, ৬৭, ২৭৯, ২৯২, ৩০৯-৩১৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫১, ৩৫৯, ৩৬১
মানে ৪৭
মার্কস ২৭৭, ২৯৮, ৩১০, ৩৬১
'মাসিক পত্রিকা' ২২৪
'মিছিল' ২৬৪, ২৭৮
মিস্ মেয়ো ৮২
'মীরার দুপুর' ৩৪৪, ৩৬১
মুকুন্দরাম ১৩
'মুখের রেখা' ৩৬২
মুরাসিকি ১
মূর ১১০
'মৃগয়া' ২৮১, ৩৩৮
'মৃণালিনী' ১০৮, ১১৭, ১২০, ১২৮, ১৩০, ১৩১
'মৃণ্ময়ী' ২২৪
মেকলে ১৮৮
'মেঘ ও রৌদ্র' ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ২৪৩
'মেজদিদি' ৩২১
মেরিডিথ ৬৩
মোপার্সাঁ ২, ৩৬
'মোমের পুতুল' ৩৪৬, ৩৬১, ৩৬২
'মোহানা' ৩৩২, ৩৩৪

মোহিতলাল ১১১
'ম্যাজিক মাউন্টেন' ৪৪, ৪৫, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪
ম্যালেন্স ৮৪, ৮৫, ৮৬
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৭৩, ২৭৪
যুবনাশ্ব ২৭৮
'যোগাযোগ' ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪২, ১৫৫, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৮০, ২১৮-২২২, ২৬৯
রঙ্গলাল ১১০
'রজনী' ১০৮, ১০৯, ১১৪, ১২০, ১২৮, ১৩৮, ১৪৯
'রত্নদীপ' ২২৫, ২২৬, ২৬৬, ২৬৭
'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' ২৪, ৪০, ৫১, ৫২, ৫৩
রবীন্দ্রনাথ ৪১, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫১, ১৫২-২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৩২, ২৩৫, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৯, ২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩১৯, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪৪
'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' ১৬১
'রমলা' ২২৯
রমাপদ চৌধুরী ৩৪১, ৩৫৪
'রমাসুন্দরী' ২২৫
রমেশচন্দ্র ৫৬, ৭১, ৭২, ৭৪, ০৯, ২৪২, ২৪৪
'রাইকমল' ২৮৩
'রাজপথ' ২২৫
'রাজর্ষি' ১৬৭
'রাজসিংহ' ৩০, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১৩০, ১৪৩-১৪৯
'রাত ভ'রে বৃষ্টি' ৩৫৯
'রাত্রি' ২৮০
'রাধা' ২৮৪, ২৯৩, ৩৪৫, ৩৫২, ৩৫৩
রামকৃষ্ণ ৩৪৩
রামতনু লাহিড়ী ৯০
রামমোহন ৭০, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮১, ৯৬, ১৯৫
রামরাম বসু ৮৩
'রামানন্দের পাঁচালী' ৬৯
'রামায়ণ' ১৭, ২৬০, ২৮৩
রাস্কলনিকফ্ ৩৬, ৩৭
রাস্কিন ১০৯
রিচার্ডসন ৭, ১০৭
রুশো ১২৩
'রেজারেকশন' ১৭, ৩২, ৬৭, ২৯১
লক্ ৭, ১০১
'লখিন্দর দিগর' ৩৪২, ৩৪৯, ৩৬৪
'লঘু গুরু' ২৭৪, ২৭৫
লরেন্স ১৪, ১৫, ২৯
'লামা' ৩৪৩
'লালকেল্লা' ৩৫৩
'লালবাঈ' ৩৫৪
'লিপিকা' ১৬৫
লেস্‌লি স্টিফেন ৯
'লোক রহস্য' ৬৯

'শঙ্খবিষ' ৩৪৩
'শব্দের খাঁচায়' ৬৭, ৩৬৫, ৩৩৬
শরৎচন্দ্র ৬১, ৬২, ৭১, ১৬৪, ২২৩-২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ৩২০, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৪৯
'শরৎ সরোজিনী' ১৮৫
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২০০
'শহরতলী' ৩১০, ৩১১, ৩১৫, ৩১৬
শার্লট ব্রান্টী ৬৩
শিবনাথ শাস্ত্রী ৯০
শিবরাম চক্রবর্তী ৩৫০
'শিলালিপি' ৩৪২
শ্রীকান্ত ২৪৯-২৬০
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডক্টর) ১২০, ১২২, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ২১১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৯, ৩২৯
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৪৬, ৩৬৩
শেক্‌স্‌পীয়ের ১২, ১৩, ১১৩, ১১৪, ১২৭, ১৬৪, ১৮৮, ২২৩, ২৬০
শেলী ১১, ৮৯, ১১০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪৮
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৩
সতীনাথ ভাদুড়ি ৩৪১, ৩৫৫, ৩৫৬
'সত্যাসত্য' ৩১৯-৩৩২
সন্তোষকুমার ঘোষ ৩৪১, ৩৪৩, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২
'সপ্তপদী' ২৮৭, ২৯০, ২৯৩
'সপ্তর্ষি' ২৮০
সমরেশ বসু ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৩
'সমাচার চন্দ্রিকা' ৭৮
'সমাচার দর্পণ' ৭৫, ৭৬
'সমাজ' ৫৮, ২৪২
'সরীসৃপ' ৩১০, ৩১১
সংসার' ৫৮, ২৪২
'সাড়া' ২৭৮
সার্ত্রে ৩১০
'সাহেব বিবি গোলাম' ৩৭, ৪১, ৪২, ৩৫৪, ৩৫২, ৩৫৩
'সীতারাম' ১০৭, ১০৮, ১১৯, ১৩০, ১৪৯
সুকুমার সেন (ডঃ) ৯৩,১৮৫
'সুখ' ৩৩১
সুধাংশু ঘোষ ৩৫০
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬, ২২৯, ৩৩৩
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডঃ) ৮২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪৬, ৩৫০, ৩৬৩
সুবোধ ঘোষ ৩১১, ৩৪০
সুবোধ সেনগুপ্ত (ডঃ) ১১২, ১২৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৭
'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ১৮৫
'সে ও আমি' ২৮০
সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ ৩৬৬
'সোনার তরী' ২৯৯
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২২৫
স্কট ১০, ৫৪, ১১০, ১৪৪
স্তাদাল ১২, ১৩, ১৮

'স্বদেশী সমাজ' ২৪৬
'স্বয়ংসিদ্ধা' ৩৩৮
'স্বর্ণলতা' ৫৬, ৭২, ৮৯, ৯৫, ১৫১, ২৪২
স্মলেট ৭, ৯
স্যামুয়েল রিচার্ডসন ৮
হগার্থ ৯
হউয়ার্ড ফাস্ট ৩০৯
'হাটে বাজারে' ২৮০
হার্ডি ১২, ১৫, ১৬, ৫১, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০
'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ২৮৪, ২৮৫, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ৩৪৫
হিউম ৭
'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ৮৭
হেনরী জেম্‌স্‌ ৪, ১২, ১৩, ১৪, ২০, ২৩, ২০৯
হেমচন্দ্র ৭১, ৭২
হেয়ার ৮৩
হোমার ৩৩২
হ্যামণ্ড ১০
হ্যামলেট ৩

A

Amald and Peter ১০৬
Art and Fiction ৪
Aspect of Novel ১৭

B

Berker ১০৩
Bert-Seller ৩১
Black Age ১০২
Bleak House ১১

C

Craft of Fiction ৪৩

G

George Sand ৫৪
Ginger Man, The ৩১

J

J. H. Bucukly ১০৬
J. K. & Barbara Hammond ১০২

M

Magic Mountain ২, ৩২
Moby Dick ২

N

Napoleon's Russian Compaign ১৪৮

P

Political Economy ১০২

R

Rajmohon's Wife ১০৭

S

Segur ১৪৮
Sign of Four ২

T

Tristram Shandy ২

U

Ulysses ২, ৩, ১৬, ৩২

V

Victorian Temper ১০৬

W

Why the novel Matters ২৯